দুই বাংলার প্রাণের গল্প

সুদিন চট্টোপাধ্যায় ▫ শ্যামলকান্তি দাশ

সম্পাদিত



দুই বাংলার প্রাণের গল্প

দুই বাংলার প্রাণের গল্প

সম্পাদনা

সুদিন চট্টোপাধ্যায়

শ্যামলকান্তি দাশ

দীপ প্রকাশন ২০৯৫ বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৬

প্রকাশক
শংকর মণ্ডল
২০৯এ বিধান সরণি, কলকাতা ৬

প্রথম প্রকাশ
কলকাতা বইমেলা, জানুয়ারি ১৯৫৯

প্রচ্ছদ
ধীরেন শাসমল

টাইপ সেটিং
আই. ই. আর. ই.
২০৯এ বিধান সরণি, কলকাতা-৬

অফসেট প্রিন্টিং
লক্ষ্মীনারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২০৯এ বিধান সরণি, কলকাতা ৬

নিবেদন

দুই বাংলা কথাটাব মধ্যে গভীব বিষাদ জড়িয়ে আছে। পঞ্চাশ বছবেবও অধিককাল হয়ে গেল, তবু বিচ্ছেদেব বিষাদ যাওয়াব নয়. বাজনীতিব, ইতিহাসেব সত্য মেনে নিয়েছি আমবা সকলেই। কিন্তু কথাটা তো ঠিক, সব কিছু ওলটপালট হয়ে গিয়েছিল, এত বড ভাঙচুব বিশ্বাসেব, সৃষ্টিব, স্বপ্নেব জগতে কদাচিৎই আসে। কিন্তু যখন আসে সব কিছু নাড়িয়ে দিয়ে যায়, টলিয়ে দিয়ে যায়। ঘব গুছোতে সময় লাগে, লাগছে। তাব মধ্যে মনেব আবাম, বোধেব তৃপ্তিব কথা হল এইটুকুই যে বাজনীতিব বিভাজন আমাদেব সাহিত্য, সংস্কৃতি ও মননেব ক্ষেত্রে কোন ভেদবেখা টেনে দেয়নি। ওপাবেব সৃষ্টিব প্রসন্ন সূর্যালোক সামান্ত ডিঙিয়ে এপাবেব প্রাঙ্গণকে আলোয় ভাসিয়ে দিয়ে যায়। ওপাবও ভেসে ওঠে হেসে ওঠে আমাদেব আনন্দগানে। দুই বাংলাব প্রাণেব কলবব মুখবিত মিলন সীমান্ত মানেনি, মানে না। এপাব বাংলা ওপাব বাংলাব প্রেম-প্রতিবাদ, দুঃখ অভিমান, ক্ষুধা পিপাসা, বিস্ময় ব্যথাব কথা নিয়েই দুই বাংলাব প্রাণেব কথা। ছোটগল্পেব বাঁধনেব মধ্যে এসব কথা জড়ো হয়ে আছে। আমাদেব নিশ্বাসেব মত, সন্ধ্যাতাবাব নিষ্পলক চেয়ে থাকাব মত এগুলো সত্য। এই নিয়েই হৃদয়-বীণাব এই গান।

'তোমায় নিয়ে খেলেছিলেম খেলাব ঘবেতে।
খেলাব পুতুল ভেঙে গেছে প্রলয় ঝড়েতে।
থাক্ তবে সেই কেবল খেলা, হোক-না এখন প্রাণেব মেলা- -
তাবেব বীণা ভাঙল, হৃদয়-বীণায় গাহি বে।।'

আমাদেব এদিকেব গল্প গান সাহিত্য কবিতা ওদিকেব মানুষজনেবা উদাব অন্তঃকবণে গ্রহণ কবেন। তাঁবা তো বাংলাভাষাকে সংগ্রাম কবে নতুন জীবন দিয়েছেন। মুখেব ভাষাকে বুকেব ভাষা কবেছেন। তাই বাংলা ভাষায় সৃষ্টিব স্বাদ পেতে তাঁদেব অতুলনীয় আগ্রহ। আমবা কিন্তু ভাষা নিয়ে এবং ভাষাব সম্পদ যা সাহিত্যেব প্রাণবস্তু তা নিয়ে প্রত্যাশিত আবেগ দেখাতে পাবিনি। তাই ওপাবেব অনেক কিছুই আজও আমাদেব অপবিচিত। আমাদেব মানস চলাচলকে সহজ ও অনায়াস কবাব জন্য এ এক ক্ষুদ্র কিন্তু আন্তবিক প্রয়াস একথা ভাবা যেতে পাবে। প্রশ্ন উঠতে পাবে দুই বাংলাব প্রাণেব কথা জানতে আমবা ছোটগল্পকে বেছে নিলাম কেন? উত্তবটা খুব সহজ কবে একালেব যশস্বী সাহিত্যিক এবং সাহিত্য বিচাবক, অধুনা প্রয়াত নাবায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় দিয়েছিলেন। তাঁব কথায় '.....আধুনিক ছোটগল্প হল যন্ত্রণাব ফসল। মহৎ বিশ্বাস থেকে— অন্তত মোটামুটি একটা নিশ্চিন্ত ভিত্তি থেকে (যা ফ্লোব্যাবও বাজতন্ত্রেব মধ্যে পেয়েছিলেন) উপন্যাস সৃষ্টি হয়, কিন্তু শূন্যতাব আঘাতে তাব উপকবণগুলো টুকবো টুকবো হয়ে ভেঙে পড়ে— আদর্শ আব বিশ্বাসেব উজ্জ্বল-কোণিক ধাবালো খণ্ডগুলিকে লেখক জিজ্ঞাসাব মাধ্যমে নগ্ন-তীক্ষ্ণতাব সঙ্গে ছুঁড়ে দিতে থাকেন।' এই নগ্ন তীক্ষ্ণতাব মধ্যে দিয়ে নিজেদেব পবিচিত পৃথিবী, সুখ দুঃখ, শোক-বিহ্বলতা,

চাওয়া-পাওয়া, এক কথায় প্রাণের কান্না-হাসি, বিচিত্র বেদনা ও পরম প্রসন্নতায় আত্মপ্রকাশ করে।

মাত্র খানকয় গল্প বেছে নিয়ে যে সংকলন তাকে কখনওই উভয় বাংলার কালোত্তীর্ণ প্রতিভার প্রতিনিধিত্বমূলক সংকলন বলে দাবি করা যায় না। বাংলা ছোটগল্পের প্রাণপুরুষ, জনক যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সময় থেকে পরবর্তী বেশ কিছু কাল যে ছোটগল্পের স্বর্ণযুগ ছিল তার অনেকখানিই আমাদের এ ক্ষুদ্র সংকলনে অনুপস্থিত। কারণ একটাই এ গল্পগুলো অনেকেই পড়েছেন, বারবার পড়েছেন। আমরা অনতিঅতীত ও সাম্প্রতিক কালকে আমাদের বিবেচনার মধ্যে রেখেছিলাম। অবশ্য এই কালসীমার মধ্যে যে বিপুল পরিমাণ লেখালেখি হয়েছে তার খন্ডিত প্রতিবেদনও যে 'দুই বাংলার প্রাণের গল্প' এমন কথা আমরা বলি না। আসলে গল্প বাছাইয়ের ক্ষেত্রে ত্রুটি থেকে গেছে। যাঁরা বাছেন তাঁরা নিজের মত করেই বাছেন। তার মানে এই নয় যে যাঁদের লেখা অন্তর্ভুক্ত করা গেল না অথবা যে লেখাগুলি বাদ গেল তার মধ্যে সৃষ্টির ঐশ্বর্য কিছু কম আছে। বস্তুত বিপরীতটাই সত্য। বাংলা সাহিত্যে এমন অসংখ্য বেগবান, প্রাণচঞ্চল ও দ্যুতিময় গল্প রচিত হয়েছে যে কোন সংকলনেই তাদের ধরে রাখা সম্ভব নয়। সাহিত্যের সংসারে সবচেয়ে শেষে এসেও, বিষয়ে বৈচিত্র্যে সংখ্যায় এবং সৌকর্যে সে এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে সাদা চোখের পরিমিতি বোধের সীমানাকে সে সহজেই লঙ্ঘন করে যায়। ফলে বাছাইকারেরা তাঁদের জ্ঞানবুদ্ধির সীমাবদ্ধতাকে শিরোধার্য করতে বাধ্য হন। আরো একটা কথা না বললেই নয়, সম্পাদনার মধ্যে দিয়ে কিন্তু সাহিত্য বিচারের কোনো চেষ্টা করা হয়নি। পাঠকেরা প্রাজ্ঞ এবং শ্রদ্ধেয়। সাহিত্যের বিচারক, তা কবিতা গল্প অথবা উপন্যাস যাই হোক না কেন, একমাত্র পাঠকই হতে পারেন। দেশ এবং কালের সীমানা ডিঙিয়ে লেখা বেঁচে থাকবে কিনা তা পাঠকের হৃদয় এবং মননই বলে দেবে।

আমাদের এই প্রচেষ্টা আদৌ সফল হত কিনা সন্দেহ, যদি না শ্রদ্ধেয় আশিস সান্যাল সতত সাহস ও সাহায্য যোগাতেন। শ্রীমান সৌম্যেন্দু সামন্ত আমাদের স্নেহভাজন। সে সযত্নে সমস্ত প্রুফ দেখে দিয়েছে। বন্ধুবর শচীন দাশ গল্প বাছাই থেকে শুরু করে সম্পাদনার নানাকাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাহায্য করেছেন। শ্রী রতন ব্যানার্জি আমাদের অনুপ্রাণিত করেছেন শুরু থেকেই। আর তরুণ সাহিত্যপ্রেমী শ্রীমানশৌভিক ঘোড়ই উদার নিষ্ঠায় এই কাজের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছে প্রথম থেকেই। এঁদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার। তাই কৃতজ্ঞতার কথা উচ্চারণই করলাম না।

দীপ প্রকাশনীর কর্ণধার শংকর মণ্ডল এ জাতীয় বই প্রকাশে উদ্যোগী হয়ে যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়েছেন বললে অত্যুক্তি হবে না। তবে অসম্ভবের আমন্ত্রণ গ্রহণেই তাঁর আনন্দ বেশি। সেজন্য তাঁর প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। দুই বাংলার প্রাণের গল্প প্রাণে প্রাণে অবাধ আলাপের দ্বার খুলে দিক এই প্রার্থনা জানিয়ে নম্র নমস্কারে আমাদের নিবেদন শেষ করলাম।

সুদিন চট্টোপাধ্যায়

শ্যামলকান্তি দাশ

সূচিপত্র

এপার বাংলা

ওপার বাংলা

এপার বাংলা

স্তনদায়িনী

মহাশ্বেতা দেবী

মাস-পিসি বনগাঁ-বাসী বনের মধ্যে ঘর
কখনো মাসি বলল না যে, খই মোয়াটা ধর

যশোদার মাসি কখনো আদর করত, না অনাদর, তা যশোদার মনে পড়ে না। জন্ম থেকেই সে যেন কাঙালীচরণের বউ, তাতে গুণে জেয়ন্তে-মরন্তে কুড়িটা ছেলেমেয়ের মা। মনেই পড়ে না যশোদার, কবে তার গর্ভে সন্তান ছিল না, মাথা ঘুরত না সকালে, কাঙালীর শরীর কুপি-জ্বলা আঁধারে তার শরীরকে ভূ-তাত্ত্বিকের মতো ড্রিল করত না। মাতৃত্ব সইতে পাবে, কি পাবে না, সে-হিসেব কোনোদিন খতিয়ে দেখতে সময় পায়নি যশোদা। নিরন্তর মাতৃত্বই ছিল তার বাঁচবার ও অসংখ্য জীবের সংসারকে বাঁচাবার উপায়। যশোদা পেশায় জননী, প্রফেশ্যনাল মাদার। বাবুদের বাড়ির বউ-ঝির মতো এমেচার মা ছিল না যশোদা। এ জীবন পেশাদারদের একচেটিয়া। এমেচার ভিখিরী-পকেটমার-গণিকা এ শহরে পাত পায় না, এ রাজ্যে। এমনকি ফুটপাথ ও পথের নেড়িকুত্তা, ডাস্টবিন-লোভী কাক— তারাও নবাগত এমেচারদের ঠাঁই দেয় না। যশোদা মাতৃত্বকে পেশা হিসেবে নিয়েছিল।

সেজন্য দায়ী হালদারবাবুদের নতুন জামাইয়ের স্টুডিবেকার গাড়ি এবং বাবু-বাড়ির ছোট ছেলের ভরদুপুরে চালক হবার আকাঙ্ক্ষা। আকাঙ্ক্ষাটি ছেলেটির মনে হঠাৎ জেগেছিল। হঠাৎ-হঠাৎ ছেলেটির মনে ও শরীরে যেসব বাতিক চাগাত, তা তৎক্ষণাৎ পরিতৃপ্ত করতে না পারলে ছেলেটি ক্ষান্ত হতো না। হঠাৎ-হঠাৎ বাতিকগুলি ওর দুপুরের নৈঃসঙ্গ্যেই চাগাত এবং বোগদাদের খলিফার মতো ওকে বান্দা খাটাত। এ পর্যন্ত সে কারণে সে যা-যা করেছে, তাতে ক'রে যশোদাকে মাতৃত্বের পেশা নিতে হয়নি।

এক দুপুরে হঠাৎ কামের তাড়নায় ছেলেটি তাদের রাঁধুনিকে আক্রমণ করে ও রাঁধুনিটির পেটে তখন ভরা ভাত, চোরাই মুড়ো ও কচুশাকের ভার ছিল বলে, আলস্যে শরীর মন্থর ছিল বলে, রাঁধুনিটি, "লঃ, কি করবি কর"—বলে চিতিয়ে পড়ে থাকে। অতঃপর ছেলেটির ঘাড় থেকে বোগদাদী ভূত নামে এবং সে—"ক্যারেও কইও না মাসি" বলে সানুশোচনা অশ্রু ফেলে। রাঁধুনি তাকে "ইয়াতে আর কওন-বলনের আছে কি ?"—বলে সত্বর ঘুমোতে যায়। সে কোনদিনই কিছু বলে দিত না। কেননা তার শরীর ছেলেটিকে আকর্ষণ করেছে জেনে সে যথেষ্ট গর্বিত হয়েছিল। কিন্তু চোরের মন বোঁচকার দিকে। ছেলেটি পাতে অসঙ্গত সংখ্যায় মাছ ও ভাজা দেখে মনে-মনে প্রমাদ গণে। মনে করে রাঁধুনি তাকে ফাঁসালে সে কেচ্ছায় পড়বে। অতএব আরেক দুপুরে সে বোগদাদী জিহ্নের তাড়সে মায়ের আংটি চুরি করে, সেটি রাঁধুনির বালিশের ওয়াড়ে ঢোকায় এবং শোর তুলে রাঁধুনিকে তাড়িয়ে ছাড়ে। আরেক দুপুরে সে বাবার ঘর থেকে রেডিও তুলে নিয়ে বেচে দিয়েছিল। দুপুরের সঙ্গে ছেলেটির এহেন আচরণের সঙ্গতি খুঁজে না পাওয়া তার মা-বাপের পক্ষেও মুশকিল, কেননা তার পিতা পঞ্জিকা দেখে হরিসালের হালদারদের ঐতিহ্যমতে সন্তানদের গভীর নিশীথে সৃষ্টি করেছিলেন। বস্তুত এ বাড়িতে ফটক পেরোলেই ষোড়শ শতক। পঞ্জিকা ও স্ত্রী-গ্রহণ এ বাড়িতে আজো আচরিত। কিন্তু এসব কথা বাই-লেন মাত্র। এ সকল দুপুরে বাতিকেব জন্যে যশোদার মাতৃত্ব পেশা হয়নি।

কোনো এক দুপুরে কাঙালীচরণ দোকানের মালিককে দোকানে বসিয়ে কোঁচার আড়ালে চারটি চোরাই শিঙাড়া জিলিপি নিয়ে ঘরে ফিরছিল। প্রত্যহই ফেরে। যশোদা ও সে ভাত খায়। ছানাপোনা তিনটি বিকেলে বাসি শিঙাড়া ও জিলিপি খায়। কাঙালীচরণ ময়রার দোকানে তাড়ু নাড়ে ও সিংহবাহিনীর মন্দিরের যাত্রীদের মধ্যে যারা 'হারায়ে মারায়ে কাশ্যপ গোত্র' হয়নি, সে সকল জাত্যভিমানী বামুনদের 'সদ্ব্রাহ্মণের প্রস্তুত লুচি তরকারি' খাওয়ায় লুচি ভেজে। প্রত্যহই সে ময়দাটা-আটা সরায় ও সংসারে সুসার করে। দুপুর নাগাদ পেটে ভাত পড়লে যশোদার প্রতি তার বাৎসল্য ভাব জাগে এবং যশোদার স্ফীত স্তন নিয়ে নাড়াচাড়া ক'রে সে ঘুমিয়ে পড়ে। দুপুর নাগাদ ঘরে ফিরতে ফিরতে কাঙালীচরণ অদূর সুখের কথা ভাবছিল এবং স্ত্রীর সুবর্তুল স্তনের কথা ভেবে স্বর্গসুখ পাচ্ছিল। কচি মেয়ে বিয়ে করে তাকে কম খাটিয়ে প্রচুর খাওয়ালে আখেরে দুপুরে সুখ মেলে, একথা চিন্তা করে তার নিজেকে দূরদর্শী পুরুষবাচ্চা মনে হচ্ছিল। এহেন সময়ে বাবুদের ছেলে স্টুডিবেকার-সমেত ঘ্যাঁক ক'রে কাঙালীচরণকে বাঁচিয়ে তার পায়ের পাতা ও গোড়ালির ওপরের গোছ দুটি চাপা দিল।

নিমেষে লোক জমল। নেহাৎ বাড়ির সামনে দুর্ঘটনা নইলে 'রক্তদর্শন ক'রে ছেড়ে দিতুম, বলে নবীন পাণ্ডা চেঁচাতে লাগল। শক্তিস্বরূপিণী মায়ের পাণ্ডা সে, দুপুরে রৌদ্ররসে তেতে থাকে। নবীনের গর্জনে হালদাররা যে-যে বাড়িতে ছিল,

সবাই বেরুল। হালদারকর্তা সগর্জনে, "হালা আবুইদা ষাঁড, তুমি ব্রহ্মহত্যা করবায় ?" বলে ছেলেকে পেটাতে থাকেন। ছোট জামাই তখন স্বীয় স্টুডিবেকার সামান্য আহত দেখে স্বস্তিতে হাঁপ ছাড়লেন এবং এই পয়সায়-ধনী, কালচারে-পাঁঠা শ্বশুরগোষ্ঠীব চেয়ে তিনি যে শ্রেষ্ঠতর মানুষ, তা প্রমাণের জন্য মিহিন আদ্দির পাঞ্জাবির মতো ফিনফিনে গলায় বললেন, "লোকটা কি মারা যাবে? হাসপাতালে নিতে হবে না?"—কাঙালীর মনিবও ভিড়ের মধ্যে ছিল এবং পথে বিক্ষিপ্ত শিঙাড়া জিলিপি দেখে সে বলতে গিয়েছিল, "ছিঃ ঠাকুর! তোমার এই কাজ?"—এখন সে জিভ আগলাল এবং বলল, "তাই করুন সারা" —ছোট জামাই ও হালদারকর্তা কাঙালীচরণকে সত্বর হাসপাতালে নিলেন। কর্তার মনে আন্তরিক দুঃখ হল। দ্বিতীয় যুদ্ধের সময়ে, যখন তিনি ছাঁট লোহা বেচে-কেনে মিত্রশক্তির ফাসি-বিরোধী সংগ্রামে হায়তা করছেন—তখন কাঙালীচরণ কিশোর মাত্র। বামুন বলে তাঁর ভক্তিশ্রদ্ধা রক্তের পোকা ও সে কারণে ভোরে চাটুজ্জেবাবুকে না পেলে ছেলের বয়সী কাঙালীকে প্রণাম ক'রে তার ফাটা পায়ের ধুলো জিভে ঠেকাতেন। কাঙালী ও যশোদা তাঁর বাড়িতে পালাপার্বণে যায় আসে এবং বউমারা পোয়াতি হলে যশোদাকে কাপড়-সিঁদুর পাঠানো হয়। এখন তিনি কাঙালীকে বললেন, "কাঙালী! ভাইব না বাপ! আমি থাকতে তোমার কষ্ট অইব না।"—এখনি তাঁর মনে হল, কাঙালীর পায়ের পাতা দু'টি কিমা হয়ে গেছে, ঠেকা পড়লে আর পায়ের ধুলো নিতে পারবেন না। ভেবে বড় দুঃখ হল তাঁর, এবং "কি করল হারামজাদায়" বলে তিনি কেঁদে ফেললেন। হাসপাতালের ডাক্তারকে বললেন, "সবকিছু করেন! টাকায় লিগ্যা ভাইবেন না।"

কিন্তু ডাক্তারেরা পায়ের পাতা ফিরে দিতে পারলেন না। খুঁতো বামুন হয়ে কাঙালী ফিরে এল। ক্রাচ দু'টি হালদারকর্তা কবিয়ে দিলেন। ক্রাচ বগলে কাঙালী যেদিন ঘরে ফিরল, সেদিনই সে জানল, হালদার-বাড়ি থেকে প্রত্যহ যশোদার জন্য সিধা এসেছে। নবীন পাণ্ডা পাণ্ডা-কুলে সেজো। মায়ের ভোগের আড়াইআনার অংশীদার এবং সেই দুঃখে সে নিচু হয়ে থাকত। সিনেমায় রামকৃষ্ণকে কয়েকবার দেখার পর সে অনুপ্রাণিত হয়ে সেইমতে দেবীকে "তুষ্টু বেটি, পাগলি" বলে ও শক্তি-মতে কারণবারি দ্বারা চেতনা নিষিক্ত করে রাখে। সে কাঙালীকে বলল, "তোর জন্যে বেটির পায়ে ফুল চড়িয়েছিলুম। খেপী বললে, "কাঙালীর ঘরে আমার অংশ আছে, তার বরাতে ও বেঁচে উঠবে।" কাঙালী একথা যশোদাকে বলতে গিয়ে বলল, "অ্যাঁ? আমি যখন ছিলাম না, তুই ওই নব্নেটার সঙ্গে লটরখটর কচ্ছিলি?" যশোদা তখনি পৃথিবীর দুই গোলার্ধের মাঝে কাঙালীর সন্দেহী মাথাটি চেপে ধরলে ও বললে, "রোজ বাবুদের দু'টো ঝি এখেনে শুত আমাকে পাহারা দিতে। নবেনকে আমি আমল দিই? আমি না তোমার সথী স্ত্রী?"

বস্তুত হালদার-বাড়িতে গিয়েও কাঙালী তার স্ত্রীর প্রজ্বলন্ত সতীত্বমহিমার বহু কথা শুনল। যশোদা মায়ের মন্দিরে হত্যা দিয়েছে, সুবচনীর ব্রত করেছে, চেতলা

গিয়ে সিদ্ধবাবার চরণ ধরেছে। অবশেষে সিংহবাহিনী স্বপ্নে ধাইয়ের বেশে বগলে ব্যাগ নিয়ে এসে তাকে বলেছেন, "ভাবিসনি। তোর সোয়ামী ফিরে আসবে।" কাঙালী একথা শুনে বিশেষ অভিভূত হল। হালদারকর্তা বললেন, "বুঝলা কাঙালী! হালার অবিশ্বাসীরা কয়, মায়ে স্বপ্ন দিব, তা ধাই সাইজা ক্যান্? আমি কই, তিনি সৃষ্টি করে মা অইয়া, ধাত্রী অইয়া পালন করে।"

এরপর কাঙালী বলল, "বাবু! ময়বার দোকানে কাজ করব কি করে আর। কেবাচ নিয়ে তো বসে তাডু নাড়তে পারব না। আপনি ভগবান। কত লোককে কতভাবে অন্ন দিচ্ছেন! আমি ভিক্ষে চাইনি। এট্টা কাজের ব্যবস্তা করে দিন।"

হালদারবাবু বললেন, "হে কাঙালী! তোমার লিগ্যা জায়গা দেইখ্যা থুইছি। আমার বারিন্দার ছাউনি দিয়া এট্টা দোকান কইরা দিমু। সামনে সিংহবাহিনী! যাত্রী আসে, যাত্রী যায়। তুমি মুড়ি-মুড়খি, চিড়া-বাতাসার দোকান দাও। অহন বারিতে বিয়া লাগছে। আমার সপ্তম পুত্র, হেই আবাইগার বিয়া। যদ্দিন না দোকান অয়, তদ্দিন সিধা যাইবে।"

একথা শুনে, কাঙালী মনে বর্ষা সমাগমে বাদুলে পোকার মতো উড্ডীন হল ও ঘরে ফিরে সে যশোদাকে বলল, "সেই যে কালিদাসের শোলোকে আছে, নেই তাই খাচ্ছ, থাকলে কোথায় পেতে?" —আমার কপালে তাই হল রে! বাবু বলেছে, ছেলের বিয়ে মিটলে রকে দোকান ক'রে দেবে। যদ্দিন না দিচ্ছে, তদ্দিন সিধে পাঠাবে। ঠ্যাং থাকলে কি এরকমটা হতো? সবই মায়ের ইচ্ছে রে!"

ক্রাচ খটখটিয়ে কাঙালী সুসংবাদটি আপামরকে বিতরণ করল। ফলে তার প্রাক্তন মনিব নবীন পাণ্ডা, ফুলদোকানের কেষ্ট মহান্তি, মায়ের বাঁধা ঢাকী উল্লাস, সকলে বলল, "আহা! কলি বললে তো হয় না! মায়ের তল্লাটে পাপের পতন, পুণ্যের জয়, এ হতেই হচ্ছে। নইলে কাঙালীর পা খোয়া যাবে কেন? আর হালদারকত্তা বা বামুনের মন্যির ভয়ে এত কথা স্বীকার যাবে কেন? সবচে বড় কথা, যশোদাকে বা মা ধাই বেশে দেখা দেবে কেন? সবই মায়ের ইচ্ছে।"

এ ঘোর কলিতে পাঁচের দশকে কাঙালীচরণ পতিতুণ্ডকে ঘিরে দেড়শো বছর আগে স্বপ্নাদেশে প্রাপ্ত দেবী সিংহবাহিনীর ইচ্ছাসকল এভাবে পাক খাচ্ছে, তা দেখে সকলে যথোচিত বিস্মিত হয়। হালদারকর্তার হৃদয় পরিবর্তন, সেও মায়ের ইচ্ছে। হালদারকর্তা পাত্র না দেখে দয়া করেন না। তিনি স্বাধীন ভারতের বাসিন্দা, যে ভারত মানুষে মানুষে, রাজ্যে রাজ্যে, ভাষায় ভাষায়, রাঢ়ী বারেন্দ্র বৈদিকে, উত্তররাঢ়ী কায়স্থ ও দক্ষিণরাঢ়ী কায়েস্থে, কাপ কুলীনে প্রভেদ করে না। কিন্তু তিনি পয়সা করেছেন ব্রিটিশ আমলে, যখন ডিভাইড অ্যান্ড রুল ছিল পলিসি। হালদারকর্তার মানসিকতা তখনই গঠিত হয়ে গেছে। ফলে তিনি পাঞ্জাবি-উড়িয়া-বিহারি-গুজরাটি-মারাঠি-মুসলমান, কারুক্কে বিশ্বাস করেন না এবং দুর্গত বিহারি শিশু বা অনাহারে কাতর উড়িয়া ভিখারি দেখলে তাঁর বিয়াল্লিশ ইঞ্চি

গোপাল গেঞ্জির নিচে অবস্থিত, চর্বিতে সুরক্ষিত হৃৎপিণ্ডে করুণার ঘামাচি আদপে চুলকোয় না। তিনি হরিসালের সুসন্তান। ফলে পশ্চিমবঙ্গের মাছি দেখলেও তিনি "আঃ! দ্যাশের মাছি আছিল রিষ্টপুষ্ট— ঘটির দ্যাশে হকলডি চিমডা চাম্‌সা" বলে থাকেন। সেই হালদারকর্তা গাঙ্গেয় কাঙালীচরণকে কেন্দ্র ক'রে করুণাঘন হচ্ছেন, এ দেখে মন্দিরের চারিদিকে সকলেই বিস্মিত হয় এবং কিছুদিন ধরে লোকের মুখে মুখে এই কথাই ফেরে। হালদারকর্তা এমন ঘোর দেশপ্রেমী যে নাতি, ভাইপো, ভাগ্নেরা দেশনেতাদের জীবনী পাঠ্যপুস্তকে পড়লে কর্মচারীদের বলেন, "হঃ! ঢাকার পোলা, মইমনসিঙের পোলা, যশুইরা পোলা, ইয়াগর জীবনী পড়ায় ক্যান্‌? হরিসাইলা অইল দধীচির হাড়ে তৈয়াব। ব্যাদ উপনিষদ হরিসাইলার লিখা, এ্যাও একদিন প্রকাশ পাইবে।" তাঁর কর্মচারীরা তাঁকে এখন বলে, "আপনার চেইন্‌জ অফ হার্ট হইত্যাছে, ঘটির লিগ্যা আপনার এই দয়া, ইহার পাছে দ্যাখবেন ঈশ্বরের কুন্‌ বা পার্পাস আছে।" কর্তা একথায় আহ্লাদিত হন এবং "ব্রাহ্মণের কি ঘটি বাঙাল অয়? গলায় উপবীত থাকলে হ্যায় পাইখানায় বইয়া রইলেও মাইন্য দিতে অইব" বলে উচ্চ হাস্য করেন।

চতুর্দিকে এভাবে মায়ের ইচ্ছার প্রভাবে করুণা-মায়ামমতা-দয়ার সুবাতাস বইতে থাকে এবং নবীন পাণ্ডা কয়েকদিন ধবে সিংহবাহিনীর কথা যতবারই ভাবতে যায়, যশোদার উত্তুঙ্গস্তনা, গুরুনিতম্বা শরীর তার চোখে ভাসে এবং মা যশোদাকে যেমন ধাই সেজে স্বপ্ন দিলেন, তাকে যশোদা সেজে স্বপ্ন দিচ্ছেন কিনা সেকথা ভেবে তার শরীরে মন্দ উত্তেজনা জাগে। আট-আনার পাণ্ডা তাকে বলে, "মেয়েছেলের এ রোগ হলে বলে প্যাদ রোগ, বেটাছেলের হলে বলে ম্যাদ বোগ। তুই পেচ্ছাপ করার সময়ে কানে অপরাজিতার শেকড বাঁদ্‌।"

একথা নবীনের মনে নেয় না। একদিন সে কাঙালীকে বলে, "মায়ের ছেলে, শক্তি নিয়ে ব্যালা করব না। তবে একটা বুদ্ধি মাথায় এয়েচে। বোষ্টম ভাব নিয়ে ব্যালা করতে বাধা নেই। তোকে বলি, স্বপ্নে গোপাল পা একখানা। আমার পিসি শ্রীকেত্তর থেকে গোপাল এনিছিল পাতরের। সেটা তোকে দিই। স্বপ্নে পেইছিস বলে প্রচার দে। দেকবি দুদিনে রম্‌রমা হবে, ঝমঝমিয়ে পয়সা পডবে। পয়সাব জন্যে শুরু কব, পরে মনে গোপাল-ভাব আসবে।"

কাঙালী বলে, "ছি দাদা! ঠাকুর-দেবতা নিয়ে তামাশা করতে আছে?"

নবীন তাকে, "তবে মর্‌গা যা!" বলে তাড়া দেয়। পরে দেখা যায়, নবীনের কথা শুনলে কাঙালী ভাল করত। কেননা, হালদারকর্তা হঠাৎ একদিন হার্টফেল ক'রে মরে যান। কাঙালী ও যশোদার মাথায় শেক্ষপীরের ওয়েলকিন ভেঙে পড়ে।

কাঙালীকে পথে বসিয়ে যান হালদারকর্তা। কাঙালীকে দিয়ে ভায়া-মিডিয়া হালদারকর্তা সিংহবাহিনীর যেসব ইচ্ছা প্রকাশ পাচ্ছিল, তার প্রাক্‌ ভোট রাজনীতিক দল-প্রদত্ত প্রজ্বলন্ত প্রতিশ্রুতির মতো শূন্যে মিলায় ও নিরুদ্দেশ-যাত্রার নায়িকার মতো রহস্যজালের মায়ায় অদেখা হয়। কাঙালী ও যশোদার রঙিন স্বপ্ন-ফানুসটিতে

যুরোপীয় ডাইনির বডিকিন ফুট্‌কে যায় এবং স্বামী-স্ত্রী আতান্তরে পড়ে। ঘরে গোপাল, নেপাল ও রাধারানী খাবার তরে আখ্‌খুটে বায়না ধরে ও মায়ের মুখ খায়। শিশুদের এই 'ওদনের তরে" কান্নাকাটি খুবই স্বাভাবিক। কাঙালীচরণের চরণ খোয়া যাবার পর থেকে প্রত্যহ হালদাব-বাড়ির সিধায় ভালমন্দ খেয়েছে। কাঙালীও ভাতের তরে কাতর হয় এবং মনে গোপাল ভাব জাগিয়ে যশোদার বুকে মুখ খুঁশতে ধমক খায়। যশোদা একেবারে ভারতীয় রমণী, যে রমণীর যুক্তি বুদ্ধি বিচারহীন স্বামীভক্ত ও সন্তানপ্রেমের কথা, অস্বাভাবিক ত্যাগ তিতিক্ষার কথা, সতী সাবিত্রী সীতা থেকে শুরু করে নিরুপা রায় ও চাঁদ ওসমানি পর্যন্ত নকল ভারতীয় নারী জনমানসে জাগিয়ে রেখেছেন। এহেন স্ত্রীলোককে দেখেই সংসারের ন্যালা মাক্‌ড়ারা বোঝে, ভারতের সেই ঐতিহ্য প্রবহমান— বোঝে এদের কথা মনে রেখেই এই সব আপ্তবাক্য রচিত হয়েছে—

"স্ত্রীলোকের জান যেন কচ্ছপের প্রায়"—
"বুক ফাটে তণ্মুখ ফোটে না"—
"পুড়বে নারী উড়বে ছাই
তবে নারীর গুণ গাই"—

বস্তুত, বর্তমান দুরবস্থার জন্য যশোদার একবারও স্বামীকে দুষতে ইচ্ছে যায় না। শিশুদের তরে যেমন, কাঙালীর তরেও তেমনি মমতা তার বুকে উছলে ওঠে। পৃথিবী হয়ে গিয়ে ফলে শস্যে অক্ষম স্বামী ও নাবালক সন্তানদের ক্ষুধা মিটাতে ইচ্ছা যায়। যশোদার এই স্বামীর প্রতি বৎসল ভাবটির কথা জ্ঞানী মুনিরা লিখে যাননি। তাঁরা প্রকৃতি ও পুরুষ এই ভাবে নারী পুরুষকে ব্যাখা করেছেন। কিন্তু সে তাঁরা করেছেন আদ্যি যুগে— যখন অন্য দেশ থেকে তাঁরা এই পেনিনসুলায় প্রবেশ করলেন। ভারতের মাটির গুণ এমনি যে এখানে রমণীরা সবাই জননী হয়ে যায় এবং পুরুষরা সবাই গোপাল ভাবে আপ্লুত থাকে। সকল পুরুষই গোপাল ও সকল রমণী নন্দরানী, এ ভাবটি যাঁরা অস্বীকার ক'রে নানারূপে 'ইটার্নাল শী—'মোনালিসা'—'লা পাসিওনারিয়া'— 'সিমন দ্য ব্যোভোআর'— ইত্যাদি পছন্দমতো কারেন্ট পোস্টার পুরনো পোস্টারের ওপরে সাঁটতে চান ও মেয়েদের সেভাবে দেখতে চান, তাঁরাও এ ভারতের ছানাপোনা। তাই দেখা যায় শিক্ষিত বাবুদের এ সকল অভীপ্সা বাইরের মেয়েছেলেদের জন্য। ঘরে ঢুকলে তাঁরা বিপ্লবিনীদের মুখে ও ব্যবহারে নন্দরানীকেই চান। প্রসেসটি খুবই জটিল। এটি বুঝেছিলেন বলে শরৎচন্দ্রের নায়িকারা নায়কদের সতত চারটি বেশি করে ভাত খাইয়ে দিতেন। শরৎচন্দ্রের এবং অন্যান্য অনুরূপ লেখকদের লেখার আপাত সরলতা আসলে খুব জটিল এবং সন্ধেবেলা শান্ত মনে বেলের পানা খেয়ে চিন্তা করার কথা। পশ্চিমবঙ্গে যাঁরাই লেখাপড়া ও চিন্তাশীলতার কারবার করেন, তাঁদের জীবনে তামাশার প্রভাব অত্যন্ত বেশি এবং সে কারণে বেল ফলটিতে তাঁদের সমধিক গুরুত্ব

দেওয়া উচিত। বেলফল-থানকুনি-বাসকপাতাকে সমধিক গুরুত্ব দিই না বলে আমরা যে কত কি হারাচ্ছি তা নিজেরা বুঝি না।

যা হোক, যশোদার জীবনকথা বলতে বসে বারংবার বাই-লেনে ঢোকার অভ্যেস ঠিক নয়। পাঠকের ধৈর্য কিছু কলকাতার পথঘাটের ফাটল নয় যে দশকে-দশকে বেড়ে চলবে। আসল কথা হল, যশোদা সমধিক ফাঁপরে পড়ল। কর্তার শ্রাদ্ধ চলার কালে তারা লুটেপুটে খেল বটে, কিন্তু সব চুকেবুকে গেলে যশোদা রাধারানীকে বুকে ধরে ওবাড়িতে গেল। বাসনা, গিন্নিকে বলেকয়ে তাঁর নিরিমিষ হেঁসেলের রান্নার কাজ চেয়ে নেবে।

গিন্নির বুকে কর্তার শোক বেজেছিল খুব। কিন্তু উকিলবাবু জানিয়ে গেছেন কর্তা এই বাড়ির মালিকানা, চালের আড়তের স্বত্ব তাঁকেই দিয়ে গেছেন। তিনি সেই বলে বুক বেঁধে আবার সংসার সাম্রাজ্যের হাল ধরেছেন। মাছটা-মুড়োটা বলে বড় কষ্ট হয়েছিল। এখন দেখছেন উৎকৃষ্ট গাওয়া ঘি, গাঙ্গুরামের দই, সন্দেশ, ঘন ক্ষীর ও মর্তমান কলা খেয়েও কোনোমতে শরীরটা টিকিয়ে রাখা চলে। গিন্নি জলচৌকি আলো করে বসে আছেন। কোলে এক ছ-মেসে ছেলে, গিন্নির নাতি। এ পর্যন্ত ছয় ছেলের বিয়ে হয়েছে ও পঞ্জিকায় যেহেতু প্রায় মাসেই স্ত্রী-গ্রহণ অনুমোদিত, সেহেতু গিন্নির বাড়িতে একতলায় সার সার আঁতুড়ঘর প্রায়শ ফাঁক যায় না। লেডি ডাক্তার ও সরলা ধাই এ বাড়ি ছাড়া হয় না। গিন্নির মেয়ে ছয়টি। তারাও দেড়বছুরে পোয়াতি। তাই কাঁথা-কানি-ঝিনুক-বোতল-রবারক্লথ-বেবিজন্‌সন্‌ পাউডার-স্নানের এপিডেমিক লেগেই থাকে।

গিন্নি নাতিকে দুধ খাওয়ার চেষ্টায় জেরবার হচ্ছেন ও যশোদাকে দেখে স্বস্তি পেয়ে যেন বললেন, "মা আমার ভগবান হইয়া আস্‌ছ! এবারে দুধ দাও মা, পা ধরি। মায়ের অসুখ— তা এমন পোলা যে বুতল মুখে ধরে না।" যশোদা তখনি ছেলেকে দুধ দিয়ে শান্ত করল। গিন্নির সনির্বন্ধ অনুরোধে যশোদা রাত ন-টা অবধি ওবাড়িতে থাকল এবং গিন্নির নাতিকে দফায় দফায় দুধ দিল। তার সংসারের জন্য রাঁধুনি বাম্‌নি ভাত-তরকারি গামলা ভরে দিয়ে এল। ছেলেকে দুধ দিতে দিতেই যশোদা বলল, "মা! কর্তা তো কত কথাই বলিছিলেন। তিনি নেই, তাই সেকথা আর ভাবি না। কিন্তু মা! তোমার বামুন ছেলের পা দু'খানা নেই। আমার জন্যে ভাবি না। কিন্তু সোয়ামি-ছেলের কথা ভেবে বলছি, যা হয় এটা কাজ দাও। নয় তোমার সোন্‌সারে রান্না কাজ দিলে?"

"দেখি মা! চিন্তা কইরা দেখি।" গিন্নির কর্তার মতো বামুন ভজা নন। তাঁর ছেলের দুপুরে বাই চাগানো দোষে কাঙালীর পা গেছে একথা তিনি পুরো মানেন না। নিয়তি কাঙালীরও, নইলে খটখটে রোদে ফিক্‌ফিক্‌ ক'রে হেসে হেসে পথ ধরে সে যাচ্ছিল কেন? তিনি মুগ্ধ ঈর্ষায় যশোদার ম্যামাল প্রোজেকশান দেখেন

ও বলেন, "কামধেনু কইরা তোমায় পাঠাইছিল বিধাতা। বাঁট টানলেই দুধ! আমার ঘরে যেগুলো আনছি, তাদের এ্যার সিকিভাগ দুধ-অবুঁঠায় নাই!"

যশোদা বলে, "সে আর বলতে মা। গোপাল ছেড়ে দিল, বয়স হল তিনবছর। এটা তখনো পেটে আসেনি। তাতেও দুধে যেন বান ডাকত। কোত্থেকে আসে মা? খাওয়া নেই, মাখা নেই।"

একথা নিয়ে রাতে মেয়েমহলে প্রচুর কথা হয় এবং রাতে ব্যাটাছেলেরাও একথা শোনেন। মেজ ছেলে, যাঁর স্ত্রী অসুস্থ এবং যাঁর ছেলে যশোদার দুধ খেল, তিনি সবিশেষ স্ত্রৈণ। অন্য ভায়েদের সঙ্গে তাঁর তফাত হল, ভাইরা পাঁজি দেখে সুদিন পেলেই সপ্রেমে বা অপ্রেমে বা বিরক্ত মনে বা কারবারে গুণ চটের কথা ভাবতে ভাবতে সন্তান সৃজন করেন। মেজছেলে একই ফ্রিকোয়েন্‌সিতে স্ত্রীকে গর্ভবতী করেন, কিন্তু তার পেছনে থাকে সুগভীর প্রেম। স্ত্রী বারবার গর্ভবতী হন, সে ভগবানের হাত। কিন্তু সেইসঙ্গে স্ত্রী যাতে সুন্দরী থাকেন, সেজন্যেও মেজছেলে আগ্রহী। ক্রমান্বয় গর্ভাধান ও সৌন্দর্যের কম্‌বিনেশন কিভাবে করা যায়, একথা তিনি অনেক ভেবে থাকেন, কিন্তু কূল পান না। মেজছেলে আজ স্ত্রীর মুখে যশোদার সারপ্লাস দুধের কথা শুনতে শুনতে হঠাৎ বলেন, "পাইছি পথ।"

"কিসের পথ?"

"এই তোমার কষ্ট বাঁচাইবার পথ।"

"কেম্‌তে? আমার কষ্ট যাইব চিতায় ওঠলে। বছর-বিয়ানীর আর শরীল সারে?"

"সারব সারব, ভগবানের কল হাতে পাইছি যে! বছর বিয়াইবা, দ্যাহও থাকব।"

স্বামী-স্ত্রী পরামর্শ হল। স্বামী সকালে গিয়ে মায়ের ঘরে ঢুকলেন ও ঘুচুর ঘুচুর ক'রে কথা কইলেন। গিন্নি প্রথমে গাঁইগুঁই করতে লাগলেন কিন্তু তার পরে স্বগতচিন্তা করতে করতে বুঝলেন প্রস্তাবটি লাখ টাকার। বউরা এসেছে, বউরা মা হবে। মা হলে ছেলেকে দুধ খাওয়াবে। যেহেতু যতদিন সম্ভব, ততদিনই মা হবে— সেহেতু ক্রমান্বয়ে দুধ খাওয়ালে চেহারা ঝটকাবে। তখন যদি ছেলেরা বারমুখে হয় বা বাড়ির ঝি'দের ওপর উৎপাত করে, গিন্নি কিছু বলতে পারবে না। ঘরে পাচ্ছে না বলে বাইরে যাচ্ছে— হক কথা। তাই যশোদা যদি কচিকাঁচাদের দুধ-মা হয়, তাহলে নিত্য সিধা, পুজোয় পার্বণে কাপড়, মাসান্তে কিছু টাকা দিলেই কাজ হয়। গিন্নির বাড়িতে আজ চাপড়াষষ্ঠী, কাল সুরচনী, পরশু মঙ্গলচণ্ডীব্রত লেগেই থাকে। তাতেও যশোদাকে বামুন-এয়ো করা চলবে। তাঁর ছেলের কারণে যশোদার এত খোয়াব, পাপও স্খালন হবে।

যশোদা তাঁর প্রস্তাবে হাতে মন্ত্রীত্ব পেল। নিজের স্তন দু'টিকে বড় মহার্ঘ মনে হল তার। রাতে কাঙালীচরণ খুনসুড়ি করতে এলে সে বলল, "দেখ! এখন এর জোরে সংসার টানব। বুঝেশুনে ব্যবহার করবে।" কাঙালীচরণ সে রাতে গাঁইগুঁই

করল বটে, কিন্তু সিধাতে চাল-ডাল-তেল-আনাজের বহর দেখে তার মন থেকে গোপাল-ভাবটি নিমেষে চলে গেল। ব্রহ্মা-ভাবে সে উদ্দীপিত হল এবং যশোদাকে বুঝিয়ে বলল, "পেটে সন্তান থাকলে তবে তো তোর বুকে দুধ আসবে। এখন সেকথা ভেবেই তোকে কষ্ট করতে হবে। তুই সতীলক্ষ্মী। নিজেও পোয়াতি হবি, পেটে ছেলে ধরবি, বুকে পালন করবি, এ ত জেনেই মা তোকে ধাইবেশে দেখা দিইছিল।"

যশোদা এককথার যাথার্থ্য বুঝল ও সাশ্রুচোখে বলল, "তুমি স্বামী, তুমি গুরু। যদি বিস্মরণ হয়ে না-না করি, তুমি সোঙরে দিও। কষ্ট আর কি বল? গিন্নি মা কি তেরটা বিয়োয়নি? গাছের কি ফল ধরতে কষ্ট হয়?"

অতএব সেই নিয়মই বহাল রইল। কাঙালীচরণ পেশাদারী পিতা হল। যশোদা হল প্রফেশানে মা। বস্তুত যশোদাকে দেখলে এখন সেই সাধকমার্গের গানটির গভীরতা অবিশ্বাসীরও মনে জাগে। গানটি হল—

মা হওয়া কি মুখের কথা?
শুধু প্রসব কল্লে হয় না মাতা।

হালদার-বাড়ির একতলায় চক্‌মেলানো উঠোনের চারধারে বড়-বড় ঘরে বারো চোদ্দটি সুলক্ষণা গাভী হামেশা হামেহাল বজায় থাকে। দু'জন ভোজপুরী গোমাতা স্তানে তাদের পরিচর্যা করে। খোল-ভুসি-খড়-ঘাস-গুড় পাহাড়-পাহাড় আসে। হালদারগিন্নি বিশ্বাস করেন, গরু খাবে যত, দুধ দেবে তত। যশোদার জায়গা এ বাড়িতে এখন গো-মাতাদের ওপরে। গিন্নির ছেলেরা ব্রহ্মাবতার হয়ে প্রজাদের সৃষ্টি করে। যশোদা প্রজা প্রপালিকা। তার দুগ্ধসঞ্চয় যাতে অব্যাহত থাকে সেদিকে হালদারগিন্নি কড়া নজর রাখলেন। কাঙালীচরণকে ডেকে বললেন, "হ্যাঁ বামুন ছেলে? দোকানে তাড়ু নাড়তা, ঘরে পাকসাকের ভারটা নিয়া অরে আবাম দেও। নিজের দু'টো, এখানে তি'নটা, পাঁচ'টারে দুধ দিয়া ঘরে গিয়া পাকসাক করতে পারে?"

কাঙালীচরণের জ্ঞাননেত্র এভাবে খুলে গেল এবং নিচে এসে ভোজপুরীদ্বয় তাকে খৈনি দিয়ে বলল, "মা জী ত ঠিকাহি বলেছে। হামরা গৌ-মাতার ইতনা সেবা করি— তা তুর বহু তো জগৎমাতা আছে।"

এরপর থেকে কাঙালীচরণ বাড়ির রান্নার ভার তুলে নিল হাতে। ছেলে মেয়েদের ক'রে তুলল কাজের সাগরেদ। ক্রমে সে থোড়ঘণ্ট, কলাই ডাল, মাছের অম্বল রাঁধতে বড়ই সেয়ানা হল এবং সিংহবাহিনীর প্রসাদী পাঁঠার মাথার মুড়িঘণ্ট রেঁধে নবীনকে খাইয়ে-খাইয়ে সেই দুর্দান্ত গেঁজল মাতালকে নিজের বশীভূত ক'রে ফেলল। ফলে নবীন কাঙালীকে নকুলেশ্বর শিবের মন্দিরে ঢুকিয়ে দিল। যশোদা প্রত্যহ রাঁধা ভাত-ব্যঞ্জন খেয়ে পি.ডব্ল্যু অফিসারের ব্যাংক-অ্যাকাউন্টের মতো ফুলে ফেঁপে উঠল!

তার ওপর গিন্নি তাকে দুধ উঠ্নো করে দিলেন। পোয়াতি হলে তার জন্যে আচার-ঝালনাডু-মোরব্বা পাঠাতে থাকলেন।

এইভাবে অবিশ্বাসীদেরও প্রত্যয় জন্মাল, যশোদাকে সিংহবাহিনী এই কারণেই বগলে ব্যাগ নিয়ে ধাই হয়ে দেখা দিয়েছিলেন। নইলে নিরন্তর গর্ভধারণ, সন্তান-প্রসব, অপরের ছানাপোনাকে গাভীর মতো অকাতরে দুগ্ধদান, কে কবে শুনেছে বা দেখেছে? নবীনের মন থেকেও মন্দ ভাব চলে গেল। পাঁঠার মাথা, কারণবারি, গাঁজা, এহেন উগ্র জিনিস খেয়েও তার শরীর আর তাতল না। মনে আপনা হতেই ভক্তিভাব এল। যশোদাকে সে দেখা হতেই "মা! মা! মাগো!" বলে ডাকতে থাকল। চতুর্দিকে সিংহবাহিনীর মাহাত্ম্য বিষয়ে বিশ্বাস পুনর্জাগ্রত হল এবং অঞ্চলটির বাতাসে দেবীমাহাত্ম্যের ইলেকট্রিফাইং প্রভাব বইতে থাকল।

যশোদা বিষয়ে সকলের ভক্তিভাব এমন প্রখর হল যে বিয়ে-সাধ-অন্নপ্রাশন পইতেতে সকলে তাকে ডেকে প্রধানা এয়োর সম্মান দিতে থাকল। যশোদার ছেলে বলে নেপাল-গোপাল নেনো-বোঁচা-পটল ইত্যাদিকে সবাই সেই চোখে দেখতে থাকল, এবং যে যেমনটি বড় হল, পইতে নিয়ে মন্দিরে যাত্রী ধরে আনতে থাকল। রাধারানী, আলতারানী, পদ্মরানী ইত্যাদি মেয়েদের জন্যে কাঙালীকে বর খুঁজতে হল না। নবীন আশ্চর্য তৎপরতায় মেয়েদের বর জুটিয়ে দিল ও সতী মায়ের সতী কন্যারা যে যার শিবের ঘর করতে গেল।

হালদার-বাড়িতে যশোদার আদর বেড়ে গেল। স্বামীরা খুশি, কেননা এখন আর তাঁদের পাঁজি উলটোতে দেখলে বউদের হাঁটুতে ঠকঠকি লাগে না। তাঁদের গোপালরা যশোদার স্তন্যে লালিত হচ্ছে বলে তাঁরা যথেচ্ছ গোপাল হতে পারেন বিছানায়। বউদের 'না' বলবার মুখ রইল না। বউরা খুশি। কেন না দেহের ডোলটি ভাল থাকল। তারা যথেচ্ছ মেম কাটের জামা ও বডিস্ পরতে পারল। হোলনাইট সিনেমা দেখে শিবরাত্তির করার সময়ে ছেলেকে দুধ দিতে হল না। এ সবই সম্ভব হল যশোদার জন্যে। ফলে যশোদার মুখ খুলল এবং শিশুদের নিরন্তর স্তন দিতে দিতে গিন্নির ঘরে বসে সে ফুট কাটতে থাকল, "মেয়েছেলে বিয়োবে, তার জন্যে ওষুধ রে, ব্লাডপেসার দেখা রে, ডাক্তার দেখানো রে। আদিখ্যেতা! এই তো আমি! বছর-বিউনি হইছি। তাতে কি শরীর টস্কাচ্ছে, না দুধ কমছে? কি ঘেন্না মা! শুনছি নাকি ইঞ্জিশান দিয়ে সব দুধ শুকিয়ে ফেলেছে। এমন কথাও শুনিনি কখনো!"

হালদার-বাড়ির ছেলেদের মধ্যে যারা কিশোর, তাদের বাপ-জ্যেঠা-কাকারা গোঁফ গজাতেই ঝি'দের আওয়াজ দিত। দুধ-মার দুধে তারাও মানুষ, তাই দুধ-মার বন্ধু ঝি-রাঁধুনিকে তারা এখন মাতৃভাবে দেখতে থাকল এবং মেয়ে-ইস্কুলের চারপাশে হাঁটাহাঁটি শুরু করল। ঝিয়েরা বলল, "যশি! ভগবতী হয়ে এইছিলি তুই! তো' হতে বাড়ির হাওয়া পালটাল!"

ছোট ছেলে যখন একদিন উবু হয়ে বসে যশোদার দুগ্ধদান দেখছে, তখন

যশোদা বলল, "তুমি বাছা আমার নক্ষী! বামুনের ঠ্যাং খুঁতো করেছিলে বলে তো এতসব হল? বল দেখি কার ইচ্ছেয় হল?"

ছোট্ট হালদার বলল, "সিংহবাহিনীর ইচ্ছে!"

তার জানতে ইচ্ছে হয়েছিল, ঠ্যাং নেই, তবু কাঙালীচরণ ব্রহ্মা হয় কি উপায়ে? কথাটা ঠাকুর দেবতার দিকে চলে গেল বলে, সেও প্রশ্নটি ভুলে গেল।

সবই সিংহবাহিনীর ইচ্ছে!

পঞ্চাশের দশকে কাঙালীর ঠ্যাং কাটা যায়, আমাদের কাহিনী এই সময়ে পৌঁছেছে। পঁচিশ বছরে, থুড়ি তিরিশ বছরে, যশোদা কুড়ি বার আঁতুড়ে ঢুকেছে। শেষের দিকের মাতৃত্বগুলো বেফয়দা যায়, কেননা, কেমন ক'রে যেন হালদার-বাড়িতে নতুন হাওয়া ঢুকে পড়ল। ওই পঁচিশ না তিরিশ বছরের গণ্ডগোলটুকু সেরে নিই। কাহিনী যখন শুরু হয় তখনি যশোদা তিন ছেলের মা ছিল। তারপর তার সতেরোবার সন্তান-সম্ভাবনা হয়। হালদারগিন্নিও মরে গেলেন। তাঁর বড় ইচ্ছে ছিল, তাঁর শাশুড়ির যেমনটি হয়েছিল, তেমনটি বউদের কারো হোক। কুড়িটি সন্তান হলে আবার স্বামী-স্ত্রীর বিয়ে হবার নিয়ম ছিল বংশে। কিন্তু বউমারা বারো-তেরো-চোদ্দতে ক্ষান্ত দিল। দুর্বুদ্ধিবশত তারা স্বামীদের বোঝাতে সক্ষম হল এবং হাসপাতালে গিয়ে ব্যবস্থা করে এল। এসবই নতুন হাওয়ার কুফলে ঘটল। কোনো যুগেই জ্ঞানী পুরুষ বাড়িতে নতুন হাওয়া ঢুকতে দেন না। দিদিমার কাছে শুনেছি জনৈক ভদ্রলোক তাঁর বাড়িতে এসে 'শনিবারের চিঠি' পড়ে যেতেন। কদাচ ঘরে বইটি ঢোকাতেন না। বলতেন, "বউ-মা-বোন যে ওই কাগজ পড়বে, সেই বলবে আমি নারী! মা নই, বোন নই, বউ নই।" ফলে কি ঘটবে, তা জিগ্যেস করলে বলতেন, "চটি পরে ভাত রাঁধবে।" নতুন হাওয়ার প্রকোপে অন্দরে অশান্তি হয়, এ চিরকালের নিয়ম।

হালদার-বাড়িতে চিরকাল ষোড়শ শতক চলছিল। কিন্তু সহসা বাড়িতে মেম্বর সংখ্যা অগণিত হল বলে ছেলেরা যে যার মতো নতুন বাড়ি বানিয়ে সটকে পড়তে থাকল। সবচেয়ে আপত্তির কথা, মাতৃত্ব বিষয়ে গিন্নির নাতবৌরা একেবারে উলটো হাওয়া খেয়ে ঘরে ঢুকল। বৃথাই গিন্নি বললেন, চালের অভাব, টাকার অভাব নেই। কর্তার বড় সাধ ছিল হালদারদের দিয়ে অর্ধেক কলকাতা ভরে ফেলেন। নাতবৌরা নারাজ। তারা বুড়ির দাবড়ি অগ্রাহ্য করে স্বামীদের নিয়ে কর্মস্থলে ছাঁটল। এরই মধ্যে সিংহবাহিনীর মন্দিরের পাণ্ডাদের মধ্যে বিষম কলহ হওয়াতে কে বা কাহারা যেন দেবীর মূর্তি ঘুরিয়ে দিল। মা মুখ ফিরিয়েছেন একথা শুনে গিন্নির বুক ভেঙে গেল এবং মনোদুঃখে ভরা জ্যৈষ্ঠে অসঙ্গত পরিমাণে কাঁঠাল খেয়ে দাস্তবমি হয়ে তিনি মারা গেলেন।

গিন্নি মরেই খালাস পেলেন, কিন্তু জ্যান্ত থাকার জ্বালা মরণ হতে বেশি। গিন্নির

মৃত্যুতে যশোদার আন্তরিক দুঃখ হল। বয়স্ক মানুষ পাড়ায় মরলে বাসিনীর মতো সুবিন্যাসে কেউ কাঁদতে পারে না, বাসিনী এ বাড়ির পুরনো ঝি। কিন্তু যশোদার ভাতের থালাটি গিন্নির সঙ্গে বিসর্জন গেল, তাই যশোদা আরো সুবিন্যাসে কেঁদে সকলকে অবাক করে দিল।

বাসিনী কাঁদল, "অ ভাগ্যিমানী মা! মাথার চুড়োটি খসতে কত্তা হয়ে সকলেরে যে আগলে রেখেছিলে মা! কার পাপে চলে গেলে মা গো! ওগো, আমি যে বন্নু, অত ক্যাটাল খেওনি, তা মোর কতা যে মোটে নিলে না গো মা!"

যশোদা বাসিনীকে দম নিতে সুযোগ দিল ও সেই বিরতিতে কেঁদে উঠল, "কেন রইবে মাগো! ভাগ্যিমানি তুমি, পাপের সংসারে রইবে কেন বল গো মা! সিংহাসন পাতা ছিল তা যে তুলে ফেললে গোল বউদিরা! গাচ যখন বলে ফল ধরবনি, সে যে পাপ গো! অত পাপ কি তুমি সইতে পার মাগো! তা বাদে সিংহবাহিনী যে মুক ফেরালে গো মা! বুঝিছিলে পুণ্যের পুরী পাপের পুরী হয়ে গেল, এ পুরীতে কি তুমি বাস কত্তে পার? কত্তা চলে যেতে তোমারো যে মন চলে গিইছিল গো মা! শরীলটা সংসারের দিকে চেয়ে ধরে রেখেছিলে বই তো নয়। অ বউদিরা! আলতা দিয়ে পায়ের ছাপ উটিয়ে রাখ গো! ও পায়ের ছাপ ঘরে রইলে লক্ষ্মী বাঁদা থাকবে গো! সকালে উঠে ওতে মাতা ঠেকালে ঘরে রোগ দুঃখ ঢুকবে না গো।"

শবদেহের পেছন-পেছন যশোদা কেঁদে কেঁদে শ্মশানে গেল ও ফিরে এসে বলল, "স্বচক্ষে দেখুন সগ্‌গ থেকে রথ নেমে এসে চিতার বুক থেকে গিন্নিমাকে নিয়ে ওপরপানে চলে গেল।"

গিন্নির শ্রাদ্ধশান্তি চুকে গেলে বড় বউ যশোদাকে বললেন, "বামুন দিদি! সংসারে তো ভাঙন ধরল। মেজ সেজ বেলেঘাটার বাড়িতে উইঠ্যা যাইত্যাছে। রাঙা আর নতুন যাইত্যাছে মানিকতলা-বাগমারি। ছোট যাইব গিয়া আমাগো দক্ষিণেশ্বরের বাড়ি।"

"এখেনে কে থাকবে?"

"আমিই থাকুম। তবে গিয়া নিচতলা ভাড়া দিব। অহন সংসার গুটাইতে অইব। তোমার পুত্রে [illegible]বারে পালছ, নিত্য সিধা গেছে। হ্যায সন্তান দুধ ছারছে, তবুও আট বছর মা সিধা পাঠাইছে। উনি যা মন লয় তাই করছে। পোলারা কথা কয় নাই। কিন্তু অহন ত আর পারতাম না।"

"আমার কি হইব বড় বউদি?"

"তুমি যদি আমার সংসারে পাক-সাক কর, তোমার প্যাট চলব। কিন্তু ঘরের হকুলডিরে কি করবা?"

"কি করব?"

"তুমিই কও। জেয়ন্তে তুমি বারো সন্তানের মা! মাইয়াগুলান্ বিয়া অইয়া গিছে। ওরারা ত শুনি যাত্রী ডাকে, মন্দিরে ভোগ খায়, চাতালে পইড়া থাকে। বামুনও ত শুনি নকুলেশ্বর মন্দির ভাল জমাইছে। তোমার অভাব কিসের?"

যশোদা চোখ মুছে বলল, "দেখি. বামুনকে বলি।"

কাঙালিচরণের মন্দিরে এখন খুবই রমরমা। কাঙালী বলল, "আমার মন্দিরে তুই কি করবি?"

"নরেনের বোনঝি কি করে?"

"সে মন্দিবেব সোম্সাব দেখে, বাঁধে বাড়ে। তুই ঘরেই রাঁধিস না ক'দ্দিন। মন্দিবেব উঠনো তুই ঠেলতে পারিস?"

"ওবাড়ির সিধে উঠে গেল। সে কতা মাথায় ঢুকল ড্যাকরার? খাবে কি?"

কাঙালি বলল, "সে তোকে ভাবতে হবে না।"

"এদ্দিন ভাবিয়েছিলে কেন? মন্দিরে খুব দু'পয়সা হচ্ছে, তাই না? সব জমিয়েছ আর আমার গতর জল করা ভাত খেয়েছ বসে-বসে।"

"বসে বসে রাঁধত কে?"

যশোদা হাত নেড়ে বলল, "বেটাছেলে এনে দেয়, মেয়েছেলে রাঁধে-বাড়ে। আমার কপালে সকলই উলটো হইছিল। আমার ভাত খেয়েছ যখন, তখন আমাকে ভাত দেবে এখন। ন্যায্য কথা।"

কাঙালি ফস্ করে বলল, "কোত্থেকে ভাত যোগাড় করলি? হালদার বাড়ি তোর কপালে জুটত? আমার ঠ্যাং কাটা গেল বলেই না তোব কপালে ওবাড়ির দোর খুলল? কত্তা তো আমাকেই সব দেবেথাবে বলিছিল। সব ভুলে বসে আছিস মাগী?"

"তুমি মাগী না আমি মাগী। বউয়ের গতরে খায়, সে আবার বেটাছেলে?"

একথা থেকে দুজনের তুমুল কলহ বেঁধে গেল। দুজনে দুজনকে শাপশাপান্ত করল। অবশেষে কাঙালী বলল, তোর মুখ আর দেখব না, যাঃ!

"না দেখলে না দেখবে।"

যশোদাও রেগে ঘর ছেড়ে বেরোলো। ইতিমধ্যে পাণ্ডাদের শরিকে-শরিকে সট হয়েছে, ঠাকুরের মুখ ফেরাতে হবে, নইলে সমূহ সর্বনাশ। সেজন্যে মন্দিরে মহা ধুমধামে প্রায়শ্চিত্ত পুজো হচ্ছে। যশোদা সেখানে হত্যা দিতে গেল। দুঃখে তার প্রৌঢ়, দুগ্ধহীন, স্থূল বুক দুটি ফেটে যাচ্ছে। সিংহবাহিনী তার দুঃখ বুঝে পথ বাতলে দিন।

তিনদিন যশোদা চাতালে পড়ে থাকল। নতুন হাওয়া সম্ভবত সিংহবাহিনীও খেয়েছেন। তিনি মোটেই স্বপ্নে দেখা দিলেন না। উপরন্তু তিনদিন উপোসী থেকে কাঁপতে কাঁপতে উঠে যশোদা ঘরে গেল, ছোট ছেলে বলে গেল, "বাপ মন্দিরে

থাকবে। আমাকে আর নবাকে বলেছে তোরা ঘণ্টা বাজাবি, রোজ পেসাদ পাবি, পয়সা পাবি।”

“বটে! তা বাপ কোথা!”

“শুয়ে আছে। গোলাপী মাসি বাবার পিঠের ঘামাচি গেলে দিচ্চে। বলল, তোরা পয়সা দিয়ে ল্যাবেঞ্চুস খেগে যা! আমরা তাই তোকে বলতে এনু।”

যশোদা বুঝল, হালদার-বাড়িই নয়, কাঙালীর ক।ছেও তার দরকার ফুরিয়েছে। জল-বাতাসা খেয়ে সে নবীনকে নালিশ করতে গেল। নবীনই সিংহবাহিনীর প্রতিমা হিঁচকে বিমুখ করেছিল ও অন্য পাণ্ডাদের সঙ্গে বাসন্তী পূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা ও শারদ দুর্গাপূজার বিশেষ রোজগার বিষয়ে ফয়সালা হবার পর পুনর্বার প্রতিমাকে হিঁচড়ে মুখ ফিরিয়ে সে ব্যথিত নড়ায় পাকি মদ মালিশ করে গাঁজা টেনে বসেছিল এবং স্থানীয় ভোটের ক্যাণ্ডিডেটের উদ্দেশে বলেছিল, “পুজো দিলি নে তো? মায়ের মাহাত্ম্য আবার ফিরেছে। এবার দেখে নোব কেমন ক’রে জিতিস।”

মন্দিরের আওতায় থাকলে এ দশকেও কি কি অলৌকিক ঘটনা ঘটে নবীনই তার প্রমাণ। দেবীর মুখ সে নিজেই ফিরিয়েছিল এবং নিজেই বিশ্বাস করেছিল পাণ্ডারা ভোট-চাই দলসকলের মতো জোট বাঁধছে না বলে মা বিমুখ হয়েছেন। এখন মার মুখ ফেরাবার পর তার আবার ধারণা জন্মাল, মা নিজে ফিবেছেন।

“ যশোদা বলল, কি বকছ?”

নবীন বলল, “মায়ের মাহাত্ম্যের কথা কইছি।”

যশোদা বলল, “নিজে ঠাকুরের মুখ ঘুরিয়েছিলে তা জানি না ভেবেছ?”

নবীন বলল, “চুপ কর যশি। ঠাকুর শক্তি দিলে, বুদ্ধি দিলে, তবে না আমা হতে কাজটি হল?”

“তোমাদের হাতে পড়ে মায়ে মাহাত্মি গেল!”

“মাহাত্মি গেল! গেলে পরে পাখা ঘুরছে, পাখার নিচে বসে আছিস, তা হল কি ক’রে? চাতালের ছাতে ইলেটিরি পাখা এর আগে ঘুরেছে?”

“ তা ত হল। এখন আমার কপাল পোড়ালে কেনে, তাই কও দিখি? আমি তোমায় কি করিছি?

“কেন? ক্যাঙালি তো মরেনি?”

“মরবে কেন? মরার বাড়া হয়েছে।”

“কি হল?”

যশোদা চোখ ভারি গলায় বলল, “এতগুলো পেটে ধরিছি, সেই বলে বাবুদের বাড়ি বাঁদাধরা দুধ-মা ছিলাম। জান তো সবই। কোনদিন কুপথে হাঁটিনি।”

“আই ব্বাস! তুই হলি গে মায়ের অংশ।”

“মা তো ভোগে-রোগে রইল। অংশ যে অন্ন বিনে মরতে বসেছে। হালদার

বাড়ি তো হাত ওঠালে।"

"তুই বা ক্যাঙালীর সঙ্গে ঝগড়া করতে গেলি কেন? বেটাছেলে ভাতের খোঁটা সয়?"

"তুমি বা তোমার বোনঝিকে হোথা গছালে কেন?"

"সে ঠাকুবের লীলে হয়ে গেল। গোলাপি যেয়ে মন্দিরে ধন্না দিত। তা ক্রেমে-ক্রেমে ক্যাঙালী বুঝল, ও হচ্চে ঠাকুরের ভৈরব আর গোলাপী ওর ভৈরবী।"

"ভৈরবী! খ্যাংবা মেরে ওব হাত হতে সোয়ামি ছাড়িয়ে আনতে পারি এখনি।"

নবীন বলে "নাঃ! সে আব হতে হচ্চে না। ক্যাঙালী পুরুষ ছেলে, ওর আব ততো মন ওঠে? তা বাদে গোলাপির ভাইটে সাক্ষাৎ গুণ্ডা, সে হেথা যেয়ে পওরা দিচ্চে। আমাকেই গেট আউট ক'বে দিলে। আমি যদি দশ ছিলিম টানি, সে টানে বিশ ছিলিম। ক্যাঁকালে লাথি মেরে দিলে। যেয়েছিলাম তোর কথা বলতে। ক্যাঙালী বললে, ওর কতা আমায় বল না। ভাতাব চেনে না, বাবু-বাড়ি চেনে। বাবু-বাড়ি ওর ইষ্টিদেবতা, সেথা যাক্ গা।"

"তাই যাব!"

বলে সংসারের অবিচারে পাগল পাগল যশোদা ঘবে ফিরল। কিন্তু শূন্যঘরে মন টেকে না। দুধ না থাক, কোলের কাছে একটা ছেলে না থাকলে ঘুম আসে না। মা হওয়া বড ভীষণ নেশা। সে নেশা দুধ শুকোলেও কাটে না। অগত্যা মন খুইয়ে যশোদা হালদাবনী কাছে গেল। বলল, "রাঁধব বাড়ব, মাইনে দেবে দিও, না দেবে না দিও। হেথা থাকতে দিতে হবে। মিনসে নিজেব মন্দিরে থাকতেছে! ছেলেগুলো কি বেইমান মা! সেথা গিয়ে জুটেছে। কার তরে ঘর আটকে বাখব মা?"

"তা থাকো। তুমি ছেলেদের দুধ দিছ, তায় বামুন। তা থাক। কিন্তু দিদি, থাকতে তোমাব কষ্ট হইব। ওই বাসিনীদের লগে এক ঘরে থাকব। ক্যারো লগে ঝগড়াবিবাদ কইর না। বাবুর মাথা গরম। তায় সেজ পুলা বুম্বা গিয়া সেই দেশি মেয়ে বিয়া বসছে বইলা ম্যাজাজ মন্দ। ক্যাচাকেচি হইলে তাঁই চটব।"

সন্তান হবার ক্ষমতাই যশোদার লক্ষ্মী ছিল। সেটি খতম হতেই তার কপালে সাধ্বী যশোদার এখন পড়তির সময়। মানুষের স্বভাবধর্ম হল উঠতির কালে এত দুর্গতি ঘটল। পাড়ার মাযেব ভক্ত বাড়িগুলির শ্রদ্ধেয়া দুগ্ধবতী সতী অসঙ্গত অহমিকা হয় এবং পড়তির কালে " অবস্থা বুঝে নিনু হয়ে থাকি"— এ সারেগুার আসে না মনে। ফলে মানুষ তুচ্ছ জিনিস নিয়ে আগের দাপে দামড়াতে যায় ও ব্যাঘেব লাথি খায়।

যশোদার কপালেও তাই হল। বাসিনীরা তার পা ধোয়া জল খেত। এখন বাসিনী অক্লেশে বলল, "তুমি তোমার বাসন মেজে নেবে। তুমি কি মনিব, যে তোমার

এঁটো বাসন মাজব ? তুমিও মনিবের চাকর, আমিও।"

"জানিস আমি কে ?"—বলে গর্জে উঠতে যশোদা বড় বউয়ের মুখ শুনল, "এই লিগাই আমার ডর ছিল খুব। মায়ে অরে মাথায় উঠাইয়া দিয়ে গেছে। দেখ বামুন দিদি ! ডাইকা আনি নাই, সাইধা আসছ, অশান্তি কইর না।"

যশোদা বুঝল, এখন আর তার টুঁ কথাটিও কেউ শুনবে না। মুখ বুজে সে রাঁধল বাড়ল, এবং বিকেলে মন্দিরের চাতালে গিয়ে কাঁদতে বসল। মন খুলে কাঁদতেও পারল না। নকুলেশ্বর মন্দির থেকে আরতির বাজনা শুনে ও চোখ মুছে উঠে এল। মনে মনে বলল, এবার দয়া কর মা ! শেষে কি টিনের বাটি হাতে পেতে বসতে হবে ? তাই চাও ?

হালদার-বাড়ি ভাত রেঁধে আর মায়ের কাছে মনোদুঃখ নিবেদন ক'রে দিন কাটতে পারত। কিন্তু যশোদার কপালে তা সইল না। যশোদারও দেহ যেন এলে পড়ল। কেন কিছুতে ভাল লাগে না, যশোদা বোঝে না। মাথার ভেতর বিভ্রম সব। রাঁধতে বসলে মনে হয় সে এ বাড়ির দুধ-মা। কাস্তাপেড়ে শাড়ি পরে সে সিধে নিয়ে ঘরে যাচ্ছে। স্তন দুটি বড় শূন্য লাগে, যেন বরবাদ। স্তনবৃন্তে শিশুর মুখ নেই, এ তার জীবনে ঘটবে বলে ভাবেনি।

খুব অন্যমনস্ক হয়ে গেল যশি। ভাত তরকারি প্রায় সবই বেড়ে দেয়, নিজে খেতে ভুলে যায়। মাঝে মাঝে নকুলেশ্বর শিবের উদ্দেশে বলে, "মা না পারে তুমিই আমায় সরিয়ে নাও। আর পারি না।"

শেষে বড় বউয়ের ছেলেরাই বলল, "মা ! দুধ-মার শরীর কি অসুস্থ ? কেমন যেন হইয়া গেছে ?"

বড় বউ বলল, "দেখি !"

বড় বাবু বলল, "দেখ ! বামুনের মাইয়া, কিছু অইলে আমাগো শাপ অইব।"

বড় বউ জিগ্যেস করতে গেল। ভাত চড়িয়ে যশোদা রান্নাঘরেই আঁচল পেতে শুয়েছিল। বড় বউ তার আদুড় গা দেখে বলল, "বামুন দিদি ! তোমার বাঁও মাইয়ের উপরটা লাল মত দেখায় ক্যান ? ইশ ! দগদগা লাল !"

"কি জানি। ভেতরে যেন পাতর ঠেলে উঠেচে। বড় শক্ত, ঢিল পারা।"

"কি অইল ?"

"কি জানি ? এতগুলোকে দুধ দিইছি, তাতেই হয়ত অমন ধারা হল ?"

"ধুর ! ঠুন্‌কা হয়, মাইঠোস হয় দুগ্ধ থাকলে। তোমার তো কুলেরটা দশ বছইরা।"

"সেটা নেই গো ! তার উপরেরটা আছে। সেটা ত আঁতুড়ে গেছে। গেছে, ভাল গেছে। পাপের সংসার !"

"রও কাল ডাক্তার আইব নাতিরে দেখতে। তারে জিগামু। আমি য্যান্ ভাল দেখি না।"

যশোদা চোখ বুজে বলল, "যেন পাতরের মাই গো পাতর পোরা। আগে শক্ত গুলিটা সরত নড়ত, এখন আর নড়ে না, সরে না।"

"ডাক্তাররে দেখামু।"

"না বউদিদি, বেটাছেলে ডাক্তারের কাছে আমি গা আদুড় করতে পারব না।"

রাতে ডাক্তার আসতে ছেলেকে সামনে রেখে বড় বউ জিগ্যেস করল। বলল, "ব্যথা নাই, জ্বালা নাই, কিন্তু হ্যায় জানি আলাইয়া পড়ত্যাছে।"

ডাক্তার বললেন, "জেনে আসুন দিকি, কুঁচকে গেছে না কি নিপ্‌ল, বগলের নিচটা বিচিফোলা মতো কি না!"

"বিচিফোলা" শুনে বড় বউয়ের মনে হল ছিঃ! অসভ্য! তারপর সরজমিনে তদন্ত সেরে এসে বললেন, "কয়, অনেকদিন ধইরাই আপনে যা যা বললেন, তা হইছে।"

"বয়স কত?"

'বড় ছেলের বয়স ধল্লে পরে পঞ্চান্ন হবে।"

ডাক্তার বললেন, "ওষুধ দেব।"

বেরিয়ে গিয়ে বড়বাবুকে বললেন, "আপনার কুকের ব্রেস্টে কি হয়েছে শুনলাম। আমার মনে হয় ক্যানসার হাসপাতালে নিয়ে দেখানো ভাল। চোখে দেখিনি। তবে যা শুনলাম, তাতে ম্যামারি গ্লাণ্ডে ক্যানসার হতে পারে।"

বড়বাবু ষোড়শ শতকে সেদিন অব্দি ছিলেন। অতি ইদানীং তিনি বিংশ শতকে এসেছেন। তেরটি সন্তানের মধ্যে মেয়েদের বিয়ে দিয়েছেন এবং ছেলেরা যে যার পথে ও মতে বড় হচ্ছে, বড় হয়েছে। কিন্তু এখনো তাঁর মগজের বুদ্ধিকোষ অষ্টাদশ এবং প্রাক্ রেনেসাঁস উনিশ শতকীয় অজ্ঞানের অন্ধকারে ঢাকা। আজও তিনি বসন্তের টিকা নেন না ও বলেন, বসন্ত হয় ছুড়লোকের। আমার টিকা লইতে লাগত না। উচ্চ বংশ, দেবদ্বিজে ভক্তিমান বংশে ও রোগ হয় না।"

"ক্যানসার" শুনে তিনি উড়িয়ে দিলেন ও বললেন, "হঃ! হইলেই হইল ক্যানসার! অতই সোজা! কি শুনতে কি শুনছেন, যান, মলম দিলেই সারব। আপনের কথায় আমি বামুনের মাইয়ারে হাসপাতালে পাঠাইতে পারব না।"

যশোদাও শুনেমেলে বলল, "হাসপাতালে যেতে পারবনি বাবু। তার চে আমার মত্তে বল। ছেলে বিয়োতে হাসপাতালে গেলাম না, এখন যাব? হাসপাতালে গেছল বলে ত মড়িপোড়া ঠ্যাং দুটো খুঁতো ক'রে ফিরে এল!"

বড় বউ বলল, "সিদ্ধমলম আইনা দেই লাগাও। সিদ্ধমলমে ঠিক আরাম হইব। গুপ্ত ফোঁড়া মুখ লইয়া ফাটব।"

সিদ্ধমলমে কোনোই কাজ হল না এবং ক্রমে যশোদা খাওয়াদাওয়া ছেড়ে হীনবল হল। বাঁ দিকে আঁচল্ রাখতে পারে না। কখনো মনে হয় জ্বালা, কখনো মনে

হয় ব্যথা। অবশেষে চামড়া ফেটে ফেটে ঘা দেখা দিল। যশোদা বিছানা নিল।

ভাবগতিক দেখে বড়বাবুর ভয় হল, বুঝি তার ভিটেতে বামুন মরে। যশোদার ছেলেদের ডেকে সে ধমকে বলল, "মা হয়, এতদিন খাওয়াইছে, এখন হ্যায় যে অসুখে মরে। তোরা নিয়া যা! হকলডি থাকতে হ্যায় কা্য়েতের ভিটায় মরব?"

কাঙালি একথা শুনে বড়ই কাঁদল ও যশোদার প্রায়ান্ধকার ঘরে এসে বলল, "বউ! তুই সতীলক্ষ্মী! তোকে হেনস্তা করার পর দু' বছরের মধ্যে মন্দিরের বাসন চুরি হল, আমার পিঠে ফোঁড়া হয়ে ভুগলাম, 'গোলাপি হারামজাদী ন্যাপলাটাকে ভুলিয়ে বাক্স ভেঙে সব্বস্ব নিয়ে তারকেশ্বরে দোকান দিলে। চ, তোরে আমি মাথায় ক'রে রাখব।"

যশোদা বলল, "বাতিটা জ্বাল!"

কাঙালি বাতি জ্বালল।

যশোদা অনাবৃত ও ঘা-বিজবিজে বাম-স্তন দেখিয়ে বলল, "ঘা দেখেছ? ঘায়ের গন্ধ কেমন জান? এখন নিয়ে যেয়ে কি করবে? নিতে বা এলে কেন?"

"বাবু ডাকলে।"

বাবু তবে রাখতে চাইছে না।—যশোদা নিশ্বাস ফেলল, ও বলল, "আমারে দিয়ে কোনো সুসার হবেনি জান? নিয়ে যেয়ে করবে বা কি?"

"তা হোক, কাল নে যাব। আজ ঘর পক্কের ক'রে রাখি। কাল নিয্যস নে যাব।"

"ছেলেরা ভাল আচে? মাঝে মধ্যে নবলে আর গৌরটা আসত; তাও আসে না।"

"সব ব্যাটা সাপ্তপর। আমার ইয়েতে জন্ম তো? আমার মতোই অমানুষ।"

"কাল আসবে?"

"আসব— আসব—আসব।"

যশোদা সহসা হাসল। সে হাসি বড়ই বুকে দাগা-দেওয়া ও প্রাচীন স্মৃতির কথা মনে পড়ানো।

যশোদা বলল, 'হ্যাঁ গো, মনে আচে?"

"কি মনে থাকবে বউ?"

"এই মাই নিয়ে তুমি কত সোহাগ কত্তে? নইলে তোমার ঘুম হতো না? কোল খালি হোত না, এটা বোঁটা ছাড়ে তো ওটা ধরে, তায় বাবুর বাড়ির ছেলেগুলো! কি ক'রে পাত্তাম, তাই ভাবি!"

"সব মনে আছে বউ!"

কাঙালির এ কথাটি এ মুহূর্তে সত্য। যশোদার ক্লিষ্ট, শীর্ণ, কাতর চেহারা দেখে কাঙালীর স্বার্থপর দেহ ও প্রবৃত্তি এবং উদরসর্বস্ব চেতনাও অতীত স্মরণে মমতাকাতর

হল। সে যশোদার হাতটি ধরল ও বলল, "তোর জ্বর?"

"জ্বর তো হয়ই। আমি ভাবি ঘায়ের তাড়সে?"

"এমন পচা গন্ধ কোত্থেকে আসছে?"

"এই ঘা হতে।"

যশোদা চোখ বুজে বলল। তারপর বলল, "তুমি বরং সন্নিসী ডাক্তারকে দেখিও। তিনি হোমোপাথি দিয়ে গোপালের টাইফয়েড সারিয়েছিল।"

"ডাকব। কালই নে যাব তোকে।"

কাঙালি চলে গেল। সে যে বেরিয়ে গেল, ক্রাচের খটখট শব্দ যশোদা শুনতে পেল না। চোখ বুজে, কাঙালী ঘরে আছে জ্ঞানে নিস্তেজে বলল, "দুধ দিলে মা হয়, স— ব মিছে কতা! না নেপাল-গোপালরা দেখে, না বাবুর ছেলেরা উঁকি মেরে এট্টা কতা শুধোয়।"

ঘা-গুলি শত মুখে, শত চোখে যশোদাকে ব্যঙ্গ করতে থাকল। যশোদা চোখ মেলে বলল, "শুনচ?"

তারপরই সে বুঝল, কাঙালী চলে গেছে।

রাতেই সে বাসিনীকে দিয়ে লাইফ্‌বয় সাবান আনাল ও ভোর হতে সাবান নিয়ে নাইতে গেল। গন্ধ, কি দুর্গন্ধ! বেড়াল-কুকুর ডাস্টবিনে পচলে এমন গন্ধ হয়। যশোদা চিরকাল, বাবুদের ছেলেরা স্তনবৃন্ত মুখে দেবে বলে কত যত্নে তেলে-সাবানে স্তন দুটি মার্জনা করেছে। সেই স্তন তার এমন বেইমানি করল কেন? সাবানের ঝাঁঝে চামড়া জ্বলে ওঠে! যশোদা তবু সাবান দিয়ে স্নান করে এল। মাথা ঝিমঝিম করে, সব যেন আঁধার আঁধার। যশোদার শরীরে আগুন, মাথায় আগুন। কালো মেঝেটি বড় ঠাণ্ডা। যশোদা আঁচল বিছিয়ে শুল। স্তনের ভার সে দাঁড়িয়ে সইতে পারছিল না।

সেই যে শুল যশোদা, জ্বরে অজ্ঞান ও বিবশ। কাঙালী ঠিক সময়েই এল কিন্তু যশোদাকে দেখে সে বুদ্ধি হারিয়ে ফেলল। অবশেষে নবীন এসে ধমকে বলল, "এরা কি মানুষ? সবগুলো ছেলেকে দুধ দিয়া বাঁচাল তা এট্টা ডাক্তার ডাকে না? হরি ডাক্তারকে ডেকে আনছি।"

এমন রুগী হাসপাতালে নেয় না। কিন্তু বড়বাবুর চেষ্টায় ও সুপারিশে যশোদা হাসপাতালে ভর্তি হল।

"কি হয়েচে। অ ডাক্তারবাবু, কি হয়েচে"— কাঙালী বালকের মতো কেঁদে জিগ্যেস করল।

"ক্যানসার।"

"মাইয়ে ক্যানসার হয়?"

"নইলে হল কি করে?"

“নিজের কুড়িটা, বাবুদের বাড়ির তিরিশটা ছেলে— খুব দুধ ছিল ডাক্তারবাবু—”

“কি বললে ? কতজনকে ফীড করেছ ?”

“তা পঞ্চাশ জনা ত হবে।”

“প-ঞ্চা-শ-জ-ন ?’

“হ্যাঁ বাবু।”

“ওর কুড়িটা সন্তান হয়েছে ?”

‘হ্যাঁ, বাবু।”

‘গড্ !”

“বাবু !”

“কি ?”

“এত মাই খাওয়াত বলেই কি— ?”

“তা বলা যায় না ক্যানসার কেন হয়, তা বলা যায় না। তবে বুকের দুধ যারা অতিরিক্ত খাওয়ায়— আগে বোঝনি ? একদিনে ত এমনটা হয়নি ?”

“আমার কাছে ছিল না বাবু। ঝগড়া ক’রে—”

“বুঝেছি।”

“কেমন দেখছেন ? ভাল হবে তো ?”

“ভাল হবে ! ক’দিন থাকে সেই দেখ। এনেছ তো শেষ অবস্থায়। এ অবস্থা থেকে কেউ বাঁচে না।”

কাঙালি কাঁদতে কাঁদতে বলে। বিকেলে, কাঙালীর কান্নাকাটিতে বিপর্যস্ত হয়ে বড়বাবুর মেজছেলে ডাক্তারের কাছে গেল। যশোদার জন্যে তার সামান্যই উৎকণ্ঠা ছিল, কিন্তু বাবা হুড়কো দিলেন— সে বাবার টাকার ওপর নির্ভর করে।

ডাক্তার তাকে সব বুঝিয়ে বললেন। একদিনে হয়নি, বহুদিন ধরে হয়েছে। কেন হয়েছে ? তা কেউই বলতে পারে না। বুকের ক্যানসার কিভাবে বোঝা যাবে ? স্তনের ওপর দিকে ভেতরে শক্ত গুলি, সেটা সরানো চলে। তারপর ক্রমে ভেতরের গুলি শক্ত, বড় ও জমাট চাপের মতো হল। চামড়া কমল-রঙা হওয়া প্রত্যাশিত, যেমন প্রত্যাশিত স্তনবৃন্তের সংকোচন। বগলের নিচে গ্ল্যাণ্ডটি আওরে উঠতে পারে। আল্‌সারেশন, অর্থাৎ ঘা যখন হল, তখন বলা চলে শেষ অবস্থা। জ্বর ? সেটা দ্বিতীয় বা তৃতীয় পর্যায়ে পড়বে গুরুত্বের দিক থেকে। শরীরে ঘা জাতীয় কিছু থাকলে জ্বর হতেই পারে। সেটা সেকেণ্ডারি।

এতগুলি বিশেষজ্ঞ-কথা শুনে মেজছেলের মাথা গুলিয়ে গেল। সে বলল, “বাঁচব ?”

“না’

“কদ্দিন কষ্ট পাইব ?”

"মনে হয় না বেশি দিন।"

"কিছুই যখন করার নাই, কি চিকিৎসা করবেন ?"

"পেইনকিলার, সেডেটিভ, জ্বরের জন্যে অ্যান্টিবায়োটিক। শরীরও তো ডাউন খুব, খুবই।"

"খাওয়া ছাইরা দিছিল।"

"কোনো ডাক্তার দেখাননি ?"

"দেখ্ছিল।"

"বলেননি ?"

"বলছিল।"

"কি বলেছিলেন ?"

"ক্যানসার অইতে পারে। আসপাতালে লইতে বলছিল। হ্যায় যাইতে চায় নাই।"

"চাইবে কেন ? মরবে যে!"

মেজছেলে বাড়ি ফিরে এসে বলল, "তখন যে অরুণ ডাক্তার কইল ক্যানসার হইছে, তখন লইলেও বাচত বুঝি।"

তার মা বলল, "অতই যদি বুঝিস তবে লইস নাই ক্যান ? আমি কি বাধা দিচ্ছিলাম ?"

মেজছেলে ও তার মার মনের কোথাও অজানা পাপবোধ ও অনুশোচনা পচা ও আবদ্ধ জলে বুদ্বুদের মতো জাগছিল ও নিমেষে লয় পাচ্ছিল।

পাপবোধ বলছিল— আমাদের কাছেই আছিল, কুনদিন দেখি নাই উঁকি মাইরা, কবে বা হছিল রোগ, গুরুত্ব দেই নাই। হ্যায় ত আবুইদা মানুষ, আমাদের এত জনবে পালছিল, দেখি নাই অরে। অহন হকলে রইতে আসপাতালে গিয়া মরতাছে, পুলা এতগুলা, স্বামী আছে, আমাদের আকডাইয়া ধরছিল যহন, তহন আমাদেরই—! এইও তাজা শরীর আছিল, দুধ বাইরাইত ঠিকর দিয়া, কুনদিন ভাবি নাই হেয়ার এই রোগ অইব।

পাপবোধের লয় বলছিল— নিয়তি কে খণ্ডাইতে পারে ? হেয়ার কপালে আছে ক্যানসারে মরণ— ঠেকাইব ক্যা? আমাদের এহানে মবতে দোষ অইত— হেয়ার স্বামীপুত্র কইত কি কইরা মরল ? অহন হেই দোষ হইতে বাচছি। কেও কিছু বলতে পারত না।

বড়বাবু ওদের আশ্বস্ত ক'রে বলল, "অহন অরুণ ডাক্তার কইতাছে ক্যানসাব হইলে কেও বাঁচে না। বামুনদিদির যেই ক্যানসার হইছে তা অইলে মাই কাইটা ফালায়, জরায়ু বাদ দেয়, হেয়ার পরও মাইন্ষে ক্যানসারে মরে। দেহ, বাবায় বামুন বইলা বড় ভক্তি দিয়া গিছে— বাবার দয়ায় আমরা বাঁইচা আছি। ভিটায় বামনুদিদি মরলে প্রায়শ্চিত্ত করতে অইত।"

যশোদার চেয়ে কম আক্রান্ত রোগী কত আগে মরে, যশোদা ডাক্তারদের আশ্চর্য ক'রে প্রায় একমাস টিকে রইল হাসপাতালে। প্রথম প্রথম কাঙালী, নবীন, ছেলেরা যাতায়াত করেছিল বটে, কিন্তু যশোদা একই রকম আছে, কোমাটিক, জ্বরে ভাজা-ভাজা, আচ্ছন্ন। স্তনের ক্ষতগুলি ক্রমেই বড়-বড় হাঁ করছে এবং স্তনটির চেহারা এখন এক নগ্ন ক্ষতসদৃশ। অ্যান্টিসেপটিক লোশননিষিক্ত পাতলা গজ কাপড়ে সেটি আবৃত, কিন্তু গলিত মাংসের তীব্র গন্ধ ঘরের বাতাসে ধূপের ধোঁয়ার মতো নীরবে ও চক্রাকারে ছড়াচ্ছে সর্বদা। তা দেখে কাঙালীদের উৎসাহে ভাটা পড়ল ও ডাক্তারও বললেন, "সাড়া দিচ্ছে না? না দিলেই ত ভাল। অজ্ঞানেই সওয়া যায় না, সজ্ঞানে কেউ ঐ যমযন্ত্রণা সইতে পারে?"

"কিছু জানছে, আমরা আসি যাই বলে?"

"বলা কঠিন।"

"খাচ্চে কিছু?"

"নল দিয়ে।"

"তাতে মানুষ বাঁচে?"

"এখন যে খুব—"

ডাক্তার বুঝলেন, যশোদার এ অবস্থার জন্য তাঁর মনে অহেতুক রাগ হচ্ছে যশোদার ওপর, কাঙালীর ওপর, যেসব মেয়েরা ব্রেস্ট-ক্যানসারের লক্ষণকে যথেষ্ট সিরিয়াসলি নেয় না এবং আখেরে বীভৎস নরকযন্ত্রণায় মরে, তাদের ওপর। ক্যানসার, রোগী ও ডাক্তারকে নিয়ত পরাজিত করে। একটি রোগীর ক্যানসার মানে রোগীর মৃত্যু এবং বিজ্ঞানের পরাজয়, ডাক্তারের ত বটেই। সেকেণ্ডারি সিম্প্‌টমের ওষুধ দেওয়া যায়, খাওয়া বন্ধ হলে ড্রিপ দিয়ে শরীরকে গ্লুকোজ খাওয়ানো চলে, শ্বাস নিতে ফুসফুস্ অপারগ হলে অক্সিজেন— কিন্তু ক্যানসারের অগ্রগমন, প্রসারণ, ব্যাপ্তি, হত্যা, অব্যাহত থাকে। ক্যানসার শব্দটি এক সাধারণ সংজ্ঞা, এ সংজ্ঞা দ্বারা শরীরের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ম্যালিগন্যান্ট গ্রোথ বোঝায়। 'দি গ্রোথ ইজ পার্পাসলেস, প্যারাসাইটিক, অ্যান্ড ফ্লারিশেস অ্যাট দি এক্সপেন্স অফ দি হিউম্যান হোস্ট।' এর চারিত্র্যবৈশিষ্ট্য হল, সংক্রমিত শরীরাংশকে ধ্বংসকরণ, মেটাস্টাশিয়া দ্বারা ব্যাপ্তি, রিমুভালের পর প্রত্যাবর্তন টক্সিমিয়া সংঘটন।

কাঙালি তার প্রশ্নের সদুত্তর না পেয়ে বেরিয়ে এল। মন্দিরে এসে সে নবীন ও ছেলেদের বলল, "আর যেয়ে লাভ নেই। চিনতে পারে না, চোখ খোলে না জানতে পারে না। ডাক্তার যা পারে কত্তেছে।"

নবীন বলল "যদি মরে যায়?"

"বড়বাবুর টেলিফোন নম্বর আচে, বলবে।"

"ধর যদি তোমারে দেকতে চায়। সতীলক্ষ্মী বউ তোমার ক্যাঙালী। কে বলবে

এতগুনোর মা। শরীর দেকলে— তা কোনো দিকে হেলেনি, চায়নি।”

বলতে বলতে নবীন গুম্ মেরে গেল। বস্তুত, অচৈতন্য যশোদার ক্ষতাক্রান্ত স্তন দেখার পর তার গাঁজা-চরস-মদজনিত ঘোলাটে মাথায় বহু দার্শনিক চিন্তা ও দেহতত্ত্বের কথা মিত্তনম ঢোঁড়া সাপের মতো মন্থর খেলা করে। যেমন, ওর জন্যেই এত আকুলি ব্যাকুলি ছিল?— সেই মনমাতানো বুকের এই পরিণাম? হোঃ। মানবদেহ কিস্সু নয়। তার তরে পাগল হয় যে সেও পাগল।

কাঙালির এত কথা ভাল লাগল না। যশোদার প্রতি তার মন থেকেই রিজেক্শান এসে গিয়েছিল। সেদিন হালদার-বাড়ি যশোদাকে দেখে মন সত্যিই কাতর হয় ও হাসপাতালে নেবার পরও ব্যাকুলতা থাকে। কিন্তু সে অনুভূতি ঠাণ্ডা মেরে আসছে এখন। ডাক্তার যখনি বলেছে যশোদা বাঁচবে না, সে মন থেকে যশোদাকে প্রায় অকষ্টে বাদ দিয়েছে। তার ছেলেরাও তারই ছেলে। তা ছাড়া মা তাদের কাছে অনেকদিনই দূরের মানুষ হয়ে গেছে। মা মানে চুড়ো ক'রে বাঁধা চুল ধপধপে কাপড়, প্রবল ব্যক্তিত্ব। হাসপাতালে যে শুয়ে আছে, সে অন্য কেউ, মা নয়।

স্তনের ক্যানসারে ব্রেন কোমাটোজ হয়, যশোদার বেলা সেটি মুশকিল আসান হল।

সে যে হাসপাতালে এসেছে, হাসপাতালে আছে, তা বুঝল যশোদা এবং এও বুঝল, এই যে বিবশকারী ঘুম, এ ওষুধের। তাতে খুব স্বস্তি হল তার। এবং দুর্বল ও আক্রান্ত, আচ্ছন্ন মস্তিষ্কে মনে হল, হালদার-বাড়ির কোনো ছেলেটা কি ডাক্তার হয়েছে? নিশ্চয় তার দুধ খেয়েছে বলে এখন দুধের ঋণ শুধছে? কিন্তু ওবাড়ির ছেলেরা তো স্কুল না পেরোতে কারবারে ঢোকে। যেই হোক্ যারা এত করেছে তারা বুকের দুর্গন্ধময় উপস্থিতিটা থেকে তাকে মুক্তি দেয় না কেন? কি দুর্গন্ধ, কি বেইমানি? এই স্তনকে সে ভাতেব যোগানদার জেনে নিয়ত গর্ভ ধরে দুধ ভরে রাখত। স্তনের কাজই দুধ ধরা। কত গন্ধসাবানে স্তন মেজে পরিষ্কার রাখত, বড্ড ভারী ছিল বলে জামা পরেনি যৌবনেও।

সেডেশান কমে এলেই যশোদা চেঁচিয়ে ওঠে “আঃ। আঃ আঃ।”—এবং ব্যাকুল ঘোলাটে চোখে নার্স ও ডাক্তারকে চায়। ডাক্তার এলে সাভিমানে বিড়বিড় ক'রে বলে, “দুধ খেয়ে এত বড়টা হল, এখন এমন কষ্ট দিচ্চে?”

ডাক্তার বলে, “বিশ্বসংসারে দুধ— ছেলে দেখছে।”

আবার ইঞ্জেক্শন ও আবার নিদ্রাচ্ছন্ন অসাড়তা। যন্ত্রণা, ভীষণ যন্ত্রণা, অ্যাট দি এক্সপেন্স অফ দি হিউম্যান হোস্ট ক্যানসার সংক্রমিত হচ্ছে। ক্রমে যশোদার বাম স্তন ফেটে আগ্নেয়গিরির ক্রেটার-সদৃশ হল। পূতিগন্ধে কাছে যেতে কষ্ট হয়।

শেষে একরাতে, যশোদা বুঝল তার পা ও হাত ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। ও বুঝল এবার মৃত্যু আসছে। চোখ খুলতে পারল না যশোদা, কিন্তু বুঝল, কেউ কেউ তার

হা" দেখছে। সুচ বিঁধল বাহুতে। ভেতরে শ্বাসের কষ্ট। হতেই হবে। কারা দেখছে? তারা কি তার আপন কেউ? যাদের পেটে ধরেছিল বলে দুধ দেয়, ভাতের জন্য যাদের দুধ দেয়, যশোদার মনে হল সে ত বিশ্বসংসারকে দুধ দিয়েছে, তবে সে কি একা-একা মরতে পারে? যে ডাক্তার রোজ দেখছে সে, যে ওর মুখে চাদর টেনে দেবে সে, যে ওকে ট্রলিতে তুলবে সে, যে ওকে শ্মশানে নামাবে সে, যে ওকে চুল্লিতে দেবে সে, ডোম— সবাই তার দুধ-ছেলে— বিশ্বসংসারকে দুধে পাললে যশোদা হতে হয়। নির্বান্ধবে একলা মরতে হয়, মুখে জল দিতে কেউ থাকে না। অথচ শেষ সময়টা কারো কথার কথা ছিল। সে কে? কে সে? সে কে?

যশোদা মারা গেল রাত এগারোটায়।

বড়বাবুর বাড়ি ফোন গেল। বাজল না। রাতে ওঁদের ফোন ডিস্কানেক্ট করা থাকে।

হাসপাতালের মর্গে যথাবিধি পড়ে থেকে যশোদা দেবী, হিন্দু ফিমেল, যথাসময়ে গাড়িতে শ্মশানে গেল ও দাহ হল। ডোমই তাকে দাহ করল। যশোদা যা-যা ভেবেছিল, ঠিক তাই-তাই হল। যশোদা ঈশ্বর-স্বরূপিণী, সে যা ভাবে, অন্যেরা ঠিক তাই করে, তাই করল। যশোদার মৃত্যু ও ঈশ্বরের মৃত্যু। এ সংসারে মানুষ ঈশ্বর সেজে বসলে তাকে সকলে ত্যাগ করে এবং তাকে সতত একলা মরতে হয়।

আমি, আমার স্বামী ও একটি নুলিয়া

রমাপদ চৌধুরী

আমাব একেবারেই ইচ্ছে ছিলো না। বড়-জা জোর করে ঠেলে পাঠালো। বললে, 'নতুন, অত লজ্জা দেখাসনি। ঐ লজ্জা করে কবেই আমরা সব হারিয়েছি, এখন তোদের দেখলে শুধু হিংসেয় জ্বলে-পুড়ে মরি।' বড়-জা আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড। তাই বিয়ের পর যেদিন প্রথম আলাপ হলো, আমি বয়সের এবং সম্পর্কের মান রাখবার জন্য প্রণাম করলাম, সেদিন থেকেই বড়-জা আমাকে 'তুই' বলতে শুরু করেছিলো। আর যেহেতু আমি ওর ছোট দেওরের বউ, অর্থাৎ বাড়ির একেবারে আনকোরা নতুন বউ, সেই হেতু আমার নাম হলো, 'নতুন'। তা বড়-জা বললে, 'দেখ্ নতুন, যা কিছু ফুর্তিটুর্তি এখন করে নে, এরপর তো সারাটা জীবন আমাদের মত হাঁড়ি ঠেলতে হবে।' আমার তখন সবে বিয়ে হয়েছে অনভ্যাসের ঘোমটা টানতেও হাসি-হাসি পায়। তাই বড়-জার খোলাখুলি কথাগুলো শুনে লজ্জা-লজ্জা করতো। কিন্তু বড়-জা দমবার পাত্র নয়। তার দেওরটিকে বললে, 'ছোটঠাকুরপো, নতুনকে নিয়ে পুরী কি দার্জিলিং কোথাও বেড়িয়ে এসো দিনকয়েকের জন্যে। ওই যে হনিমুন না কি বলে, আমরা কি ছাই জানি আজকালকার রীতিনীতি।' তা শুনে এমনভাবে হাসলো গৌতম, তাকালো আমার দিকে যে বেশ বুঝতে পারলাম অমন একটা ইচ্ছে ওরও যে না হচ্ছে তা নয়। গৌতমের গোপন ইচ্ছেটা বুঝতে পেরে— না, আজকালকার মেয়েদের মত ওকে নাম ধরে ডাকতে আমি পারি না, পুরোনো দিনের বউদের মতই আড়েঠারে বুঝিয়ে দিই, তবু সত্যি কথা বলতে কি, মনে মনে ওর নাম ধরে ডাকতে, নামটা মুখের মধ্যে লোফালুফি করতে বেশ লাগতো। কিন্তু বড়-জার সামনে তো আর নাম বলতে পারি না। তাই বললাম, 'ওর ইচ্ছে হয় যাক, আমি যাবো না।' বড়-জা রাগ দেখিয়ে বললে 'ওরে আমার লজ্জাবতী লতা, যাবার ইচ্ছে নেই! যা বলছি শোন নতুন, যা বলছি শোন তোরা দু'টিতে

দিন-কয়েক কোথাও গিয়ে—'

ঠেলেঠুলেই একরকম পাঠিয়ে দিলে। আমি আর গৌতম এসে উঠলাম পুরীর একটা হোটেলে। একেবারে সমুদ্রের গা ঘেঁষে। সমুদ্র আমি আগে তো কখনও দেখিনি। দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। অভিভূত হয়ে গেলাম। সমুদ্র এত সুন্দর! সমুদ্র এমন বিশাল! মনে হলো, কোথায় ছিলাম আমি এতাদন! এমন একটা রূপের পৃথিবী আছে আমি জানতামই না? আমার বুকের মধ্যেও যেন খুশির ঢেউগুলো গুরগুর করতে করতে ফুর্তিতে ফেটে পড়তে লাগলো। ছেলেমানুষের মত আমার নাচতে, গাইতে, ছুটে যেতে ইচ্ছে হলো ঢেউগুলোর কাছে। কিন্তু তা না করে আমি গৌতমের উপর খুশি হয়ে উঠলাম, ঠায় ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি-মিষ্টি হাসি হাসতে লাগলাম। আর ওর সুন্দর চোখজোড়ার দিকে, চোখের তারা দুটোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার কেমন ভাবতে ভালো লাগলো, ওর চোখ দুটো যেন সমুদ্রের মতো নীল, সমুদ্রের মতো গভীর, সমুদ্রের মত বিশাল। আনন্দে আহ্লাদে ওর চোখের দুটি সমুদ্রে ডুবে যেতে ইচ্ছে হলো, হারিয়ে যেতে ইচ্ছে হলো।

ও বললে, 'কি দেখছো অমন করে?' ওর বোধহয় একটু অস্বস্তি লাগছিলো। লাগবারই কথা। কেউ একজন হাতে চিবুক রেখে ঠায় মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলে অস্বস্তি লাগবে না?

কিন্তু আমি কি করবো। আমাকে তখন দুষ্টুমিতে পেয়েছে। বললাম, 'সমুদ্দর দেখছি।'

ও কেমন অপ্রতিভ হলো। বললে, 'আমি কি সমুদ্র নাকি?'

আমি আরো দুষ্টুমি করে সুর দিয়ে গেয়ে উঠলাম, 'তুমি হও গহীন গাঙ, আমি ডুইব্যা মরি!'

ও তিনটে আঙুলের হালকা থাপ্পড় দিলে আমার গালে। আমি খিলখিল করে হেসে উঠেই ছুটে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে । বালির ওপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে গিয়ে দাঁড়ালাম একেবারে সমুদ্রের ধারে, বালির ওপর যেখানটাতে ঢেউগুলো ফেটে ফেটে ফেনা হয়ে পড়ছে, সেখানে।

না, ঠিক অতদূর নয়। ঢেউয়ের অত কাছে যেতে আমার কেমন ভয়-ভয় করলো। আমি তো তার আগে সমুদ্র দেখিনি, তাই অমন সুন্দর ঢেউগুলোকে যেমন ভালোও লাগলো তেমনি কাছে যেতেও কেমন একটা আতঙ্ক বোধ করলাম। অচেনা মানুষের কাছে যেতে হলে যেমন ভয় ভয় করে, তেমনি। ঠিক কেমন, বলবো? ফুলশয্যার রাত'টার মত। ভালোও লাগছে, মনের মধ্যে বেশ একটা খুশির গুনগুন, আবার অচেনা মানুষ গৌতমের এত কাছে যেতে হবে ভেবে কেমন এক ভয়-ভয় ভাব।

হঠাৎ চমকে উঠে ফিরে তাকিয়ে দেখি, গৌতমও এসে দাঁড়িয়েছে একেবারে আমার পাশটিতে, গা ঘেঁষে। আর আমারই মত তাকিয়ে আছে সমুদ্রের দিকে।

ছোট ছোট এক একটা দল পাড় ঘেঁষে হেঁটে যাচ্ছিলো। মেয়ে-পুরুষ, ছোট ছোট বাচ্চা ছেলেমেয়ে। যেই ঢেউ এসে পড়ছে, দু' একজন ছুটে যাচ্ছে সাদা ফেনায় পা ডোবাতে। ওদিকে জেলেদের ডিঙির সারি পড়ে আছে বালির ওপর, আর বালির ওপর বসে বসে বড বড জালগুলো মেরামত করছে জেলেরা।

—এই, ওরা কি কুড়োচ্ছে, কী ? আমি জিগ্যেস করলাম।

ও বললে, ঝিনুক।

ওমা, তাই নাকি! আমিও ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম। দেখলাম, ছোট বড নানা রকমেব, সাদা আর রঙিন ঝিনুকের রাশি পডেছে ঢেউয়েব সঙ্গে সঙ্গে। ঢেউ সরে গেলেই সেগুলো চিকচিক করছে বালির ওপর। আমি দাঁডিয়ে দাঁডিয়েই দেখলাম। কুডোতে কেমন লজ্জা হলো। আমার বয়েসী অনেক মেয়েই ঝিনুক কুডোতে কুডোতে এগিয়ে যাচ্ছিলো। আমি কেমন লজ্জা পাচ্ছিলাম। কারণ, যারা সামনে দিযে হেঁটে যাচ্ছিলো, তাবা ফিবে ফিরে তাকাচ্ছিল আমার দিকে। মেয়েরাও। আমি দেখতে খুব সুন্দর, আমার চোখ দু'টো টানাটানা, আমাব ঘাডটা কি চমৎকার, আমার ফরসা সুডোল হাত দেখলে নাকি হাত বোলাতে ইচ্ছে কবে, এমনি সব কথা বলে ইস্কুলের বন্ধুরাও আমাকে ক্ষ্যাপাতো, কলেজেব মেয়েবা প্রশংসা করতো। কিন্তু সমুদ্রের পাড় দিয়ে যেতে যেতে ওরা যখন বাব বাব ফিবে ফিরে তাকাচ্ছিলো তখন বেশ বুঝতে পাবছিলাম রূপ দেখছিলো না ওবা। বয়স-হওয়া দু'টি মহিলাব হাসি দেখেই বুঝলাম ব্যাপাবটা। আসলে ওবা বুঝতে পাবছিল আমাদের সবে বিয়ে হয়েছে। ও ঠিক বোঝা যায়, আমি নিজেও তো কত মেয়েকে দেখেই ধরে ফেলতাম। বিয়ের পর চেহাবাটাই কেমন অন্যরকম অন্যরকম লাগে। তাছাড়া সিঁথিতে সিঁদুরও বোধহয় একটু বেশি দিয়ে ফেলতাম তখন। একটু বেশি দূর অবধি।

ওবা তাকাচ্ছিল বলে লজ্জা নয়, সবে বিয়ে হয়েছে বলে লজ্জা নয, বরং মজাই লাগছিলো। তবে লজ্জা হচ্ছিল ঝিনুক কুড়োতে, ওদেব সামনে ওদেব মত ঝিনুক কুডোতে। কিন্তু সে আব কতক্ষণ। এক সময় দেখলাম, নিজেরই অজান্তে কখন হাসতে হাসতে আমিও ঝিনুক কুডোতে শুরু কবেছি, ঢেউয়ের ফেনায় পা ডুবিয়ে হাঁটছি। আর ঢেউ লেগে কাপড ভিজে যাবে বলে কাপডটা এক বিঘত তুলে ধবেছি। লজ্জা দূব হয়ে গেছে, ভয ভেঙে গেছে তখন।

হাঁটতে হাঁটতে একটু অনুভবেই বুঝতে পাবছিলাম যে, গৌতম পিছন পিছন আসতে আসতে আমার ফবসা পা— পায়ের উন্মুক্ত অংশটুকুব দিকে তাকাচ্ছে।

এক বিঘত পা উন্মুক্ত করে হাঁটা এক জিনিস, আর সমুদ্রে স্নান করা অন্য। স্বামী বলেই তো বেশি অস্বস্তি। তা ছাড়া অত লোকের সামনে! না বাবা, আমি সমুদ্রে স্নান করবো না।

পরের দিন সকাল থেকেই নুলিয়াটা পিছনে লাগলে।— সমুন্দরে নাহাবে না দিদি।

ও বলে উঠলো, না, না, নুলিয়া লাগবে না। আমি কি নতুন নাকি এখানে! আরো কতবার এসেছি।

সত্যি, গৌতমেব উপর এত হিংসে হচ্ছিলো। ও কতবার এসেছে, অথচ আমি কিনা এই প্রথম! এমন চমৎকার জায়গা ছেড়ে কোথায় ি নাম এতাদন? যাক, এসেছি যখন চোখ ভরে দেখে নিই, প্রাণ ভরে নিশ্বাস নিই।

যেখানটায় সকলে স্নান করছিলো সেইখানটায় এসে বালিব ওপর বসলাম দু'জনে। স্নান করতে-করতে সবাই হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে। ঢেউ লেগে বালিতে লুটোপুটি খাচ্ছে মেয়েরা. দু-একজন পুরুষ ঢেউযের মাথায় লাফাতে লাফাতে অনেক অনেক দূর অবধি চলে যাচ্ছে। আব তারও ওদিকে, অনেক দূরেব অথৈ জলে কালো কালো ক্ষুদে ক্ষুদে কয়েকটা ডিঙিতে করে মাছ ধরছে নুলিয়ারা! পাড থেকে কেউ বা ডিঙি ভাসাবার চেষ্টা কবছে, বার বার ফিরে আসছে ঢেউ লেগে।

ও বললে, কি. সমুদ্রে স্নান করবে না?

আমি আতঙ্কে হাত নেড়ে বলে উঠলাম, না বাবা, অত শখ নেই আমার।

—আবে দূর, ভয়ের কিছু নেই। আমি নিয়ে যাবো তোমাকে, দেখো। গৌতম বললে— এমনভাবে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে, যেন উনিও একজন নুলিযা সমুদ্রেব সঙ্গে এত চেনাশোনা।

আমি মনে মনে বললাম, তোমাকেও আমি নুলিয়া না নিয়ে একা নামতে দেবো কিনা। বিয়ের পর বউয়েব কাছে সবাই অমন শিভালরি দেখাতে চায গৌতমবাবু, আমি তা জানি।

মনে মনে এ কথা ভাবতে ভাবতে আমি হঠাৎ ঠাট্টার সুরে ডাকলাম. ও গৌতমবাবু!

ও ফিরে তাকালো।

বললাম, কি দেখছেন স্যার?

—সমুদ্র।

বললাম, উহুঁ। আমি জানি

—কি?

হেসে উঠে বললাম, বদ

সত্যি, মেয়েরা যে কি করে স্নান করছিলো আমার নিজেরই অবাক লাগছিলো। কখনো বালিতে গড়িয়ে পড়ছে, কাউকে স্রোতের টানে টানে নিয়ে যাচ্ছে। কারো কাপড-চোপড।

একজনের অবস্থা দেখে তো আমি আর গৌতম হেসে লুটিয়ে পড়লাম। বেচারা শাড়িখানা হাতে নিয়েই টুও করে বসে পড়লো গলা অবধি জলে ডুবিযে। কি করবে, জলের তোড়ে লাজলজ্জা রাখা দায়! আর কাপড়-জামা নামেই আছে, জলে ভিজে এমন অবস্থা, শরীরের কিছুই চাপা-ঢাকা থাকে না। পুরুষগুলোও কেমন ক্যাটক্যাট করে তাকিয়ে আছে দেখো।

আমি ইয়ার্কির ছলে গৌতমের চোখের দিকে তাকালাম!— এই। কি দেখছো মশাই অমন ড্যাবড্যাব করে?

ও হাসলো। আর আমি ভাবলাম, ওদের মত ওভাবে সমুদ্রের জলে নামতে পারবো না আমি এত লোকের সামনে। গৌতমের সামনে।

কিন্তু ইচ্ছেও যে না-হচ্ছিলো তা নয়। এক একবার ভাবছিলাম, মন্দ হয় না। বেশ তো জলে লুটোপুটি খাওয়া যায়। বিয়ের আগে এই তো সেদিনও ঝমঝম বৃষ্টি পড়ছে, আমরা দু'বোন ছাদে গিয়ে ভিজলাম। তবে হ্যাঁ, নুলিয়া না নিয়ে নামতে পারবো না। ওদের মত নুলিয়াটাকে হাত ধরতে দেবো না অবশ্য। মেয়েগুলো অমনভাবে নুলিয়াদের হাত ধরেই বা যাচ্ছে কেন ঢেউ কেটে কেটে! টাল সামলাতে না পেরে পড়ে যাবে, ভেসে যাবে, এই ভয়ে? তা একটু দূরেই নয় থাকবে নুলিয়াটা। না, এতদূর এসে সমুদ্রে স্নান না করে গেলে মনে খুঁতখুঁতুনি থেকে যাবে। বড়-জা হয়তো জিগ্যেস করবে, হ্যাঁ রে নতুন, সমুদ্রে নেয়েছিস তো রোজ? তারপরও অবশ্য ইয়ার্কি ঠাট্টা করবে তা জানি। বড-জা অবশ্য বলেছিলো, আগে নাকি এসেছিল একবার রথের সময়। ননদরাও। এবার ওরা যদি সবাই আসতো ভালো হতো। সবাই মিলে সমুদ্রে স্নান করা যেতো। বড়-জা বেশ ভালো মানুষ। সত্যি, আমি কত সুখী, কত সুখী। কারো জীবনে যে এত সুখ থাকে বিয়ের আগে কল্পনাও করতে পারিনি।

গৌতম হঠাৎ হেসে উঠলো হো হো করে। তন্ময়তা ভেঙে গেলো। সামনে তাকাতেই আমিও হেসে উঠলাম। ভীষণ মোটা একটা লোক সমুদ্রে নামছিলো, প্রথম ঢেউ লেগেই কাত। ফুটবলের মত গড়াতে গড়াতে ফিরে এলো বালির ওপর হুমড়ি খেয়ে।

আরে, এর মধ্যে এত চড়া রোদ উঠে গেছে? বালি তেতে উঠেছে।

—কি, নামবে না? গৌতম জিগ্যেস করলো।

আমি সায়ও দিলাম না, অমতও করলাম না। ভেতরে ভেতরে যে একটু ইচ্ছে না হচ্ছিলো তা নয়। গৌতম বললে, চলো তাহলে তেল তোয়ালে নিয়ে আসি, কাপড়টা বদলে আসি।

উঠে পড়লাম। হোটেলের নুলিয়াটা আবার সেলাম করলে।—নাহাতে যাবে না দিদি?

বললাম, যাবো, দাঁড়াও।

গৌতম বলে উঠলো, না না, নুলিয়া লাগবে না। আমি একাই পারবো তোমাকে সামলাতে।

আমার অবশ্য নিজের জন্যে তত ভয় হচ্ছিলো না, ভয় হচ্ছিল ওর জন্যেই। বললাম, থাক্ না একজন সঙ্গে। সবাই তো নুলিয়া নিয়েই নামছে।

তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলো গৌতম, আমার কথাটাকে কোন আমলই দিলো না।

হেসে বললে, তুমি দেখছি সাজুন্তির চেয়েও ভীতু!

আমি কি যেন বলতে যাচ্ছিলাম, থেমে গেলাম। কারণ আমাদের দোতলার ঘরটির পাশের সিঁড়ি বেয়ে তেতলার সেই বউটি, যার সাজগোজের ঘটা দেখে আমরা 'সাজুন্তি' নাম দিয়েছিলাম, তাকে নেমে আস.ে দেখলাম। পিছনে তার স্বামী।

চোখাচোখি হতেই বউটি হেসে বললে, যাবেন না সমুদ্রে স্নান করতে?

কি আশ্চর্য, ওই বউটা— যে কাপড় ভিজে যাবে এই ভয়ে ঝিনুক কুড়োবার সময়েও ঢেউয়ের কাছে যেত না, সেও চলেছে সমুদ্রে স্নান করতে? একটা সদাসিধে শাড়ি পরেছে, গোলাপি রঙের টার্কিশ তোয়ালেটা বাঁ কাঁধ থেকে ডান কাঁধে অবধি ছড়িয়ে দিয়েছে সুছন্দ বুকের ওপর দিয়ে, একরাশ ফাঁপানো চুলে ঢেকে গেছে সারা পিঠ।

নিজের অজ্ঞাতেই আমি গৌতমের দিকে তাকালাম। চোখ সরিয়ে নিলে ও, আর বউটির প্রশ্নের জবাবে, হেসে বললে, তখন থেকে তো ভয় ভাঙাবার চেষ্টা করছি।

আমি হাসলাম বটে, কিন্তু মনে মনে চটে গেলাম গৌতমের ওপর! আমি সমুদ্রকে ভয় পাই এ-কথাটা বউটিকে না শোনালেই কি চলতো না? আর গৌতম বউটির দিকে অমন মুগ্ধ হয়ে তাকিয়েছিলোই বা কেন? না হয় আমার চেয়ে একটু সাজগোজ বেশিই করে, দেখতে কি আমার চেয়ে সুন্দর?

বউটি এবং তার স্বামী হাসতে হাসতে নেমে গেলো। আমি চুল খুলে কাপড় বদলে নেমে পড়লাম একটাও কথা না বলে। গৌতম পিছনে পিছনে।

নুলিয়াটা আবার ধরলো বেরুবার মুখে।

গৌতম বললে, না, না, লাগবে না।

আসলে ওর মনে প্রথম থেকেই একটা বাহাদুরি দেখাবার নেশা ঢুকেছিলো বেশ বুঝতে পেরেছিলাম। ও যেন সব জানে, সব বোঝে, সব পারে। প্রথম প্রথম ওর এই ভাবটা আমার বেশ ভালোই লাগছিলো। বেশ একটা নির্ভর করার মত মানুষ যেন। কিন্তু যেখানে সত্যিই ভয় আছে সেখানে এই বাহাদুরির কি দরকার। দু'আনা পয়সা তো, তার বেশি আশাও করে না নুলিয়াটা। কিন্তু পয়সার জন্যে তো নয়, বরং পয়সা খরচ করতে পেলেই যেন খুশি হয় গৌতম। আসলে ওর অকারণ টাকা খরচ করার মধ্যেও যেন কি একটা বাহাদুরি লুকিয়ে আছে! বেশ বুঝতে পারতাম, ও যেন আমার চোখে— তার নবপরিণীতা স্ত্রীর চোখে নিজেকে বড় করে তোলবার ফিকির খুঁজছে। কখনো অপ্রয়োজনে টাকা খরচ করে, কখনো সমুদ্রকে তুচ্ছ করে, কখনো বা হোটেলের ঠাকুর-চাকরকে ধমক দিয়েও বোধ হয় আমার কাছে ওর মূল্য বাড়াবার চেষ্টা করছিলো।

নুলিয়াটা কিন্তু নাছোড়বান্দা। ফিরে তাকিয়ে দেখলাম সে এসে দাঁড়িয়ে আছে

একটু দূরে।

গৌতম যখন ওকে তুচ্ছ করে আমার হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যেতে গেলো, নুলিয়াটা তখন শুধু বললে, কারিন্ট আছে বাবু।

কিন্তু কে শোনে তার কথা। গৌতম টানতে টানতে আমাকে তখন জলে নামিয়ে নিয়ে গেছে। ওর হাত ধরে ধরেই ঢেউয়ের ঘা খেতে খেতে ভয়ে ভয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। কিছুটা গিয়ে আর সাহস হলো না। যত এগিয়ে যেতে চায় আমি তত বাধা দিই। শেষে হাল ছেড়ে দিলে ও, বললে, বেশ, তবে তুমি উঠে যাও, আমি একটু পরে উঠবো।

তখন ওর কথা আর কে ভাবে, নিজে পালিয়ে বাঁচতে পারলে হয়।

পাড়ে উঠে এসে চিৎকার করে বললাম, এই! এই বেশি দূর যেয়ো না।

কিন্তু বললেই কি আর শোনে! ঐ যে বললাম, ওর মনে তখন বাহাদুরি দেখানোর নেশা ঢুকেছে। বিয়ের পর তখন একটা মাসও কাটেনি, এ সময়ে নতুন বউটির চোখে নিজেকে নেপোলিয়ান বানানোর ইচ্ছা কোন্ স্বামীর না হয়। ও তাই আমার কথায় কান দিলো না।

আমার অবশ্য যেমন ভয় করছিল, তেমনি ভালোও লাগছিলো। সাজুন্তি ইতিমধ্যে স্নান সেরে ভিজে কাপড়ে এসে দাঁড়িয়েছে আমার পাশে, আর তার স্বামীটি স্নান করছে তখনও, কিন্তু নুলিয়ার হাত ধরে। তাকে দেখে আমি হেসেই ফেললাম। মেয়েমানুষেরও অধম, কি ভীতু রে বাবা ভদ্রলোকটা। মনে মনে ভয় পেলে কি হবে, গর্বও হচ্ছিলো গৌতমের জন্যে। ও একা একাই কতদূর এগিয়ে যাচ্ছে দেখো!

একটার পর একটা ঢেউয়ের মাথায় লাফ দিয়ে, কখনো ঢেউ ভেঙে পড়ার মুহূর্তে টুপ করে ডুব দিয়ে ও তখন অনেক দূরে চলে গেছে। আমি চিৎকার করে ডাকলাম একবার, বোধহয় শুনতে পেলো না।

একি, এত দূরে চলে যাচ্ছে কেন ও? এতদূর চলে গেছে তখন গৌতম, যেখানে আশেপাশে আর একটিও লোক নেই।

সাজুন্তির স্বামী ততক্ষণে উঠে এসেছেন, আর বউটি গৌতমের দিকে আঙুল দেখিয়ে তার স্বামীকে বললে, উনি কতদূর গেছেন।

বউটির চোখের দৃষ্টিতে গলার সুরে সপ্রশংস ভাবটুকু দেখে গর্বে বুক ফুলে উঠলো আমার। সত্যি, গৌতম যেন মুহূর্তের জন্যে নেপোলিয়ানের মত বীর হয়ে উঠলো আমার চোখে।

কিন্তু সাজুন্তি আর তার স্বামী হোটেলের দিকে চলে যেতেই আমার বুকের ওপর একটা আতঙ্কের পাথর চেপে বসলো।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই আমার মনে হলো, গৌতম যেন নিজে ইচ্ছে করে এগিয়ে যাচ্ছে না, গৌতম বুঝি বা স্রোতের টানে তাল রাখতে না পেরে ভেসে যাচ্ছে। হ্যাঁ, তাই। হাত তুলে বার বার যেন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা

কর‌ছে। যেন হাত তুলে চিৎকার করে বলছে, 'আমাকে বাঁচাও।'

অতদূর থেকে তার চিৎকার এসে পৌঁছানোর কথা নয়। কিন্তু সমস্ত শরীর যেন মুহূর্তে থরথর করে কেঁপে উঠলো আতঙ্কে, ভয়ে। মনে হলো গৌতম ভেসে যাচ্ছে, স্থির মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

বিভ্রান্তের মত আমি এদিক-ওদিক তাকালাম, কি করবো ঠিক করে উঠতে পারলাম না, নুলিয়াটাকে খুঁজলাম।

লোকটা ঠায় দাঁড়িয়ে আছে তখনও। অন্যমনস্ক ভাবে কি যেন দেখছে।

সমস্ত শরীর শিউরে উঠলো আমাব, চোখ ঠেলে কান্না এলো। পাগলের মত হয়ে গেলাম আমি। ছুটে গেলাম নুলিয়াটার কাছে। তারপর মুহূর্তের মধ্যে আমার দু'হাতের দুটো বালা খুলে তার হাতে গুঁজে দিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে অনুরোধ করলাম, ওকে বাঁচাও তুমি, বাঁচাও। ঐ দেখো ভেসে যাচ্ছে, ডুবে যাচ্ছে...

ঠিক কি বলেছিলাম, কিভাবে বলেছিলাম, নিজেও জানি না। সেই মুহূর্তে আমার মাথার ঠিক ছিলো না।

কিন্তু নুলিয়াটার মাথার ঠিক ছিলো। সে বালা দুটো আমার হাতেই গুঁজে দিয়ে একবার তাকালো গৌতমের দিকে। বিড়বিড় করে কি যেন বললে, তারপর সমুদ্রেব বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

উঃ, সে যে কী উৎকণ্ঠায় এক ঘণ্টা কেটেছে, আজ ভাবলেও সারা শরীর ঘামে ভিজে যায়, ঘুম আসে না কোনো কোনো দিন।

নুলিয়াটা একটু একটু করে এগিয়ে চলেছে, একটার পর একটা ঢেউ পার হচ্ছে, আর আমার মনে হচ্ছে যেন কত সময় পার হয়ে যাচ্ছে। বালির ওপর এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত অবধি নিষ্ফল ছোটাছুটি, নিজেরই অজ্ঞাতে কখন আমিও জলের কাছে এগিয়ে এসেছি।

একটার পর একটা ঢেউ পার হচ্ছে নুলিয়াটা, আর আমার মন বলছে পারবে, না, পৌঁছতে পারবে না নুলিয়াটা, গৌতমকে বাঁচানো যাবে না।

এক নিমেষের জন্যে গৌতমের শরীরের কালো বিন্দুটুকু একটা মাতাল ঢেউয়ের মাথায় উঠেই অদৃশ্য হয়ে গেলো। আর আমার পা দুটো থরথর করে কেঁপে উঠলো, মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠলো, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হলো, চোখের দৃষ্টি হঠাৎ ঝাপসা হতে হতে সামনের সব কিছু অন্ধকার হয়ে গেলো, সমুদ্রের গর্জন আর স্নানার্থীদের চিৎকার কোলাহল একটু একটু করে স্তব্ধ হয়ে গেল... আমি কি অন্ধ হয়ে যাচ্ছি, আমি কি কানে শুনতে পাবো না আর? বীভৎস একটা আতঙ্কে চিৎকার করে কেঁদে উঠতে চেষ্টা করলাম আমি, তারপর বোধহয় বসে পড়লাম বালির ওপব, কিংবা পড়ে গেলাম, কিংবা...

কি যে হয়েছিলো আমি জানি না।

একটু একটু করে যখন জ্ঞান ফিরে এলো, দেখলাম, একরাশ লোক আমাকে

ঘিবে আছে। মুখেব সামনে ঝুঁকে পড়ে অচেনা এক ভদ্রমহিলা বাতাস কবছেন আমাকে. আব নুলিয়াটা চোখেব পাতা খুলতে দেখে একমুখ হাসি নিয়ে বলছে, বাবুকে জান বাঁচায় দিয়েছি, দিদি, বাবু বাঁচ গেছে।

ধীবে ধীবে আমি উঠে বসলাম। দেখলাম, পাশে বসে ক্লান্তিতে অবসন্নতায় গৌতম তখনও ধুঁকছে

ক্লান্ত অবসন্ন শবীব টানতে টানতে, নুলিয়াটাব কাঁধে ভব দিয়ে ধীবে ধীবে হোটেলে ফিবে এলাম। ফিবে এসে বিছানায় লুটিয়ে পড়লাম। ঘুম. ঘুম, পবম তৃপ্তিব ঘুম।

বিকেলেব দিকে যখন হোটেলেব সামনেব বাবান্দাটায় দু'খানা চেয়াব নিয়ে এসে আমবা বসলাম, তখন আমাব শবীবেব ক্লান্তি দূব হয়েছে, কিন্তু গৌতমেব সাবা দেহ তখনও ব্যথা, অসহ্য ব্যথা। দৈত্যেব মত শক্তিশালী অবিশ্রান্ত ঢেউয়েব সঙ্গে যুদ্ধ কবে কবে পবাজিত সৈনিকেব মত ক্লান্ত আব লজ্জিত সে। মুখ তুলে তাকাতেও লজ্জা।

ইতিমধ্যে গুজবটা বটে গিয়েছিলো সাবা হোটেলে। সকলেই একবাব কবে এসে সমবেদনা জানিয়ে যাচ্ছিলো, খোজ নিয়ে যাচ্ছিলো গৌতম কেমন আছে, আব লজ্জায় অস্বস্তিতে আমি মাটিতে মিশে যেতে চাইছিলাম। মনে হচ্ছিলো, এই সমুদ্র ছেড়ে, এই হোটেল ছেড়ে পালিয়ে যেতে পাবলে যেন বাঁচি।

এক সময় সার্জান্ত আব তাব স্বামী এসে দাঁড়ালো পিছনে কেমন আছেন?

গৌতম অপ্রতিভ হাসি হেসে তাকালো, বললে, ভালো। তাবপব মাথা নিচু কবলে।

আব ভদ্রলোকেব দিকে তাকিয়ে আমাব মনে পড়ে গেল, ওকে নুলিয়াব হাত ধবে স্নান কবতে দেখে আমবা হেসেছিলাম। পাশাপাশি দু'জনকে তুলনা কবে গৌতমেব দুঃসাহসেব জন্যে গর্ববোধ কবেছিলাম।

ওবা চলে গেলো। আমাদেব চোখেব সামনে দিয়েই সমুদ্রেব পাশে গিয়ে দাঁড়ালো।

আব তখনই চোখাচোখি হলো নুলিয়াটাব সঙ্গে। সামনেব বাস্তাটা দিয়ে যেতে যেতে সে ফিবে তাকালো আমাব দিকে, হাসলো, সেলাম কবলো। তাবপব চলে গেল নিজেব কাজে। আব আমাব সমস্ত মন কৃতজ্ঞতায় নুয়ে পড়লো। ও না থাকলে আজ কি যে হতো! গৌতম বাঁচতো না, আমি বাঁচতাম না। হ্যাঁ, মৃত্যুই তো বলবো তাকে। বিয়েব পব একটা মাসও যেতে না যেতে যদি আমাব বাইশ বছবেব যৌবন থমকে থেমে যেতো তা'হলে তাকে মৃত্যু ছাড়া আব কি বলবো!

নিজেবই অজান্তে কখন যে হাতেব তিন ভবি সোনাব বালা দুটোয় হাত দিয়েছি টেব পাইনি।

সচেতন হতেই একটা খুশিব দীর্ঘশ্বাস বেবিয়ে এলো। ভাবলাম, লোকটাকে এখনই ডেকে বালা দুটো দিয়ে দিলে হবে। ও আমাব জন্যে যা কবেছে, যা দিয়েছে, তাব কাছে এটুকু দান কত তুচ্ছ!

কিন্তু লোকটা তখন অনেক দূরে চলে গেছে। তাই ভাবলাম, থাক এত তাড়া কিসের, লোকটা তো আর চলে যাচ্ছে না, কাল সকালে যখন আবার আসবে তখনই দিয়ে দেবো।

পরের দিন সকালে গৌতম আবার চাঙ্গা হয়ে উঠলো। গতকালের সেই লজ্জা আর অস্বস্তি যেন ঝেড়ে ফেলেছে।

বললে, চলো, বেড়াতে যাবে না?

বললাম, চলো।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালাম সমুদ্রের পাড়ে, যেখানে অবিশ্রান্ত ঢেউ ফেটে পড়ছে তীরের ওপর, তা থেকে একটু দূরে। আগেকার মত কাছে যেতে ইচ্ছে হলো না। না, ভয় নয়, কেমন একটা বিতৃষ্ণা।

হঠাৎ দেখলাম নুলিয়াটা আর একজনের সঙ্গে কাঁধে একটা লাঠিতে বিরাট জালটা ঝুলিয়ে যাচ্ছে আমাদের পাশ দিয়ে। চোখাচোখি হলো। ও হাসলো। আমিও।

ভাবলাম, এখনই দিয়ে দেবো বালা দুটো? কিন্তু এই বালা দুটো নিয়ে কিই বা করবে ও? ওর কাছে এ বালা দুটোও যা, দু'গাছি চুড়িও তাই। নিয়ে ওর বউকে পরতে দেবে হয়তো, বিক্রি তো করবে না। আর চুড়ি দুটোর দামই বা কম কি? দুটোয় এক ভরি সোনা তো আছেই। তা ছাড়া, কৃতজ্ঞতার দাম তো সোনা দিয়ে যাচাই হয় না। আর বালা দুটো ওকে দিয়ে দিলে মা বকবে না তো! বড়-জা? বলবে হয়তো, 'দু'দিনের জন্যে গেলি নতুন, গিয়েই বালাজোড়া খুইয়ে এলি?' বলবে নিশ্চয়ই, কারণ বালার প্যাটার্নটা বড়-জার খুব পছন্দ হয়েছিল। তার চেয়ে এক জোড়া চুড়িই বরং দেয়া যাবে নুলিয়াটাকে, ওর বউকে পরাতে বলবো।

কিন্তু এ জায়গাটা ছেড়ে পালাতে না পারলে যেন শান্তি নেই। আমরা দু'জনে এই সমুদ্রের পাড়ে এসে দাঁড়িয়েছি, অন্য সকলের মত সমুদ্র দেখছি, কিংবা কিছুই দেখছি না। অথচ ঝিনুক কুড়োতে কুড়োতে যারাই যাচ্ছে, ফিরে তাকাচ্ছে আমাদের দিকে, আমার দিকে। আর তাদের সেই তীব্র দৃষ্টিতে আমি যেন উপহাস দেখতে পেলাম। যেন সকলেই হাসছে আমাদের দেখে। যেন বলাবলি করছে, যেমন বীরত্ব দেখাতে গিয়েছিল, উচিত শাস্তি হয়েছে।

সাজুন্তির চোখেও যেন এমনি এক উপহাস লুকিয়েছিলো। সেই দু'টি টানাটানা কৌতুকে চঞ্চল চোখ, যে চোখ প্রশংসায় বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে বলে উঠেছিলো, 'দেখো, দেখো, উনি কতোদূর গেছেন!' সেই চোখজোড়া এখন যেন উপহাসে তীক্ষ্ণ।

আমি গৌতমকে বললাম, চলো, কাল সকালেই চলে যাই। আমার আর ভালো লাগছে না।

গৌতম সায় দিলো, তাই চলো।

কিন্তু যাওয়া হলো না। স্টেশন থেকে ফিরে এসে গৌতম বললে, বার্থ পাওয়া গেলো না। তিন দিন পরে একটা ব্যবস্থা হবে।

পরের, পরের দিন সকালে নিত্যদিনের মতই সাজুন্তি আর তার স্বামী নেমে গেলো আমার চোখের সামনে দিয়ে। তেমনি বুকের ওর গোলাপি তোয়ালেটা বিছিয়ে, এক পিঠ এলোচুলে একটা অকারণ ঝাঁকুনি দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে আমাদের ঘরের সামনে বউটি থমকে দাঁড়ালো, কিন্তু স্নান করতে যাবো কিনা, সে প্রশ্ন না করেই নেমে গেল। অর্থাৎ ওরা লক্ষ্য করেছে যে আমরা ঐ দুর্ঘটনার পর আর সমুদ্রে স্নান করতে যাইনি। শুধু কি লক্ষ্য করেছে ? হয়তো বলাবলি করেছে নিজেদের মধ্যে, হাসাহাসিও।

বউটির ওপর অকারণেই চটে গেলাম আমি। থামলোই যদি আমার চোখের সামনে তা হলে একটাও কথা বললো না কেন ? ভাবলাম, আমিও আর কথা বলবো না ওর সঙ্গে, উত্তর দেবো না কোনো প্রশ্নের।

কিন্তু ওরা যখন স্নান সেরে ফিরছে, মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল সিঁড়ির বাঁকে। আর হঠাৎ কথার ফোয়ারা হয়ে উঠলো বউটি— শুনেছেন ? আজ আবার একজন ডুবে যাচ্ছিলো, একটা বুড়ো। নুলিয়ারা গিয়ে বাঁচালো তাঁকে। ...কেউ ডুবে গেলে বাঁচানোর কাজ ওদের, নুলিয়াদের। শুনলাম গরমেন্ট নাকি টাকা দেয় সেইজন্যে। সত্যি ? নুলিয়ারা না থাকলে কি যে হতো। ....আর আজ কি সাংঘাতিক জোয়ার ছিলো, দেখলেন না তো !

অনর্গল কথা, অনেক কথা বলে গেলো বউটি। আমি শুধু ম্লান হাসলাম একটু। আর বউটি চলে যেতেই আমি গৌতমকে বললাম, এই ! নুলিয়ারা নাকি টাকা পায় গরমেন্টের কাছে, কেউ ডুবে গেলে বাঁচাবে বলে ?

— কই শুনিনি তো ! গৌতম বললে।

আমি বললাম, হ্যাঁ, ওপরতলার বউটি যে বললে। ওই সাজুন্তি।

দুপুরে শুয়ে শুয়ে আমি ঐ কথাই ভাবছিলাম, আর আনমনে চুড়ি দুটো নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলাম। চুড়ির প্যাটার্নটা দিদি পছন্দ করেছিলো। দিদি ! দিদির কথা মনে পড়লেই আমার এত ভালো লাগে ! দিদির মত আমাকে বোধহয় আর কেউই ভালোবাসে না। গৌতমও নয়। বিয়ের যত ঝামেলা তো দিদিই মাথায় করে নিয়েছিলো। বাজার করা, ডেকরেটর ডাকা, শ্বশুরবাড়ির লোকদের আদর আপ্যায়ন। — বাবা বুড়ো মানুষ, কত দিক আর সামলাবেন ? দাদাটা তো আড্ডা আর হকি-ক্রিকেট নিয়ে আছে।

দিদি বিয়ের পর একটা উপদেশ শুধু দিয়েছিলো। বলেছিলো, দ্যাখ নমি, গায়ের গয়নাগুলো— বাবা যা দিয়েছেন তোকে-আমাকে, এগুলো লোক দেখবার জন্যে নয়, সাজগোজের জন্যেও নয়। এগুলোই আমাদের ব্যাঙ্ক, আমাদের ভবিষ্যৎ। খেয়ালের বশে যেন এগুলো বিক্রি করিস না, হাজার অভাব অনটন হলেও না।

আচ্ছা, অভাব অনটন হলেও যা বিক্রি করতে নিষেধ করেছিলো দিদি, তা যদি নুলিয়াটাকে দিয়ে দিই, তা হলে কি দিদি রাগ করবে? দিয়ে অবশ্য দেবো না। দিতে আমার নিজেরই তেমন ইচ্ছে এখন আর হচ্ছে না। কেন দেবো, সাজুন্তি যে বললে, ওরা গবর্মেন্টের কাছ থেকে টাকা পায়. ডুবন্ত মানুষ দেখলে তাকে বাঁচানো তো ওদের কাজ। তাছাড়া ডিঙি করে কত মাছ ধরে আনে ওরা, বিক্রি করে। নেহাত গরিবও ওরা নয়। এক একজনকে স্নান করিয়ে দিতে দু'আনা করে নেয়, তাতে কম টাকা রোজগার হয় নাকি ওদের! আমি অবশ্য অকৃতজ্ঞ নই। নুলিয়াটা সত্যিই তো গৌতমকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। ও না থাকলে আজ কি দশা হতো আমার? কোন মুখ নিয়ে বাড়ি ফিরতাম? তাছাড়া, সারা জীবনটাই তো নষ্ট হয়ে যেতো, এই বাইশ বছর বয়সে—। না, নুলিয়াটাকে কিছু একটা দিতেই হবে। আংটিটা দিলে কেমন হয়। আমার তো অনেকগুলো আংটি। চেনা-অচেনা অনেকেই তো আংটি দিয়েছে। মুক্তো-বসানো যেটা, সেটা অবশ্য দেবো না। আর জামাইবাবু যেটা দিয়েছে সেটা খুব সুন্দর দেখতে! ওটা রেখে দেবো। না রাখলে জামাইবাবু কি ভাববে? যদি কোনদিন পরতে বলে। ওটা দিয়েছি শুনলে জামাইবাবু খুব দুঃখ পাবে। জামাইবাবু সত্যি খুব ভালোবাসে আমাকে, খুব। এক এক সময় মনে হয় দিদিকেও যেন অত ভালোবাসে না। তা অবশ্য সত্যি নয়। বউয়ের চেয়ে কেউ কি আর শালিকে বেশি ভালোবাসতে পারে? মোটেই না। জামাইবাবুটা ভারি ফাজিল, আর ভারি দুষ্টু। ও ইচ্ছে করেই অমন ভাব করে। আমি কি আর বুঝি না! দিদিকে রাগাবার জন্যেই অমন করে। রাগলে দিদিকে খুব সুন্দর দেখায় কিনা।

রাগলে দিদিকে যে খুব সুন্দর দেখায়— আমি কিন্তু কোনদিন লক্ষ্য করিনি। গৌতমই প্রথম বলেছিলো। সেই যে দিদির বাড়ি গিয়ে সব মিষ্টিগুলো খেতে পারেনি গৌতম, আর দিদি তাই রেগে গিয়েছিলো— তারপরই বলেছিলো ও। বলেছিলো, তোমার দিদি রেগে গেলে খুব সুন্দর দেখায় কিন্তু ওঁকে।

গৌতম রেগে গেলে আমার মোটেই ভালো লাগে না। তাই দু'দিন পরে যাবার আগের দিন বিকেলে ও যখন রুক্ষ গলায় বললে, জিনিসপত্তর গোছগাছ করছি না কেন, তখন আমার খারাপ লেগেছিলো। কই, বিয়ের পর থেকে একটা দিনও তো অমনভাবে কথা বলেনি ও। হঠাৎ এমন রাগ রাগ ভাব কেন? আসলে ও বোধহয় ভেবেছিলো আমার ফিরে যেতে ইচ্ছে নেই। আর ও তখন পালাবার জন্যে অধীর! প্রতি মুহূর্তে বেচারার মনে অদ্ভুত এক লজ্জা। কি না, সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছিলো লোকটা! ভাবলে, আমার নিজের হাসি পায়। সত্যি, কি কাণ্ডটাই না করলো গৌতম। বড়-জা বলেছিলো হনিমুন করে আসতে। ভালো হনিমুনই হলো বটে।

কিন্তু সারাটা বিকেল, সারাটা সন্ধে গম্ভীর গম্ভীর ভাব, সারা মুখ যেন থমথমে করছে গৌতমের। অপ্রয়োজনে একটা কথাও যেন বলতে নারাজ। ওর এই মুখের

ভাব দেখে কথাটা বলতে সাহস হলো না, অথচ ওকে না বলে তো আংটিটা দেয়া যায় না।

ভাবলাম, থাক, কাল সকালে নিশ্চয় মনটা ভালো থাকবে ওর, তখনই বলবো। আর নুলিয়াটাও তো কাল সকালেই আসবে, তখনই দেয়া যাবে গৌতমকে জিগ্যেস করে।

গৌতমকে জিগ্যেস করে আংটিটা দিতাম ঠিকই। আর গৌতম নিশ্চয়ই আপত্তি করতো না। কিন্তু পরের দিন সকালে যে এতবড় তাড়াহুড়ো হবে আমি কি ছাই জানতাম।

সকালে ঘুম থেকে উঠতে এমনিতেই দেরি হয়ে গেলো। এলার্ম দিয়ে রেখেছিলাম টাইমপিসে, কিন্তু এলার্মের দম দিয়ে রাখতেই ভুলে গিয়েছিলাম। তাই সেটাও বাজেনি, ঘুমও ভাঙেনি। যখন ঘুম ভাঙলো তখন আর এক ঘণ্টাও সময় নেই।

গৌতম চা খেয়ে চলে গেল হোটেলের হিসাব মেটাতে। ফিরে এসে বিছানা পত্তর গোছগাছ করতে লেগে গেলাম দু'জনে। সংসার ছড়িয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছিলাম এ-ক'দিন। টুকিটাকি জিনিসপত্তরগুলি তো নেহাত কম ছিলো না। আগের দিন কিছু কিছু বাঁধাছাঁদা হয়েই ছিলো, কিন্তু চিরুনি, টুথব্রাশ, পাউডার, দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম সব গুছিয়ে নিতে সময় লাগলো।

আর এ-সব করতে গিয়ে নুলিয়াটার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম।

বাক্স-বেডিং সব রিক্শায় তুলে সবে রিকশাওয়ালা প্যাডেলে পা দিয়েছে অমনি দেখি কি নুলিয়াটা আসছে সামনের রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে।

রিক্শা চলতে শুরু করেছে তখন। আমাদের দেখতে পেয়ে এক মুখ খুশির হাসি হাসলো নুলিয়াটা, সেলাম করলে। সেলাম করল বোধহয় বকশিশের লোভেই।

ছি-ছি, একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম ওর কথা। এত খাবাপ লাগলো আমার। রিক্শাওয়ালাকে থামতে বললাম।

গৌতমকে বললাম, এই দেখো তো তোমাব ব্যাগটা, ওর বকশিশটা দেয়া হয়নি। গৌতম বললে, টাকা তো তোমার বটুয়াতে।

তাই তো। খেয়ালই ছিলো না। আমার হাতেই তো বটুয়াটা। লাল ভেলভেটের ওপর সুন্দর নকশা করা বটুয়াটা এখানেই কিনেছি। মন্দিরে যেদিন গিয়েছিলাম সেই পাণ্ডার ছরিদারটার সঙ্গে, সেদিন।

বটুয়া খুলে দেখলাম, দশ' টাকাব নোট চার পাঁচখানা, খুচরো মাত্র দুটি টাকা আর কয়েক-আনা পয়সা।

কি করি, স্টেশনে পৌঁছেই তো রিক্শার ভাড়া দিতে হবে। কুলির পয়সা দিতে হবে। সব খুচরোগুলো তো দিয়ে দেওয়া যায় না।

তাই একটা একটাকার নোট বের করে নুলিয়াটার হাতে তুলে দিলাম। ও খুশি হয়ে সেলাম করলে। হাসলো। বললে, ফির আসবে বাবু, সেলাম দিদি, সেলাম।

সে'লাম জানিয়ে চলে গেল লোকটা। আর আমার এত ভালো লাগলো তাকে। এত ভালো।

ফিরে এসেই বড়-জাকে বললাম, জানেন দিদি, নুলিয়াগুলো এত ভালোমানুষ, এমন চমৎকার।

বড়-জা হাসলো। বললে, দেখিস নতুন, এত ভালো ভা. গা বলিস না, ঠাকুরপোর আবার হিংসে হবে।

আমি হেসে ফেললাম। তারপর বললাম, ওমা, আসল কাণ্ডটার কথাই তো বলিনি, রীতিমত একটা কাণ্ড।

— কি কাণ্ড ? চোখ কপালে তুললো বড়-জা।

আমি বললাম, আপনার ঠাকুরপো আর একটু হলেই তো ডুবে যেতো। একটা নুলিয়া দেখতে পেয়েই সাঁতরে গিয়ে বাঁচালো। লোকটা নিজেই দেখতে পেয়েছিলো। ওরা তো সমুদ্রে চান করাতে দু'আনা করে নেয়, আমি আসবার সময় কিন্তু একটা টাকাই বকশিশ দিয়ে এসেছি।

বলতে বলতে হঠাৎ কেন জানি না একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম, সেদিনের সেই আতঙ্কের দৃশ্যটুকু চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। বড়-জা কি যেন বললে, আর আমার তন্ময়তা ভেঙে গেলো। ভাবলাম, সত্যিই কি বালা দুটো দেবো বলেছিলাম নুলিয়াটাকে ? বোধহয় না। সে-সময় আমার কি মাথার ঠিক ছিলো ? কি বলেছি, কি করেছি তা কি আর আমিই জানি ! না, বালা-টালার কথা নিশ্চয়ই বলিনি। তাছাড়া আমার বলা-কওয়ার জন্যে কি অপেক্ষা করেছিলো নাকি নুলিয়াটা ? কখনো না। আমি বলার আগেই হয়তো নুলিয়াটা দেখতে পেয়েছিলো। দেখতে পেয়েই সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো। কেউ ডুবে গেলে তাকে বাঁচানো তো ওদের কাজ।

পলাশ

বিমল কর

ওখানে পলাশ ফুটেছে। ফাল্গুনের এই গোড়াতেই গাছগুলোর গা-মাথা লাল টুকটুক করছে। সকালের রোদে— শুধু সকাল কেন, একটু চড়া বেলার রোদে— দুপুরে, শেষ বিকেলেও যে কী সুন্দর দেখায়! তাকালে চোখ ফেরান যায় না। তবু ত ওখানটা পলাশবন নয়; মাঠের মধ্যে এদিক-ওদিক দু-দশটা গাছ, এই যা। তা বলে ধু ধু মাঠ নয়। ধান কাটার পর ফাঁকা ক্ষেত। কেমন যেন করুণ-করুণ চেহারা। আলের পর আল; আঁকাবাঁকা। তারই মধ্যে কোথাও একটা আমলকী গাছ দাঁড়িয়ে আছে; কোথায় হরিতকী। পড়ো জমিতে জাম-জামরুল। রেললাইনের পাশে টেলিগ্রাফ পোস্ট। তারের ওপর ফিঙে। জল জমে জমে ডোবার মতন হয়েছে কোথাও, শেওলা-জমা সবুজ মতন জল, তার ওপর তিরতিরে পাতা, জলশাক। ধবধবে বকগুলো এই এসে বসে, আবার উড়ে যায়। কোথায় যে যায়! আল ধরে ধরে খানিকটা গেলে ঝোপঝাড় কিছু আছে দূরে। ছায়াভরা গ্রাম-টাম হবে। 'ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি।' উমা কৌতুকের সুরে হেসে উঠে রতিকান্তর বর্ণনায় ছেদ টেনে দেয়। বলে 'আপনি কাজকর্ম কিছু করেন, না বসে বসে পলাশগাছ আর মাঠ-বন দেখেন, সত্যি করে বলুন ত জামাইবাবু?'

রতিকান্তর পোশাক পরা শেষ হয়েছিল। শাদা শার্ট, খাকি হাফপ্যান্ট। মোজা সমেত পা-টা চটির মধ্যে গলিয়ে ডেক-চেয়ারে শুয়ে শুয়ে সিগারেটটা শেষ করে নিচ্ছিল। এখন সবে সাড়ে-আটটা। এরই মধ্যে নাওয়া, খাওয়া, পোশাক পরা সব শেষ। বিনু একটা বড় মতন টিফিন-কৌটো ঝাড়নে বেঁধে এনে দেবে, আর চায়ের ফ্লাস্কটা; কাঠের ফ্রেমে আঁটা জলের কুঁজোও। চাপরাসী এসে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। কৌটো, ফ্লাস্ক, কুঁজো নিয়ে চলে যাবে। তারপরই রতিকান্ত উঠে পড়ল। টেবিল

থেকে সেই এক বিঘতটাক চওড়া নোট বই আর পেন্সিল পকেটে ফেলে, স্কেলটা বুকপকেটে গুঁজে, জুতো বদলে, চশমার ওপর অ্যাটাচিটা এঁটে নিয়ে চলে যাবে রতিকান্ত।

'কাজকর্ম না করে কি উপায় আছে?' উমার কথার জবাবটা দিল রতিকান্ত। বিনু ফ্লাস্ক আর টিফিন কৌটো হাতে ঘরে এসে পড়েছে তৎক্ষণে। রতিকান্ত আবার বললে, 'তবে ফাঁকি মারতে ইচ্ছে হলে কেউ কি আর ঠেকাতে পারে!'

বিনু স্বামীর জন্যে কাচা পাটকরা রুমাল, ভাজা মশলা, এটা-সেটা গোছ করে দিতে দিতে বলল, 'রোজ রোজ ত শোনাচ্ছ কী সুন্দর জায়গা, কী সুন্দর জায়গা— পলাশফুল ফুটেছে, হাতিঘোড়া নাচছে— তা একদিন ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যাওনা বেড়াতে।'

প্রস্তাবটা আগেও উঠেছে। উমা নিজেই বলেছে। আজ আবার। উমা ঠোঁট উলটে বলল, 'ও-কথা আর বলিস না দিদি। জামাইবাবুর মাথা কাটা যাবে।'

'মাথা কাটা যাবে বলিনি ত।' রতিকান্ত সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিল। হাসিমুখ। বলল, 'চাকরিটা যাবে বলেছি।'

'ওই একই হল।' উমা দিদির ব্লাউজের হাতায় ফুল তুলছিল সুতো দিয়ে। দাঁত দিয়ে সুতো কাটল। নিচু মুখ। চোখ দুটো শুধু ভুরুছোঁয়া হয়ে রতিকান্তকে নজর করল।

বিনু বোনের হয়ে বলল, 'আর কারুর চাকরি যায় না, তোমার বেলাতেই যত অমুক সাহেব তমুক সাহেব দেখে ফেলবে।' কথাটা শেষ করতে করতে বিনু বাইরে চলে গেল টিফিন, জলের কুঁজো চাপরাসীকে গছিয়ে দিতে।

রতিকান্ত ডেক-চেয়ার ছেড়ে উঠল। সামনেই ড্রয়ার দেওয়া টেবিল। তারই উপরে কাঠের টুকরো এঁটে আয়না বসান। কাচটার রঙ কেমন একটু হলুদ হলুদ। দু-চারটে চিড়ও আছে। রতিকান্তর নিজের হাতের মিস্ত্রীগিরি।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলের ওপর চিরুনির কয়েকটা দ্রুত এবং অভ্যস্ত টান দিল রতিকান্ত। কাচের মধ্যে দিয়েই উমার গোলগাল ফরসা মুখটা দেখা যাচ্ছিল। 'রেলের ট্রলির নিয়মকানুনটা আলাদা, বুঝলে উমা। এ ত আর তোমার দিদির কুড়িয়ে পাওয়া ঠেলাগাড়ি নয়।' বলে রতিকান্ত হেসে নিজের বুকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। 'এ-ঠেলাগাড়িতে তোমার দিদি যা খুশি চাপাতে পারে। কিন্তু রেলের ট্রলিতে ওয়াইফকেও চাপান যায় না।' রতিকান্ত হাসতে লাগল। সেই সঙ্গে নোটখাতা, পেন্সিল, রুমাল পকেটে পুরে নিচ্ছিল।

'আ-হা, কী কথা!' উমা জামাইবাবুর দিকে আড়চোখে চেয়ে মধুর ভঙ্গিতে হাসল। 'ওয়াইফের চেয়ে ওয়াইফ-সিস্টারের দাম বেশি মশাই। আপনার সাহেবকে সেটা বুঝিয়ে দেবেন।'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়। আমিও তাই বলি। বিশেষ করে আমরা যখন হারাধনের দশটি গিয়ে একটিতে ঠেকার মতন, সবে ধন নীলমণি একটিমাত্র ওয়াইফ-সিস্টার।' রতিকান্ত মাথা নেড়ে নেড়ে বলল। তারপর দুজনের একসঙ্গে হাসি।

হাসি থামলে উমা বলল, 'আপনার সেই গোকুলবাবুর ওয়াইফ-সিস্টারের গল্পটা কাল রাত্রে যতবার মনে পড়েছে— ততবার হেসেছি জামাইবাবু।'

বিনু এল। রতিকান্ত তৈরি। শুধু জুতোটা পায়ে গলিয়ে বেরিয়ে পড়ার বাকি।

ঘরের মধ্যে জানলার কাছে কাঠের দোলনায় রতিকান্তর মেয়ে ঘুমচ্ছে। দেড় বছরেব মেয়ে। মেয়ের গালে আস্তে করে একটু আঙুল ঘষে হাসিহাসি চোখে বললে রতিকান্ত, 'এ বেটি মাসির মতনই তেজী হবে। এক ফোঁটা মেয়ের মুখের চেহারাটা দেখ। গাল ফোলানো কপাল কোঁচকানো।'

বিনু স্বামীর সোলার হ্যাটটা পেরেক থেকে নামিয়ে এনেছে। জুতো পরা হয়ে গেলে এই টুপিটা হাত বাড়িয়ে দেওয়ার যা বাকি। তারপর আর রতিকান্তর জন্যে করণীয় কিছু নেই।

'মাসির মুখটা এমন কিছু ফেলনা নয়; বোনঝির তাতে জাত যাবে না।' উমা কৃত্রিম একটা ঝাঁজ দেখাল।

'তা ঠিক; তবে ফলাফলটাও খুব ভালো হবে বলে মনে হয় না—', রতিকান্ত খুব প্রচ্ছন্নভাবে কিসের যেন একটা ইঙ্গিত দিয়ে হাসিমুখে বাইরে চলে গেল।

বাইরে ঠিক নয। ঘরের চৌকাঠের সামনে হেঁট হয়ে জুতো পরতে লাগল।

বিনুর সঙ্গে উমাও চৌকাঠের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

জুতোর ফিতে বেঁধে রতিকান্ত মুখ তুলল। বিনু টুপিটা দিল। উমা বলল, 'খুব সে মাসির নিন্দে করে পালাচ্ছেন। আর আসছি না বাপু এখানে। এই প্রথম, এই শেষ।'

'ছি ছি—', রতিকান্ত জিভ কাটল, কানে আঙুল দিয়ে বলল, 'অমন কথা শুনতে নেই।'

'কেন বলবে না! সারাদিন ত নিজে ঘুরে বেড়াও, কিন্তু ওকে কবে একটু সঙ্গে করে বাইরে নিয়ে গেছ?' বিনু বোনের হয়ে বলল, 'এসে পর্যন্ত ত মেয়েটার ঘরে বসে বসেই কাটছে।'

কথাটা রতিকান্তের কানে গেছে কি যায়নি বোঝা গেল না। জুতোর শব্দ তুলে ততক্ষণে সে এগিয়ে গেছে।

দুই বোনে একটুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থাকল। উমা দিদির কাঁধ থেকে খসে পড়া আঁচলটা তুলে দিতে দিতে বলল, 'জামাইবাবু যেন কেমন হয়ে গেছে দিদি দেখছিস?'

'কেমন?' অন্যমনস্কভাবে শুধল বিনু।

জ াবটা চট করে ঠোঁটে এল না উমার। কথাটা কেন বলল, কী দেখে, কী ভেবে—উমাও তার হদিস পেল না। একটু থেমে যেন কিছু একটা মনে মনে গুছিয়ে নিয়ে বলল, 'এই বয়সেই কেমন যেন একটু বুড়ো বুড়ো।'

বিনু মুখ ঘুরিয়ে বোনকে দেখল। তারপর কিছু না বলেই হাসল একটু।

দিন দুই যেতে না যেতেই এক সকালে উমার হুটোপাটি শুরু হয়ে গেল। রতিকান্ত কথা দিয়েছে আজ ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। না, না— চাঁদমারি কিংবা তিন-পাথরের গুহা থেকে চুইয়ে পড়া জল দেখতে নয়, নিয়ে যাবে ট্রলি করে, পাঁচ মাইল দূরের সেই পলাশফোটা রোদ-ঝলমল মাঠে। রতিকান্তর মুখে শুনে শুনে, সেই তেপান্তর সম্পর্কে উমার কেমন একটা কৌতূহল জেগেছিল। আর যদি সে কৌতূহল খুবই সাধারণ হয়, তাতেই বা কী! ট্রলির উপর বসে পাঁচ মাইল পথ, হাওয়ার দমকা খেতে খেতে হু হু করে এগিয়ে যাওয়া, ভাবতেই যে ভালো লাগে। ট্রলিতে কখনো চড়েনি উমা। দেখছে। এইত সেদিনও দেখল। লাইনের উপর দিয়ে যখন চলে যায়, এমন সুন্দর একটা গনগন আওয়াজ হয়। যেন একদল ভোমরা গুনগুন করছে। লাইন ধরে রাস্তাটাও—জামাইবাবু যেখানে কাজে যায়—নাকি চমৎকার। ঝোপঝাড়, জঙ্গল, মাঠ, ছোট ছোট দুটো নদী। উমার ত উৎসাহ খুব। কলকাতার অন্ধগলির বাসিন্দে সে। ট্রেনেই চড়েছে জীবনে হয়ত দু-চারবার। ফাঁকা মাঠঘাট বন এসব এক সিনেমার ছবিতে ছাড়া দেখেছেই বা কোথায়। আব দেখবেই বা কবে!

আসলে হয়ত এসব কিছুই না। শুধু একটা চঞ্চলতা, ঘর থেকে বাইরে বেরুবার, দু-পাঁচ ঘণ্টা কোথাও কোনো নতুন জায়গা থেকে বেড়িয়ে আসার।

অত সকালে কি স্নান সারা যায়, ভাতেই কি খাওয়া যায়! তবু উমা স্নান সারল। ভিজে চুল শুকবে কি শুকবে না, বিনুনি দিলে নির্ঘাত জট; দরকার কি, এলোই থাক। ভাত দু-গরাস পেটে গেল। ওতেই হবে। 'বুঝলেন জামাইবাবু, লুচি আলুর দম সব বাপু বেঁধে নিয়ে যাচ্ছি, আমাদের সেই বেহালার মাঠে বেড়াতে যাওয়ার মতন। আমার আবার বাইরে বেরুলে খিদেটা বেশি পায়। দিদি, ক'টা পান দিবি? ও জামাইবাবু, যদি বলেন ত আমার সঞ্চয়িতাটা নিই; গাছের ছায়ায় বসে বসে পড়া যাবে।'

বিনু বোনের ছটফটানি দেখে বলে, 'তুই যেন হরিদ্বারে গঙ্গা চান করতে যাচ্ছিস উমি, এমনি করছিস। যা তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিগে যা। ছাপা শাড়িটাই পরে যাস, ভালোটালো পরে দরকার নেই, জলে কাদায় কাঁটার খোঁচায় ত একশা করে আনবি।'

যাবার মুখে কিছু না হক, উমা একমুঠো এলাচ-দারুচিনি নিয়ে বেরুল। রতিকান্ত

হেসে বলল, 'তা ভালো, সারাটা পথ তোমার মুখ থেকে সুগন্ধ বাক্য শোনা যাবে।'

উমা ভ্রূভঙ্গি করে জামাইবাবুর হাতে চিমটি কেটে দিল। এদিক-ওদিক একটু তাকিয়ে জিব ভেঙিয়ে বলল মৃদু সুরে, 'দয়া হলে এমনিতেই অনেক কিছু শোনাতে পারি মশাই।'

ট্রলিতে উঠে উমার মুখ যেন আর বন্ধ হয় না। একটার জবাব পেতে না পেতে আর একটা। 'ও জামাইবাবু, মাথার ওপর এ আবার কী? এ যে রাজছত্র! রঙটা শাদা কেন? পিছনের লোক দুটো যে লাইনের ওপর দিয়ে ছুটছে— ওমা পা পিছলে পড়ে যাবে না? আপনি ছুটতে পারেন লাইন দিয়ে? পারেন না!'

রতিকান্তর পাশে কাঠের বেঞ্চটায় বসে উমার যেন শান্তি হচ্ছিল না। একবার ডানদিকে, পরক্ষণেই বাঁদিকে মুখ ফেরাচ্ছে। সামনের জিনিসটা কখন যে হুস করে পিছনে পড়ে যাচ্ছে ভালো করে ঠাওর করতেই পারছে না। তখন আবার ঘাড় ঘোরাও। দাঁড়িয়ে যেতে পারলেই যেন স্বস্তি পেত উমা। কিন্তু সেখানে তার ভয় আছে।

একটা পুরো এলাচ মুখে ফেলে দিয়ে চিবুতে লাগল উমা। 'ওটা কী জামাইবাবু? দেখুন দেখুন, একপাল গরু কিভাবে নামছে ঢালু দিয়ে। যদি পা পিছলে পড়ে—!'

রতিকান্ত প্রথম প্রথম জবাব দিয়েছিল; এখন আর সব কথার জবাব দিচ্ছে না। বুঝতে পেরেছে রতিকান্ত, উমার প্রশ্নগুলোর জবাব না দিলেও চলে।

খানিকটা এগিয়ে আসতে আশপাশের চেহারাটাই যেন বদলে গেল। মাঠের পর মাঠ। উঁচু নিচু। ছোট ছোট শালঝোপ। জল শুখনো বালি-কিচকিচ নালা। সামান্য দূরেই একটা পাহাড়ের ঢল নেমে এসেছে। গাছ আর ঝোপ সেই ঢালুর মুখে যেন কেউ গেঁথে বসিয়ে দিয়েছে। ছোট বড়ো পাথর। কালচে রঙ। একটা নীল মেঘ পাহাড়টার মাথার উপর চাঁদোয়ার মতন বসান। দু-একটা লোক দেখা যায় কি যায় না।

পাহাড়টার নাম কী? কত দূর? ওখানে মন্দির আছে কি নেই? উমার বকবকানি শেষ পর্যন্ত থেমে এল।

পরিবেশটা আবার বদলাল। এবার দু-পাশে একটু তফাত থেকে বুনো ঝোপ-জঙ্গলের একটানা ছায়া-ছমছম চেহারা। ঝাঁকড়া-মাথা গাছ, গাছের গা বেয়ে বেয়ে বুনো লতা। কতক পাখি। কাঠবেড়ালি।

উমা হঠাৎ কান খাড়া করে কী যেন শুনতে লাগল। 'ওটা কী ডাকছে জামাইবাবু?'

'ঘুঘু'। রতিকান্ত একটু অবাক হয়ে উমার দিকে চাইল।

'ইস্; আমারও ঠিক তাই মনে হয়েছিল।' উমা আঁচল দিয়ে কপালটা চট করে মুছে নিল। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাপটাও বেড়েছে।

রতিকান্ত রসিকতা করে বলল, 'ঘুঘুও কি কলকাতায় নেই নাকি উমা ?'

'কী যে বলেন ! তা নয়। কলকাতার ঘুঘুগুলো এমন সুন্দর করে ডাকতে পারে না। ওদের দম নেই।' উমা নিজের কথায় নিজেই হেসে উঠল।

রতিকান্তও হো হো করে হেসে ফেলল।

হাসি থামল। উমা আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে নিয়ে এবার ঝুঁকে বসল। জানুর উপর কনুই, হাতের তালুতে মুখের ভার নিয়ে।

'আমরা কতটা এলাম জামাইবাবু ?

'অর্ধেকটা চলে এসেছি।' রতিকান্ত জবাব দিয়ে একটা সিগারেট ধরাল।

'আপনার জলতেষ্টা পাচ্ছে না ? আমার ত গলা শুকিয়ে এল।' সামনের রোদের দিকে চেয়ে চেয়ে উমা বলল। তাতটা সত্যিই বেশ বেড়েছে। ফাল্গুনের গোড়াতেই এত ঝকঝকে রোদ এখন। লাইনগুলোতে যেন আঁচ লেগেছে, পাথরের টুকরোগুলোও বোধহয় গরম।

'জলতেষ্টা পেয়েছে ত জল খাও।' রতিকান্ত কুঁজোটার জন্যে পিছন দিকে চাইল।

'থাক ; এখন খাব না। বরং একটু পান খাই।' সত্যিসত্যিই কাগজে মুড়ে গোটা চার পাঁচ খিলি পান এনেছে উমা। রতিকান্ত পান খায় না। উমা জোর করে গুঁজে দিল মুখে। তারপর নিজে একটা খিলি মুখে পুরে বলল, 'আপনাকে বড়ো সাধ্যসাধনা করতে হয়। স্বভাবটা আজও তেমনি আছে। বদলাল না।'

ঠিক কী সূত্রে যে কথাটা, রতিকান্ত বুঝে উঠতে পারল না। অনুমান করতে পারল, কোনো একটা পুরনো প্রসঙ্গ আছে। বলল রহস্যভবেই, 'সাধ্যসাধনা আর করল কে ? বলতে না বলতেই চাকরির মায়া ছেড়ে এখানে বেড়াতে নিয়ে এলাম তোমায়।'

'যান, যান—' উমা মুখ না তুলে শুধু একটু ঘাড় ফেরাল, 'তাও যদি না সব কথা আমার মনে থাকত।' উমা চুপ করে গেল। ট্রলিটা লাইনের উপর সুন্দর একটানা শব্দ করে এগিয়ে যাচ্ছে। সামনে ঝলসানো রোদ। পাশের লাইন দিয়ে একটা মালগাড়ি আসছে এই মুখে। তার ইঞ্জিনের ধোঁয়া।

রতিকান্ত উমাকে দেখছিল। ফরসা মুখটা রোদের ঝাঁজে লালচে হয়ে উঠেছে। ঠোঁট দুটি পানের রসে লাল। কাঁধে জড়ান এলোচুল শুকিয়ে গেছে। হাওয়ায় উড়ছে কতকগুলো। কানের পাশে, কপালে। একটু যেন ঘাম জমেছে উমার কপালে।

নীরবতা কাটিয়ে উমা হঠাৎ বলল, 'আপনার বিয়ের পর এই আবার আপনার সঙ্গে দেখা। মধ্যে অবশ্য কলকাতায় একবার দেখা হয়েছিল— ঘণ্টাখানেকের জন্য।'

কথাটা ঠিক। বিনুকে আনতে গিয়ে একবার দেখা হয়েছিল উমার সঙ্গে বিনুদের বাড়িতে। উমাই এসেছিল দেখা করতে শাঁখারিটোলার বাড়ি থেকে। বিনু তার মাসতুতো বোন। আলাদা আলাদা বাড়ি মা-মাসির।

বাড়ি আলাদা হলেও মেয়েদের বিয়ের সময় একসঙ্গে পাত্র খোঁজা শুরু করেছিল মেয়ের মায়েরা। বিনুতে উমাতে এমন কিছু বয়সের তফাত নয়। বছর আড়াই তিন বড়জোর। পাত্র হিসেবে রতিকান্তর সংবাদটা যোগাড় করেছিল উমার মা। বিয়েটা কিন্তু হয়ে গেল বিনুর সঙ্গে। তারপরে চারটে বছর কেটে গেছে, উমার বিয়ে হয়নি আজও। এই ক'বছরের মধ্যে উমাদের সংসারে ছোট বড়ো অনেক কাণ্ডই ঘটে গেছে। উমার মা মারা গেছে। নানা কারণে ওর বিয়ের কথাটা চাপাই পড়ে আছে এখনো। আবার উঠবে। হয়ত উঠেছেও এর মধ্যে। নয়ত চার বছর পরে হঠাৎ এই শাল পলাশের দেশে হাওয়া বদলাতে পাঠাবে কেন উমার বাবা এবং মাসি— বিনুর মা।

এসব পুরনো কথা আজ এখন উমা কিংবা রতিকান্তর মনে পড়ছিল কিনা বলা মুশকিল। দেখা হবার কথায় হয়ত কিছু মনে পড়ে থাকতেও পারে।

'তুমি ত অনেক দিন থেকে এখানে আসব আসব করছিলে, এলেই পারতে।' রতিকান্তর গলার স্বর এমনিতেই একটু মৃদু, এখন আরো মৃদু এবং কোমল হল।

'আমার ইচ্ছাতেই যদি কাজ হত--- !' উমা সামনে এসে পড়া মালগাড়িটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল।

মালগাড়ির শব্দটা এতক্ষণ কথা ছাপিয়ে যাওয়ার মত ছিল না। এবার রীতিমত কর্কশ হয়ে উঠেছে। ঘটাং ঘটাং বিশ্রী একটা শব্দকে খাদে বেঁধে চাকা ঘষে যাওয়ার একটানা একটা আর্তনাদ। লাইনে, পাথরে এই ফাঁকায় সেই শব্দটা যেন প্রতি মুহূর্তে আরো তীব্র হচ্ছিল।

উমার মনে হল রতিকান্ত যেন কিছু একটা বলল। কী বলল, উমা শুনতে পেল না। শুধু একটা 'তুমি' ছাড়া।

দুজনেই চুপ। মালগাড়িটা পেরিয়ে গেল। শব্দটাও দূরে আসতে লাগল।

একসময় আবার সব শান্ত। সেই ট্রলির চাকার শব্দ, সামনে ঝলসে ওঠা রোদ, মাঠঘাট, টেলিগ্রাফ পোস্ট।

উমা মুখ তুলে রতিকান্তর দিকে চেয়ে হঠাৎ একটু হাসল। 'আপনাকে আমি যত চিঠি দিয়েছি তার সিকির সিকিরও জবাব আপনি দেননি।'

রতিকান্ত কথাটায় যেন লজ্জা পেল। বলল, 'আমি ভালো চিঠি লিখতে পারি না, উমা। আর সেই একঘেয়ে আমরা ভালো আছি, তোমরা কেমন আছ— এ লিখতেও ইচ্ছে করে না।' একটু থামল রতিকান্ত। যেন আরো কিছু বলার আছে এমন ধরনের একটা ভঙ্গি করে শেষে বলল, 'তা বলে ভেব না তোমার কথা মনে পড়ত না।'

উমা রতিকান্তর চোখের দিকে একপলক চেয়ে থেকে মুখ নামিয়ে নিল। নিজের পরনের ছাপা শাড়িটার একটা ফিকে হয়ে যাওয়া ফুল দেখতে দেখতে বলল, 'চোখের

সামনে কেউ থাকলে তাকে এসব কথা বলতে হয়, না জামাইবাবু?' কথার শেষে ম্লান একটু হাসি।

রতিকান্ত জবাব দিল না। অন্যমনস্কভাবে সামনের দিকে চেয়ে থাকল।

জায়গাটায় পৌঁছে খুশি। রতিকান্ত যা বলেছে তার সঙ্গে যদি ফর্দ মেলান যায়, কোথাও কমতি হবে না। সত্যিই সুন্দর এই জায়গাটা।

ট্রলি থেকে নেমে কিছুক্ষণ ত উমা চোখ ভরে সব দেখল। লাইনের এপাশটায় আলতোলা ফাঁকা ক্ষেত। দৃষ্টির সীমানা অনেক দূর পর্যন্ত চলে যায়, সবুজ একটা বনের মাথায় আকাশ যেখানে ছুঁয়ে যাচ্ছে, ততদূর। মাঝে মধ্যে একটি করে যেন কুঞ্জবন, অনেকগুলো গাছ জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে। ওপাশটায় পলাশ। ছাড়া ছাড়া, কিন্তু দূর থেকে মনে হয় ঘেঁষাঘেঁষি। লাল টুকটুক করছে। সামনে কনস্ট্রাকশানের লাল ইট-গাঁথা কেবিনের অসম্পূর্ণ চেহারাটা। চুনসুরকির একটা ডাঁইও চোখে পড়ে। সামান্য কিছু মজুর, হল পাইপ, তারের বাণ্ডিল, রেললাইনও চোখে পড়ে।

রতিকান্ত বলল, 'তুমি ওখানটায় ছায়ায় বসে বসে জিরও, আমি একটু কাজকর্ম দেখে আসি।'

উমা মাথা নেড়ে সায় জানাল। তারপর আস্তে আস্তে সামনের ছায়াটায় এসে বসল।

কী রোদ! আকাশটা যেন তার গা থেকে সমস্ত রোদের ঢেউ এই মাঠ আর ক্ষেত আর নিরিবিলি ফাঁকায় ছড়িয়ে দিয়েছে। অকৃপণভাবে। ফাল্গুনের হাওয়া। একটু তবু তপ্ত। কতকগুলো ফড়িং সামনের ঘাসে উড়ে উড়ে ঘুরপাক খাচ্ছে। দু একটা পাখি সামনে দূরে ডেকে ডেকে উড়ে যাচ্ছে, আবার এসে বসছে আশেপাশে।

উমা মুখটা মুছে নিল। ট্রলিটা একপাশে ছায়ার নিচে রাখা রয়েছে। কাছেই। জলতেষ্টা পাচ্ছিল খুব। কুঁজোটা আনতে এগিয়ে গেল উমা।

জল খেয়ে ছায়ার তলায়, ঘাসে পা ছড়িয়ে চুপ করে বসে থাকল উমা। আশেপাশে কেউ নেই। পাখিদের খুব মৃদু একটা কিচির-মিচির ছাড়া কোনো শব্দ কানে আসে না। তাও এর মধ্যে ছেদ আছে, দীর্ঘ ছেদ। একটা ফড়িং উমার হাঁটুর উপর এসে বসল, ছাপা শাড়ির ফুলের উপর। আবার উড়ে গেল। মাঠ আর আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে কখন যেন ঘোর লেগে যায় উমার।

রতিকান্ত কখন এসে পাশে বসেছে, উমার হুঁশ ছিল না। কিংবা হয়ত হুঁশ ছিল, তবু অন্যমনস্কতা কাটাতে পারেনি । রতিকান্ত জলের কুঁজো তুলে আলগোছে অনেকটা জল খেয়ে নিল।

'কেমন লাগছে?' রতিকান্ত বেশ করে গা এলিয়ে বসল ঘাসের উপর।

'খুব সুন্দর।' উমা কোলের উপর জড় করা আঁচলটা পাশে ফেলে দিয়ে সুন্দর

করে হাসল।

একটু চুপচাপ। উমাই বলল আবার, 'আমার যদি আপনার মতন কাজ হত, এখানে বসে বসে সারাটা দিন কাটিয়ে দিতুম।'

'একা একা ?' রতিকান্ত পরিহাস করে শুধল হাসিমুখে।

উমা রতিকান্তর দিকে আড়চোখে চাইল হাসিমুখেই। মাথা কাত করে জবাব দিল, 'দোকা যখন নেই তখন একা একাই।'

রতিকান্ত সিগারেট ধরাল। আরো একটু আরাম করে বসল। বলল, 'তুমি কি কবিতা-টবিতা লেখ নাকি ?'

'না। আপনার বিয়েতেই একটা যা লিখেছিলুম।' উমা রতিকান্তর মুখের দিকে চেয়ে ঠোঁট কামড়ে থাকল।

'সেটা ত চুরি।' রতিকান্তর জবাব।

'কী— ?' একটা কৃত্রিম তিরস্কার কিংবা প্রতিবাদ, 'আর একবার বলুন ত কী বললেন।'

'চমৎকার হয়েছিল কবিতাটা।' রতিকান্ত তাড়াতাড়ি তারিফ করার একটা ভঙ্গি করল, 'ফার্স্ট ক্লাস। কী ভাষা, কী ছন্দ! পড়লেই রবিঠাকুরের সেই—আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে গিয়াছে দেশ ছেয়ে— মনে পড়ে যায়।' হাসতে লাগল রতিকান্ত।

উমা চুপ। অন্যদিকে চেয়ে থাকল। বলল তারপর খুব মৃদু গলায়, 'মিথ্যেই বা কি— বড় মাসির বাড়ি ত আনন্দেই ছেয়ে গিয়েছিল।'

'আমি বোধহয় আনন্দময়ী— সরি, আনন্দময় ছিলাম ?' রতিকান্ত ধোঁয়া ছাড়ল।

উমা মাথা হেলাল।

রতিকান্ত হঠাৎ বলল, 'আর তুমি বেচারি বোধহয় সেই দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে ?'

রতিকান্ত হাসছিল। উমার মুখে হাসি ছিল না। এবার যেন একটু হাসি এল, রতিকান্তর কথা শোনার পর। বলল, 'আপনি যা ভাবেন।' উমা ঘাসের উপর থেকে আঁচলটা তুলে মুঠোর মধ্যে দুমড়তে লাগল। আর বলব-না বলব না করেও শেষে বলে ফেলল, 'আমার কবিতাটাই শুধু চুরি, আরো'— কথাটা শেষ করল না উমা।

ইঙ্গিতটা কিন্তু রতিকান্ত ধরতে পারল। উমার মার খোঁজ নেওয়া, দেখা পাত্র বিনুর মা চুরিই করেছে বলা যায়। পুরনো এই প্রসঙ্গটার জের না টেনে ব্যাপারটাকে লঘু করার চেষ্টা করলে রতিকান্ত, 'আমিও বোধহয় কিছু চুরিটুরি করেছিলাম, কী বল ? নেহাত বেঁধে আনতে পারলাম না—!'

একটু থেমে রতিকান্ত শালীর মুখের দিকে চাইল, 'সে কী আমার কম দুঃখ।' মুখে হাসিঠাট্টার একটা হায় হায় বেদনার ভার ফোটাল রতিকান্ত।

উমার মুখে কোন জবাব নেই। বেশ খানিকটা নীরবতার পর উমা নিশ্বাস ফেলে

বলল, 'এখানে বসে বসেই কি দিন কাটাবেন নাকি? কই উঠুন, বলেছিলেন না যেদিকে দু'চোখ যায়— বেড়াব।' বলতে বলতে উমা উঠে দাঁড়াল।

রতিকান্ত খানিকটা উঠে বসে রোদের দিকে চাইল। 'এই রোদে ঘুরবে? তারপর যদি মাথা ধরে?'

'আপনি টিপে দেবেন না-হয় একটু।' উমা হেসে উঠল। একটু আগের সেই গম্ভীর মুখের রেশ সবটুকু এখনো কাটেনি। তবু এই হাসি সুন্দর। রতিকান্তর ভালো লাগল।

উমা আবার তাগাদা দিল।

উঠল রতিকান্ত। শুধু ওঠা নয়। উমার কথামত টিফিনের কৌটোটা পর্যন্ত হাতে ঝুলিয়ে নিল, চায়ের ফ্লাস্কটা কাঁধে। উমাব ইচ্ছে দূরের ওই ছায়াঘন কোন কুঞ্জে বসে চা খাবে। বিকেলের আগে এদিক আর মাড়াচ্ছে না।

হয়তো এমনিই হয়। একটা বাঁধা সীমানা ছাড়িয়ে চলে আসতে পারলে অনেক কিছু ভুলে যাওয়া যায়। শাঁখারিটোলার অন্ধগলির মেয়ে অনেক কিছু ভুলল। ভুলে গেল যে, জুতো হাতে ঝুলিয়ে আল দিয়ে খালি পায়ে ছোটা দৃষ্টিকটু, ভুলে গেল যে, হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছে বলে চোরকাঁটার ভয়ে গোড়ালির অনেকটা উঁচু পর্যন্ত কাপড় তুলে নেওয়া অসভ্যতা। শাড়ির তলায় খানিকটা সায়া যে বেরিয়ে রয়েছে পায়ের কাছে, এটা অভব্যতা। এবং হোক রতিকান্ত জামাইবাবু, তবু যখন তখন তার হাত ধরে টানা— উঠতে পড়তে তাকে জড়িয়ে ধরা, তার সঙ্গে অজস্র কথা বলা এবং ওব সঙ্গে অট্টরোলে সারাক্ষণ হাসাহাসিটা তার উচিত নয়। এসবই অনুচিত।

রতিকান্ত ভুলে যাচ্ছিল। বিনুর স্বামী হিসেবে তার যেসব কর্তব্য সেই কর্তব্যগুলো কি বজায় থাকছিল এখানে— এই রোদভরা মাঠে আর ফাঁকায় আর ফাল্গুনের হঠাৎ মধুর দুপুরে। বোধহয় থাকছিল না। উমার ফরসা রোদের ঝাঁজলাগা মুখখানা এত মুগ্ধ হয়ে তবে কেন সে দেখবে? মাথার উপরকার তাতটুকু বাঁচাবার জন্যে, উমা আলগা করে যে ঘোমটাটুকু তুলে দিয়েছিল, সেই ঘোমটাটুকু বা রতিকান্তর এত ভালো লাগবে কেন? কেন মনে হবে তার পাশে-পাশে মাথায় কাপড় তুলে দেওয়া যে-মেয়েটি চলেছে এর সঙ্গে বিনুকে অনায়াসেই কল্পনা করা যায়।

উমার চঞ্চলতা, তার উচ্ছ্বাস, খোলামেলা রঙ্গরসিকতা রতিকান্তকে মুগ্ধ করছিল। শাঁখারিটোলার মেয়ে এত জীবন্ত— রতিকান্ত যেন জানত না। বুঝতে পারেনি, উমার মধ্যে এত সুন্দর এক আকর্ষণ এবং মাধুর্য লুকিয়ে আছে। এখন বুঝছে রতিকান্ত। উমার ছায়ায় নিজের ছায়াকে প্রায় মিশিয়ে দিয়ে এই নির্জনে হাঁটতে হাঁটতে।

ওরা ফুল পাড়ল। একরাশ ফুল। 'ইস্, কী লাল। ইচ্ছে হচ্ছে সব নিয়ে যাই। দিন ত একটা ছোট্ট মতন ফুল জামাইবাবু। মাথায় দি। দূর ছাই, এলোচুলে কি

আর ফুল থাকে ?'

'কই দাও, আমায় দাও। আহা, এত ছটফট করো না। ফার্স্ট ক্লাস।' রতিকান্ত সুতোর মত দুটি চুলের গুচ্ছে ফাঁস দিয়ে পলাশফুলটা গুঁজে দেয়।

'আমি কী রকম ঘেমেছি দেখছেন, জামাইবাবু। কপাল গলা বুক ভিজে টসটস করছে।'

রতিকান্ত উমার ঘামের বিন্দু তোলা মুখ-গলা দেখল। উমার রঙটা রোদের তাতে আরো লাল হয়ে উঠেছে। চোখ দুটি বড়ো সুন্দর উমার। বেশ টলটলে। গলায় একটা তিল। আলতা-লাল ব্লাউজটা যেন জ্বলজ্বল করছে। রতিকান্তর ঘোর লাগে।

উমার আঁচল ভর্তি পলাশ, ছাপা বাসন্তীব রঙ শাড়িটায় কেমন একটা স্নিগ্ধতা।

'চলুন, এবার ওই পুকুরটার কাছে গিয়ে বসি। খুব ছায়া আছে।'

পুকুরের পাড়ে এসে বসল দুজনে। ছায়া এখানে ঘন। গাছ, লতাপাতা, বুনো মিষ্টি গন্ধ। জলটা কালো। ঘুঘু ডাকছে মাথার উপর। ক'টা শালিক ঘাস খুঁটছে।

টিফিন, চা শেষ করে ক্লান্ত দুটি মানুয বিশ্রাম নিচ্ছে। মাঝে মাঝে উমা মাটির ছোট ছোট ঢেলা ছুঁড়ছে পুকুরের জলে।

'কটা বাজল জামাইবাবু ?'

'তিনটে প্রায়।' রতিকান্ত ঘড়ি দেখে বলল।

'আর ঘন্টাখানেক, তারপরেই ফিরব, কেমন ?'

'না ফিরলেই বা কী।' রতিকান্ত হাসে। কিন্তু এ হাসি যেন শুধুই তরল পরিহাস নয়।

'ও বাবা, খুব যে আ পনা প্রাণ দেখি।' উমা দাঁতে করে ঘাসের শিষ কাটছিল। আড়চোখে চেয়ে বলল।

'আটখানা নয়, তবে দু'খানা।' রতিকান্ত আমগাছেব ডালপাতায় চোখ রেখে জবাব দিল।

উমা পা দুটো টান টান করে ছড়িয়ে দিয়ে আরাম পেল। 'আমি কলকাতায় ফিরে গেলে— টুকরো দুটো আবার জুড়ে যাবে, না জামাইবাবু ?' সরলভাবে হাসছিল উমা।

রতিকান্ত জবাব দিল না। ভাবছিল কিছু।

মধ্যাহ্নের খর উজ্জ্বলতা এবার ম্লান হয়ে আসছিল। অন্তত এখানে। পত্র পল্লবের ফাঁক দিয়ে যে আলোটুকু পুকুরপাড়ের সবুজের উপর এসে পড়েছে তার তীব্রতা এখন আর তত নেই। এ যেন মরা আলো। যে-পাশে রতিকান্তরা বসে আছে সে-পাশটায় ছায়া আরো গাঢ় ঘন হয়ে আসছে। আবহাওয়াটা কেমন ক্লান্ত, অলস, তন্দ্রাজড়ান। টুপটাপ দু-একটা পাতা খসে পড়ছিল পুকুরের জলে। একটা কাঠবেড়ালি আমগাছের গুঁড়ি বেয়ে তরতর করে উঠে যাচ্ছে। ঘুঘুর ডাকও আর শোনা যায়নি।

বো্ধহয় উড়ে গেছে।

চুপচাপ দুটি মানুষ। কেউ কারুর দিকে চাইছে না। তবু দুজনেই অনুভব করতে পারছে, এখন একের মনে অন্যজন এই নিস্তব্ধ পরিবেশটির মতন ছড়ান, মাখান।

উমা আঁচলে জড় করা পলাশফুল মাঝে মাঝে তুলছিল আর রাখছিল। কখনো ফুলের নরম পাপড়ি গালে গলায় ধীরে ধীরে বুলিয়ে কোমল অথচ অন্যরকম এক স্পর্শ নিচ্ছিল।

তারপর একসময় উমা নিজের তন্ময়তার মধ্যে গুনগুন শুরু করল। সুরটা যখন কথায় ফুটল, তখন দিন আর মধ্য নেই, তবু তার কথাগুলো বাতাসে যেন শব্দ ভেঙে ভেঙে ছড়িয়ে যেতে লাগল। ঘরোয়া মেয়েরা ঘরোয়া গলার গান। হয়ত সুরের হেরফের আছে। তবু, এ গান, এখন— এই পরিবেশে নিজের মতন করে জগৎ গড়ে নিতে পারে। 'মধ্যদিনে যবে গান বন্ধ করে পাখি— হে রাখাল বেণু তব বাজাও একাকী।'

পাখিরা গান বন্ধ করেছিল, কিন্তু কোনো রাখাল বেণু বাজাল না। না বাজাক, রতিকান্তর মন দূরবাঁশির সুর শোনার মতন আনমনা। উমার মনও।

গান থামল। ছায়া যেন আরো বিষণ্ন হল এখানে। একটা দমকা হাওয়া এল। গাছপাতা নড়ল। হাওয়াব শব্দটা অবুঝ দীর্ঘনিশ্বাসের মতন খানিকক্ষণ ছটফট করে মিলিয়ে গেল।

রতিকান্তর চোখ নাকি সব সময়ে হাসি দিয়ে মাখান। এখন মনে হচ্ছিল. কথাটা ভুল। ভীষণ এক অন্যমনস্কতা এবং বিষণ্নতা মাখান। সেই চোখে তাকিয়ে তাকিয় উমাকে মাঝে মাঝে দেখছিল রতিকান্ত। উমার ঠোঁটে পানের লাল দাগ শুকিয়ে গেছে। চোখের তারার তলায় তেমনি একটা শুষ্কতা।

চারটে বেজে গেছে কখন। অনেকটা পথ হাঁটতে হবে। রতিকান্তর যেন হুঁশ হল। বলল, 'চল উমা, ওঠা যাক।'

উমা উঠে দাঁড়াল। পা বাড়িয়ে বলল, 'আমি ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে মাঝে মাঝেই একটা পুকুর দেখি। জল টলটলে। এটা বোধহয় সেই পুকুর, না জামাইবাবু?'

'বোধহয়।' রতিকান্ত হাঁটতে শুরু করে বলল, 'এবার থেকে আমিও বোধ হয় দেখব।'

পুকুরের উঁচুটুকু পার হয়ে আসতেই একটা গাছে উমার আঁচল জড়িয়ে গেল। আঁচল ছাড়িয়ে নিয়ে গাছটা একটু দেখল উমা। হঠাৎ বলল, 'এটা কী গাছ, জানেন?'

গাছটা চিনত রতিকান্ত। বলতে গিয়েও থেমে গেল। বলল না। মাথা নাড়ল, 'জানি না।'

অথচ মাঠে নেমে রতিকান্ত কিছুতেই বুঝতে পারল না, কামরাঙা নামটা কেন তার ঠোঁটে আটকে গেল? কেন? আর কেনই বা এখন একটা অদ্ভুত অস্বস্তি

হচ্ছে তার।

পড়ে আসা বিকেলের আলো দিয়ে ফিরে চলল রতিকান্ত আর উমা।

পাঁচটা নাগাদ ট্রলি ফেরার কথা। ফিরল না। মাঝখানে কোথায় প্যাসেঞ্জার ট্রেনটা আটকে গেছে লাইনের গোলমাল হয়ে, খানিক দেবি হবে।

দেরি বলে দেরি। প্রায় একটা ঘণ্টা আটকে থাকতে হল। প্যাসেঞ্জার ট্রেনটা চলে গেলে রতিকান্তরা যখন ট্রলিতে উঠল— তখন সামনের মাঠে গোধূলি স-টুকু আলো ে দিয়ে মাটির তলায় চলে গেছে।

এবার ফেরার পালা। ট্রলিম্যানরা ে কদমে ছুটেছে। ট্রলিটাও যেন হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে। উমা পায়ের কাপড় হাঁটু দিয়ে চেপে বসল। আঁচলে জড়ানো একরাশ পলাশ।

'দিনটা বেশ কাটল, না জামাইবাবু?' উমা বলল।

'হ্যাঁ। বেশ।'

'আমি ত ভুলতেই পারব না।' উমার এলোচুলের একটা গুচ্ছ হাওয়ায় তার চোখের উপর এসে পড়ল। চুল সরাতে লাগল উমা।

রতিকান্ত কোনো কথা বলল না।

চাঁদ উঠল। শুক্লপক্ষের চতুর্দশীর চাঁদ। কেউ জানত না, খেয়ালও করে নি। হঠাৎ যেন চোখে পড়ল। পুব আকাশ ধবধব করছে। গোল চাঁদটা ওদেব মুখোমুখি।

আর সেই চাঁদের আলো রেললাইনেব দু'পাশে, সামনে মাঠে, গাছে, জঙ্গলে ছড়িয়ে গেছে। ডুবে গেছে লা যায়। সবই স্পষ্ট, লাইন দেখা যাচ্ছে, পাথর, সিগন্যালের তার পর্যন্ত। পাশের মাঠঘাটও যেন সকালের ফরসায় স্পষ্ট। একটা ছুঁচ পড়লেও কুড়িয়ে নেওয়া সহজ।

উমা দু-চারটে কথা বলছিল এতক্ষণ, এবার চুপ করে গেল। রতিকান্ত একেবারেই অন্য মানুষ। কথা বলছেই না। উমার দিকে পর্যন্ত তাকাচ্ছে না। ট্রলির চাকায় সেই সুন্দর একটানা শব্দ। ফাল্গুনের দক্ষিণ হাওয়াটা দিচ্ছে। কী যে সুন্দর গন্ধ।

রতিকান্ত কথা বলছিল না। কিন্তু ভাবছিল। ভাবছিল, হঠাৎ এ কী হয়ে গেল তার? কেন হল! এমনিই হয় নাকি!

বিনুকে বার বার জোর করে মনের সামনে টেনে আনছে রতিকান্ত। এ যেন ঝুটো কি আসলের বিচার। এতকাল— চারটে বছর বিনু কি ঝুটো ছিল? আবিষ্কার করার কারণটা আজই ঘটল রতিকান্তর। আজকের সকাল দুপুর বিকেলের অভিজ্ঞতার পর।

বিনু যে ঝুটো— এ কথাটা রতিকান্ত নানাভাবে ভেবেও স্থির করতে পারছে না। প্রথমত তাকে স্ত্রী হিসেবে না ধরে একটি মেয়ে হিসেবেই ধরা যাক। পুরুষের

চোখে খারাপ লাগবে এমন মেয়ে বিনু নয়। এ কথা ঠিক, বিনু ডানাকাটা পরী নয়। কিন্তু এও ত ঠিক, বিনু কুৎসিত নয়। বিনুর রঙ ফরসা, উমার মতনই প্রায়। বিনুর মুখের গড়ন ভালো, উমার চেয়েও ভালো। বিনুর ঠোঁট দুটি সুন্দর, অসম্ভব সুন্দর। তার চুল আরো কালো। দেহের গড়নে খুঁত যেসব আছে— সেসব খুঁত সকলের থাকে, লক্ষ্মতে একটি-দুটি বাদে। উমার চেয়ে বিনু রূপের বিচারে হীন নয়, বরং ভালো। আর তাই ত রতিকান্তর বিয়েটা বিনুর সঙ্গেই হল। দিদি দেখে, বিনুকেই সেরা ভেবেছিল।

রতিকান্ত এরপর বিনুকে স্ত্রী হিসেবে যাচাই করতে লাগল। ভালো লাগে না, এমন স্ত্রী ত বিনু নয়। যা চায় মানুষ, স্ত্রীর কাছে— যেসব সহজ, সাধারণ প্রত্যাশা— বিনু তার কোনোটাই মেটাতে পারে না— এমন নয়। বিনু ভালো ঘরনী। স্বামীর জন্যে, সংসারের জন্যে তার দিন রাত্তির এক হয়ে গেছে। যদি বল সেবা, বিনু আর দশটা বাঙালি ঘরের মেয়ের মতন সেবাময়ী। তার মন নরম, কোমলতায় স্নিগ্ধ। স্বামীর পান চুন হাতে হাতে যোগায়। রুমাল, গেঞ্জি, মোজা কাচে। আবার সর্দি হলে তেল মালিশ করে দেয়।

বিনু আমায় ভালোবাসে। আমি বিনুকে ভালোবাসি। আমার মেয়েকে। আমার সংসারকে। রতিকান্ত মনে মনে কথাটা বলে ফেলে অনেকটা স্বস্তি পেল।

কিন্তু ? রতিকান্ত এতক্ষণ ধরে একবার ঘাড় ঘুরিয়ে উমাকে দেখল। উমা ভাবুকের মতন গালে হাত দিয়ে দিগন্ত ধোয়া জ্যোৎস্নার দিকে চেয়ে রয়েছে। ফাল্গুনের হাওয়ায় তার এলোমেলো চুল আরো আলুথালু হয়ে যাচ্ছে।

উমাকেও যেন বড়ো ভালো লাগছে। রতিকান্ত পুরনো কথাটা আবার মনে টেনে আনল। মনে হচ্ছে, এইভাবে যদি ট্রলিটা রাতের পর রাত জ্যোৎস্না ডোবা মাঠঘাটের মধ্যে লাইন দিয়ে ছুটে যায়— রতিকান্তর ইচ্ছে হবে না, ওটা থামুক, রাত শেষ হোক।

কিন্তু এ-কল্পনার অর্থ হয় না। রাত ফুরবে। চাঁদ ডুববে। ট্রলিও থামবে। তার চেয়ে বাস্তব একটা কল্পনা করা যাক। উমা যদি এখানে থেকে যায়, তার কাছে। যদি এমনি মাঝে মাঝে ওরা দুটিতে ফাঁকায় বেড়াতে বেরয়। সেটা ত অসম্ভব নয়। তখন কি ভালো লাগবে না উমাকে ? লাগবে, লাগবে, লাগবে।

রতিকান্তর মনে এক ধরনের অদ্ভুত অনুভূতি জুড়ে বসছিল। বেশ বুঝতে পারল রতিকান্ত, উমাকে তার ভালোবাসতে ইচ্ছে করছে। একটা পঁয়ত্রিশ বছরের পুরুষ বাইশ বছরের এক মেয়েকে যেমন করে ভালোবাসতে চায়, যেমনভাবে।

.... আমার স্ত্রী, আমার মেয়ে— এদের ভালোবাসার পরও আমি কী করে উমাকে ভালোবাসতে পারি ? এটা সম্ভব নয়।....

সম্ভব যে কেন নয়, রতিকান্ত ভেবে ভেবেও তার কোনো সুসঙ্গত কারণ খুঁজে

পাচ্ছিল না। যেসব কারণ সকলেই জানে, রতিকান্তও— তারও, বাস্তবিক তার কোনো কিছুরই মাথামুণ্ডু রতিকান্ত বুঝতে পারছে না এখন।

ইচ্ছে করাটা এক, আর ইচ্ছে করতে নিষেধ করাটা অন্য জিনিস। ইচ্ছেটা মনের, নিষেধটা অন্যের।

ভালোবাসার এই ইচ্ছের সঙ্গে কি আর কিছু নেই? কিচ্ছু না? রতিকান্ত মাথার চুলগুলো আঙুল দিয়ে টেনে টেনে স্নায়ুগুলোকে একটু পরিষ্কাব করতে লাগল।

কিন্তু কিছুই হল না। রতিকান্ত অনুভব করতে পারল, তার আবার নতুন করে ত্রিশের আগে ফিরে যেতে ইচ্ছে কবছে। যখন তার বিয়ে হয়নি, যখন যে কোনো মেয়েকে ভালোবাসা যেতে পারত, অন্তত সেটুকু নিষ্কলুষ স্বাধীনতা তার ছিল।

...এখন আমার আর সে স্বাধীনতা নেই। ইচ্ছে থাকলেও। মন চাইলেও। ভালোবাসার জন্যে মন কাঁদলেও।....

কেন?

কেন'র জবাবটা বতিকান্ত জানে না। অথচ বিনুকে জানে, এবং কেন'র কথায় বিনু, বিনুর মেয়ে আসে। তারা আসবেই। রতিকান্ত তাদের সবাতেও চায় না।

ট্রলিটা প্রায় রতিকান্তদের স্টেশনটার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। তেমনি খইছড়ানো জ্যোৎস্না, দক্ষিণের হাওয়া, উমার লাবণ্যভরা মুখ।

রতিকান্তর মনে হঠাৎ অন্য একটা কথা কিভাবে যেন এসে যায়। ঢেউয়ের একটা ধাক্কার মতন। আর কথাটা ভাবতে গিয়ে নিজেকেই তার পাগল মনে হয়।

তবু কথাটা না ভেবেও পারে না রতিকান্ত। তার মনে হয়, ভালোবাসাটা একটা গুণ। গুণ। কোয়ালিটি' নিজের মনের কাছে নিজের মুখ রেখেই রতিকান্ত তার এই সহসা-আবেগ প্রকাশ করে ফেলে। যেমন দয়া, যেমন সততা— রতিকান্ত বলছিল এবং বেদনা অনুভব করছিল, তেমনি, আমার, আমাদের এ ভালোবাসা, এই ভালোবাসার ইচ্ছাটা একটা গুণ। আমাকে— আমাদেব এই ভালোবাসাকে সংখ্যায় বেঁধে ফেলতে বলছ। বেশ ত বাঁধছি। আমাব স্ত্রীকেই আমি ভালোবাসব। একটি শুধু মেয়েকে। কিন্তু ভালোবাসতে ইচ্ছে করছে উমাকে— এই ইচ্ছেকে তুমি নষ্ট করে দিতে চাও। পারবে? পারবে না।

একটা শব্দ উঠছিল। ট্রলি ইয়ার্ডের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। স্টেশন এসে গেল।

ট্রলি থেকে নামবার সময় উমা হঠাৎ বলল, 'ও জামাইবাবু, আমি কি এমনিভাবে পুঁটলি বেঁধে রাস্তা দিয়ে যাব নাকি? ফুলগুলো আপনি নিন।' উমা আঁচল খুলে ধরল।

রতিকান্ত থমকে চেয়ে থাকল একটু। টকটকে রোদে পলাশগুলো কত লাল ছিল, আর এখন চাঁদের এমন আলোতেও যেন সেই লাল মরে ক্ষয়ে কেমন পাংশু রঙের হয়ে গেছে।

'তাই দাও।' রতিকান্ত ম্লান হাসি হেসে বলল, 'ওগুলো এখন আমার হাতেই ভালো মানাবে।' ফুলগুলো তুলে রুমালে বাঁধতে লাগল ও।

'মানে?' উমা তাকাল।

'মানে আর কী, ওদের অবস্থা এখন আমারই মতন।'

উমা জামাইবাবুর মুখের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে তা'পর বলল, 'ছি, ও-কথা বলবেন না। বলতে নেই।'

উমার চোখে বড় সুন্দর একটু হাসি ছিল।

শাদা অ্যামবুলেন্স

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম ফুস্‌কুড়িটা সে গোপনে দেখল। জানলা খুলে, হাতটা সূর্যের আলোতে রেখে দেখল। মনে হয় শ্বেতচন্দন দিয়ে কে ফোঁটা দিয়েছে। গায়ে জ্বর। সে জ্বর নিয়ে সারা বাড়ির কাজ করেছে। মেঝে মুছে রেখেছে। ড্রইং রুমের সোফা সেট, বাতিদানের আধার এবং আলমারির কাচ ও জানলার শার্সি ঝেড়েমুছে তকতকে করতে গিয়ে তার মনে হয়েছে শরীরে ব্যথা, ভয়ঙ্কর রকমের ব্যথা, সে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। কপাল টান ধরে আছে এবং কেমন একটা বমি-বমি ভাব। সে ঠিক করেছে এখন মাদুর পেতে এই ছোট্ট ঘরটিতে— (সে ঘরটাতে একাই থাকে)— গ্যারেজের উপরে এই ছ'ফুট বাই আট ফুট ঘরে শুয়ে পড়বে। ফুস্‌কুড়িটা দেখেই ওর জল তেষ্টা পাচ্ছিল তীব্র। এখনই হয়ত ছোট দিদিমণি চিৎকার করবে, ওর কুকুরটা নিচে নেমে গেছে, কথা শুনছে না, ধরে আনতে হবে কুকুরটাকে। নীল রঙের কুকুর, লম্বা জিভ এবং বক্‌লস পরালে বাঘের মতো— কুকুরটা তাকে মানুষের মধ্যেই গণ্য করে না। তাকে দেখলেই ওটা বেশি ছুটোছুটি শুরু ক'রে দেয়। সে এখন এ সব পারে না। বয়স হয়েছে। সেই কর্তা বাবার আমলে সে এক কাপড়ে এখানে এসে উঠেছিল। এখন কর্তাবাবা নেই। ছোটবাবু আছেন। তাঁর দুই মেয়ে। মিলি আর লিলি। লিলি দিদিমণি ঘুম থেকে বড্ড দেরি করে ওঠে। ওর ঘরের জানালা খুলে দিলে সে দিদিমণির লম্বা শরীর কতদিন প্রায় উলঙ্গ দেখেছে। লিলিদিদি ওকে আর মানুষের মতো মান্য করতে চায় না। কুকুরটা শুয়ে থাকে খাটের নিচে। উপরে লিলিদিদি। সিল্কের গাউন এবং চুলের ফিতে সাদা রঙের। আশ্চর্য রক্ত লিলিদির শরীরে। কুকুরটার যেমন ঢুকে যাবার নেই মানা ওরও তেমনি মানা নেই। সে যেন কিছু দেখে না, ঘর সাফসোফ করে দেয়, ঘরের বইপত্র সাজিয়ে রাখে, ফুলদানিতে ফুল দিয়ে যায় ভোরে এবং অলস সূর্য জানলায় নেমে এলে

সে শুধু ডাকে— লিলিদি তোমার কফি। সকালে কফি না খেলে লিলিদির ঘুম ভাঙে না। বিছানা ছেড়ে উঠতেও পারে না।

সুতরাং এক্ষুনি ডাকবে তাকে। লিলিদি ডাকলে আর নিস্তার নেই। সে যে জ্বরে ভুগছে, একথা এখন বলতে পারছে না। সে একটা ছেঁড়া পাঞ্জাবি গায়ে দিল। ছোটবাবুর যা কিছু পুরনো ছেঁড়া পাঞ্জাবি, কাপড়, যা আর গায়ে দেওয়া যায় না— তার দুটো একটা তাকে দিয়ে দেন। সে সেই পাঞ্জাবি শরীরে গলিয়ে নিয়েছে। হাতটা ঢেকে রেখেছে। কারণ সকাল থেকে সে লক্ষ্য করছে দুটো একটা ফুসকুড়ি দেখা দিচ্ছে। জল নিয়ে বেশ টসটসে। সে সবই ঢেকে ঢুকে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এখন লিলি দিদিমণি ডাকলেই ভয়। বাইরে বোগেনভেলিয়ার ডালপালাগুলি বাতাসে নড়ছে। কুকুরটা সেই ডালপালায় কি যেন শিকার খুঁজছে। সে ভাবল, দিদিমণি ডাকলে সাড়া দেবে না। বরং শরীরের যা অবস্থা মাদুর বিছিয়ে শুয়ে পড়লে ভাল। কিন্তু ভয়— সে যেন শুয়ে পড়লেই ধরা পড়ে যাবে! তোমার কি হয়েছে সুবল দাদা। তুমি শুয়ে আছ কেন! ডলি (কুকুরের নাম) কি দুষ্টুমি করছে দ্যাখো। একেবারে সারাটা দিন লিলি দিদিমণি কচিখুকির মতো থাকে। যেন শরীরে কিছুই গজায়নি। কিছু বোঝে না জানে না মতো। অথচ সাজ-পোশাকে শরীরের সব উঁচু ক'রে রাখার বাসনা। এসব ভাবতেই সে কেমন জিভে কামড় দিল। সে কর্তাবাবার আমল থেকে আছে, বিশ্বাসী মানুষ। ওরা যখন সবাই উটি চলে যায় হাওয়া বদলাতে, তখন সে বাড়িতে একা থাকে। কুটোগাছটি পর্যন্ত কেউ সরাতে পারে না। সুতরাং বিরক্ত মুখে সে লিলি দিদিমণির অথবা মিলি দিদিমণির সম্পর্কে কিছু অশ্লীল চিন্তা ক'রে ফেলে নিজেই জিভে কামড় দিলে শুনল, ডাকছে লিলি দিদিমণি, না কি ছোট মা ডাকছে, গলার স্বরটা সে কেন জানি বুঝতে পারল না, জ্বরের জন্যে হয়ত হবে কারণ তার কান ঝাঁ ঝাঁ করছে, চোখ মুখ লাল, সে সকাল থেকেই দূরে দূরে থেকেছে। তার কোনোদিন কোনো অসুখ হয়নি, হলে সে নিজেকে বড় ছোট ভাবত, অসুখ হওয়াটা ওর পক্ষে কৃতিত্বের ব্যাপার নয় সে জানে। আজ এই যে এত বছর পর শরীরে জ্বর এসে গেল— এবং দু-একটা ফুস্‌কুড়ি ভেসে উঠেছে শরীরে, কোমর, হাত পা ভীষণ কামড়াচ্ছে, সে দাঁড়াতে পারছে না ভালমতো, এখন যে সে কি করে! ছোট মা না লিলি দিদিমণি ডাকছে তা পর্যন্ত সে বুঝতে পারছে না। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে তার কি করা কর্তব্য এখন, বাতাসে ফুঁ দেবে না দূর থেকে সব কথা শুনে চলে আসবে! সে যাই হোক কিছু ভাববার আগেই ছোট মা কেমন সিঁড়ির মুখে তরতর ক'রে নেমে এল; এই সুবল তোমাকে যে ডাকছি শুনতে পাচ্ছ না।

— হ্যাঁ মা শুনতে পাচ্ছি, বললেই শুনতে পাব।

— বাজার থেকে এক কিলো মুরগির মাংস নিয়ে আয়।

— আর কি লাগবে?

ছোট মা বললেন, দাঁড়া। বলে উপরে উঠে গেলেন, ফ্রিজ খুলে কি দেখলেন, তারপর বললেন, না আর কিছু লাগবে না।

সুবল মার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে উপরে গেল, টাকা নিল এবং নেবার সময় দেখল মুখের দিকে তিনি হাঁ করে তাকিয়ে আছেন। হ্যাঁরে সুবল, তোর অসুখ করেছে!

— না! মা অসুখ করেনি।

— চোখ মুখ এত লাল!

রাতে ভাল ঘুম হয়নি।

কুকুরটা বুঝি জ্বালিয়েছে?

না মা কুকুরের দোষ কি। সে আমার ঘরে শোবে না লিলি দিদিমণির ঘরে শোবে ঠিক করতে পারে না। দিদিমণি দরজা খুলে শোয়, আমার শুতে ভয় করে।

ছোট মা হেসে দিলেন। সুবল হাবাগোবা লোক। বয়স হয়েছে। প্রৌঢ় বলা চলে। মিলি লিলির সে জন্ম দেখেছে। সে ওদের কোলে পিঠে ক'রে মানুষ করেছে। তবু যে কেন সুবল ভয় পায়!

ছোট মা বললেন, তোর তো কোনো অসুখ করে না জানি।

— হ্যাঁ মা, আমার অসুখ করে না। মনে পড়ে না—

অসুখ হয় না তোর, কি যে হিংসে হয় না তোকে!

— তা মা আমার এই আছে হিংসা করার মতো। কোনো অসুখ হয় না।

— আর আমার দ্যাখ.... এই বলে ছোট মা আর কিছু দেখালেন না। কথা অর্ধেক পথে বন্ধ ক'রে দিলেন। এত বেশি কথা তিনি কখনও সুবলের সঙ্গে বলেন না। বলে ফেলে তিনি নিজেই কেমন তাড়াতাড়ি নিজেকে সংযত ক'রে নিলেন।.... তাড়াতাড়ি ফিরবি।

— ফিরব মা।

— তোর এই একটা অসুখ আছে। বাড়ির বাইরে গেলে আর ফিরে আসতে চাস না!

— তা মা আমার এই একটা অসুখ কি ক'রে যে হয়ে গেল!

সত্যি ওর এই একটি মাত্র অসুখ। বাইবে বের হলে ফিরে আসতে ইচ্ছে হয় না। কতলোকের সঙ্গে তার পরিচয়। সকলের সঙ্গে সে একটা যেন সম্পর্ক পাতিয়ে বসে আছে। রাস্তার মোড়ে নন্দী মশাইয়ের কাপড়ের দোকান, পরে পালবাবুর চায়ের দোকান, এবং বড় পথ ধরে গেলে কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচে একটা মানুষ বসে থাকে, চুল দাড়ি কামায়— তার সঙ্গে দেখা হলেই— এই যে সুবলদা, মুরগির মাংস আনতে যাচ্ছে। কেবল ওদের খোঁটা দেবার স্বভাব— এত মুরগি খায় কি ক'রে? দুবেলা মুরগি, তাজা মুরগি— আহা ওরা যেন সুবলের মুখ দেখলে বড় বাড়িটা যে সুন্দর সুন্দর মুরগির কলিজা সিদ্ধ ক'রে খায়, তা টের পায়। পরে বের হলেই সুবলকে এ ও ডাকবে, কথা বলবে, মেয়ে দুটোর খবর নিতে চাইলে সে জিভে

কামড় দেবে— ওদের কিছু বেলাল্লাপনা, অথবা চুটল চালচলন এইসব মানুষের চোখে লাগে— ওরা যেন সুবলকে কাছে পেলে— সব রাগদুঃখ উজাড় ক'রে দিতে চায়। সে সেজন্য যতটা পারে ওদের কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করে— অথবা কোনোদিন কৃষ্ণচূড়া গাছটার নিচে বসে থাকলে তার কেন জানি একটা আবাসের কথা মনে হয়, সে তার পুত্র সন্তানটিকে যে কোথায় কার কাছে গচ্ছিত রেখে চলে এসেছিল এখন যেন সব মনে করতে পারে না। বৌটা পালিয়ে গেলে সে উন্মাদের মতো হয়ে গিয়েছিল— সে এদেশে এসে অভাবের সঙ্গে লড়তে পারেনি। বৌটা তার স্বজন ফেলে একা বাউণ্ডুলে মানুষের সঙ্গে ভেগে গেল। সুতরাং সে মুরগির মাংসের জন্য অথবা অন্য কোনো কাজে বের হলে চুপচাপ হাঁটে— হাঁটতে হাঁটতে সে তার স্মৃতিতে ফিরে যায়। এবং কি ক'রে যেন দশটা পাঁচটা লোকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ওর দেরি হয়ে যায় — সে টের পায় না কত আগে বের হয়েছে! বাড়ি ফিরে গেলেই ছোট মা একেবারে রণমূর্তি। মায়ের আঁচল পর্যন্ত তখন ঠিক থাকে না। কুকুরটা শুয়ে কুঁই কুঁই করতে থাকে। সুবল একেবারে নির্বিকার। যেন এই চিৎকার চেঁচামেচি সে আদৌ শুনছে না। সে তার কাজ ক'রে যাচ্ছে। কারণ এ বাড়িতে ছোটবাবু তার আপনার জন। একমাত্র তিনিই তার দুঃখটা ধরতে পারেন। বের হবার সময় সে মুরগির মাংস কিনে তাড়াতাড়ি ফিরবে এমন ভাবল।

কিন্তু পথে বের হতেই ওর ভেতরে একটা ভয় লেগে গেল। সে এতক্ষণ ঘরের ভিতর ছিল। ছায়া ছায়া অন্ধকারে বোঝা যায়নি। ওর মুখে মুসুবির মত দুটো-একটা গোটা দেখা দিচ্ছে। সে যে এখন কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। সে চাদর গায়ে দিলে পারত। এবং অর্ধেকটা মুখ তবে ঢেকে রাখা যেত। এই গরমে চাদর গায়ে দিলেই অবিশ্বাস বাড়বে। আরে তুমি কি পাগল, চাদর গায়ে, এই সকালের রোদে বের হয়েছ! না কি তোমার জ্বর-টর আছে শরীরে! অসুখ হয়েছে তোমার! সে সুতরাং চাদর গায়ে দিতে পারে না। সে প্রায় হন হন করে হাঁটতে থাকল। যদি বলে কেউ, অ সুবল, তোমার মুখে ও-সব কি উঠেছে!

সে বলবে, আর কবেন না কর্তা, মুখে আমার ব্রনো উঠেছে।

— এই বয়সে ব্রনো, তুমি কি বাবা রাত জেগে ছোট দিদিমণির হালকা শরীর স্বপ্নে দ্যাখো না কি?

ছিঃ ছিঃ, কি যে বলেন! ওদের আমি কাঁধে পিঠে মানুষ করেছি। ওরা আমার...

— ওরা তোমার কি?

সে আর যেন মনে মনে কোনো উত্তর পায় না। সে শুধু হন হন ক'রে হাঁটে। ওকে তাড়াতাড়ি মাংস নিয়ে ফিরতে হবে। মুরগিকে সাধু ভাষায় কি বলে, কুক্কুট। কুক্কুটের মাংস।

সে বাজারে ঢুকলেই লোকগুলি ওর দিকে বেশি ক'রে তাকাতে থাকল। শরীরে কি যে কষ্ট! চোখমুখ ফেটে যাচ্ছে মতো। মনে হয় শরীরটা তার ফুলে যাচ্ছে,

এত বিষ ব্যথা। সে আহা উহু করতে পারলে কিছুটা আসান পেত। কিন্তু যেভাবে লোকগুলি ওকে দেখতে আরম্ভ করেছে, তাতে তাকে নির্বোধের মতো দেখাচ্ছে। নির্বোধ না হলে এমন মুখ নিয়ে কেউ বাজারে আসে।

সে মুহূর্তও দেরি করল না। যতটা তাড়াতাড়ি পারল, যেন এখন সে বাজার থেকে চুরি ক'রে পালাচ্ছে, হাতে কুক্কুটের মাংস, গায়ে বসন্ত ফুটে ফুটে বের হচ্ছে। এবং এখন মুখে চার-পাঁচটা মাত্র গোটা, একটু বেলা হলেই ওগুলো বেড়ে যাবে সংখ্যায়— সে তাড়াতাড়ি একটা নিমগাছের নিচে এসে দাঁড়াল। কিছু নিমের পাতা পকেটে পুরে হাতে কুক্কুটের মাংস নিয়ে হাঁটতে থাকল। তখন সে দেখল একদল মেয়ে-পুরুষ, হাতে তাদের লাঠি সড়কি, এবং লাল-নিশান— ওরা বিপ্লবের ধ্বনি দিতে দিতে চলে যাচ্ছে। ওর ইচ্ছা হল কুক্কুটের মাংস হাতে নিয় সেও সেখানে ভিড়ে যায়। গনগনে রোদ্দুরে ওর শরীরে মুখে যা সব বের হচ্ছে তা বিষের মতো সারা শরীরে গলে পড়ুক। হাফ-ডেড হয়ে বেঁচে থাকতে আর ওর ভাল লাগছে না। সে দিদিমণিদের মতো ইংরেজি উচ্চারণ করল।

বাড়ির ভিতর ঢুকেই সে সদর বন্ধ ক'রে দিল। দু'পাশে নানারকমের মৌসুমী ফুলের চাষ। টবে সুন্দর সুন্দর গোলাপ ফুটে আছে। ব্যালকনিতে হাল্কা পোশাকে লিলি দিদিমণি চুলে ক্রিম মাখছে। অথবা এই যে বাগানে এতসব ফুল ফুটে আছে, বড় রাস্তায় বাসট্রাম যাচ্ছে এবং নির্বোধের মতো মুখ নিয়ে সুবলদা ফিরছে কুক্কুটের মাংস নিয়ে— তার কাছে এসব অর্থহীন। শরীরে কোমল নীল রঙের এক মৌমাছি কেবল হুল ফোটায়। বড় আকাশ মাথার উপর থাকলেই লিলি দিদিমণির অন্যমনস্ক হতে ভালো লাগে।

সুবল সিঁড়ি ধরে দোতালায় উঠে যাচ্ছে। সিঁড়িতে কি সুন্দর কার্পেট। দু'পাশে পেতলের ভাসে সব নানা বর্ণের মানি প্ল্যান্ট এবং পরিচ্ছন্ন সংসার, সুবল হাতে ক'রে মানুষ করছে। সে যেতে যেতে দেখল দুটো পাতা শুকনো মানি প্ল্যান্টের, পাতা দুটো ছিঁড়ে ফেলল। সুবলের জন্য এই বাড়িতে তকতকে কুটোগাছটি পড়ে থাকবর জো নেই। সে সব ঝেড়ে-পুঁছে তকতকে ঝকঝকে ক'রে রাখে। বরাবরের এটা অভ্যাস সুবলের, বাবু অথবা ছোট মা বাড়ি থাকুক আর থাকুক না, সে বাড়ির এইসব মানি-প্ল্যান্টের মতো চুপচাপ এখানে দীর্ঘকাল পড়ে আছে। ওর কোনো নালিশ ছিল না। কোনো অসুখ ছিল না, কি যে বিড়ম্বনা হয়ে গেল— এই অসুখ নিয়ে সে এখন কি করবে— তার এত কাজ, শুয়ে থাকলে চলবে কেন, আর সে পরম বিশ্বাসী মানুষ, অসুখ নেই বলে সংসার তাকে নানারকম সুযোগসুবিধা দিয়ে থাকে— সে দুপুরের পর একটু ঘুমোতে পায়। কেউ তখন ওকে জ্বালাতন করে না। কুকুরটা পর্যন্ত ঘরে ঢুকতে ভয় পায়।

দোতলার বারান্দায় ছোটবাবু দাঁড়িয়ে আছেন। সে একটু ঘুরে গেল, যেন ওদিকটায় সে ছোট মার সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছে— কুক্কুটের মাংস, দাম এবং পয়সা এসব

সম্পর্কে সামান্য কথাবার্তার জন্যে। সে মুখটা ঘুরিয়ে হেঁটে হেঁটে ছোটবাবুকে পার হয়ে গেল। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে দেখতেই মনে হল, ছোটবাবু তাকে তখনও দেখছে। সে একেবারে ছুটে এবার বাথরুমের পাশে ঘরটায় এখন লিলি দিদিমণি কাপড় ছাড়বেন তার পাশে গিয়ে ব্যাগটা রেখে দিল। সে আর এই ঘুপ্‌চি-মতো জায়গা থেকে নড়ল না। দিনিমণিব হয়ে গেলে সে একেবারে সায়া ব্লাউজ কাপড় সব ধুয়ে নিচে গিয়ে শুয়ে পড়বে। নতুবা মাথা ঘুরে পড়ে গেলে সে হাতেনাতে ধরা পড়ে যাবে।

ছোটবাবু ব্যালকনির দিকে হেঁটে যাচ্ছিলেন— তাঁর মনে হল সুবল কেমন তাঁকে আজ এড়িয়ে চলছে। মুখটা ভার-ভার, লাল্‌চে মতো। যেন কিছু হয়েছে। তিনি আজ ছুটির দিন বলে কোর্টে বের হননি। বিচারক মানুষ। মনটা সহজেই খুঁতখুঁত করতে থাকল। সে কি কোনো অপরাধ ক'রে ফেলেছে— যা আজকালকার দিন, কিছুই বিশ্বাস নেই, লুকিয়ে লুকিয়ে থাকছে, ডাকলে কাছে আসছে না, দূর থেকে জবাব দিচ্ছে— চোখ মুখ ফোলা ফোলা দেখাচ্ছে— কি যে করবেন এখন, কি করলে বিচারকের মতো দৃঢ়তা দেখানো হয়— ভেবে তিনি ডাকলেন. সুবল, সুবল আছিস!

—আজ্ঞে যাই,ছোট হুজুর। বলেই সে এক দৌড়ে দরজার পাশে নিজেকে আড়াল ক'রে দাঁড়াল। যেন ছোটবাবু ওর ভাসুর ঠাকুর। সে গ্রাম্য বিধবা বৌয়ের মতো জড়ো সড়ো হয়ে শরীর ঢেকেঢুকে একপাশে দাঁড়িয়ে আছে।

সুবলের সহসা এ সংকোচবোধ দেখে ছোটবাবু না হেসে পারলেন না। তিনি বললেন, কিরে তুই ওখানে দাঁড়ালি কেন?

— আজ্ঞে।

—কাছে আয়।

সুবল নড়ল না।

—তোর মুখটা এমন দেখাচ্ছে কেনরে?

—কেমন দেখাচ্ছে ছোট হুজুর!

—কাছে আয় বলছি।

সে আর পারল না। সে হুজুরের পায়ের কাছে একেবারে ভেঙে পড়ল— হুজুর আমার শরীরে গোটা উঠেছে।

কেমন আঁৎকে উঠলেন তিনি! বলিস কি! টিকে নিসনি?

— নিয়েছি হুজুর।

—দেখি মুখটা। বলে ভাল ক'রে আলোতে নিয়ে দেখলেন। তুই এই নিয়ে বাজারে গেলি! হাওয়া লাগাচ্ছিস শরীরে!

—হুজুর আস্তে। ছোট মা জানলে কুরুক্ষেত্র করবে।

রাখ তোর কুরুক্ষেত্র! চুপচাপ গিয়ে শুয়ে থাক। মশারি টানাবি। একদম বের

হবি না।

—কে একদম বের হবে না! ছোট মা শুনে একেবারে ছুটে এলেন।

—তোমাদের সুবল।

—কেন কি হয়েছে?

—পক্স হয়েছে।

মানে!

—মানে পক্স। পক্স বোঝ না! মুখে দ্যাখো না— এই সুবল একটু ঘুরে দাঁড়া।

—অমা...তবে কি হবে!

মিলি মায়েব চিৎকাব শুনে ছুটে এল। ছোট মা দুহাতে মিলিকে ঘরে ঢুকতে বাধা দিলেন। সর্বনাশ! এখন কি হবে!

মিলি বলল, কি হয়েছে মা?

চোখ লাল ক'বে ছোট মা বললেন, তুমি যাও। যা করছিলে করগে।

মিলি এখন কাপড় ছেড়ে এসেছে। সে স্নান করেছে। শরীরে সর্বত্র ঠাণ্ডা ভাব। চন্দনের গন্ধ শরীবে। চোখেমুখে কমনীয় ভাব। এবাব গিয়ে মিলি আয়নার সামনে বসবে। মুখে পাউডাব দিয়ে থুয়ে বের হলে সে দেখতে পাবে, তার মুখেও গুটি উঠে গেছে! সে শুনেছে, শুনে ফেলেছে, শুনে ছুটে গেছে লিলিব ঘরে, ওঠ দিদি, এখনও তুই গল্পেব বই পড়ছিস— কি হয়েছে জানিস না! সুবলদার পক্স হয়েছে।

এই এক ব্যাপার— যেন প্রায় অগ্নিকাণ্ড ঘটে গেছে— ছুটোছুটি, এমন সুন্দর সুন্দর সব মুখ কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে— আয়নার পাশে দাঁড়ালেই মনে হচ্ছে গুটি উঠে এমন সুন্দর ভালোবাসার জন্য উদাস মুখ এবং এমন চোখের নিচে কাজল সব নষ্ট ক'রে দেবে— এই তিন যুবতী, ছোট মা এই বয়সেও নিজেকে যুবতী ক'রে রেখেছেন— যেন বয়স বাড়ে না তাঁর, মুখে রেখা পড়ে না, কেবল খুকি খুকি, ওলো সখি ভাব— সে যে এখন কি করবে, সুবল ছোট মার দিকে তাকাতে পারছে না— চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, এতদিনের বিশ্বাসী মানুষটা, এই বাড়িতে সে এতদিন আছে— কোনোদিন কোনো অবিশ্বাসের কাজ সে করেনি, আজ সে যে এটা কি ক'রে বসল! ছোট-মা'র জোড়ে জোড়ে পা ছড়িয়ে প্রথম কাঁদতে ইচ্ছে হল। না এখন কাঁদার সময় নয়, একটা বিহিত করতে হবে— কুকুরটা এদিকে নেই— যা লোভ এই কুকুরের, সব মুরগির মাংস না আবার খাবলা খাবলা খেয়ে নেয়— কুকুরটা কোথায় রে?

লিলি বলল, সুবলদার ঘরে।

— ওটাকে ওর ঘর থেকে নিয়ে আয়।

—যাচ্ছি। দূর থেকে জবাব দিল লিলি।

—রান্না হবে না মা? লিলি বই ভাঁজ ক'রে চিৎকার ক'রে জানতে চাইল।

—-রাখ তোর মাংস। এখন তোমাদের বাঁচাতে পারলে হয়।

— কি আরম্ভ করলে তুমি! ছোটবাবুকে ধমক না দিয়ে পারলেন না।

—এত বড সর্বনাশ! আর তুমি বলছ, আমি কি করেছি!

—তাই বলে এই অসুখ! যার কোনো ওষুধ নেই। যা এত সংক্রামক, বাতাসে ঘুরে বেড়ায়। সে আর অন্য অসুখ খুঁজে পেল না। পষ্ট পষ্ট ক'রে বলেছি বাইরে বেশি সময় কাটাবি না। — তুমি সর। ওকে যেতে দাও। ওর ঘরে চলে যাক্। বেচারা দাঁড়াতে পারছে না। কাল থেকেই দেখছি কেমন সব সময় লুকিয়ে লুকিযে থাকছে।

— কাল থেকেই হয়েছে! তবে তো সোনায় সোহাগা! সব জডিয়ে এখন তিনি আমায় উদ্ধার করতে যাচ্ছেন।

— তুমি সর বলছি!

— আমি সরছি। কিন্তু সুবল ঘরে থাকবে না।

— তার মানে!

— মানে সোজা। কে ওর পচা গলা শবীর দেখাশোনা করবে!

- -কেন তুমি!

— আমি পারব না।

— লিলি মিলি!

-- ওদের বিয়ে দিতে হবে না!

— ঠিক আছে আমিই করব।

—এত বুঝি সোজা!

— ছোটবাবু সামান্য হতভম্বের মতো তাকিয়ে থাকলেন। ছোট বৌয়েব চোখের দিকে তাকাতে পারছেন না। ভয়, ভীতি এবং বিস্ময়ে চোখ দুটো কেমন ছোট হয়ে গেছে। তিনি যে দৃঢ়তাটুকু দেখাবেন স্থিব করেছিলেন, স্ত্রীর এমন ভয়াবহ চোখ দেখে তা আর দেখাতে পারলেন না। তিনি শুধু ধীরে ধীরে বললেন, ঠিক আছে, সুবল এখন তুই গিয়ে শুয়ে থাক। দেখি কি করতে পারি।

সুবল বলল, ও ঠিক আছে বাবু। আমার খাবারটা জলটা বাইরের ঘরে রেখে যাবেন— আমি সেখান থেকে তুলে নিয়ে যাব। এই বলে সুবল নেমে যাচ্ছে এমন সময় ছোট বৌ ডাকল, সুবল তুমি ও ঘরে ঢুকবে না।

— আমি কোথায় যাব তবে মা।

— ক'টা ত দিন। কোথাও গিয়ে থাক। তোমার কোনো আত্মীয়স্বজন নেই?

— সে তো সবই জানেন।

— তার জন্যে অসময়ে কোনো আত্মীয়স্বজন থাকবে না সে কি ক'রে হয়! তুমি বরং সুবল, তোমার বিছানা নিয়ে কিছুদিন আত্মীয়ের বাড়িতে থেকে এস।

সুবল বুঝতে পারল, ছোট মা সাহস পাচ্ছেন না। সে বলল, ঠিক আছে মা।

আমি রাস্তায় গিয়ে নিমগাছের নিচে শুয়ে থাকব।

— সেই ভাল মানে! ছোটবাবু আর নিজেকে সংযত ক'রে রাখতে পারলেন না। কিন্তু সুবল জানে ছোটবাবু ভীতু গোছের মানুষ। যখন ছোট মা কোনো রকমে পারবেন না— তখন কেমন একটা অসুখের ভান করে বিছানায় সারাদিন শুয়ে থাকেন, চোখমুখ বসে যায়— অদ্ভুত রহস্যজনক এক অসুখ ছোট মা ভিতরে তখন পুষে রাখেন। ছোটবাবুর আর তখন চিন্তার শেষ থাকে না— তিনি আর ছোট মা'র ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে সাহস পান না। তখন শিয়রে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দেন, ভালোবাসার কথা বলেন, পৃথিবীতে এই ছোট বৌ বাদে তাঁর আর কে আছে— একেবারে মলিন মুখ তখন সহসা নির্মল হয়ে যায়। ছোট বৌযেব ঠোঁটে সামান্য হাসি ভেসে উঠলে তিনি নিশ্চিন্ত। সুতরাং সুবল বুঝতে পারল শেষ পর্যন্ত ছোট মা-ই জয়ী হবেন— সে আব দাঁড়াল না— মাদুর বগলে ক'রে রাস্তায নেমে একটা বড় গাছের উদ্দেশ্যে হাঁটতে থাকল।

সুবল হাঁটতে থাকল। বগলে মাদুর, হাতে একটা পেতলেব ঘটি আর ছেঁড়া বালিশ। সে হাঁটছে। খব রোদে ট্রাম-বাস পার হয়ে যাচ্ছে। রাস্তার লোকগুলি ওর মুখ দেখে আৎকে উঠছে— অথচ অফিসে কাচারিতে গিয়ে গল্প করবে, শালা কলকাতায় আর বসবাস কবা যাবে না, রাস্তায় এখন লোকজন মুখে শরীরে পক্স নিয়ে চলাফেরা করছে। মানুষজন যা হয়ে যাচ্ছে-- ফুটপাথে বাচ্চা দিচ্ছে, এসব যে দিনে দিনে কি হচ্ছে, কি হচ্ছে শালা-- বলে ওরা হয়ত গপ্‌প ক'রে পান খাবে এবং বাড়ি গিয়ে বিবি নিয়ে শুয়ে থাকবে।

সুবল একটা ছায়ামতে জায়গা খুঁজছে। তাব আত্মীয়স্বজন বলতে ছায়ামতো জায়গাটা এবং নিচে শুয়ে থাকলে গাছের পাতা মুখের উপর ঝবে পড়তে পারে-- নিমগাছ হলে ভাল হয়, মারিমড়কেব দেবী নিমগাছেব হাওয়া সহ্য করতে পাবে না। বাড়ির কাছে একটা নিমগাছ আছে, কিন্তু সেখানে শুয়ে থাকলে পাড়াব লোকেরা চিনে ফেলবে এবং ছোটবাবুব ওপর গিয়ে হামলা করতে পারে— সে সেজন্য রেলিং দেওয়া পুকুর পার হয়ে এল, বড় বড় দালান কোঠা পার হয়ে এল, বাগানে নানারকম ফুল ফোটে— ও জল তেষ্টা পাচ্ছে। সে হাঁটতে হাঁটতে কম দূরে চলে আসেনি! যারাই দেখছে সবে যাচ্ছে। রাস্তায় লাল-নিশান হাতে নিয়ে জনগণতান্ত্রিক সবকাব গঠনের জন্যে এক দল মানুষ চেল্লাচিল্লি করছে। সুবল এখন রাস্তা পার হতে পারছে না। ওরা পার হয়ে গেলে. সে ঐ দূরের গাছটা মনে হচ্ছে গাছটা নিমগাছই হবে, সে গুটি গুটি পা পা ক'রে হেঁটে হেঁটে সেখানে এবার চলে যাবে। আর সব সুন্দর, কাছেই একটা টিপকল আছে, ডানদিকে চায়ের দোকান, মানুষজনের ভিড় তেমন নেই— নিরিবিলি জায়গাটার জন্যে ওর লোভ বেড়ে গেল। সে জনগণতান্ত্রিকের দলটা পার হয়ে গেলেই সেখানে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়বে। না কি সে ওদের সঙ্গে মিলে গিয়ে এবার নেমে পড়বে! আমি এক হা-অন্নের মানুষ,

অসুখ করলে পাপ, ছোট দিদিমণি হালকা পোশাক পরে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে, আর রেকর্ডপ্লেয়ারে রেকর্ড বাজছে এবং ডেটল দিয়ে সারা বাড়ি ছোট মা কর্পোরেশনের মেথর ডেকে ধুয়ে দিচ্ছেন। একটা অশ্লীল কথা জিভে এল! সুবল নিজের জিভে গপ্ ক'রে কামড় দিল।

বস্তুত যুদ্ধ আর কোথাও হচ্ছে না। রক্তের জন্য, সংগ্রামের জন্য এবং বেঁচে থাকার জন্য ক্রমান্বয় যুদ্ধ চাই। সে তাকালে উপরের দিকে। গরমকাল বলে দরজা জানলা বন্ধ। ভিতরে ঠাণ্ডায় সব বৌ-বিবিরা এখন শরীর ঠাণ্ডা করছে। বাবুরা অফিস কাচারি থেকে ফিরে এলেই আবার ধকল যাবে শরীরে, এখন শুয়ে বসে লম্বা হয়ে শরীর ঠিকঠাক ক'রে নেয়া— সুতরাং দরজা-জানলা বন্ধ, সে সেইসব দরজা-জানলার নিচে একটা বড় মতো নিমগাছের ছায়ায় মাদুর বিছাল। হাত-পা ঝাঁ ঝাঁ করছে, কান ঝাঁ ঝাঁ করছে। কতক্ষণে গড়িয়ে পড়বে। এক ঘটি জল নিয়ে এল সে। সে জল এনে শুয়ে পড়লেই গুটি গুটি সেই দুই রাস্তার বালক পাশে এসে দাঁড়াল। বেশ কৌতূহল নিয়ে ওরা সুবলকে দেখছে। মুখে বড় বড় গোটা, জল নিয়ে একেবারে বেথুন ফলের মতো টসটসে হয়ে আছে। সুবল চোখ বুঁজে ছিল, টের পায়নি, দুজন নাবালক ওর মাথার পাশে দাঁড়িয়ে আছে, ওদের নিশ্বাসের শব্দ সে যেন টের পেল এবং চোখ তুলে তাকালে দেখল— ওরা ওকে দেখে ফিক্ ফিক্ ক'রে হাসছে।

— তোরা কেরে?

— আমরা? ওরা এইটুকু বলেই চুপ ক'রে থাকল। ওরা যে কে ওরা ঠিক জানে না। সুবলও যেন টের পেল ওরা যে কি ওরা জানে না। সে এতদিন কিন্তু এমন অনেক নাবালককে ফুটপাথে পড়ে থাকতে দেখেছে। তারা কে, কেন এই ফুটপাথে— এমন কথা ওর একবারও মনে হয়নি! মনে হলেও সে এমন ভাবত কৃতকর্মের জন্য তুমি পাপ ভোগ করছ। কৃতকর্ম! শালা জীবনে কোনো কর্মই করিল না, তোর আবার কৃতকর্ম! সে এবার মুখ বিকৃত ক'রে ফেলল। কথা বলতে ভাল লাগছে না। কেবল চুপচাপ পড়ে থাকতে ইচ্ছে হচ্ছে এবং আঃ উঃ করতে ইচ্ছে হচ্ছে। পরক্ষণেই সে দেখল, ওরা একজন মাথার কাছে, অন্যজন শিয়রে— শালারা কি যমের দূত! সে বলল, এই তোরা কোথায় থাকিস!

ছোট বাচ্চাটি আঙুল কামড়াচ্ছিল। কোথাও না, ওরা কোথাও থাকে না, যখন সেখানে থাকে তখন সেই অঞ্চলটা নিজের বলে ভেবে নেয়। এখন এখানে আছে, সুতরাং বলল, আমরা এখন এখানে আছি।

— জলটল লাগলে এনে দিতে পারবি? তারপরেই সুবলের মনে হল, ওর শরীরে সংক্রামক ব্যাধি। মা দয়া করেছে ওকে। সে বলল, এখানে আসবি না। এলে তোদের অসুখ করবে। মারিমড়কের দেবী শালা তোমাদের প্রেমে পড়ে যাবে।

ওরা যেভাবে মাথার কাছে পায়ের কাছে ছিল, ঠিক তেমনি দাঁড়িয়ে থাকল।

ওদের কেন জানি এই মানুষটাকে নিজের লোক বলে মনে হয়। ভাঙা একটা টালির ঘরে, আগে কাঠ চেরাই হতো, এখন কিছু হয় না, ঘরটায় ওরা এই ভরদুপুরে শুয়ে থাকে, রাতে এই নিমগাছটার নিচে। এখন একটা লোক এসে জায়গাটা দখল করে নিয়ে গিয়েছে। ওদের আশেপাশে কোথাও একটা জায়গা ক'রে নিতে হবে।

— তোরা সরে যা, দাঁড়িয়ে থাকলে আমার মতো তোদেরও হবে।

— তোমার জলটল আনতে হবে বলেছিলে!

— না কিছু লাগবে না, আমাকে ঘুমোতে দে!

— ওরা দুপুরে এবার ছুটে বেড়াতে থাকল। কোথাও কিছু নেই, অথচ কি আনন্দে যে ছুটছে এই ভর দুপুরে— মুক্ত পুরুষ, শুধু দুটো অন্নসংস্থান, তা এ পাড়ায় এসে ওদের এখন চিন্তা করতে হয় না— কারণ সকাল সকাল নানা রকমের বাসি খাবার দোতলা তিনতলা থেকে ছুঁড়ে দেওয়া হয়, দিনমান ঐ খেয়ে বেশ সুখে দিব্যি চলে যাচ্ছে, স্নান ক'রে আসলে হয়, কিন্তু খুব পরিচ্ছন্ন ভাবটা ভাল নয়, তবে ওদের দেখলেই বলবে বাবুরা, এই যাবি, কাজ করবি— তাই নোংরা, যতটা পারা যায় শরীর, চোখমুখ, চুল নোংরা ক'রে পড়ে থাকা— তারপর নির্বিবাদী হয়ে দিনমান সম্মুখ সমরে— এতক্ষণে অরিন্দম কহিলা বিষাদে— যা মুখে মনে আসে আওড়ায়, কারণ বড় বড় পোস্টারগুলোর লেখা ওরা দুজন কোনো কোনোদিন বাজি ধরে পড়তে বের হয়। কে কতটা পোস্টার পড়েছে তার একটা প্রতিযোগিতা ওদের ভেতর।

ছোট নাবালকটি বড় বড় চোখে একটা পোস্টার পড়তে গিয়ে থমকে গেল। বড় মাঠে বৃষ্টিপাত আরম্ভ হচ্ছে। যে যার মতো এখন চাষ করতে লেগে যাও। সবুজ চারায় ছেয়ে যাবে, ফুল ফুটবে, ফল হবে। দিনমানে পৃথিবীর জায়গা বদল ক'রে নাও।

সে বড় ছেলেটিকে ডেকে নিয়ে গেল— একটা ভাঙা পাঁচিলে কে এঁটে দিয়ে গেছে পোস্টারটি। ওরা দুজনই কোনো অর্থ ধরতে পারল না।

সন্ধ্যায় ওরা সেই নিমগাছটার নিচেতে এসে দেখল, বুড়ো মানুষটি নেই। অ্যাম্বুলেন্স এসে এইমাত্র নিয়ে গেছে। ওরা ভেবেছিল, বুড়ো মানুষটাকে অর্থ জিজ্ঞাসা করবে— কি মানে? এই যে লেখা— বড় মাঠে বৃষ্টিপাত আরম্ভ হচ্ছে যে যার মতো এখন চাষ করতে লেগে যাও। সবুজ চারায় ছেয়ে যাবে, ফুল ফুটবে, ফল হবে। দিনমানে পৃথিবীর জায়গা বদল ক'রে নাও— এসব কথার কি মানে— কারা লিখছে! কেন লিখছে! দেয়ালে দেয়ালে সব নানারকমের আশার কথা লেখা হচ্ছে— কবে থেকে হবে এটা! ওদের মনে হয়েছিল বুড়ো মানুষটাই একমাত্র জবাব দিতে পারে। কিন্তু এসে যখন দেখল নিমগাছের ছায়ায় কেউ নেই, কেবল মাদুর পড়ে আছে, তখন ওরা মনমরা হয়ে মাদুরটা লাথি মেরে সরিয়ে দিল। এবং সারাদিন ঘুরে আর কিছু করতে ভাল লাগল না। গাছের গুঁড়িতে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল।

বোধহয় কলকাতার আকাশে চাঁদ উঠেছে। এই নিরিবিলি গাছটার নিচে শুয়ে থাকলে বোঝা যায় কখনও কখনও কলকাতার আকাশে চাঁদ ওঠে। ওরা ঘুমোচ্ছিল। দুটো একটা নিমের পাতা মাথায় পড়ছে এবং শরীরে মৃদু বাতাস, ওপাশে একটু হেঁটে গেলেই লেকের জল, জলে কত সুন্দরী মেয়ে এখন কবিতা আবৃত্তি করছে। নরম সিল্কের পোশাক, ফুলের মতো ফুটে থাকা সব মেয়ে এবং ছোক্‌রা যুবক, হাফ্ প্যান্ট পরা বালক ব্রিজের নিচে উঁকি মেরে মাছের খেলা দেখতে দেখতে পৃথিবীটাকে পাশের যুবতীর মতো রহস্যময় মনে করছে— বেঁচে থাকা কি মধুর! তখনই মনে হয় কলকাতার আকাশে কোনো কোনোদিন চাঁদ ওঠে, নিমের ছায়ায় অন্নহীন ক্ষুধার্ত বালক ঘুম যায়। এবং রাত দশটা না বাজতে অ্যাম্বুলেন্স ফিরে আসে।

সুবল ফিরে এসেছে। হাসপাতালে চিকেন পক্সের জন্য কোনো ওয়ার্ড নেই। সুতরাং নিমগাছের নিচে রেখে আবার শহরের বুকে অ্যাম্বুলেন্সটা পালিয়ে গেল।

ওরা কাতর গলা শুনে জেগে গেল। ভোজবাজির মতো ব্যাপার। ওরা উঠে চোখমুখ ঘষে দেখল, দিনমানে যে মানুষ শালা গাইব হয়ে গেছিল নিমের ছায়া থেকে, সে আবাব অধিক রাতে ফিবে এসেছে। ওরা তাড়াতাড়ি উঠে গেল, এই যে দাদু খুব কষ্ট হচ্ছে!

— তোরা!

আমরা তোমাকে খুঁজছিলাম।

— তা তুমি যে ফিরে এলে।

সে চুপ ক'বে থাকল। কথার জবাব দিল না। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে খুব। তবু বলল, আমাকে খুঁজছিলি কেন?

— তুমি ভাল হলে তোমাকে আমরা এক জায়গায় নিয়ে যাব।

সুবল বলল, বড় ক্ষিদে পেয়েছে বে!

আমাদেব কাছে শুকনো রুটি আছে। খাবে?

— কোথায় পেলি?

— ঐ যা দেয়। রোদে শুকিয়ে রাখি। খেতে মচ্ মচ্ করে। খাও। তুমি ভাল হয়ে যাবে।

এমন ক্ষিদে যে সে এখন যা পাবে, পারলে যেন নিমপাতা বেটে সরবত ক'রে খায়। সে এত কাছে এমন দুজন সহৃদয় মানুষ পেয়ে বলল, আমাকে দিলে তোরা খাবি কি?

— আমরা ঠিক খেয়ে নেব। আমরা ত কোনোদিন উপোস থাকি না। বলে ওরা পুঁটলি খুলে শুকনো রুটি গুড় এবং একঘটি জল দিল। জ্যোৎস্না নিমের পাতার ফাঁকে জাফরি কাটা। ওরা কাছে এলে বলল, এত কাছে আসিস না। তোরা আমার কাছে থাকলে তোদের অসুখ করবে। তারপর কি আরামে এবং সুখে যেন সে মড়মড় ক'রে মুখে দিতে গিয়ে দেখল জিভে লাগছে। গলায লাগছে। তবু ক্ষিধের

যন্ত্রণাতে সে খেয়ে ফেলল রুটি এবং গুড়। কেমন একটা পরিতৃপ্ত ভাব। সে বলল, আমাকে তোরা কোথায় নিয়ে যাবি ?

— একটা কথার মানে বুঝছি না দাদু।

— কি কথার মানে রে!

— বড় মাঠে বৃষ্টিপাত আরম্ভ হচ্ছে, যে যার মতো চাষবাস করতে লেগে যাও। সবুজ চারায় ছেয়ে যাবে। ফুল ফুটবে, ফল হবে। দিনমানে পৃথিবীর জায়গা বদল ক'রে নাও।

বুড়োর মুখটা কেমন সহসা অতর্কিত উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, কোথায় এমন কথা আজকাল লেখা হচ্ছে!

— হ্যাঁ দাদু!

— আমাকে নিয়ে যাবি সেখানে ? আমি বসে বসে লেখাটা পড়ব।

— তুমি ভাল হলে তোমাকে নিয়ে যাব।

কিন্তু সকাল হতে না হতেই আবার অ্যাম্বুলেন্স এসে সুবলকে নিয়ে গেল। তার আর সেখানে যাওয়া হল না।

গাছের নিচটা আবার খালি। বুড়ো মানুষটিকে অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে গেছে। ওরা বাসি খাবার সংগ্রহ করতে বের হবে এবার। উঠি উঠি করেও দেরি ক'রে ফেলেছে। আশা ছিল বুড়ো মানুষটিকে নিয়ে যাবে, যেখানে সেই কথাগুলি লেখা আছে সেখানে। কোথায় কোন্ হাসপাতালে নিয়ে গেল ওকে ওরা জানে না। আর দেখা হবে না ভাবতেই কেমন কষ্ট হচ্ছিল ওদের। ওরা চুপচাপ হাতে নুড়ি পাথর নিয়ে ক্রমাগত ঢিল ছুড়ছে কাচের জানলাতে।

বড়টি বলল, কিরে যাবি না ?

ছোটটি বলল, আমার কিছু ভাল লাগছে না।

— ভাল লাগছে না কেনরে ?

— ওরা ওকে কোন্ হাসপাতালে নিয়ে গেল ?

— দাদুর জন্যে কষ্ট হচ্ছে!

ছোটটি হাসল। তারপর শিস্ মেরে উঠে দাঁড়াল: কষ্ট হ.কতে নেই, ঘুরে ফিরে নেচে নেচে সে কোমর দুলিয়ে গাছের ছায়ায় ছায়ায় হাঁটার সময়ই দেখল, সেই অ্যাম্বুলেন্সটা আবার ফিরে আসছে। ওরা গাড়িটা দেখেই ছুটে এল। এবং ওদের ফের কাজ আরম্ভ হয়ে গেল। — ওরা তোমায় রাখল না!

সুবল বলল, মাদুরটা বিছিয়ে দে। সে চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়ল। ওর মুখে ও সারা গায়ে এখন গুটি · এবং ওর ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। সে বলল, আমাকে তোরা কোথায় নিয়ে যাবি বলছিলি ?

— তুমি ভাল হলে নিয়ে যাব।

আমি ভাল আছি। আমাকে আজ রাতে নিয়ে চল। কেউ দেখতে পাবে না।

রাতে রাতে আমরা সেখানে চলে যাব।

রাতের বেলা, যখন গাড়িঘোড়া আর চলছে না, শেষ ট্রাম চলে গেছে, তখন সে ধীরে ধীরে ওদের দুজনকে নিয়ে হাঁটতে থাকল। এমন একটা কথা আজকাল লেখা হচ্ছে। কোথায় কিভাবে লেখা হচ্ছে— সে উৎসাহে সব কষ্ট ভুলে যাচ্ছে। দিনমানে জায়গা বদল ক'রে নাও। ওরা বড় রাস্তা পার হয় একটা পার্কের পাশ দিয়ে হাঁটতেই যেন সুবল তার পরিচিত পথের সন্ধান পেল। এই পথে সে রোজ কুক্কুটের মাংস কিনতে বাজারে যায়। গরিবের অসুখ হতে নেই। অসুখ হলে হাসপাতালে জায়গা থাকে না। বার বার একটা অ্যাম্বুলেন্স ওকে নিয়ে কপট আরোগ্য কামনায় ছোটাছুটি করে।

বাড়িটা সে চিনতে পারল। বোগেনভেলিয়ার অশান্ত শাখা-প্রশাখা দুলছে। এত রাতে শুধু লিলিদি জেগে আছে। বাড়ির সেই নতুন হলুদ রঙের দেয়ালের নিচে ওরা তিনজন হাঁটু মুড়ে বসল। রাস্তার আলোতে স্পষ্ট সেইসব শব্দগুলি চোখের উপর নাচতে থাকল! কুকুরটা বুঝি টের পেয়েছে। ব্যালকনিতে চিৎকার করছে। ওরা তাড়াতাড়ি হামাগুড়ি দিয়ে পেছনের দেয়ালটায় চলে গেল। এবং রাতে রাতে ওরা এইসব দেয়ালের চারপাশে লিখে বেড়াতে থাকল--- বড় মাঠে বৃষ্টিপাত হচ্ছে। যে যার মতো চাষবাস করতে লেগে যাও। সবুজ চারায় ছেয়ে যাবে। ফুল ফুটবে, ফল হবে। দিনমানে পৃথিবীর জায়গা বদল ক'রে নাও। ওরা সেই লেখা দেখে দেখে কেমন উদ্দীপ্ত হল এবং নিজেরা লিখতে আরম্ভ ক'রে দিল।

ওরা দেখল চারপাশে সব জানলা-দরজা ভয়ে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। যা কিছু ঐশ্বর্য, সুখ এবং প্রেম ভালোবাসা মানুষের কাছ থেকে চুরি ক'রে শুকনো বাঘ অথবা হরিণের মাথার ভিতর ওরা পুরে রেখেছিল, দেয়ালে দেয়ালে এখন সেইসব বাঘের মুখ আস্ত বাঘ হয়ে লাফিয়ে পড়ছে। হরিণেরা দ্রুত দৌড়ায়। কিন্তু বাঘের থাবাতে হরিণের মাংস এবং কলিজা এবার খসে খসে পড়বে।

এইভাবে যবে হাজার লক্ষ মানুষের হাহাকার সমস্ত রাজপথ দীর্ণ করবে তখন এক অলিখিত চুক্তি হবে— আর শাদা অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে ঘোরাফেরা করবেন না। এবার ভিতরে ঢুকে পড়ুন। এবং রক্তের ভিতর যে রঙ খেলা ক'রে বেড়াচ্ছে অস্বচ্ছ আলোতে তাকে দেখে ঘাবড়ে যাবেন না। নিয়মমাফিক আমাদের জানা আছে সূর্য পূর্বদিকে ওঠে এবং পশ্চিমে অস্ত যায়।

জননীরা

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

শীতের রোদে পিঠ দিয়ে বসেছিল দুটিতে। উল বুনছিল। একজনেরটা নীল, অন্যজনের লাল। নীল উলটা বেশ চঞ্চল। ঘাসের ওপর সারাক্ষণ এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছিল। লাল উলটা কিছু গম্ভীর, কিছু শান্ত— যেন অন্যমনস্ক।

ওদের কাছাকাছি মরসুমি ফুল ফুটেছিল অনেক। সামনের সরু পাঁচ রাস্তায় ছেলেরা ক্রিকেট খেলছিল। কদাচিৎ পাশ কাটিয়ে প্রিঁ প্রিঁ করে চলে যাচ্ছিল মৃদুগতির দু একটা গাড়ি। কখনও রঙিন কার্ডিগান চড়ানো চীনা মুরগির মতো ফেঁপে ওঠা কোন মেয়ে, কোন বর্ণাঢ্য মাস্তান। এবং এই দূরপ্রসারী সরকারি ল্যাণ্ডস্কেপের ওপর আকাশ খুব বড় থাকায় সব শব্দ আর আনাগোনা একটি ব্যাপ্ত নির্জনতা ও নৈঃশব্দেরই অন্তর্গত।

'মিংকু মিংকু!' মাঝে মাঝে মুখ তুলে ডাকছিল নীল উলে আঙুল থামিয়ে--- সে তৃণা। দেড় বছরের ফুটফুটে মেয়েটি ঘাসের ওপর হাঁটু দুমড়ে মুখ ফেরাচ্ছিল। ভিজে ঠোঁট আর থুতনিতে ঘাসের কুটো, এক হাতের মুঠোয় ছেঁড়া পাতা, হেসে বলেছিল— 'তাঃ তাঃ!'

'মিংকু, ছিঃ! খায় না। পোকা—পোকা!' তৃণা ভুরু কুঁচকে এবং হেসে মিথ্যে ধমক দিচ্ছিল। তারপর ধূসর প্লাস্টিকের কাঁটা দুটো ফের নড়ে উঠছিল। ...'যাই বলুন, মেয়েরা আসলে ছেলেদের তুলনায় অনেক শান্ত হয়— অনেক ভদ্র। ওই দেখুন না—মিংকু। বিংকু হলে এতক্ষণ এমনি করে চুপচাপ বসতে পেতুম ভাবছেন? মোটেও না। মা, মা! কী দুষ্টু, কী দুষ্টু! একটু চোখের আড়াল হয়েছি না— ব্যস, আর নেই। একেবারে নেই! ছেলে আমার এক কীর্তি করে বসে আছে ততক্ষণে।'... তৃণা ফের একবার মিংকুকে দেখে নেয়। মিংকু ঘাসে আঁচড় কাটে, হামাগুড়ি দেয়। তার পিঠের উপর দিয়ে একটা প্রজাপতি চলে যায়।

রিক্তা তার লাল উলের দিকে তাকিয়ে শুধু বলে, 'তাই বুঝি ?'

হ্যাঁ। ঘরে কিচ্ছু রাখবার উপায় ছিল না— যা হাতের সামনে পায়, তক্ষুণি ভাঙে। বাবারে বাবা! কী ছেলে, কী ছেলে!' ...তৃণা খিকখিক করে একটু হাসে।...'একবার কলকাতা থেকে ওঁর এক বন্ধু এসেছেন। ভদ্রলোক ঘড়ি খুলে টেবিলে রেখে বাথরুমে গেছেন। ফিরে এসে দেখেন ঘড়ি উধাও। খোঁজো, খোঁজো! হুঁ উ— আবার কে ? ছেলে আমার ক্রিকেট বল খেলছে— টেবিলের পায়া হয়েছে উইকেট। ভাগ্যিস ভাই, ঘড়িটা ছিল বিদেশি— একটুও টসকায়নি। নয়তো, আমরা সত্যি লজ্জায় পড়ে যেতুম।'... তৃণা ফের হাসে।... 'সেইদিনই আবার এক কীর্তি। কোটের পকেটে সিগ্রেট প্যাকেট ছিল— মানে সেই ভদ্রলোকের! কখন বিংকু মোড়া এনেছে টেনে— তার ওপর চড়েছে, পকেটে হাত ভরে... মিংকু, এই মিংকু! চলে এসো, চলে এসো! দেখছেন, দেখছেন ওর কাণ্ড ?'

মিংকু সবুজ বেড়া ধরে দাঁড়িয়েছে এবং একটা হাত চালিয়ে দিয়েছে ভিতরে। তৃণা উঠতে যাচ্ছিল হন্তদন্ত হয়ে, রিক্তা বলে, 'বসুন— আমি দেখছি।' তারপর উল রেখে যায়। মিংকু তার দিকে তাকিয়ে থাকে। রিক্তা মাথা দোলায়— 'উঁহুহু— করে না। এস।'

মিংকু কিন্তু ধমক দেয় তক্ষুনি।... 'গাঃ !'

'দিদি, আপনার মেয়ে আমাকে বকছে।'... রিক্তা মুখ ঘুরিয়ে হাসতে হাসতে বলে।

তৃণা বলে, 'হ্যাঁ—মিংকুসোনা বকে দাও মাসিকে। খুব বকে দাও। কেমন ?'

তিনটে পুতুল চারটে গাড়ি আর একটা খরগোস এলোমেলো পড়েছিল এখানে ওখানে। এক জায়গায় জড়ো করে রিক্তা। সেগুলো দেখতে দেখতে কিছু ভাবে। ভাসা-ভাসা কিছু কথা। ফুরফুরে উত্তরের বাতাসে তার চুল ওড়ে এবং কপালের অসচেতন ভাঁজে ছুঁয়ে চুলগুলো কী দুঃখ কিংবা সুখ— অথবা সুখ দুঃখময় করে তোলে ওর মুখ। আস্তে বলে সে, 'এসো—খেলবে ? মিং-কু-উ !'

মিংকু হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে ওঠে। ফুঁপিয়ে বলে, 'গাঃ গাঃ গা !'

রিক্তা বলে, 'এই রে! দিদি, আপনার মেয়ের রাগ হয়েছে।'

তৃণা বলে, 'না না না—নেয়নি। মাসি নেয়নি। কিচ্ছু নেবে না। তুমি চলে এস, হুঁ— চলে এস মাসির কাছে। খেলবে।'

মিংকু দু'হাত তুলে টলতে টলতে কাছে আসতেই হঠকারী আবেগে রিক্তা তাকে জড়িয়ে ধরে। আর মিংকু প্রচণ্ড ছটফট করে কেঁদে ফেলে। তৃণা মৃদু ধমকায়— কোন ফল হয় না। তখন রিক্তা ঠোঁট ফুলিয়ে বলে, 'বেশ-বেশ। আড়ি দাও। খেলবে না তো আমার সঙ্গে ? যাও—আড়ি!' সে ছেড়ে দেয় ওকে। মিংকু পুতুলগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

রিক্তা উঠে দাঁড়ায়। চারিদিকে ঢেউ খেলানো মাঠের ওপর কোয়ার্টার— খালি

কোয়ার্টার। সামনে দূরে আবছা একটা পাহাড়। ডাইনে ও দূরে ব্লাস্ট ফার্নেসের চিমনি— সারা রাত যার লাল আগুনের ঝলকানি দেখতে দেখতে কেটে যায়। এখানে আসা অব্দি একটা রাতও পুরো ঘুমে কাটাতে পারে নি সে। শীত প্রচণ্ড, তবু জানালা খুলে রেখেছে। অসীম কিছু টের পায় না, কিংবা পায়। তবে বেশিব ভাগই তো তার নাইট ডিউটি।

অন্তত দুটো মিনিট রিক্তা পুরো ল্যাণ্ডস্কেপে চোখ রাখে। আবার কিছু ভাসা-ভাসা কথার ঝাঁক উড়ে আসে। তারপর আস্তে হেঁটে বেতের সবুজ চেয়ারে তৃণার পাশে বসে। উল বুনতে থাকে।

'তবে যাই করুক, আমার বিংকু ভীষণ—ভীষণ শার্প ছেলে ছিল, ভাই। বলে না বাচ্চারাই ভাল মন্দ লোক চিনতে পারে। একবার হল কী, ফ্রিজটা হঠাৎ বিগড়েছে। দুপুরবেলা দুটো মিস্তিরমতো লোক এসে বললে, সায়েব পাঠিয়েছেন ফ্রিজ সারাতে। ওদের ভেতরে আসতে বললুম। অমনি ভাই'.... তৃণা বড়ো চোখে বলে, 'অমনি বিংকুর সে কী চেঁচামেচি। দুটো ছোট্ট হাত তুলে বলে, নান্না নান্না! ছেলে কিছুতেই লোক দুটোকে ঘরে ঢুকতে দেবে না। সে এক অবস্থা। কেঁদেকেটে মেঝেয় লুটোপুটি খাচ্ছে— থামানো যায় না। আমি তো বড্ড অবাক। এমন করছে কেন? অগত্যা ওদের বললুম, পরে এসো বরং— দেখছ তো... মিংকু, মিংকু, আবার?'

রিক্তা বলে, 'তারপর?'

'হ্যাঁ— জানেন? ওরা চলে তো গেল। তক্ষুনি ফোন করলুম ওকে— অফিসে। বললুম, তোমার ছেলের কীর্তি শোন। আর উনি শুনে কী বললেন জানো?

'কী?'

'কই, আমি তো কোন লোক পাঠাইনি।'

'সে কী!'

'হ্যাঁ। তাই তো বলছি— কী কাণ্ড দেখুন। অতটুকু ছেলে— সে ঠিক চিনতে পেরেছিল ওরা আসলে কে। ভাই! তারপর তো ভয়ে অস্থির হয়ে থাকি। কেউ এলে....' হাসতে হাসতে তৃণা বলে, 'অচেনা কেউ এলে তখন বিংকুকে সামনে রাখি।'

রিক্তাও হাসে। 'কষ্টিপাথরের মতো?'

তৃণা দুলে দুলে কয়েক মুহূর্ত হাসে। তারপর গম্ভীর হয়। উলে হাত চালায় দ্রুত। কতক্ষণ পরে ছোট্ট একটা প্রশ্বাস ফেলে বলে, 'তাই তো সইল না ভাই! চারদিকে সব এত পাপ— এত নরক। সে থাকতে চাইবে কেন? থাকল না।'

পাপ! রিক্তার হাতের মুঠোয় নরম লাল উলের পিণ্ডটা একটু চমকাল কি? রিক্তা মুখ তুলে আকাশের দিকে রাখল। পাপ শব্দটা অজস্র রঙিন বেলুনের মতো উড়ছে, দুলছে। বুদ্বুদের মতো ছড়িয়ে যাচ্ছে চারিদিকে। অজস্র লাল নীল হলুদ সবুজ বুদ্বুদ। বুদ্বুদগুলো তার মাথার·ভিতর থেকে বেরুচ্ছে, নাকি মাথার ভিতর

ঢুকছে এবং দম আটকে আসছে। খুব জোরে প্রশ্বাস ফেলে সে। অস্ফুট স্বরে শুধু বলে, 'ঠিক তাই।'

'যখন পেটে— সবে তিন মাস হয়েছে, এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখলুম। বুঝলেন? এক সন্ন্যাসী, লাল— ভীষণ লাল পোশাক পরা, আপনার ওই উলের চেয়েও লাল— যেন আগুন জ্বলছে। তা সন্ন্যাসী এসে বলছে, বেটি, ভিক্ষে দে। আমি তো হন্তদন্ত, ছোটাছুটি করছি— দেবার জিনিস একটাও পাচ্ছি নে, একটাও পাচ্ছি নে। হ্যাঁ— আমার কিচ্ছু নেই। আশ্চর্য ভাই, ভীষণ আশ্চর্য লাগে। তখন কী যে কান্না পাচ্ছে, কী বলব।'... তৃণা হঠাৎ চুপ করে।

'কী দিলেন শেষে?'

ধরা গলায় তৃণা বলে, 'ঘুমটা উনি ভাঙিয়ে দিলেন। দেখি, ভীষণ কেঁদেছি। উনি বললেন, স্বপ্ন দেখছিলে নাকি? তখন ওকে তো সব বললুম। শুনে উনি হাসলেন। ওঁর তো কোন কিছুতে বিশ্বাস-টিশ্বাস নেই-টেই। আমি কিন্তু মনে মনে অস্বস্তিতে ভুগছি। সব সময় ভাবি, সন্ন্যাসীকে তো ভিক্ষে দিতে পারলুম না। তারপর অবশ্য অনেক সাধু-সন্ন্যাসীর সেবা করেছিলুম। কিন্তু যা নেবার, ঠিক নেওয়া হয়ে গিয়েছিল।'

রিক্তা ওর মুখটা দেখে নিয়ে বলে, 'আপনি কোত্থেকে উল কেনেন তৃণাদি?'

'উঁ? মজুমদার হাউস।'

'দেখুন, আমার উলটা কেমন যেন— ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে। পুবনো।'

তৃণা উলটা দেখে নিয়ে বলে, 'বিচিত্রা স্টোর্স আছে ওদিকটায়— ওদের স্টক খুব ভালো। এটা কোত্থেকে এনেছিলেন?'

'আমি না— ও এনে দিয়েছিল।'

'অসীমবাবুর লাল রঙ পছন্দ?'... মৃদু হাসে তৃণা।

'হুঁ।'

'হাতে কোলে একটা আসুক, তখন দেখবেন কর্তাব লালের নেশা কেটে যাবে।' তৃণা অভিজ্ঞ গলায় বলে।... 'যদ্দিন একা একা, তদ্দিন একরকম! হলেটলে তখন আবেকরকম। ওর বাবা মায়ের মনের রঙ অনেকটা কেড়ে নেয় কিনা। তবে নেয় যেমন, দেয় তার কতগুণ বেশি! হোক ভাই, হলে বুঝবেন।' পরক্ষণে আঙুল তুলে রাস্তার ওপারে একটা কোয়ার্টার দেখায় সে।.... 'ওই বিলুদিদের বেলায় আবার সব উল্টো। যখন ঝাঁক বেঁধে সব বেরোবে, দেখবেন। সব লাল নীল সবুজ বেগুনী— এক ঝাঁক পাখির মতো। ছোটবড়ো সবাই রঙচঙে। আর কী চড়া রঙ না ওদের পছন্দ। ফ্যামিলিসুদ্ধ। আমার ভাই অতটা চড়া ভাল্লাগে না।'

রিক্তা বলে, 'আমারও।'

তৃণা ওর দিকে তাকায়। খুঁটিয়ে দেখে বলে, 'কিন্তু তাই বলে অতো বেরঙা হয়ে থাকাও ভালো নয়। আপনি অত সাদা পছন্দ করেন? প্রথম দিন তো ভাবলুম,

অসীমবাবুর অবিবাহিতা বোনটোন বা আত্মীয় কেউ হবেন। পরে শুনলুম রাতারাতি অসীমবাবু বিয়ে করে বসে আছেন এবং আপনিই তিনি। সত্যি, আপনি খুব সাদাসিধে হয়ে থাকেন।'

রিক্তা একটু হাসে।... 'নাঃ। তাই কি?'

'আপনি একটু সেজেগুজে থাকলে অফিসারস জোনের সুন্দরীরা বিপদে পড়ে যাবে।' বেশ মমতা ও প্রীতিতে তৃণা এ মন্তব্য করে।... 'অসীমবাবুকে বলতে হবে।'

'যান!' রিক্তা সলজ্জ বলে। 'আমি জানি আমার চেহারা খুব ভালো না।'

তৃণা সস্নেহে যুগপৎ মিংকু আর রিক্তার দিকে তাকিয়ে বলে, 'থাক থাক। বিনয়ে কাজ নেই। এই! আজ সন্ধ্যার দিকে একবার বেরোবেন?'

'কোথায়?'

'মার্কেটের দিকে। বলে রাখব ওঁকে— গাড়িটা পাওয়া যেতে পারে। দু-মাইলেরও বেশি যে।'... তৃণা ছোট্ট হাই তোলে।... 'ঘুম পাচ্ছে যেন। এই! আমি কিন্তু আপনাকে আজ সাজিয়ে দেব।'

তারপর আবার উলবোনা শুরু হয় দুজনের। রাস্তাব ক্রিকেটে উত্তেজনা বাড়তে থাকে। গাড়ির প্রিঁ প্রিঁ শোনা যায়। আর মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যায় জলহাঁসের ঝাঁক। শীতের সূর্য দূরের পাহাড় ছুঁতে একটু নামে। রোদ রঙ বদলায়।

'অ্যাদ্দিনে বিংকু পড়ত পাঁচে। এটা ডিসেম্বর তো? হ্যাঁ— সতেরো ডিসেম্বর। নার্সিংহোমে হয়েছিল। খুব কষ্ট দিয়েছিল— ভীষণ। তবে একটুও জ্ঞান হারাইনি। যাই বলুন ভাই, আজকাল নার্সিংহোম— তেমন জানাশোনা থাকলে— খুব সেফ্। বেস্ট্।'

'উঁ? কী?'

'নার্সিং হোম।'

'ও! হ্যাঁ।' তৃণার দিকে তাকিয়ে থাকে রিক্তা। নার্সিং-হোম্! শব্দটা সেই প্রাগুক্ত 'পাপ' শব্দটার বেলুনগুলো কিংবা বুদ্বুদগুলোর মতোই ছড়াতে থাকে সারা আকাশে। আগেরগুলোও এ সময় শোঁ শোঁ করে কোত্থেকে ভেসে এসে একসঙ্গে মিশে যায়। উজ্জ্বল ঝকঝকে অজস্র রঙিন বেলুন অথবা বুদ্বুদ ঝাঁকে ঝাঁকে আকাশ ছেয়ে ফেলে। যেদিকে তাকায় শুধু ওই— শুধু লাল নীল সবুজ-বেগুন বল। এই লাল উল তাদের ভিড়ে হারিয়ে যায়। উদ্দেশ্যহীন হয়ে ওঠে দুটো প্লাস্টিক স্টিক, নিরর্থ পশমি টুকরো কোলে পড়ে থাকে, দুই বাহু অসমাপিকা ক্রিয়াপদের মতো বাকি শরীরের দিকে তাকিয়ে থাকে পূর্ণ কোন বাক্যের আশায়।

একটু দুঃখিত হাসি ফোটে তার ঠোঁটের কোণায়। সে বলে, 'চোখ জ্বালা করছে।'

তৃণা বলে, 'কলকাতায় থাকলে নাকি আই-সাইট যেতে বাধ্য। আমি অবশ্য বরাবর বাইরেই কাটিয়েছি। বিয়ের সময় কোথায় ছিলুম জানেন? জব্বলপুরে।'

রিক্তা অকারণ জিগ্যেস করে, 'আপনি তাহলে জব্বলপুরের মেয়ে? ওখানে তো মার্বেল রক আছে।'

'না, তা ঠিক নয়।'... উলে চোখ দিয়ে তৃণা বলে। 'আমার জন্ম পাটনায়। বাবা তো রেলওয়ে অফিসার। কাজেই বুঝতেই পারছেন— সেই তো কবিতায় আছে দেশে দেশে মোর ঘর আছে। আমার কোন পারমানেন্ট লোকালিটি নেই।'

তৃণার ছোট্ট কৌতুক ও হাসির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে রিক্তা বলে, 'এখন আছে— স্বামীর লোকালিটি।'

মাথা দোলায় তৃণা।... 'মোটেও না! ও তো এখানে সেণ্ট্রাল গভমেণ্টের ডেপুটেড অফিসার। ডাক এলেই হয়— চলো দিল্লী।'

'যাবেন।' রিক্তা উলে মন রাখে।...

'হ্যাঁ— সত্যি বলেছেন। পেলে তো এক্ষুনি চলে যাই এখান থেকে— এক্ষুনি!' তৃণা মুখ তুলেছে। ঝুপসি বৃষ্টিভেজা টবের গাছের মতো। নরম গলায় বলে সে।... 'আমার বিংকুর জন্যে— জানেন? সব সময় খালি মনে পড়ে যায়। কত ভুলভাল হয়ে যায়। হঠাৎ মনে হয়, বিংকু এখন পাশের ঘরে খেলছে— নয়তো লনে গাড়ি চালাচ্ছে। তক্ষুনি টের পাই, কি ভুল, কী ভুল! এই যা যা দেখেছেন, প্রত্যেকটি জায়গায় ওর ছাপ লেগে আছে। আমার ভীষণ অসহ্য লাগে ভাই, যখন সেগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখি— কেউ নেই। একদিন হল কী— ঘরে চুপচাপ বসে আছি, জাস্ট সাড়ে ছটা সন্ধে। ওই যে পেয়ারাগাছটা দেখছেন, ওতে বিংকুর দোলনা ছিল। জানলা দিয়ে— মানে, চোখের কোণায় দিব্যি দেখতে পাচ্ছি বিংকু দোল খাচ্ছে। ছোট ছোট সাদা দু'খানা মাখনের মতো হাত...'

'দিদি, ও কথা থাক।'... রিক্তা ওর চোখে দুর্যোগ দেখে চঞ্চল হয়ে ওঠে। 'আরে! মিংকুর কাণ্ড দেখছেন? মিং-কু-উ।'

মিংকুর দিকে দৌড়ে যায় সে। ওকে দাঁড় করিয়ে বলে, 'দিদি আপনার মেয়ে হিসি করে ফেলেছে।'

অমনি হাসে তৃণা।...'দিলে তো?' রিক্তা মিংকুকে তার কাছে নিয়ে আসে। তখন সে ওর পাতলুন আর স্পঞ্জ জাঙিয়া একে একে খুলে ফেলে।... 'বিংকু এমন বয়সে সোজা কিন্তু নোটিশ দিত— আগে-ভাগে। বুঝলেন? বলত— মাম মাম এ্যা! এ্যা।'

খিলখিল করে দুটি মহিলা একসঙ্গে হাসে। তারপর তৃণা ঘরের দিকে ডাকে, 'কসিলা, কসিলা মিংকুব পোশাক বদলে দাও।'

একটি কিশোরী দেহাতী মেয়ে দৌড়ে এসে মিংকুকে নিয়ে যায়। মিংকু হাত পা ছুঁড়ে প্রতিবাদ করে। রিক্তা বলে, 'কসিলা! অদ্ভুত নাম তো।'

'উঁহু— ওরা দু'বোন। সুশীলা আর কুশীলা। ওই বলে ডাকে।' তৃণা জানায়!... 'আপনারটা তো বুড়ি। খুব সাবধান, এই বুড়িগুলো ভীষণ চোর হয়। অসীমবাবুকে

বলবেন— ববং আমি কমবযসী লোক দেখে দেব।'

বিক্তা বলে, 'ওকে বলাব কী আছে। আপনি দেখে দিন না। আব জানেন— আমাব বুড়িটা বড্ড নাকগলানে মেয়ে। সব ব্যাপাবে ওব কথা বলা চাই। আমাব একেবাবে পছন্দ নয।'

'ওবা অমনি— বুড়িগুলো।'

'হ্যাঁ। আব সবচেয়ে বিশ্রী লাগে ওব চাউনিটা। কেমনভাবে তাকিযে থাকে আমাব দিকে। সাবাক্ষণ।'

'সে কী!'

'সত্যি বলছি। অন্যদিকে চেযে আছ— ও কাজ কবছে। হঠাৎ মুখ ফিবিযে দেখি, ও কাজ কবছে ঠিকই কিন্তু আমাব দিকে চোখ।'

'আপনি কিছু বলেন না?'

'বলি তো। কী দেখছ হাঁ করে? তখন একেবাবে মুখ বন্ধ। ধমকেও দিযেছি। তবু....'

'আমাব বিংকু থাকলে ঠিক চিনে ফেলত কী মতলব। বাচ্চাবা সব টেব পায কিনা।'

শীতেব সূর্য দক্ষিণেব পাহাড ডিঙিযে পশ্চিমেব পাহাড ছুঁযেছে কযেক মিনিট আগে। একটা বিশাল লাল বল থেকে আবাব সেই বুদ্বুদ অথবা বেলুনগুলো বেবিযে আসছে আকাশজুড়ে। বাস্তাব ওপাব থেকে ছাযাগুলো তবতব কবে এগিযে আসছে আব এগিযে আসছে। সেই ছাযাব ওপব, ছাযাগুলোব গাযে লাল হলুদ নীল বেগুনী বুদ্বুদ অথবা বেলুনগুলো গড়িযে বেড়াচ্ছে। আব ক্রমশ শৈত্য ছাযা বঙিন গোলক মাড়িযে একটি শিশু হামাগুড়ি দিচ্ছে, কচি দাঁত আব মাড়িতে ঘাসেব কুটো আব হাসি, তাঃ তাঃ তাঃ, গাঃ গাঃ, মাম্ মাম্....

ও কি বিংকু? ও কি অন্য কেউ? বিক্তা চিনতে পাবে না। ছড়িযে আসা ছাযা থেকে হামাগুড়ি দিতে দিতে কথা বলতে বলতে বিংকু বা কে স্ফটিক দাঁত আব গোলাপেব পাপড়িব মতো মাড়িতে হাসি নিযে আবও গভীব ছাযাব দিকে চলেছে।

দুটি মহিলা সেদিকে চুপচাপ তাকিযে থাকে। তাবপব তৃণা ভাঙাস্ববে অস্ফুট বলে, 'বাঁচলে, পাঁচে পা দিত এ মাসে। হ্যাঁ— সতেবো ডিসেম্বব। পাঁচ।'

বিক্তাব ঠোঁট কাঁপে। সেও হিসেব কবছিল। ডিসেম্বব? হযতো তাই। খুব শীত ছিল। সে কাঁপা ঠোঁটে কেমন কবে বলে ওঠে, 'হ্যাঁ— ঠিক পাঁচ। বাঁচলে...'

'বাত এগাবোটা তিন মিনিটে হল। আমাব পুবো জ্ঞান ছিল। কী জোবে কেঁদে উঠল! প্রচণ্ড স্বাস্থ্যে, লক্ষণ ভাই— বুঝলেন?'

বিক্তা খোঁজে। কেউ কি কেঁদেছিল সে বাতে? তাব কিন্তু জ্ঞান ছিল না। এসেছিল অন্ধকাব থেকে, অন্ধকাবে খেলতে খেলতে চলে গেল— কেমন ছিল সে? বিংকুব মত, নাকি মিংকুব মতো? তুলতুলে ফুটফুটে একটা বাচ্চা— বাঁচলে, পাঁচ বছর।

অন্ধকারে রঙিন বেলুন নিয়ে খেলতে খেলতে এসে পড়েছে— ওই তো!

তৃণা বলে, 'সব সময় এখনও চোখের ওপর দেখতে পাই ভাসে।'

আর সে হু হু করে কেঁদে ওঠে এবার। দ্বিতীয় নারী সায় দিয়ে বলে, 'হ্যাঁ, ভাসে— ভাসবেই তো।' দ্বিতীয় নারীও কাঁদে— চুপিচুপি, দিনশেষের ছায়ায় মুখ লুকিয়ে।

চতুর্থ সীমানা

মতি নন্দী

"তাকিযে দেখ, সমুদ্র তাই না? মনে হচ্ছে যেন আকাশটা গড়িযে পড়েছে।"

কবি স্বামীব কথা অনুসবণ কবে চোখটাকে আকাশ ববাবব উত্তব-দক্ষিণ কবিযে ঘাড নাড়ল। বাস্তাটা সোজা চলে গেছে। মাঝখানে খানিকটা উঁচু হযে থাকায এবং তাব ওপাবে গাছপালা-বাড়ি ইত্যাদি না থাকায সত্যিই মনে হয আকাশটা মাটিব দিকে নেমেছে।

"যেখানে আকাশটা মাটি ছুঁচ্ছে ওখানেই ভাঙাটা।" বেসবকাবি বাস ওদেব নামিযে দিযে চলে গেছে। ওবা বাস্তা পাব হবাব আগে এই নতুন কলোনিটাব দিকে তাকিযে এইসব বলে মুগ্ধ হযে বাস্তা পাব হল

কাঁচা ড্রেনেব উপব সিমেন্টেব সেতু। পাব হলে কলোনিব সদব। সোজা বাস্তাটাই বাজপথ। কলোনিকে দু-ভাগ কবে 'এ' এবং 'বি' ব্লক তৈবি কবেছে। বাস চলাচলেব বাস্তাব ধাব থেকেই বাড়িগুলো তৈবী হতে হতে পিছু হটেছে। প্রায আধাআধি বাড়িতে ভবে গেছে। পিছন দিকে এখনো ম । মাটি পড়ছে জমি ভবাট হচ্ছে। দু-চাব বর্ষা না গেলে আব উঠবে না।

বাঁ হাতে কোঁচাটা একটু তুলে নিখিল ছোট্ট একতলা বাড়িটাকে থুতনি দিযে দেখিযে বলল, "ইউনিভার্সিটিব প্রফেসাবেব বাড়ি। ওব মত ইকনমিস্ট ইন্ডিযাতে খুব কম আছে।"

কবি বাড়িটাব দিকে তাকিযে, সস্মীহ কবে বলল, 'বড়লোক'?

"খুব নয, তবে দিল্লিতে প্রাযই ডাক পড়ে।"

ওবা পাশাপাশি হাঁটতে থাকল। কবিব জুতোটা নতুন। এখনো খাপ খাযনি। নিখিল সিগাবেট ধবাতে দাঁড়াল। কবি বাড়িগুলো দেখতে দেখতে বলল, "বেশ

ফাঁকা ফাঁকা, ঘেঁষাঘেঁষি নয়।” দুটো কাঠি নিভেছে, তৃতীয়টা জ্বালাতে অপেক্ষা করছে বাতাস পড়ে যাওয়ার, সুতরাং নিখিল জবাব দিল না।

কয়েকজন গৃহিণী গল্প করতে করতে বড় রাস্তায় নামল কাছেরই একটা বাড়ি থেকে। তারা একবার পিছু ফিরে তাকালো। সিগারেট ধরেছে। গৃহিণীদের পিছনে রুবি এবং নিখিল হাঁটতে শুরু করল।

“এরা সব এখনকারই ?”

“নয়তো কোথাকার হবে !”

রবি হোঁচট খেল। ভ্রূ কুঁচকে নিখিল দেখল রাস্তার খোয়াটাকে। গৃহিণীরা কি কথায় খুব হাসছে।

“ওঁরা রোজ বেরোয় বোধহয়।”

“বেরোবে না কেন, বেড়াবার এমন রাস্তা রয়েছে, বেশি গাড়ি চলে না, ভিড়ও নেই।”

“দোকানপাটও তো কম।”

“নতুন জায়গা, একি কোলকাতার মত পুরনো ? সবই হবে, আস্তে আস্তে হবে। লোকজন আরো আসুক।”

বড় রাস্তাটা থেকে দু’ধারে ছোট ছোট সমান্তরাল রাস্তা বেরিয়ে গেছে। রাস্তার ধারে সিমেন্ট বাঁধান খোলা ড্রেন, ইলেকট্রিকের খুঁটি। লুঙ্গিপরা এক মাঝবয়সী লোক বাড়ির সামনের ড্রেন খোঁচাচ্ছে বাখারি দিয়ে। ছাতে বাচ্চা কোলে বৌ। বাজারের থলি হাতে একজন পাশের রাস্তা থেকে বেরোল, একটু ব্যস্ত। গৃহিণীরা তাকে কি জিজ্ঞাসা করতেই লোকটি বলল, নিখিল-রুবি তখন তাদের অতিক্রম করে যেতে যেতে শুনল, “হঠাৎ এসে পড়েছে, আজকেই গৌরীকে নিয়ে যাবে।”

“ওম্মা সেকি, এইতো সবে বাপের বাড়ি এল।”

একটু পরেই কয়েকটা চাপা হাসির মধ্য দিয়ে কথা ফুটল, “বেচারা, দু’দিন জিরোতে এসেও শান্তি নেই।”

বেশ রোগা হয়ে এসেছে।”

“হবে না, যা টানের বহর।”

গৃহিণীরা একটা রাস্তায় ঢুকে পড়ল। আড়ে তাকিয়ে নিখিল লক্ষ্য করল রুবির ঠোঁট হাসিতে মোচকান।

নতুন একটা বাড়ি তৈরি হচ্ছে। এখন শেষ পর্যায়ে। আজ ছুটির দিন। বাড়িতে মিস্ত্রি লাগেনি। মোটরে কর্তা-গিন্নি দেখতে এসেছে, সঙ্গে ঠিকাদার। গিন্নি মেঝের দিকে হাত নেড়ে কিছু একটা বলছে, গভীর মনোযোগে কর্তা ও ঠিকাদার শুনছে,

“বেশ পয়সাওয়ালা।”

জবাব দিল না নিখিল। বাড়ির মাথায় খোঁচা খোঁচা কংক্রীট থামের শিক। জানালায়

গ্রীল। দক্ষিণে পোর্টিকো। গ্যারেজ ঘর। দরজাগুলো সেগুনের। সিঁড়িতে মোজাইক।

"লাখ খানেকের কম নয়।"

"এত লাগে!"

"লাগবেই, প্রায় পাঁচ কাঠা জমি।"

"আমাদেব তো তিনকাঠা মোটে।"

"মোটে মানে? তাই ক'টা লোকের আছে?"

নিখিলের স্বরে কিছুটা ঝাঁঝ ছিল। ক্ষুণ্ণ হয়ে রুবি বলল, "তা বলছি না, খরচ আমাদের কমই হবে। তিনটে লোকের জন্য এতবড় করে তো আর করার দবকার নেই।"

"তিন কোথায় চারজন তো।"

"না আর ক'দ্দিন বাঁচবেন।"

ওরা ক্রমশ ফাঁকা অঞ্চলের দিকে এগিয়ে আসতে থাকল। বাড়ির সংখ্যা কমছে, তৈরি শুরু হওয়াদের সংখ্যা বাড়ছে। কলোনির প্রায় মাঝামাঝি ওরা এসে পড়েছে।

সাজগোজ করে একটা পরিবার বাস ধরতে চলেছে। তার মধ্য থেকে একটা বাচ্চা ছুটে গেল রাস্তার ধারের বাড়িটার দিকে। নিচু লোহার বেড়া, একটুখানি বাগান। তার মধ্যেই দুটি চেয়ারে ধূসর হয়ে বসে রয়েছে স্বামী-স্ত্রী। বাচ্চাটি ফুল চাইল। ওরা ঘাড় নাড়ল। বাচ্চাটি হাত বাড়িয়ে একটি সাদা ফুল ছিঁড়ে নিয়ে ছুটে পরিবারের মধ্যে ফিরে এল। ঘাড় বেঁকিয়ে যতক্ষণ দেখা যায় দেখতে দেখতে স্বামী-স্ত্রী হেসে নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করল।

নিখিল এবং রুবি সবটাই দেখতে দেখতে এগোল। একবার শুধু রুবি মন্তব্য কবল, 'নিঃসন্তান বোধহয়।"

"বুড়ো বয়সে এদের খুব কষ্ট হয়।"

রুবি ঘাড় নেড়ে সমর্থন করল। "আমার এক মামারও ঠিক এই অবস্থা। কেউ তাদের কাছে গেলে যা খুশি হয়। যাবে একদিন?"

এর জবাবে নিখিল আঙুল দিয়ে দেখাল "ওইটে হচ্ছে পার্ক। ভেতরে পুকুরও আছে।"

রুবি সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল। ফ্রকপরা কয়েকটি কিশোরী ভারিক্কি চালে গল্প করতে করতে পুকুর ধারে ঘুরছে। দুজন যুবক বেঞ্চে ঘেষাঘেষি হয়ে একটা বই পড়ায় ব্যস্ত। গুটিকয় শিশু ছুটোছুটি করছে।

"পুকুরটা ঘেরা নয়। বাবুলকে একা ছেড়ে দেওয়া যাবে না।"

"না যাবে না।"

দুজনের স্বরেই দুশ্চিন্তার প্রকাশ।

"তবে ওদিকে একটা খেলার মাঠ আছে, বড়দের জন্য।"

"বড়দের খেলার মধ্যে গেলে, লেগে-টেগে যাবে।"

"পুকুরটাকেই ঘেরাও করার একটা ব্যবস্থা করাতে হবে। ওতো আর এখুনি চলাফেরা শিখছে না।"

নিখিল আশ্বস্ত করল রুবিকে। তারপর আঙুল তুলে দেখাল "ওই যে বিরাট ফাঁকা জায়গা, ওইখানে জমিটা।"

"কোনখানে?"

"চল দেখাচ্ছি। ওরই মধ্যে একজায়গায়।"

ওরা চলতে শুরু করল। দুধারে জমি। কোন কোনটায় সীমানা-চিহ্ন দেওয়া। সিমেন্টের তৈরি চৌকো ঢিবি, তারওপর আঁচড় কেটে প্লট নম্বর লেখা। কিছুদূর গিয়ে রাস্তাটা অসমাপ্ত অবস্থায় রয়ে গেছে। দরকার পড়েনি কারণ এদিকে আর বাড়ি ওঠেনি। ইলেকট্রিক খুঁটি নেই।

কলোনির লোকালয় ছাড়িয়ে ওরা অনেকদূর এসে পড়েছে। সামনে ধূ--- ধূ মাঠ তারপর অস্পষ্ট গ্রাম। দু'পাশে অনেকদূরে বাড়ি। সেগুলি অন্য কলোনির।

"এমন ফাঁকার মধ্যে?"

রুবির বক্তব্যটা ঠিক পরিষ্কার হল না। নিখিল মুগ্ধ হয়ে সামনে তাকিয়ে বলল, "এই তো ভাল, লোকালয়ের কোলাহল থেকে দূরে, শান্ত নির্জন পরিবেশে, মানুষতো এই ভাবেই বাঁচতে চায়।"

"দোকান, বাজার, বাস থেকে দূরে হয়ে গেল।"

"দোকান বাজারতো আর চব্বিশ ঘণ্টা করতে হবে না, একবারই, বাসেও একবার অফিস যাওয়া আর আসা। তোমাকেতো কলোনির প্ল্যানটা দেখিয়েছে, এখন যে জায়গাটায় আমরা দাঁড়িয়ে এখানে একটা রাস্তা হবে, আড়াআড়ি, এর ওপারে 'সি' আর 'ডি' ব্লক। পয়সাওলা লোকেরা এই দিকটায় জমি কিনেছে।"

"ওদেরই পোষাবে, গাড়িতে করে তো যাতায়াত করবে।"

কথাটা যেন শুনতে পেল না নিখিল। রাস্তা থেকে পাশের জমিতে নেমে হাঁটতে শুরু করল। বর্ষার কাদায় চটচটে। বুনোগাছ আর লম্বা ঘাসে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে যাচ্ছে। থেমে পিছু ফিরে নিখিল বলল, "এই জায়গাটায় এলে মনে হয় যেন মাঝ সমুদ্দুরে এসেছি, অবশ্য মনে হওয়াটা নেহাতই আন্দাজি ব্যাপার, সমুদ্রই কখনো চোখে দেখিনি।"

"কিসে মনে হল যে জায়গাটা সমুদ্রের মত?"

"এমনিই। মাঝে মাঝে মনে হয় না কি এ রকম? কোন কোন লোক দেখলে যেমন মনে হয় পাহাড় দেখছি। কাউকে অরণ্য, কাউকে নদী, বন্যা, উদ্যান, সেইরকম, সবকিছু মিলিয়ে একটা। তাই না?"

ভ্রূ তুলে রুবি শুনল। মন্তব্য না করে চারধারে তাকাতে তাকাতে বলল, "আমাদের

জমিতে পিলার দিয়েছে?”

“নিশ্চয়,”

“এখানে বেশিক্ষণ না থাকাই ভাল। বর্ষার সময় সাপখোপ থাকতে পারে।”

“হ্যাঁ, তা পারে।”

এক প্রবীণ গ্রামবাসিনী ওদেব কাছ দিয়েই গ্রামের দিকে চলে গেল। একবার শুধু তাকিয়েছিল। রুবি তাকিয়ে থাকল ওর দিকে। বেশ জোরে হাঁটছে। দূরে দূরে আরও কিছু লোক চলাচল করছে। আকাশে ভেসে চলেছে মেঘ। বাতাসে আঁচল খসে পড়ল। তুলে নিয়ে রুবি বলল, “এটা ভাদ্দর মাস।”

“এইটে আমাদের জমি।”

“কই?”

“এই তো।”

সন্তর্পণে শূন্যে হাত বুলোল নিখিল।

“পিলার কই?”

হঠাৎ রুবি আর্তনাদ করে উঠল।

“পিলার!”

চমকে উঠে বুনোগাছ আর লম্বা ঘাস মাড়িয়ে নিখিল ছুটে গেল। উবু হয়ে গুপ্তধন পাওয়ার মত জমি আঁচড়াতে থাকল। নেই। হামা দিয়ে কিছুটা এগোল। নেই। দু'হাতে ঘাসের চাপড়া টেনে তুলতে শুরু করল। নেই। উঠে ছুটে গেল আর এক কোণে।

রুবিও পা চেপে চেপে খুজতে শুরু করল। কাদা লাগছে শাড়িতে। হাঁটু পর্যন্ত গুটিয়ে তুলল। ঝুঁকতেই আঁচলটা মাটিতে পড়ল। বুকের কাছে দু'হাতে জড়ো করে আরো নিচু হল।

“কোথায় জমি?”

মুখ তুলে ফ্যালফ্যাল করে নিখিল তাকাল। চারপাশে চোখ বুলিয়ে বিড় বিড় করে কি বলল।

“কোথায় জমি?”

চিৎকার করল রুবি। নিখিল আর একটু সরে গিয়ে খুঁজতে শুরু করল। কাঁটা গাছ ওপড়াতে রক্ত ঝরছে। আঙুল মুখে দিয়ে নিখিল দাঁড়াল।

“ওরাতো বলেছিল করে দেবে।”

রুবি শুনতে পেল না। প্রায় মাটি শুঁকতে শুঁকতে সে এগোচ্ছে। হঠাৎ থমকালো। দু'হাতে ঘাস সরিয়ে অস্ফুটে বলল, “এই তো”।

“পেয়েছ?” ছুটে এল নিখিল। রুবির পাশে বসে মুখটা মাটির কাছাকাছি এনে বলল,. “পঁচিশ। আমাদের প্লট নাম্বার পঁচিশইতো, না ছাব্বিশ?”

"পঁচিশ।"

"ঠিক মনে আছে?"

ঘাড় নেড়ে রুবি বলল, "রেজিস্ট্রির দিনই তো তুমি বললে নম্বরটা শুভ, পঁচিশে ডিসেম্বর যিশুর জন্মদিন, পঁচিশে আগস্ট প্রমোশনের চিঠি পেয়েছি, পঁচিশে মে বাবুল জন্মেছে। মনে নেই?"

"বাকি তিনটেও তাহলে আছে।"

প্রথমটির থেকেও কম সময় লাগল বাকি পিলার খুঁজে বার করতে। তার মধ্যে একটি ভাঙা, ইঁটগুলো চুরি হয়ে গেছে। নিখিল তাইতে অস্বস্তি বোধ করল। চারদিকে চারটে না থাকলেও অবশ্য মালিকানা স্বত্ব নষ্ট হবে না, তবুও যদি এই নিয়ে পাশের জমির সঙ্গে গোলমাল হয়! কালই ব্যবস্থা করতে হবে, এই ভেবে তিন পিলারের মাঝে দাঁড়িয়ে নিখিল হাসল। বলল, "এই হল জমি।" বুক ভরে নিশ্বাস নিল। উদ্ধত ভঙ্গিতে গ্রীবা তুলে চারধারে তাকাল। পাশের স্ত্রীলোকটিকে লক্ষ্য করে হাসল।

"এতক্ষণে স্বস্তি পাওয়া গেল।" চারিপাশেব পৃথিবীতে চোখ ছোঁয়াতে ছোঁয়াতে রুবি আঁচল রাখল কাঁধে। "যা ভয় ধরেছিল।"

"ভয়, ভয় কিসের? টাকা দিয়েছি, দলিলও আছে, জিনিসটা লোপাট হবার মত নয়। জমি হচ্ছে আবহমান কালের, থাকবেও চিবকাল। তবে একটা ভয় রয়েছে পাশের জমির মালিক হয়তো ওই ভাঙা পিলারের দিক থেকে খানিকটা চুরি কবে দখল করতে পারে। এ পাশের জমিটা কিনেছে এক আই, এ,এস, আর এইটে ব্যারাকপুর কোর্টের মুন্সেফের। পেছনেরটা বায়না করে রেখেছে এক সাব-এডিটার।"

"তবু নজর রাখা ভাল।"

"নিশ্চয়, মাঝেমাঝে এসে দেখে যেতে হবে।"

দূরে কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে, বোধহয় জমি দেখতে এসেছে। কয়েকজন যুবক বেড়াতে বেড়াতে এক জায়গায় বসল। একটা লরি এসে থামল, ইঁটে বোঝাই। লাউডস্পিকারে কোথাও রেকর্ড বাজছে, অস্পষ্ট শোনা যায়। একটা চিল মাটিতে ছোঁ মেরে কি তুলে নিয়ে গেল। কুকুরটা যেতে যেতে থমকে চিলটাকে দেখল। তারপর সবুজ ধানচারার মাঠ লক্ষ্য করে দুলকি চালে এগিয়ে গেল।

"এখানে সাপ থাকতে পারে, সরে এস।"

নিখিল সরে এল। "কোথাও যদি বসার মত একটা জায়গাও থাকত।"

দুজনে চারধারে তাকিয়ে খুঁজে পেল না। তাই উবু হয়ে বসল জমির কিনার ঘেঁষে।

"এখন মাটি আলগা, জলে কিছুটা বসবে, রোদ খেয়ে শক্ত হবে!"

"তখন ভিত খোঁড়া হবে?"

স্মিত হাসল নিখিল। বাতাসের বিরুদ্ধে চোখ রেখে নিমীলিত করল। পাঞ্জাবিটা

বুকের সঙ্গে লেপটে গেছে, উঁচু হয়ে উঠেছে মানিব্যাগ।

"দোতলার ভিত করে, প্রথমে একতলা তুলতে হবে কেন জান? পরে দরকার হলে দোতলা তুলে একতলাটা ভাড়া দেওয়া যাবে। ধর আমি মরে গেলুম, তখন তুমি ভাড়ার টাকায়—"

"আহা, কথার কি ছিরি।"

স্মিত হাসি, নিমীলিত চোখে নিখিল আবার বলল, "ইন্সিওরেন্সের টাকাতেই দোতলা তুলতে পাববে।"

"থাক, খুব হয়েছে।"

প্ল্যানটা সেইভাবেই করব। সিঁড়িটা এমনভাবে হবে যাতে একতলার সঙ্গে কোন সম্পর্ক দোতলার না থাকে, তাহলে ভাড়াটের সঙ্গে কোন গোলমাল হবার চান্স থাকবে না।

এখানে বাড়ি ভাড়া কেমন?"

"তা পুরো একতলা, অবশ্য আমাদের মত ছোট বাড়ির, আশিটাকা তো হবেই।"

শুনে রুবিও বাতাসের বিরুদ্ধে চোখ রাখল। কিছুক্ষণ পরে বলল "হাওয়ায় কি রকম সোঁ সোঁ আওয়াজ হয় দেখেছ। ঠিক কানের গোড়াতেই।"

"বলেছিলাম না, মনে হয় সমুদ্রে এসেছি। কি খোলামেলা যতদূর ইচ্ছে তাকাও, যত বড় ইচ্ছে নিশ্বাস নাও, মনে হয় দ্বিগুণ হয়ে গেছি।"

"রান্নাঘরে যাতে হাওয়া আসে সে ব্যবস্থা কিন্তু রাখতেই হবে।"

খড়খড় করে উঠল ঘাস। কিছু একটা চলে যাচ্ছে। ওরা ভয় পেল। নিখিল বলল,

"এবার যাওয়া যাক।"

পিলারের কাছের ঘাসগুলো পরিষ্কার করে দিলে হোত।"

"পরে হবে, আর একদিন রোদ থাকতে থাকতে আসা যাবেখন।"

আসার সময় ওরা একটা খালি ট্যাক্সি দেখতে পেয়ে তাকাল। ট্যাক্সিটা তাই দেখে আস্তে হয়ে পড়ল। নিখিল হাত নেড়ে না করে দিল।

এক পয়সা, দু'পয়সা পরেই টাকা জমে। কষ্ট হবে, হোক। পরে দেখবে সেই কষ্টের ফল ভোগ করতে কেমন লাগে। অন্তত তিরিশ হাজার টাকা না হলে বাড়ি তৈরিতে নামা চলে না। মাল মশলার দাম যা বাড়ছে দিনদিন।"

"এমনিই তো কত খরচ কমিয়ে দিয়েছি।"

জোরে হেঁটে এসে ওরা বাসে উঠল। সন্ধ্যা উতরে গেছে। ছুটির দিন তাই শহরতলির বাসে ভিড়। নিখিল বাসের হ্যান্ডেল আঁকড়ে ঝুঁকে পড়ে কলোনিটার দিকে তাকাল।

বাস থেকে নেমে মিনিট চারেক হাঁটতেই কলকাতার মধ্যে চলে এল ওরা।

এবার ট্রামে উঠল। নেমে দুমিনিট হেঁটে বাড়ি। বাড়ির পথে রুবি বলল, "বাবুলের বিস্কুট ফুরিয়েছে কিনবে?"

"অভ্যেসটা ছাড়াও, এক বছরের ছেলেকে ওসব না খাওয়ানোই ভাল।"

"তোমার গেঞ্জি ছিঁড়েছে।"

"এখনো ক'টা দিন চলবে।"

"মার কাল একাদশী।"

"আঃ এই তো তোমার দোষ, একটু আগে বললে না কেন, তাহলে আসার পথে নেমে, কিনে নিতুম। এই তো তোমার দোষ। এখন কে আবার যাবে? কালকে বরং কাউকে দিয়ে আনিয়ে নিও।"

একতলার ভাড়াটেদের বৌয়ের সঙ্গে সিঁড়িতেই রুবির দেখা হল। দাঁড়িয়ে পড়ল।

"তোমার ছেলে কি দুরন্তই না হয়েছে। এসেছিল আমাদের ঘরে এটা টানে, ওটা হাঁটকায়। এইমাত্তর ঘুমোল, তা কেমন দেখলে?"

"বিরাট কলোনি, আর কি ফাঁকার ওপর। হু হু করছে হাওয়া, মনে হয় যেন সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে আছি। ফিরতেই ইচ্ছে করে না।"

"এখনই এতখানি, বাড়ি হলে না জানি কি হবে।"

"তাইতো ভাবছি, না জানি কি হবে। বিরাট বিরাট বাড়ি, কেউ ম্যাজিস্ট্রেট কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ প্রফেসার ওর মধ্যে আমাদের মত মানুষ গিয়ে কি করে বাস কববে, তাই ভেবে এখনই তো বুক কাঁপছে। পাশের জমিটাই এক জজের।"

ঝকমক করছে রুবির মুখ। কথায় আধোআধো ভাব।

"তোমার ছেলে একপাটি জুতো ফেলে গেছে, নিয়ে যাও।"

জুতো নিয়ে রুবি দোতলায় এল। দু'খানি ঘর। বাইরের লোক এলে সামনের ঘরে বসে। রাত্রে নিখিলের বুড়ি মা শোয়। ভিতরেরটি বড়। খাট, আলমারি আছে। রান্নাঘর বারান্দার ধারে টিনের চালা।

বছর পনেরোর একটি ছেলে বাইরের ঘরের চেয়ারে বসে, শীর্ণ হাত-পা, ড্যাবড্যাবে চোখ। চেয়ারের হাতল ধরে পা বেঁকিয়ে মাথা নিচু করে রয়েছে। রুবি ভিতরের ঘরে গেল। নিখিল জামা ছেড়ে লুঙ্গি খুঁজছে।

"মন্টু, ছোটকাকার ছেলে, ওকে বোধহয় তুমি দেখনি।"

"কি জানি, ওরা তো অনেক ভাই-বোন। কি জন্যে এসেছে?"

"একটা চিঠি এনেছে, দেখতো কি লেখা।"

"থুতনি নেড়ে টেবিল দেখাল নিখিল। রুবি চিঠিটা তুলে পড়তে শুরু করল।

"কি লিখেছে?"

লুঙ্গিটা মাথার উপর দিয়ে গলিয়ে দাঁতে চেপে সাবধানে, কাপড়ের পাঠ রক্ষায় নিখিল ব্যস্ত ছিল। হঠাৎ চমকে উঠল, "কি বললে? ছোট কাকীর কি হয়েছে?"

"খুব অসুখ, বাড়াবাড়ি যাচ্ছে।"

"তা আমি কি করব ?

রুবি চিঠি থেকে আবৃত্তি করল—

"এদিকে আমি তো অকর্মণ্য, পঙ্গু।"

"মাতলামি করে গাড়ি চাপা পড়েছিল।"

"সুবোধ মাসে ষাট টাকার বেশি সংসারে দিতে পারে না।"

"ক্লাশ এইট পর্যন্ত পড়ে বখামি শুরু করে, এখন বুঝি মোটর কারখানায় ঢুকেছে।"

"প্রবোধ ঈশ্বরের দয়ায় স্কুল ফাইন্যাল পাশ করিয়া নাইট কলেজে পড়িতেছে, দুইটা টিউশনিও করে।"

"এ ছেলেটা ওদের মধ্যে তবু ভাল।"

"সোনা এবং মোনার জন্য পাত্র খুঁজিতেছি কিন্তু উহারা লেখাপড়া জানা নয়, দেখিতেও ভাল নয়। বুঝিতেই পারিতেছ আজকালকার বিবাহের বাজারে উহাদের পার করিবার মত সঙ্গতিও আমার নাই। তাহার উপর তোমার কাকিমার ভীষণ অসুখ, বোধহয় বাঁচিবে না।"

"ও বাড়িতে এই একটি মাত্র মানুষ, সারাজীবন দুঃখে দুঃখে কাটল, তবু মুখ ফুটে একটা কথা বলেনি। মুখে সর্বদাই হাসি। আমায় খুব ভালবাসত।"

"ডাক্তার একরূপ জবাবই দিয়াছে। বাঁচাইতে হইলে যে অর্থের প্রয়োজন তাহা আমার নাই। তোমার কাকিমা সর্বদাই তোমার কথা বলে। তুমি তাহাকে যেরূপ ভালবাস, তাহার গর্ভের সন্তানও সেরূপ ভালবাসে না, একথা সে প্রায়ই বলে। তোমার পিতা মারা যাওয়ার পর তোমাদের সহিত যে মনোমালিন্য দেখা দেয়, তাহা তোমার কাকিমার চেষ্টাতেই বেশিদূর গড়াইতে পারে নাই। তোমার হয়তো এখনো ধারণা থাকিতে পারে যে, সম্পত্তি ঠকাইয়া লইয়াছি, কিন্তু রাধারমণের নামে দিব্যি করিয়া বলিতে পারি, এক কানাকড়িও ঠকাই নাই। বসতবাড়িটিও বাঁধা পড়িয়াছে এতগুলি সন্তানের মুখে অন্ন যোগাইবার জন্য। কিন্তু আজ বাঁধা দিবার মতও আর কিছু নাই। তুমি বংশের মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান। ভাল চাকরি কর, আরও শুনিয়াছি ভালই হয়। তোমার কাকিমাকে সুস্থ করিয়া তোলার জন্য আমাদের থেকে তোমার দুশ্চিন্তাই বেশি হওয়া স্বাভাবিক। তাই সুনীলকে পাঠাইতেছি, যদি—"

"টাকা ?"

রুবি একবার তাকিয়ে নিঃশব্দে চিঠির বাকি অংশটুকু পড়ে নিয়ে ঘাড় নাড়ল।

"সেই রকমই বোধ হচ্ছে।"

লুঙ্গিটা পরা হয়ে গেছে। নিখিল গম্ভীর হয়ে খাটে বসে পড়ল। ওঘর থেকে কথার শব্দ আসছে। মণ্টুর সঙ্গে মা কথা বলছে।

চিঠিটা ভাঁজ করে টেবলে রেখে রুবিও নিখিলের পাশে বসল। দুজনে পাশাপাশি

সামনের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকল। ঘাড় ফিরিয়ে আলমারির আয়নায় দুজনের চোখাচোখি হল। তারপর দুজনেই ঘাড় শক্ত করে বসে থাকল। দরজার কাছে গলা খাঁকরির শব্দে রুবি উঠে দাঁড়াল। শাশুড়ি।

"অনেকক্ষণ এসেছে, প্রায় ঘণ্টা দুই।"

অস্ফুটে নিখিলের মা বললেন। মেঝের দিকে তাকিয়ে নিখিল বলল "তা কি করব?"

একটুক্ষণ চুপ থেকে তিনি আবার বললেন, "দুদিন ধরে নানা জায়গায় ঘুরেছে, মামার বাড়ি গিয়ে পায়নি, পিসির বাড়িতেও না, শেষে এখানে এসেছে।"

"তাতো বুঝলুম, কিন্তু আমি কি করতে পারি!"

অসহায়ের মত নিখিল অগত্যা রুবির দিকেই তাকাল। সেও তারই দিকে তাকিয়ে। দরজার কাছ থেকে আবার অস্ফুটে উনি বললেন, "মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে, থাইসিস হয়েছে। আদ্দেকদিনই তো না খেয়ে থাকত।"

"মা, বাবুলের দুধ গরম করে রেখেছেন?" ধড়মড় করে রুবি বলে উঠল। নিখিলও সচকিতে তাকাল।

"রেখেছি।"

"আশ্বস্ত হয়ে রুবি বলল, "মণ্টুকে কিছু খেতে দেওয়া উচিত।"

নিখিল উঠে পড়ল। পাঞ্জাবিটা হাতে নিতেই রুবি বলল, "খাবার আনতে চললে?"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে মার জন্যেও কিছু এনো।"

মণ্টুর সামনে দিয়েই বেরোতে হবে। নিখিল বেরোতে গিয়ে ওর সামনে দাঁড়াল। "কাকিমা এখন কেমন আছে।"

উঠে দাঁড়াল মণ্টু "ভাল আছে?"

ভ্রূ কোঁচকাল নিখিল, "ভাল আছে।"

মণ্টু থতমত হল। ঢোক গিলে বলল, "কাল রক্ত পড়েনি।"

"ক'দিন এমন হয়েছে?"

"দু-তিন মাস। কাউকে বলেনি, লুকিয়েছিল।"

"জানার পর কি হল?"

মাথা নামিয়ে মণ্টু চেয়ারের হাতল আঁচড়াতে শুরু করল।

"খোকা শোন্।"

মার ডাকে নিখিল ভিতরে এল।

"ওকে এখন আর কিছু জিজ্ঞাসা করিসনি। মুখটা শুকিয়ে আছে কি রকম। ছোট ছেলে ভাবনা চিন্তা ওরও হয়। খাওয়া-দাওয়াও বোধহয় হয়নি।"

কথা না বলে নিখিল হন হন করে বেরিয়ে পড়ল। গলি দিয়ে যাচ্ছে এমন সময় কে ওকে চিৎকার করে ডাকল। ফিরে দেখে অমিয়। পাড়ারই ছেলে, পেশায় ড্রাফটসম্যান।

"আপনার প্ল্যানটা আজকেই শেষ হল। পারলাম না, হাজার চল্লিশ লাগবেই।"

"কেন, আমি যে ভাবে বললুম তাতে তো অত লাগার কথা নয়।"

অমিয় ছোট্ট করে হাসল। "আপনিতো বলেই খালাস, দোতলা বাড়ির ভিত, জমি তিনকাঠা, মেটিরিয়ালস কি রকম দেবেন তা আপনিই ঠিক করবেন, তবে যাই দিন না কেন, আমারতো মনে হয় না ওর কমে হবে। দু'বছর আগে হলে হত। আইডিয়া আছে বটে আপনার, অফিসে একজনকে আপনার করা প্ল্যানটা দেখিয়েছিলাম, খুব তারিফ করলেন।"

"অনেক ভেবেচিন্তে করা।"অস্ফুটে, প্রায় আপনমনেই বলল নিখিল।

"কবে শুরু করবেন ?"

"কি জানি।"

"সেকি, এই যে সেদিন বললেন, তাড়াতাড়ি চাই, ইমিডিয়েট স্টার্ট করবেন।"

"টাকা চাইতো। কুড়ি হাজার পর্যন্ত লোন পেতে পারি গভরমেণ্টের কাছ থেকে, ভেবেছিলাম ধার নেব না।, কিন্তু..."

অধৈর্যের ভঙ্গিতে নিখিল যাবার জন্য ঝুঁকল। অমিয় সহানুভূতি জানাবার মত করে বলল, "আসল প্ল্যানটাই হল টাকা যোগাড়। প্ল্যান হলে তখন স্যাংশান করাতে প্রাণান্ত। নানান বায়নাক্কা, একে ঘুষ তাকে ঘুষ। তাই দিতে দিতেই ফতুর।

বেশ বড় করে অমিয় হাসল। তারপর বলল, "দাঁড়ান, আপনার প্ল্যানটা নিয়ে আসি।"

অমিয় প্ল্যান আনতে চলে গেল।

তখন নিখিলের সামনে থেকে গলিটা এবং বাড়িগুলো অদৃশ্য হতে শুরু করল। হু হু হাওয়া বইতে লাগল। অস্ফুট ভেসে আসছে সমুদ্রের গর্জন। চতুর্দিকে প্রবল অন্ধকার। আর সে তার তিনকাঠা জমির মাঝে দাঁড়িয়ে। তিন কোণে তিনটে পিলারের মাথা ক্রমশ উঁচু হচ্ছে দেখে চতুর্থটির দিকে তাকাতেই দেখল ছোট কাকী পিলার হয়ে দাঁড়িয়ে, হাসছে। তারপর কাঁদতে শুরু করল : "বড় কষ্টরে নিখিল, আমাকে সারিয়ে তুলবি ?" নিখিল বলল, "এইটে আমার জমি, এখানে আমি বাড়ি তুলব। আমি সুখী হতে চাই।"

শোনামাত্র চতুর্থ পিলারটি মাটির মধ্যে আগাছার মাঝে বসে যেতে লাগল। তাই দেখে আঁতকে উঠল নিখিল :

"না, ছোটকাকী যেও না। তাহলে আমার জমির সীমানা হারিয়ে যাবে। তুমি থাকো ছোটকাকী, তুমি থাকো।"

হাত বাড়িয়ে নিখিলকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অমিয় প্ল্যানটা এনে দেবার সময় বলল, "খুব চিন্তায় পড়ে গেছেন মনে হচ্ছে। যদি বলেন তো, আরো কমে যাতে হয় এমন ভাবেও করা যায়।"

বিবর্ণ কণ্ঠে নিখিল বলল, "বাড়ি করা বড্ড শক্ত কাজ। নতুন প্ল্যানই বোধহয় করতে হবে।

যুদ্ধ

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

দ্বারিকপোতার জমি বড় আশ্চর্য, পৌষধান ওঠার পর সেখানটা খা খা করে। লঙ্কা, বরবটি, সিম কোনোটা লাগাবার উপায় নেই। কারণ, কাছাকাছি কোথাও জল নেই। উপরন্তু ছাড়া-গরুর উপদ্রব। বর্ষাকালে আরও কাহিল অবস্থা। কষ্টেসৃষ্টে ধান লাগাবার মাসখানেক পরে বৃষ্টি একটু জোর নামলেই আগাগোড়া ডুবে সমুদ্র হয়ে যাবে। জোর বাতাস উঠলে তখন ঢেউ খেলে বাদায়। হাজরা নসকর তখন দ্বারিকপোতার লাগোয়া তাদের মিস্ত্রি-পাড়ার উঠোনে বসে ফি-বছরের মত একই ছবি দেখে। বহু খাটা-খ ুনি করে লাগানো ধানচারাগুলো সবে বলকারী হয়ে উঠেছিল। নিড়েনের সময় আসতে না আসতেই জলে ডুবে গেল। যদি এক আঙুলেও বেরিয়ে থাকত— তাহলেও ধানচারাগুলো জলের ওপরের আলো খেয়ে খেয়ে বেঁচে যেত। মাসখানেক পরেও জল নামলে বিঘে চারেকের এই ভাগচাষের একটা হিল্লে হয়ে যেত। রোজ রাতে শুয়ে শুয়ে পচা ধচা গোলপাতার ছাউনির ওপর বৃষ্টির একঘেয়ে শব্দ শুনতে শুনতে ভাবে— কাল সকাল থেকে আকাশ যদি জিরেন দেয়— তবে চাইকি ক'দিনের ভেতর জল নেমে গিয়ে চাষটা বাঁচে।

কিন্তু জল নামার কোন লক্ষণই নেই। দ্বারিকপোতা এদিকে সবচেয়ে ঢালু জায়গা। চারদিককার জল এখানে এসেই নামে। তাই ডুবলে সবার আগে ডোবে। আশ্বিন মাসের শেষাশেষি বট অশ্বত্থের মরা ডালেও জল লেগে নতুন পাতা বেরোয় যাতে সবার মনেই আশা জাগে। কিন্তু দ্বারিকপোতার তখনো বেশ জল থাকে।

নিকাশি খাল একটা কেটেছিল সরকার। কিন্তু ঠিকাদারগুলো জালিয়াত। খাতায় দেখালো কয়েক লাখ মাটি। কিন্তু আসলে দু'চার লাখের বেশি মাটি কাটালো না। কলকাতায় অফিস-কাছারিতে বসে দেনাপাওনা ঠিক হয়ে গেল। হাজরার মত মানুষ মারা পড়ল।

জঙ্গল হাসিল করে এই আবাদ। কে এক দ্বারিকবাবু হাজরার জ্ঞান বয়সের অনেক অনেক আগে এখানে চাষবাসের পত্তন করেন। তাঁর নামেই জায়গার নাম। তাদের বংশপরম্পরায় শরিক— তস্য শরিকে ভাগ হয়ে হয়ে হাত বদলের পর এই চার পাঁচশো বিঘের মালিকানা এখন নানান টুকরোয় ছড়ানো। হাজরা জানে, মালিকানা তো পাল্টাবেই, জমি শুধু তার জায়গাতেই থাকে।

পৌষমাসে অন্য মাঠের চাষীরা যখন ঝুমঝুম মলের আওয়াজ তুলে শুকনো পাকা ধানের বোঝা মাথায় করে আছড়াবে বলে খামারে ফেলে— ঝরে পড়া পুষ্ট ফলধান পরের বর্ষায় বীজ করবে বলে সযত্নে তুলে রাখে— তখন হাজরা নসকর এক বেলাতেই চার বিঘের ন্যাড়ান্যাড়া কয়েক আঁটি খড় কাটতে মাঠে নামে। পোকায় কাটা সামান্য কিছু ধান জোটে। জল নামার পর যে ক'টা গোছ বেঁচেছিল তারই সামান্য ফসল। তারও আবার ভাগ আছে।

মালিক জলিল গাজি। তিনি ভাগ দিতে গেলেও নেবেন না। কারণ ভাগচাষী বোর্ডে প্রমাণ করাতে চান— চাষী হাজরা নসকর একটি অপদার্থ। চাষে মন নেই। ধান ফলে না। যেটুকু ফলে তার ভাগ দেয় না। এই বলে তিনি হাজরাকে জমি থেকে উচ্ছেদ করতে চান, কবে নিজে চাষ করবেন।

হাজরা মিথ্যেবাদী নয়। যা ফলেছে তার ভাগ দিতে চায়। কিন্তু মালিক নেবে না। নতুন আইনে খুব কড়াকড়ি। ভাগের ধান মালিককে বুঝিয়ে দিয়ে যদি একখানা রসিদ পায়— তাহলে সেই রসিদের বলে ভাগচাষী হিসেবে নাম রেকর্ড করাতে পারে। তখন জমি থেকে তাকে কে সরায়। তাহলে হাজরা নসকর একরকম পাকাপাকি রায়ত হয়ে যায়। চাই কি কোনদিন সরকারের ঘরে খাজনা জমা দিয়ে দাখিলা কেটে নেওয়ার অধিকারও তার ওপব বর্তাতে পারে। এমন কিছু আকাশকুসুম নয়। এমন ব্যাপার তো অনেক জায়গাতেই ঘটেছে।

তার কপাল মন্দ তাই হচ্ছে না। হালের বলদ নেই। একটা এঁড়ে পুষেছে। সেটা এখন বেশ বড় হয়েছে। তার লাগদার আরেকটি বলদ হলেই হাল জুড়তে পারে। কিন্তু তা আর হয়ে উঠছে না। কিন্তু চেয়ে চিন্তে আরও জমি জোগাড় করতে পারত। দুটো ধান আনত ঘরে। এভাবে দোরে দোরে জন খেটে সংসার নিয়ে খাবি খেতে হত না।

তার মালিক জলিল গাজির বয়স বেশি নয়। পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ। লোহা সিমেন্টের দোকান আছে বাজারে। বমজানের ঈদে একবার উট জবাই করেছিল। সে সময় কাঁচের প্লেট, গ্লাস দপ্তরখানায় বিছিয়ে দিয়ে মেহমানদের দাওয়াত দিয়েছিল। নিজ চাষে ছত্রিশ বিঘে জমি আছে। বাড়ির ভেতর একটা টিউবয়েল— বাইরে একটা টিউবয়েল। তিনটে দিঘি ছাড়াও একখানা লরি আছে। সারা বাজারের হয়ে সে-লরি মঙ্গল আর শনিতে শেয়ালদায় গস্ত করতে যায়। মণ প্রতি ভাড়া দু'টাকা। নিজে পার্টি করে। ভোট এলে পাড়ায় পাড়ায় মিটিং-এ যায়। খরার সময় ঠিকেদারি নিয়ে

দূরে দূরে রাস্তা বানায়। কালভার্ট বানায়।

হাজরা তার দোকানে গিয়ে অনেকক্ষণ বসে থেকে শেষে বলেছে, বাবু অভাবী মানুষ আমি। পেটের জ্বালায় ধানটা খেয়ে ফেলব। আপনার ভাগ আপনি নিয়ে নিন, আমায় একখানা রসিদ দিন।

জলিল গাজি হাজরার চেয়ে সামান্য কিছু ছোট হবে বয়সে। হেসে বলেছে, ও ধান তুমি রাখো। আরও দু'বস্তা ধান নিয়ে গিয়ে ছেলেপুলে নিয়ে এই বর্ষাটা পেটভরে খাওয়া-দাওয়া কর। গায়ে তাগদ করে আমার রাস্তার কাজে লেগে যাও। দিন গেলি চার টাকা কোমরে গুঁজে বাড়ি ফেরবা। ও জমি তুমি ছেড়ে দাও নসকর। আমার পাম্প আছে। লোক আছে। আমি চাষ করে দুটো ধান পাই।

হাজরা গলেনি। ভাগের ধানও ভাঙেনি। গাঁয়ের মাতব্বরদের বলেছে। অন্য সব পার্টির দাদাদের বলেছে। তাদের পরামর্শ: বিনে রসিদে ধান দিও না। দরকার হলে আমরা জে এল আর ও অফিসে যাব। গাজি তোমার জমি ছাড়াতে পারবে না।

খাবার ধান নেই। অথচ ঘরে মালিকের ভাগের ধান। ভাঙা যাবে না।

এক এঁড়েতে হাল চলে না। যতক্ষণ না আরেকটা হচ্ছে ততক্ষণ ওকে বসিয়ে খাওয়াতে হবে।

হাজরার হাসি পায়। তার অবস্থা ঠিক দ্বারিকপোতার মত। জায়গা আছে ফলে না। বর্ষায় সমুদ্র। খোরোকালে খটখটে ভাঙা।

এক ভরসা পুকুর ভর্তি মাছ। আর খালের চিংড়ি, আর যেমন ট্যাংরা, ধান্যেপুঁটি, শোল, শাল, সিংগি, মাগুর, বাইন, ন্যাদোস, তাছাড়া কিছু কাঁকড়া। কখনো সখনো দু'একটা কচ্ছপ। কিন্তু তার ভাগ্যে নেই। তার জাল নেই। একগাছি যা আছে—তাতে লোহার কাঠি পরানো দরকার। একসঙ্গে দু'কেজি কাঠির দাম বারো টাকা পাবে কোথায়? খালে পাটা মেরে যে মাছ ধরবে তারও উপায় নেই। অন্তত তিনখানা পাটা কিনতে একসঙ্গে তিরিশ-বত্রিশ টাকা চাই। তাতে একটা মরা মানুষের চিকিৎসা হয়ে যায়।

টিউবয়েল বসায় ঝোড়ো। তার তেমন কাজ নেই। সে একটা পরামর্শ দিল। ব্যাঙ ধরে আন, আমি কিনে নেব।

এই ফাগুন মাসে ব্যাঙ পাব কোথায়?

দেবতা চমকাবে— তারপর ব্যাঙ ধরবি! সেদিন আর নেই!

ঝোড়ো কিছু শহর ঘেঁষা লোক। রেলস্টেশনের দোকানে বসে চা গেলে। চারদিকে টিউবয়েল বসিয়ে বেড়ায়। এবার তেমন কাজ নেই। ওর কথাটা মনে লাগল। বেশ কিছুকাল এখানকার দু'চার জন ব্যাঙের আড়ৎ করেছে সেখানে। সকালবেলা জ্যান্ত ব্যাঙের পেছনের দু'খানা পা কেটে রেখে বাকিটা ফেলে দেওয়া হয়। তারপর

ধোওয়া-ধুয়ি করে বাকি মাল বরফচাপা দিয়ে কলকাতায় চালান যায়।

ঘরে তার মন বসে না। একদিন ভালো উপায় হলে বউ তার পান্তা, গরম, বাসি করে চালের আন্ডিল নষ্ট করবে। অথচ আয় করে পয়সা তো আর অন্য জায়গায় রাখা যায় না। মাঝের থেকে লাভ--- দুটো ছেলে একটা মেয়ে মাসের মধ্যে বিশ দিন কোনক্রমে একবেলা খেয়ে থাকে। গরিব ঘরের যে বুঝে চলবে তেমন বউ পায়নি হাজরা।

একই উঠোনে আর দুই ভাইয়ের ঘর। সে বড়। পরের ভাই বজরা কোত্থেকে ভাগিয়ে এনে বিয়ে করেছিল। সে বউ বিষ খেয়ে মরতেই আবার বিয়ে বসেছে। দিনে তাস পেটায়— রাতে তার কাটে। ছোট ভাইটা ভাল। ঘটির সঙ্গে বিধবা মা থাকে। ঘটির বয়স বছর ষোল। মাকে গরু দুয়ে দেয়— মা দুধ বেচে। ঘটি নিজে তিনটে তালগাছ কাটে। তার রস বিক্রি হয়, গুড় হয়! নিজে তাড়ি করে খায়—দাদাদের দেয়। মরসুমে খেজুরগাছও কাটে। হাজরাও দুটো তালগাছ কাটে। গাঁয়ের মাথায় বর্ষাকালের মেঘ ঝুলে পড়লে সব ভাই ঘরে ফিরে আসে। যে-যার বারান্দায় বসে তখন কথা বলে। সুখ দুঃখের, ঝগড়ার—। কখনো নিন্দের। ক্বচিৎ প্রশংসার।

এইভাবে থানা রায়পুর, গ্রাম মিস্ত্রিপাড়া, রেলস্টেশন বন্দিপুর, ব্লক দেকাটির খগেন নস্করের তিন ছেলের জীবন কেটে যাচ্ছিল। তার ভেতর হাজরা নস্কর নতুন কাজে নেমে জীবনে প্রথম পয়সার মুখ দেখলো। যার জীবনে কোন দিন হাসি ছিল না— সে এখন দুপুরে ঘুমোয়। সন্ধের ঘোরে তালগাছের মোচ কেটে কলসি বসায়। সারাদিনের জমানো তাড়িটুকু নামিয়ে উঠোনের দিকে তাকিয়ে বসে চুক চুক করে খায়। ক'গ্লাসের পর ঘরের ভেতর তাকিয়ে বউকে হাঁক পাড়ে। বেস্পতি। যন্তর দে—

খুব সাধারণ জিনিসের যন্তর। একখানা ভালো কঞ্চির শক্ত ছিপ। তাতে আড় বঁড়শি লাগানো কাপড়ের দোকান থেকে আনা একটা পলিথিনের মোড়ক। নারকেল মালা চাপা দেওয়া একটা গুড়ের কলসি। হেরিকেন একটা। আরেকখানা দা। ট্রেনে ফিরি হয়— আগুন ধরানোর ছ'আনা দামের পাথর। বিড়ির কৌটো, ব্যাস!

বেস্পতি সুশনি শাকের তরকারি করেছিল। সঙ্গে নুন আর ভাত। ডাবা হাড়িতে হাত ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে খেয়ে নিচ্ছিল হাজরা। সন্ধে রাতেই রেললাইন ধরে বেরিয়ে পড়তে পারলে অনেকটা পথ কাবার করা যাবে। এখনো সেজন্য কোন ভাবনা নেই এই বন্দিপুর স্টেশনের বাজার এলাকায় তো টোপই জোগাড় হয়নি। অবিশ্যি যে দোকানেই যাবে— দোকানদার নিজেই তাকে খাতির করে গোলার ঘর খুলে দেবে। হাজরা তখন আলুর বস্তা হোক, মশল্লার গুদাম হোক— কিংবা কেরোসিনের আড়ৎ হোক— হামা দিয়ে অন্ধকারে ঢুকে যাবে। তারপর যেখানে যত আরশোলা

পাবে কপাকপ ধরবে আর পলিথিনের ব্যাগে পুরবে। এই হল তার ব্যাঙ ধরার টোপ। দোকানদাররা খুশি। আরশোলা কোতলের এমন মাগনা যন্ত্র কোথায় পাবে?

ব্যাঙ ধরা বড় নেশা। বলা ভাল পয়সার নেশা। টপাটপ ধরে কলসি বোঝাই করে ভোর ভোর ফিরতে পারলে চাই বারো-চোদ্দ টাকাও রাত ফুরোলে রোজগার হয়। সাহেব মেমেদের ঘেন্না পিত্তি নেই। এমন বন-বাদাড়ের জিনিসও খায় কে জানতো। আর কেজি পিছু দরও চড়ছে রোজ রোজ। ব্যাঙ নাকি ফুরিয়ে যাচ্ছে—তাই।

এ তাড়াহুড়োর কাজ নয়। ঘাসের ওপর দিয়ে পা টিপে টিপে এসেছিল হাজরা। লালাজির ইটখোলা পার হলেই রেললাইনের দু'ধারে শুধু অন্ধকার। তখন হেরিকেনটা উসকে নিল। জোলো ঘাসের আড়ালে আড়ালে গর্ত করে ব্যাঙ বাসা করে থাকে। মেঘ ডাকলে তবে জানান দেয়। নয়ত নয়। রাত বাড়লে ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় বেরোবে। কত রকমের খুচরো সব পোকা থাকে ঘাসে। সেগুলো থপথপ করে খুঁজে বেড়াবে। নয়ত ঘাপটি মেরে বসে থাকবে।

যত রাত বাড়ে সংসার তার কাছে তত পরিষ্কার লাগে। গাঁ-গঞ্জের মানুষজন সন্ধের পর বিশেষ জেগে থাকে না। ওঠে ভোর-ভোর। এক-এক তল্লাট তখন তার জন্যে ছবির মত পড়ে থাকে। সে ব্যাঙ ধরতে বেরিয়ে হেরিকেন তুলে তুলে সেসব জায়গা দেখে। গোলাবাড়ি। পুকুরঘাট। কলাবাগান। উঠোন। ধানের গাদা। পোকাপড়া গাই অন্ধকার আকাশের নিচে একঠায় দাঁড়িয়ে অনবরত লেজের ঝাপটায় মশা তাড়াচ্ছে। তার এইসব দেখার সময় অন্য কেউ থাকে না। দিনের বেলা ট্রেনে যাওয়ার সময় এসব জায়গা চোখে পড়েছে— কিন্তু তখন এখনকার মত তন্ন তন্ন করে দেখা হয়নি।

কালকেপুরের রেলপুকুর পেরিয়ে টিনের চালতোলা ঘর পড়ল পথে। গোয়ালঘরের বাইরে দু'জোড়া হাল জোয়াল। নিশ্চয় ষোল ষোল খেই বত্রিশ বিঘের চাষ। পরিশ্রমী চাষী একখানা হালে এক মরসুমে ষোল বিঘে জমি কাড়ায় নিশ্চয়। এখন ধানের দর ভাল যাচ্ছে। ভাগের ধানটা বেচে দিয়ে একটা তাগড়াই এঁড়ে বাছুর কেনা যেত। কিন্তু জলিল গাজি তাকে ঝুলিয়ে রেখেছে।

স্কুলবাড়ি, মন্দির, কামারশালা, ক্লাবঘর— কত যে সে এই ক'মাস দেখল। দিনের বেলায় এমন নির্বিঘ্নে দেখা যায় না। এখন বেশ পরিষ্কার সব দেখা যায়। সে চোর নয়। হাতের হেরিকেনে আলো জ্বলে। ডাকাত নয়। সঙ্গে সম্বল একখানা হাত-দা মাত্র।

হাজরা রোজ নিশুতি রাতে সারা পৃথিবীর একটা আন্দাজ পায়। তখন তার দেখে বেড়ানোর পথে কোন বাধা নেই। ইটখোলা ছাড়িয়ে ভিমরুলতলা। এখানে নাকি বিরাট ভিমরুলের চাক ছিল এই বটগাছে। তিনজন সাহেব রেললাইন বসাতে এসে বাবা পঞ্চাননের দাস ভিমরুলের দঙ্গলকে ক্ষেপিয়েছিল। তখনকার সাহেবরা

নাকি ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়াত। ঘোড়া ছুটিয়েও পার পায়নি সাহেবরা। ভিমরুলের কামড়ে জ্বর—শেষে ভুল বকে মরে যাওয়ার দশা। ইংরেজের রেলকোম্পানি পঞ্চাননতলায় পুজো দিয়ে তবে রেললাইন বসাতে পেরেছিল। এসব কথা এখানকার সবাই জানে। সে ভিমরুলের চাক এতদিন থাকার কথা নয়। বটগাছটা পড়ে আছে। সামনেই সাহেবপুরের মাঠ।

হেরিকেনটা লেজের মত ঝুলিয়ে দিয়ে হাঁটতে হচ্ছিল। কাদায় মাটি ওগলানো জায়গা দেখলেই হাজরা দাঁড়িয়ে পড়ে। মাটির চেহারা সারাদিনের মত হলে বুঝতে হবে— এসব মনি কেঁচোর কান্ড। মাছের টোপে এই কেঁচো কেটে কেটে বড়শিতে গেঁথে দিতে পারলেই মৃগেল ধরা দেবেই।

আউলিয়াপুরের মোড়লদের বড়দিঘির বকচরে অনেক কলাগাছ। বেশি রাতে জ্যোৎস্না বেরিয়েছে ফুটফুটে। সঙ্গে দক্ষিণে বাতাস। সে-বাতাসে কলাপাতার বেশির ভাগই ছিঁড়ে ফালি ফালি হয়ে যাচ্ছিল। বাঁধানো ঘাট। তাতে তিজেল হাঁড়ি গোটা দুই ডোবানো। অনন্ত মোড়লের সংসার বিরাট। দু'পক্ষের হিসেব ধরলে কম করেও জনা ত্রিবিশেক লোক। কলাগাছের শুকনো বাসনা সরিয়ে হেরিকেন নামালো। গর্তের চেহারাটা চেনা চেনা। এরকম জায়গাতেই ব্যাঙ থাকে। ভাগ্য ভাল হলে একসঙ্গে দু-তিনটেও বেরিয়ে পড়ে। কাঁধের ছিপটা নামিয়ে কোমরের ব্যাগ থেকে একটা বড় সাইজের আরশোলা তুলে নিয়ে গেঁথে ফেলল। তারপর ঠিক আন্দাজ মত গর্তের মুখে ছেড়ে দিতেই জখম আরশোলাটা গর্ত পেয়ে পাতালের ভেতর নেমে গেল। সময়টা বড় সুন্দর। এমন মিহি বাতাস। এমন খুনখুনে জ্যোৎস্না। শুধু মোড়লদের কুকুরটা যা-কিছু চেঁচাচ্ছে। আরশোলাটা এখন অনেকক্ষণ ধরে মাটির ভেতরের অন্ধকার গর্তে মাথা খুঁড়বে। তারপর একসময় এ-গলি সে-গলি করে আসল গর্তে গিয়ে পড়বে। সেখানে ছানাপোনা নিয়ে ব্যাঙের সংসার।

বাইরে মাটির ওপরে মোড়লদের গোয়ালঘরে জ্যোৎস্না এসে পড়েছে। মাঝে মাঝেই দড়িবাঁধা গরু কান লটপট করে মশা তাড়াচ্ছিল। উত্তর দিকে ঢেঁকিঘর। তার পাশেই ধানের গোলা। গোলার মাথায় টিনের পারি এক পা শূন্যে তুলে উত্তরে উড়ে চলেছে। কাল কোন ব্রত ছিল বাড়ির মেয়েদের। উঠোনের কোণে মাটির ঘট, তাতে জল, জলে টগরফুল ডোবানো। উঠোনের মাটি খুবলে দুধ ঢালা হয়েছিল বোধহয়। এ-বাড়ির কোন আইবুড়ো মেয়ে আছে নিশ্চয়। অনন্ত মোড়লের প্রথমপক্ষের বউ নাতনি নয়ত? হাজরা মনে মনে একটা অঙ্ক কষে দেখল। হ্যাঁ। এতদিনে বিয়ের যুগ্যি হয়েছে। হাজরা তাকে একসময় খুকিটি দেখেছে।

এখান থেকে বাদার ভেতর দিয়ে সোজা হেঁটে গিয়ে পিচ রাস্তায় পড়লে দশঘরা গ্রাম। এপথে সোজা গেলে একঘর ব্রাহ্মণ তিনঘর কায়স্থ, যোলঘর মোড়লের বসতবাড়ি পড়বে। এর ভেতর অনন্ত মোড়লের কলাবাগানই সবচেয়ে পর্যাপ্ত। অনন্তর

মত ভাল চাষীও এদিকটায় কম। গোড়ায় অনন্তর জমি জায়গা হালবলদ কিছুই ছিল না। এখন আস্তে আস্তে তার সংসারটা ষোলকলায় ফুলে ফেঁপে উঠেছে।

আরশোলাটা অনেকক্ষণ পাতালে গেছে। এখনো ওপরে ওঠার নাম নেই।

মাটির দেওয়ালের গায়ে হাল জোয়াল হাতমই ঠেসান দিয়ে দাঁড় করানো। মোটা মোটা বাবলা গাছ কেটে নিয়ে হালে কাঠ তৈরি করেছে অনন্ত। এখানকার কামারশালায় তৈরি বড় একখানা ফলা—হাজরা দেখল— অনন্ত মোড়ল খুলে রেখেছে। আগে তো চোখে পড়েনি। হয়ত গরু জখম হচ্ছে ফলার দোষে—তাই খুলেছে অনন্ত—কামারশালায় পাঠাবে।

যদি ভাই দুটো তার কথা শুনতো— তাহলে দাঁতে কামড় দিয়ে একবার চাষ দেখাত হাজরা। তার সংসারও ফুলে ফেঁপে উঠতে পারত। এই বেশ ভাল। বেঁচে থাক ব্যাঙ। রোদে বেরোতে হয় না। রাতে ঠান্ডায় ঠান্ডায় কাজ। ভাত খেয়ে সারাদিন গড়াও। এ হল গিয়ে ব্যবসা। নিজের মালিক নিজে।

এই সময়টা তার বড় ভাল লাগে। এখন সে কত দেশ দেখতে পায়। এক একদিন কত দূর দূর চলে যায় ব্যাঙের খোঁজে। একবার ব্রহ্মডাঙায় গিয়ে চোর বলে ধরা পড়ছিল। ভাগ্য ভাল সে-গাঁয়ে হারান রায়ের বড় খুকির বিয়ে হয়েছিল। সে বেরিয়ে এসে হাজরাকে দেখিয়ে বলেছিল, আমার বাপের বাড়ির দেশের লোক। মেরোনা বলছি—

এখন তার মন বলে সব দেশে এমন চেনা জানা মানুষ আছে তার। এই পৃথিবীটাই তো তার চেনা হয়ে গেল এই ক'মাসে। বড় বড় মাঠের ভেতর দিয়ে নিশুতি রাতে ব্যাঙের লোভে লোভে ঘুরতে গিয়ে কত জিনিস যে সে দেখছে। দিনের বেলায় যেসব জিনিস খুব জরুরি মনে হবে- রাতের বেলায় তা কেমন অর্থহীন হয়ে পড়ে। এক একজন নিজের জমির আল দিয়েছে। তাতে ঢোল কলমির ডাল বসানো। মাথার ওপর চাঁদ, তারা চোখ মেলে সব দেখে যাচ্ছে। সেখানে দখল রাখা এই আলচিহ্ন কিংবা ঢোল কলমি বসিয়ে নিরিখ ঠিক রাখার চেষ্টা নেহাৎ খোকাপনা। রাতে না ঘুরলে এসব কোনদিন সে টের পেত না।

আজ অনন্তর বাড়ি খুব খাওয়া-দাওয়া হয়েছে। জোৎস্নার ভেতর বসে একজোড়া ধাড়ি বিড়াল কুচুর কুচুর করে এঁটোকাঁটা খেয়েই চলেছে। বঁড়শিতে টান পড়তেই হাজরা সাবধান হয়ে গেল। গেঁথে গেলে ব্যাঙ ঠিক ওপরে উঠে আসবে। এতো তাই। আস্তে ছিপসুদ্ধ উঁচু করে ব্যাঙটাকে শূন্যে তুলল। প্রায় হাফ কেজি হবে। তারপর আলগোছে বঁড়শি ছাড়িয়ে ব্যাঙটাকে চিৎ করে রেখে দিল। কালচে চামড়ার ওপর আধো অন্ধকারে মুখের কাছে আরও কালো রং বেরিয়ে এসে লেগে গেল।

আবে-ব্বাস! আরও একটা বড় ব্যাঙ তড়াক করে গর্ত থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এল। এ কি ভাগ্য! কাল বন্দিপুর স্টেশনের লেভেল ক্রসিং-এ সবাই দেখতে পাবে—দুলে দুলে একটা লোক পুবের রেললাইন ধরে এগিয়ে আসছে। গালে

দাড়ি। কাঁধে ছিপ। ডান হাতে দা। কোমরে কলসি— পলিথিনের ব্যাগ। বাঁ হাতে নেভানো হ্যারিকেন। মুখ দেখলেই বোঝা যাবে-- এ দিনের বেলার লোক নয়। চোখের নিচে কালি। মুখ ভর্তি হাসি। এখন হাজরা রেলের পথটি ধরে দুলে দুলে চলে আসবে বন্দিপুর বাজারে। পঞ্চাননের ব্যাঙ আড়তে। সেখানে সোনা ও কোলা ব্যাঙ—উভয় প্রকারই ক্রয় করা হয়। খোড়া তার সাইনবোর্ডে সব লিখে দিয়েছে। সন্ধে হলে তাতে ভুম জ্বলে। নেভে। জ্বলে—

টপ করে চিৎ করানো তখন ব্যাঙটা কলসিতে পুরে নারকেল মালা চাপা দিল হাজরা। কিন্তু আরেকটা গেল কোনদিকে। মেটে জ্যোৎস্নার ভেতর দিয়ে একফালি অন্ধকার লাফাতে লাফাতে গোয়ালের কোণে চলে গেল। কলসির ভেতরেরগুলো ছোট ছোট লম্ফ দিয়ে নারকেল মালা খুলে ফেলতে চাইছে। ভেতরে বাতাস নেই। হাজরা জানে খানিক পরেই ওরা আপনা আপনি ঝিমিয়ে পড়বে।

হাজরা হ্যারিকেন উসকে দেখতেই গেল। আরেকটু হলেই ধরে ফেলত। ব্যাঙটা দূরে গিয়ে বসেছে। ওইটুকু মাথায় কত কী বুদ্ধি ধরে। ধরতে ধরতে পারল না। আবার লম্ফকে গেল। [illegible] ইঁদুর [illegible] তাও দাঁড়িয়েছে-- অমনি গোয়ালের মোটা [illegible] থেকে একটা কালো বিদ্যুৎ বেঁকে মাথাটা উঁচু করে দাঁড়াল।

হ্যারিকেন পড়ে যাচ্ছিল। সেই অবস্থাতেই উঠে দাঁড়াল।

মাথায় [illegible] লাল কেরোসিনের আলো। সব পরিষ্কার দেখা যায় না। সারা [illegible] ফণা তুলে [illegible]। হাজরা নড়লেই ফোঁস করে মাথা নামাবে। নামিয়ে [illegible] অন্য কথা নেই। হাসা কেউটে। বেশ বয়স হয়েছে বুড়োর। উনি যে এখানে, তা তো হাজরার জানার কথা নয়। মাথাটা দুলছে। সারা পৃথিবী নিস্তব্ধ।

শুধু তার ভেতর— খুব খাপ খাপ আওয়াজ হচ্ছিল। হঠাৎ উঠে দাঁড়াতে গিয়ে নারকেল মালা পড়ে গিয়েছে। সেই সুযোগে এক একটা ব্যাঙ কলসির ভেতর দিয়ে লম্ফ দিচ্ছে। খোলা বাতাস পেয়ে জোর হয়েছে গায়ে। কলসি থেকে এক লাফে উঠোনের মাটিতে। তার পরেই খপ খাপ। সেই তখন ব্যাঙটাই বেরুতে পারেনি। একবার লাফিয়ে পড়ে। উঠেছিল। হাজরার বুকে লেগেই আবার কলসির ভেতরেই পড়ে গেল। গায়ে লাগতেই হাজরার বুকখানা ঠান্ডা হয়ে গেল। ব্যাঙটার মুখটা বড্ড ভিজে।

সাপের মুখ গায়ে লাগলে আরও ঠান্ডা লাগে নিশ্চয়। কিছু করার নেই তার এখন। হ্যারিকেন জ্বালাতে পারছিল না। কিছুই আশ্চর্য নয়। হয়তো আলোটাই দেখছে মন দিয়ে। নইলে সাত আটটা ব্যাঙ লাফিয়ে বেরিয়ে গেল- একটার পেছনেও ছুটলো না কেন।

বাবা পঞ্চানন। আমি মিস্ত্রিপাড়ার হাজরা নস্কর। জলিলগাড়ার ভাগচাষী। রেলস্টেশন বন্দিপুর। তোমার নামে মাসভোর গান দেব। কাঙালী খাওয়াব। এবার

আমাকে বাঁচাও।

সাপটা একটুক্ষণ মাথা নামিয়ে আবার তুলে ধরল। এখনো রাত ভোর হতে অনেকক্ষণ দেরি। না হলে একজন এগিয়ে আসত। কাছাকাছি গোয়ালের সামনেই কালো গাইটা সব বুঝতে পেরেছে। কান খাড়া করে একবার বড় চোখ দিয়ে হাজরার দিকে তাকালো। হাজরাও তাকালো। কিছু করার উপায় নেই। বাতাস বন্ধ। উঠোনের গা দিয়ে সিমের লতা গোয়ালের ছাদ বেয়ে উঠতে গিয়ে থেমেছিল। ডগাগুলো তখনো একটু একটু কাঁপছে। অন্য গরুবাছুর কিছু বুঝতে পারেনি। কেউ কেউ শুয়েছিল। গোবর মাখামাখি অবস্থায় একটা বড় গরু চার পায়ে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল। গেরস্থর রাখাল কোথায়? সেও কি কালঘুম ঘুমোচ্ছে? এখনই গোবর কাড়ানো দরকার।

হেরিকেনের আলোটুকুর ভেতর হাজরার জন্যে পৃথিবী থমকে পড়ে থাকল। সেখানে খড়ম আঁকা একটা ছোট্ট ফণা সিধে হয়ে দাঁড়ানো। তার এক হাতের ভেতর হাজরার ডান পা। আঙুলগুলো ভোঁতা। এই ঠাণ্ডা ফুরফুরে হাওয়ার ভেতরেও হাজরা টের পেল— তার ডান পায়ের লোমের ভেতর দিয়ে ঘামের ফোঁটা নিচে নেমে যাওয়ার পথ খুঁজছে। হাঁটু থেকে পায়ের পাতা অবধি চুলবুল করে উঠল। তার পা এখন আর পা নেই। এবার বাঁচলে সে ঝিনুক দিয়ে পা চুলকে রক্ত তুলে ফেলবে। সে যে কি আরাম। সামনের কালো গাইটাও মশার কামড় খাচ্ছিল। কিন্তু তাই বলে লেজ একটুও নাড়াচ্ছে না। দু'খানা কানই খাড়া করে রেখেছে। তার পেছনের পায়ের দেড় হাতের ভেতর সাপটা। অত বড় মাথাসুদ্ধ ঘাড় ঘুরিয়ে সব দেখতে হচ্ছে বলে ঘাড়ে ব্যথা হয়ে গেল গরুটার। ডান চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এল।

হাজরা সব দেখেও যেমন ছিল তেমন থাকল। গরুর গা থেকে এক ঝাঁক মশা উড়ে এসে তার খোলা পিঠ পেয়ে বসে গেল। হাত পেছনে পাঠাবার উপায় নেই। গোয়ালের গায়েই হাঁসের ঘর। তারা ধবধবে জ্যোৎস্না দেখে দিন বুঝি শুরু হল ভেবেছে। তাই একবারে একসঙ্গে চাপা গলায় ঘরের ভেতর নড়াচড়া করছিল। হাঁসগুলোর জন্যে ভয় ধরে গেল হাজরার। বড় বোকা জীব। একবার তার নিজের হাঁসঘরে এমন সাপ ঢুকেছিল। ছোবলায়নি। কিছু করেনি। তবু একটা ধাড়ি হাঁস ভয়ে মরে যায়। না জানি এবার তার নিজের কি হয়?

হেরিকেনের প্রায় নিচে এসে খড়ম আঁকা মাথাটা নামালো— তারপর সাপটা নিজে গলার নিচেটা ঘাসের সঙ্গে, গোয়ালের মাটিতে সামান্য ঘষে আবার ফণা তুলে দাঁড়ালো। এবার সাদা শরীরটা আগাগোড়া দেখা গেল। কাছেই কোথাও বাসা বেঁধেছে।

হপ্তা দুই আগে হাজরা নিজে ব্যাঙের গর্ত থেকে একটা সাপ গেঁথে তুলেছিল। আসলে সেটা সাপেরই গর্ত ছিল। গোড়ায় বুঝতে পারেনি। সে এখন হলফ করে বলতে পারে— সাপটাকে সে মারতে চায়নি। কিন্তু জ্যান্ত অবস্থায় বঁড়শি কে খুলবে?

নগদ দশ পয়সা দামের বঁড়শিও ফেলে দেওয়া যায় না। সাপটাকে মেরে তবে বঁড়শি বাঁচায়। সেই সাপেই কি কাজ তার এই দশা।

আরও কাছে এসে দাঁড়াতে হাজরার সর্বাঙ্গ থেমে গেল। ডান পা-খানা থরথর করে কাঁপছিল। অবুঝ হাসগুলো কোক কোক করছে। পেছনে আটুলিয়াপুরের মাঠ। সামনে সাহেবপুর। শেষকালে তার ভাগ্যে এই ছিল! জখম ব্যাঙটা এবারও লাফ দিয়ে হাজরার বুকে গুঁতো খেয়ে সেই কলসির ভেতরেই পড়ে গেল। তার সারা শরীর ঘেমে ছিল। চোখের পলক ফেলতে পারছে না। তারই শরীরে একটা বার্ভতি টুকরোর মত কোমরে ঝোলানো কলসির ভেতর ব্যাঙটাই শুধু লাফাচ্ছে। কিন্তু থামানোর উপায় নেই।

হাজরার চোখের সামনে মাস্তরপাড়ার উঠোন ভেসে উঠল। রান্নাঘরের পাশেই হেঁচতলায় একটা কুমড়ো গাছ লাতিয়ে উঠছে। একখানা কঞ্চি বসিয়ে দেওয়া দরকার। ঘরে গোলপাতাও আজ ক'বছর পাল্টানো হয়নি। বউ যা অসাবধানী। শেষে ভাগের এক বস্তা ধান চোরে না খায়

এখন তার আর ছোবল খেতে কোন আপত্তি নেই। মশার ঝাঁক পিঠ খুবলে গেল। ডান পায়ের কাঁপুনি থামেনি। সেখানে লোমের ভেতর সারি সারি ঘামের ফোঁটা নেমে পড়ে জায়গাটা ভিজিয়ে ফেলেছে। ছোবল খেয়ে সবচেয়ে আগে সে মাটিতে বসে পড়ে দু'হাতে মনের সুখে পা-খানা চুলকোবে। কেননা এখন তো সে জানে পর পর কি হবে। সাপে কাটা মানুষের বড় ঘুম পায়। সবচেয়ে আগে নাক বসে গিয়ে গলার আওয়াজ খোনা হয়ে যাবে। আহা বড় আপসোস! সারা রাত ধরে দুটো তালগাছে কলসি বোঝাই হয়ে তাড়ি জমেছে। খাবার লোক সে-ই থাকবে না। দুনিয়ায় এত রস। কচুর শাক। ওলের ডালনা। খেজুর তাড়ির সঙ্গে চিতি কাকড় পুড়িয়ে খেতে কি যে লাগে! ওরেই নাম স্বর্গ। পাতলা করে কচু কেটে নিয়ে পো এ পোড়া করে ভাজলে দিব্যি বিস্কুট হয়ে যায়। আর বাঁশের কোঁড়ের ডালনা। তার তুলনা হয় না। এখনো যদি ছোবল না দেয়— হাজরা তাহলে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাবে।

খুঁট আর আগল খুলে কে বেরিয়ে এল। কে ওখানে?

অনন্ত মোড়ল! চোখ তুলেই হাজরা গলা শুনে বুঝলো আমি।

গেরস্থকে সঙ্গে পেয়ে কুকুরটাও বেদম চেঁচিয়ে কাছাকাছি ছুটে এল। তাতে শোনা একটুও নড়ল না। একেবারে সামনে থেকে সব দেখে মাঝের থেকে কুকুরের গলার পর্দা নেমে গেল। শ্রেফ কুইকুই আওয়াজ বেরতে লাগল তখন।

আমি কে? সাড়া দিচ্ছ না কেন? চলতে চলতে অনন্ত মোড়ল লাঙলের খোলা ফলাটা তুলে নিল হাতে। হাজরা পাশ থেকে সব দেখেও নড়ল না। শুধু বুঝল এখুনি তাকে লক্ষ্য করে ছুড়ে মারবে। কিন্তু নড়বার উপায় নেই তার। সামনের কালো গাইটার চোখে, পেছনের পা দু'খানা ফাঁক করে লেজ তুলে দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে

মূর্তিমান বিপদ হাজরার সামনে একেবারে বুক খুলে দাঁড়াল।

খুব চাপা গলায় বলল, ছুড়বেন না মোড়লমশাই—

হাত তুলেছিল অনন্ত। আদর করব।

আমার বড় বিপদ—

রাতেভিতে গরু চুরি করতে বেরোলেই বিপদ হয়। গোয়াল থেকে গরু হাপিস করলে ক'টা— ?

আপনি এসে দেখে যান। আমি গোয়ালে ঢুকিনি। আমি রায়পুর মিস্ত্রিপাড়ার। ঈশ্বর খগেন নস্করের ব্যাটা। আমার বড় বিপদ—

চালাকি ছাড়। এদিকে এসো— পালাবার চেষ্টা করলেই ছুড়বো।

যাবার উপায় নেই। দু'দিকে চোখ রাখতে গিয়ে হাজরার দুই ভ্রূ'র মাঝখানে টন টন করে উঠলো। আমার সামনে কি দেখুন—

অনন্তর বয়স হয়েছে। লোকচরিত্র তার অজানা নয়। ধরা পড়লে চোর জোচ্চর পালাবার জন্যে অনেক রকম ফন্দি বের করে। কাছে গেলে কি কিছু ছুড়েও মারতে পারে। সাবধানী অনন্ত বলল, এই শেষবার— এদিকে তাকাও বলছি—

উপায় নেই। কেউটে ফণা তুলে দাঁড়ানো।

শব্দ, কুকুরের ডাকে অনন্তর বড় ব্যাটা উঠে এসেছিল। টর্চ ফেলেই ছোকরা চেঁচিয়ে উঠল, আরে বাবা !

কড়া আলোয় ফণা নামিয়ে নিল। তারপর কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে গোয়ালের পেছনের নালায় এঁকে বেঁকে নেমে পড়ল।

বাপ ব্যাটা এগিয়ে আসছেন। হাজরা বুঝলো এখুনি তার হাত থেকে হেরিকেনটা খসে পড়বে। কিংবা তার আগেই সে নিজেই জ্ঞান হারাবে। তাই তাড়াতাড়ি কলসির ভেতরে হাত গলিয়ে দিল। আঙুল ভিজে যাচ্ছিল। ছোট জিনিসটা খপ করে ধরেই গায়ে যত জোর ছিল সবটুকু একত্র করে বাদায় ছুড়ে দিল।

মানুষ

প্রফুল্ল রায়

ঠিক দুপুরবেলা শেরমুণ্ডি পাহাড়ের কাছাকাছি আসতেই হুড়মুড় করে বৃষ্টিটা নেমে গেল।

সেই ভোরে— আকাশ তখনও ঝাপসা, রোদ ওঠেনি,—বাঁশের লাঠির ডগায় রং-বেরঙের তালিমারা ঝুলিটা বেঁধে এবং ঝুলিসুদ্ধ লাঠিটা কাঁধে ফেলে বেরিয়ে পড়েছিল ভরোসালাল। সে আসছে রাজপুত ঠাকুর রঘুনাথ সিং-এর তালুক হেকমপুর থেকে ; আপাতত যাবে শেরমুণ্ডি পাহাড়ের ওপারে টাউন ভকিলগঞ্জে।

ভোরে ভরোসালাল যখন হেকমপুর থেকে বেরোয় তখন আকাশের চেহারা দেখে টের পাওয়া যায়নি দুপুরের মধ্যেই চারদিক ভেঙেচুরে এভাবে বৃষ্টি নেমে যাবে। খুব নিরীহ চেহারার দু-চার টুকরো ভবঘুরে মেঘ মাথার ওপর বাতাসের ধাক্কায় ধাক্কায় এদিক-সেদিক ভেসে বেড়াচ্ছিল। তারপর বেলা একটু বাড়লে চাঁদির থালার মতো সূর্যটা আকাশের গড়ানে গা বেয়ে বেয়ে উঠে এসেছিল। গলানো রুপোর মতো ঝকঝকে রোদে মাঠঘাট বন-জঙ্গল ভেসে যাচ্ছিল তখন। কিন্তু এই রোদ আর কতক্ষণ। বেলা আরেকটু চড়বার সঙ্গে সঙ্গে এক ফুঁয়ে বাতি নিভে যাবার মতো আচমকা চারদিকে অন্ধকার নেমে এসেছিল। মকাইয়ের খেত, যবের খেত, আখের খেত, নানারকম ঝোপঝাড় আর হাতচ্ছাড়া চেহারার দু-একটা গ্রাম পেরিয়ে আসতে আসতে ভরোসালালের অজান্তে কখন যে ভারী ভারী চাংড়া চাংড়া জলবাহী মেঘে আকাশ ছেয়ে গিয়েছিল টের পাওয়া যায়নি। ভরোসালাল চমকে উঠেছিল মেঘের ডাকে ; সেই সঙ্গে তার চোখে পড়েছিল আকাশটা আড়াআড়ি চিরে বিদ্যুৎ ছুটে যাচ্ছে।

মাথার ওপর মেঘ আর বিদ্যুৎ চমক নিয়ে জোরে জোরে পা চালিয়ে দিয়েছিল ভরোসালাল। আজ যেমন করেই হোক তাকে শেরমুণ্ডি পাহাড়ের ওপারে ভকিলগঞ্জে পৌঁছতেই হবে।

হাঁটতে হাঁটতে ঘাড় ফিরিয়ে বার বার পেছনদিকটা দেখে নিচ্ছিল ভরোসালাল। হঠাৎ একসময় অনেক অনেক দূরে আকাশ যেখানে পিঠ বাঁকিয়ে দিগন্তে নেমেছে সেখানটায় বৃষ্টি নেমে গিয়েছিল। জল নামতে দেখে দৌড়াতেই শুরু করেছিল ভরোসালাল। কিন্তু বৃষ্টিটা নাছোড়বান্দা হয়ে তার পিছু নিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত শেরমুণ্ড পাহাড়ের তলায় এসে তাকে ধরেই ফেলেছে।

বেশ কোমর বেঁধেই নেমেছে বৃষ্টিটা; তার সঙ্গে হাত মিলিয়েছে উল্টোপাল্টা ঝড়ো হাওয়া। এই ঝড়বৃষ্টি ঘাড়ে নিয়ে সামনে খাড়া পাহাড়ে যাওয়া সম্ভব না। ভরোসালাল এদিক-সেদিক তাকাতে লাগল। আপাতত মাথা বাঁচবার জন্যে কোথাও একটু দাঁড়ানো দরকার। হঠাৎ সে দেখতে পেল খানিকটা দূরে একটা ঝাঁকড়ামাথা পিপুলগাছের তলায় দশ-বারোটা দেহাতী লোক দাঁড়িয়ে আছে, তাদের মধ্যে একটা মেয়েও রয়েছে।

বোঝা যাচ্ছে, বৃষ্টির জন্যই ওরা ওখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। গাছতলায় মাথা গুঁজে জলের ছাঁট থেকে নিজেদের যতটা বাঁচানো যায় ভরোসালাল দৌড়ে সেখানে উঠল।

ভরোসালালের বয়স পঞ্চাশ বাহান্ন। শরীরের কাঠামো দারুণ মজবুত। চওড়া ছড়ানো কাঁধ তার, এবড়ো-খেবড়ো পাথরের মতো প্রকাণ্ড বুক, হাত দুটো জানু ছাড়িয়ে কয়েক আঙুল নেমে গেছে। গায়ের চামড়া পোড়া ঝামার মতো; সাত জন্মে সেখানে তেল পড়ে না। ফলে বারোমাস খসখসে কর্কশ গা থেকে খই উড়তে থাকে। চৌকো মুখে খাপচা খাপচা দাড়ি তার; থ্যাবড়া থুতনি। চেহারা যেমনই হোক, চোখ দুটো কিন্তু আশ্চর্য মায়াবী— যেমন সরল তেমনি নিষ্পাপ।

ভরোসালালের পরনে হাঁটু পর্যন্ত খাটো টেনি আর ফতুয়ার মতো লাল কামিজ। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তার ঘাড়ের কাছে অনেকখানি মাংস শুকিয়ে ডেলা পাকিয়ে প্রায় ঝুলে আছে। বাঘের থাবা খেয়ে ঘাড়টার অবস্থা ওই রকম।

ভরোসালাল একজন 'বীটার'। এ অঞ্চল যাকে জঙ্গল-হাঁকোয়া বলে সে তাই। তার কাজ হল বনে-জঙ্গলে টিন পিটিয়ে আর চেঁচিয়ে তাড়া করে করে বাঘ-ভাল্লুক কিংবা অন্য জন্তুজানোয়ারকে শিকারীদের বন্দুকের মুখে নিয়ে যাওয়া। বছর তিনেক আগে বকসৌলে এক শিকারীর জন্য টিন পেটাতে গিয়ে বাঘের থাবায় ঘাড়ের মাংস ওইভাবে ঝুলে গেছে। 'বীটারের' কাজ ছাড়া আরো একটা কাজ করে থাকে ভরোসালাল। চারদিকে যত ছোট খাটো শহর আছে সেসব জায়গার মিউনিসিপ্যালিটিগুলো মাঝে মাঝে রাস্তার বেওয়ারিশ কুকুর ধরে মেরে ফেলে। এই কুকুর ধরা আর মারার কাজটি করে থাকে সে।

'বীটারের' কাজ কিংবা মারার দায়িত্ব কেউ তাকে ডেকে দ্যায় না। ভরোসালাল নিজেই খোঁজ-খবর নিয়ে শিকারীর বাড়ি বাড়ি কিংবা মিউনিসিপ্যালিটিগুলোর দরজায় দরজায় হানা দেয়। এই তার জীবিকা। খুবই নিষ্ঠুর হয়তো। কিন্তু স্রেফ পেটের জন্য এসব করতে হয় তাকে।

এদিকে বৃষ্টির জোর আরো বেড়েছে। আকাশের যা অবস্থা তাতে জল কখন ধরবে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। ঝাঁকড়া মাথা পিপুলগাছের তলায় দেহাতী মানুষগুলোর সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেষি করে দাঁড়িয়েও কি রেহাই আছে। ডালপালা আর পাতার ফাঁক দিয়ে ঝরঝর জল পড়ে গা মাথা ভিজিয়ে দিচ্ছে। তবে খোলা জায়গায় দাঁড়ালে চোখের পলকে চান হয়ে যাবে। সেই তুলনায় এখানে ভেজাটা কম হচ্ছে, এই আর কি।

অন্যমনস্কর মতো তাকিয়ে তাকিয়ে বৃষ্টির ভাবগতিক দেখছিল ভরোসালাল। হঠাৎ পাশের লোকটা বলে উঠল 'বহোত ভারী বারিষ (বৃষ্টি)!'

ভরোসালাল ঘাড় ফেরাল। দেখল লোকটা মধ্যবয়সী মাথায় পাগড়ি, ভাঙাচোরা চেহারা। সে বলল 'হাঁ—'

লোকটা এবার বলল, 'মালুম হচ্ছে এ বারিষ জলদি রুখবে না।' তার ভাষা হিন্দি এবং বাংলায় মেশানো। খুব সম্ভব বিহার-বাংলার সীমান্তে কোন অঞ্চলে তার বাড়ি।

ভরোসালাল বলল, 'হাঁ—'

মধ্যবয়সী লোকটা এবার তার সঙ্গীদের দেখিয়ে বলল, 'দুফারে(দুপুরে) হামলোগকো টাউন ভকিলগঞ্জে যাবাব বাত ছিল। লেকিন কি করে যাই?'

বোঝা যাচ্ছে এরাও শেরমুণ্ডি পাহাড় পেরিয়ে ওপারে যাবে। ভরোসালাল কৌতূহলহীন চোখে লোকটার সঙ্গীগুলোকে একবার দেখে নিল। তারা অবশ্য এই লোকটার মতো মাঝবয়সী নয়। দামড়া মোষের মতো তারা এক একটা তাগড়া জোয়ান। তাদের দেখতে দেখতে সেই মেয়েটার দিকে নজর পড়ে গেল ভরোসালালের। দলটার মধ্যে সে একা— একমাত্র মেয়ে।

জীবন বা মানুষ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা খুবই কম ভরোসালালেব। জোয়ান বয়সের শুরু থেকে বনের হিংস্র জন্তুজানোয়ার আর খ্যাপা কুকুরের পেছনে ছুটে ছুটে এতগুলো বছর কেটে গেছে। তবু সে বুঝতে পারাল মেয়েটা গর্ভিনী। দু-চার দিনের মধ্যে তার বাচ্চাটাচ্চা হবে।

পাশের লোকটা প্রচণ্ড বক বক করতে পারে। এবার সে যা বলল, সংক্ষেপে এই রকম— বৃষ্টিতে ভিজে পাহাড়ি রাস্তার হাল খুবই বুরা (খারাপ) হয়ে গেছে। এখন সেখানে উঠতে যাওয়া বোকামি, পা পিছলে পড়ে গেলে আর দেখতে হবে না— নির্ঘাত খতম হয়ে যেতে হবে।

মেয়েটির দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে ভরোসালাল বলল, 'হাঁ—'

লোকটা এবার বলল, 'লেকিন দুফারের ভেতর ভকিলগঞ্জে হাজির হতে না পারলে কামটা ছুট যেতে পারে।' তাকে খুবই চিন্তিত দেখাল।

'কিসের কাম?'

'ভকিলগঞ্জে নদীর কিনারে বাঁধ বানানো হবে। আমরা মাটি কাটার কামে যাচ্ছি।

দেরি হয়ে গেলে গরমিন অফসর (গভর্ণমেণ্ট অফিসার) যদি ভাগিয়ে দ্যায়—'

'রামজী কিরপা করলে ভাগাবে না।" বলতে বলতে আবার মেয়েটির দিকে তাকাল ভরোসালাল। পৃথিবীর কোন কিছু সম্বন্ধেই বিশেষ কৌতূহল নেই তাব। নিজের পেটের জন্য বনে-জঙ্গলে বা লোকালয়ে সর্বক্ষণ তাকে এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে অন্যদিকে চোখ তুলে তাকাবার সময় পর্যন্ত পায় না। যদিও বা পায় খুবই আগ্রহশূন্যভাবে এই পৃথিবী আর পৃথিবীর মানুষকে দেখে থাকে সে। তবু আবছাভাবে ভরোসালাল ভাবল কি ওই মেয়েটির পেটে ন-দশ মাসের বাচ্চা রয়েছে। এ অবস্থায় সেও কি মাটি কাটতে চলেছে! জেনানাদের এ সময়টা কোন ভারী কাজ করা ঠিক নয়। ভাবল বটে, তবে কিছু বলল না।

সেই লোকটা ঘাড়ের পাশ থেকে বলে উঠল, 'রামজী কি কিরপা করবে ?'

ভরোসালাল এবাব আর উত্তর দিল না। অন্যমনস্কের মতো মুখ ফিরিয়ে মেঘের ভারে নেমে আসা ঝাপসা আকাশ দেখতে লাগল।

কিন্তু উত্তর না দিলে কী হবে, পাশের লোকটা ঘ্যানঘেনে বৃষ্টির মতো সামনে বকে যেতে লাগল।

কতক্ষণ পিপুলগাছটার তলায় দাঁড়িয়েছিল, খেয়াল নেই ভরোসালালের। হঠাৎ একসময় বৃষ্টির তোড় কমে এল ; সেই সঙ্গে ঝড়ের দাপটও। তবে আকাশ ভারী হয়ে আছে। যে কোন মুহূর্তে প্রবল বেগে আবার শুরু হয়ে যেতে পারে।

সেই লোকটা কানের পাশ থেকে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'বারিষ ধরে এসেছে, এই মওকায় পাহাড় পেরুতে হবে।' বলেই সঙ্গীদের উদ্দেশে জোরে জোরে হাঁকল, 'অ্যাই ছোকরারা— চল [illegible], জোরসে পা চালা—' সবাইকে তাড়িকে নিয়ে সে পাহাড়ের দিকে চলল।

দলটা আগে আগে চলেছে। তাদের পেছনে রয়েছে সেই মেয়েটা। ভরোসালাল এই সুযোগটা ছাড়ল না। মেয়েটার পেছন পেছন সেও চলতে লাগল। বৃষ্টির জোর নতুন করে বাড়বার আগেই সেও শেরমুণ্ডি পাহাড় পেরিয়ে যেতে চায়।

দিনকয়েক আগে ঠাকুর রঘুনাথ সিং শিকারে যাবে— এই খবরটা পেয়ে হেকমপুর তালুকে ছুটে গিয়েছিল ভরোসালাল। পুরো চারটে দিন রঘুনাথ সিং-এর সঙ্গে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে টিন পিটিয়ে মোট দশটা টাকা আর তিন কিলো মাইলো মজুরি হিসেবে পেয়েছে। সেই টাকাটা তার কোমরে গোঁজা রয়েছে, আর মাইলোগুলো আছে চিত্রবিচিত্র ঝুলিটায়।

হেকমপুরে থাকতে থাকতেই সে খবর পেয়েছিল পূর্ণিয়া টাউনে দু-চার দিনের মধ্যে খ্যাপা কুকুর মারা হবে। তাই রঘুনাথ সিংয়ের শিকার শেষ হতে না হতেই সে বেরিয়ে পড়েছে। শেরমুণ্ডি পাহাড় ডিঙ্গিয়ে ওপারে টাউন ভকিলগঞ্জে আজকের রাতটা কাটাবে ভরোসালাল। তারপর কাল সকালে উঠে চলে যাবে সগরিগলি ঘাটে ; সেখানে নদী পেরিয়ে পূর্ণিয়া টাউনের দিকে হাঁটা শুরু করবে।

যাই হোক এই শেরমুণ্ডি পাহাড়টা ভয়ানক রকমের খাড়া। তার সারা গায়ে ঘন অরণ্য। শাল আর মহুয়ার গাছই এখানে বেশি করে চোখে পড়ে। অবশ্য আমলকি, দেবদারু, কেঁদ আর ট্যারা বাঁকা চেহারার অগুনতি সিসম গাছও চারদিক ছড়িয়ে রয়েছে। এছাড়া আছে নানা ধরনের ঝোপঝাড়, সাবুই ঘাস এবং আগাছার জঙ্গল।

জঙ্গলের ভেতর দিয়ে আঁকাবাঁকা পায়ে চলার রাস্তা উঠে গেছে। সেই রাস্তা এই মুহূর্তে অত্যন্ত বিপজ্জনক। কেননা যদিও এটা একটা পাহাড় তবু হাজার হাজার বছরের ঝড়বৃষ্টিতে পাথর ক্ষয়ে ক্ষয়ে এর গায়ের ওপর চামড়ার মতো মাটির একটা স্তর জমেছে। বৃষ্টিতে সেই মাটি গলা মাংসের মতো থকথকে হয়ে আছে।

খুব সাবধানে পা ফেলে ওরা পাহাড় বাইছিল। বৃষ্টির জোর কমে এলেও অল্প অল্প পড়েই যাচ্ছে। হাওয়ার দাপটও আগের মতো নেই। দু'ধারের ঝোপঝাড় থেকে ঝিঁঝিঁদের একটানা চিৎকার উঠে আসছিল। গাছের মাথায় সরু মোটা— নানা বিচিত্র সুরে পাখিটা একটানা ডেকে যাচ্ছে। কোথায় যেন সাপেদের পেট টেনে টেনে চলার শব্দ হচ্ছে।

সেই মধ্যবয়সী লোকটা মাঝে মাঝেই তার সঙ্গীদের উদ্দেশে হেঁকে উঠছিল, 'জলদি পা চালা। হো রামজী দুফার পার হয়ে গেল।'

চারদিকের নানারকম শব্দ বা মধ্যবয়সী লোকটার হাঁকাহাঁকি শুনেও যেন শুনতে পাচ্ছিল না ভারোসালাল। দূর-মনস্কের মতো খাড়াই পাহাড় ভাঙছিল সে। নেহাত বৃষ্টিটা হঠাৎ এসে গেছে। নইলে তাড়াহুড়ো করে ওপারে যাবার খুব একটা দরকার তার নেই। কারণ আজকের দিনটা তার বিশ্রাম। টাউন ভকিলগঞ্জে একবার পৌঁছুতে পারলে ধীরেসুস্থে হাত-পা ছড়িয়ে দিনের বাকি অংশটা সে কাটিয়ে দেবে। তারপর কাল থেকে আবার নতুন কাজের ধান্দা শুরু হবে। কিন্তু কালকের কথা কাল।

খানিকক্ষণ পাহাড় বাওয়ার পর হঠাৎ কাতর গোঙানির মতো একটা আওয়াজ কানে আসতে থমকে উঠল ভরোসালাল। সামনের দিকে তাকাতেই দেখতে পেল সেই গর্ভিনী মেয়েটা পাহাড়ে ওঠার ক্লান্তিতে ভয়ানক হাঁপাচ্ছে। তার মুখটা খুলে অনেককানি হাঁ হয়ে গেছে। তার ফাঁক দিয়ে থেকে থেকে গোঙানিটা বেরিয়ে আসছিল। হাঁপানির দাপটে মেয়েটার বুক তোলপাড় হয়ে যাচ্ছিল। চোখের তারাদুটো মরা মাছের চোখের মতো; মনে হচ্ছিল সে দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসবে।

প্রায় টলছিল মেয়েটা। তার মধ্যেই হাতখানেক গভীর থকথকে কাদার ভেতর এলোপাথাড়ি পা ফেলতে চেষ্টা করছিল। কিন্তু পারছিল না। সে হয়ত ঘাড় মুখ গুঁজে হুড়মুড় করে পড়েই যাচ্ছে; তার আগে পেছন থেকে হাত বাড়িয়ে তাকে ধরে ফেলল ভরোসালাল। বলল, 'কেয়া তুমহারা তবিয়ত আচ্ছা নেহী?'

খুব নির্জীব গলায় মেয়েটা উত্তর দিল 'নেহী—'

ভরোসালাল কী বলতে যাচ্ছিল; হঠাৎ তার চোখে পড়ল সেই মাঝবয়সী লোকটা দামড়া মোষের মতো জোয়ান ছোকরাগুলোকে নিয়ে ঝোপঝাড় ঠেলে অনেকদূর

এগিয়ে গেছে। সে এবার অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়ল, 'আরে তোমার সাথবালারা (সঙ্গীরা) বহোত দূর চলে গেল যে ?'

মেয়েটা বলল, আমি ওদের সাথে আসিনি।'

ভয়ানক চমকে উঠল ভরোসালাল, মতলব (মানে) ?

'আমি একেলীই এসেছি।'

'হো রামজী, শরীরের এই হাল নিয়ে তুমি একেলীই বেরিয়ে পড়েছ ?

—'কী করব ?'

'কেন, তোমার মরদ কোথায় ?'

মেয়েটা ভরোসালালের প্রকাণ্ড চওড়া বুকের ওপর শরীরের ভার রেখে খানিকটা সামলে নিয়েছিল। এবার সোজা হয়ে হয়ে দাঁড়িয়ে সে বলল, 'সে আসতে পারল না।'

ভরোসালাল জিজ্ঞেস করল, 'কেন ?'

'মহাজনের ক্ষেতিবাড়িতে বেগার দিতে গেছে।'

'বেগার ?'

'হাঁ—' মেয়েটা এবার যা বলল সংক্ষেপে এইরকম— চার সাল আগে তাদের দেহাতের মহাজন বিষুণ আহীরের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নিয়েছিল তার মরদ। টাকাটা আর শোধ করা যায়নি। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা লোকটার ; তার সিন্দুকে সোনাচাঁদি আর জহরতের পাহাড়। আর জমিজমা ক্ষেতিবাড়ির তো লেখাজোখা নেই। তাদের দেহাতে যেখানে যে জমিতে পা দেওয়া যাক না সেটাই বিষুণ আহীরের। এত জমি এত টাকা-পয়সা থাক ন কী হবে, লোকটা আস্ত কসাই। এই মেয়েটার মরদের সামান্য ক'টা টাকা উসুল করার জন্য বিষুণ তাকে বছরের পর বছর বেগার খাটিয়ে চলেছে। বছরে দু'মাস মেয়েটার মরদকে বিষুণ আহীরের ক্ষেতিবাড়িতে বেগার দিতে হয়। সুদে-আসলে বিষুণের টাকাটা ফুলেফেঁপে এমনই হয়ে দাঁড়িয়েছে যাতে দশ বছর বেগার দিলেও নাকি ওটা শোধ হবে না। এইরকম যখন অবস্থা তখন মেয়েটির মরদ তার সঙ্গে আসে কি করে ?

সব শুনে ভরোসালাল এবার জিজ্ঞেস করল, 'তোমার ঘরে মরদ ছাড় আর কোঈ (কেউ) নেই ?

'নেহী।'

'হো রামজী—' বলে একটু চুপ করল ভরোসালাল। পরক্ষণে আবার শুরু করল, 'এবার তুমি চলতে পারবে ?

মেয়েটা বলল, 'পারব।'

'বহোত হুঁশিয়ার হয়ে পা ফেলে চল—'

খুব সাবধানে চটচটে আঠালো কাদার ভেতর পা টেনে টেনে দুজনে এগুতে লাগল।

সেই মধ্যবয়সী লোকটা তার সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে শাল এবং সিসম গাছটাছের ভেতর উধাও হয়ে গেছে। এখন আর তাদের দেখা যাচ্ছে না। ইচ্ছা করলে লম্বা লম্বা পা ফেলে ভরোসালাল পাহাড়ের খাড়াই বেয়ে অনেক উঁচুতে উঠে যেতে পারে। কিন্তু মেয়েটাকে এ অবস্থায় ফেলে তার পক্ষে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছিল না।

জঙ্গলের জন্তুজানোয়ার, খ্যাপা কুকুর আর নিজের পেট ছাড়া পৃথিবীর কোন ব্যাপারেই ভরোসালালের আগ্রহ নেই। তবু মেয়েটার পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে তার অল্পসল্প কৌতূহল হতে লাগল। সে বলল, 'তোমার গাঁও কোথায়?'

মেয়েটি বলল, 'পাঁচ মিল (মাইল) পশ্চিম ; নাম ঝুমরিতালিয়া—'

'গাঁও থেকেই এখন আসছ?'

'হাঁ—'

'পাহাড়ের ওপারে কোথায় যাবে?'

'টেউন (টাউন) ভুকিলগঞ্জে—'

'কোন রিস্তার (আত্মীয়) বাড়ি?'

'নেহী।'

'তব্ (তবে)?'

একটু চুপ করে থেকে মেয়েটা বলল, 'আমি অসপাতাল (হাসপাতাল) যাচ্ছি।'

'অসপাতাল কেন?' বলেই ভরোসালালের মনে হল মেয়টা গর্ভিনী ; নিশ্চয়ই বাচ্চাটাচ্চা হবার ব্যাপারে হাসপাতালে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে সে আবার বলে উঠল, 'সমঝ গিয়া ; রামজীকা কিরপা—'

মেয়েটা মুখ নিচু করে হাঁটতে লাগল।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ।

এই শেরমুণ্ডি পাহাড়ের গায়ে নির্দিষ্ট কোন রাস্তা নেই। ঝোপঝাড় এবং জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ফাঁকা জায়গা দেখে দেখে খাড়াই বেয়ে ওপরে উঠতে হচ্ছে।

একসময় মেয়েটি জড়ানো গলায় হঠাৎ ডেকে উঠল, 'এ আদমী—'

ভরোসালাল ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল, 'কিছু বলবে?'

'হাঁ। একঠো বাত—'

'বল—'

তক্ষুনি কিছু বলল না মেয়েটা। খানিকক্ষণ বাদে প্রায় মরিয়া হয়েই সে শুরু করল, 'আমি একেলী আওরত (স্ত্রীলোক) ; তবিয়তের হালও খুব খারাপ। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পাহাড় বাইতে ডর লাগছে। তুমি আমাকে একেলী ফেলে রেখে চলে যেও না।'

ভরোসালাল ভাল করে মেয়েটাকে লক্ষ্য করল। তার দুর্বল রক্তহীন শরীর, গর্তে বসে-যাওয়া চোখ, চোখের কোলের গাঢ় কালি, পেরেকের মাথার মতো ঠেলে-ওঠা কণ্ঠার হাড়, মাংস ঝরে-যাওয়া লম্বাটে রোগা মুখ শির-বার-করা সিকড়ে

সিকড়ে হাত, ন-দশ মাসের বাচ্চা-ওলা স্ফীত পেট বোতামহীন জামার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা টসটসে স্তন, স্তনের বোঁটার চারপাশে ভুসো কালির ছোপ ইত্যাদি দেখতে দেখতে কেমন যেন মমতা বোধ করতে লাগল সে। বলল, আরে না-না, তোমাকে একেলী ফেলে আমি যাচ্ছি না। টেউন ভকিলগঞ্জে আমিও যাচ্ছি। আমার সঙ্গে সঙ্গে তুমি সেই পর্যন্ত যেতে পারবে।'

মেয়েটিব মুখচোখ দেখে মনে হল একটা শক্তসমর্থ সবল পুরুষের ভরসা পেয়ে সে যেন অনেকটা নিশ্চিন্ত হতে পেরেছে।

পাঁক ঠেলে ঠেলে দুজনে চলেছে তো চলেছেই। আরো খানিকক্ষণ যাবার পর হঠাৎ ভরোসালাল লক্ষ্য করল মেয়েটার পা ঠিকমতো পড়ছে না ; আবার সে টলতে শুরু করেছে। জোরে জোবে শ্বাস পড়ছে তার। এবারও তাকে ধরে ফেলল ভরোসালাল। জিজ্ঞেস কবল, 'কী হল ?'

মেয়েটা কাঁপা দুর্বল গলায় বলল, 'মাথা ঘুরছে।'

'হাঁটতে তখলিফ হচ্ছে ?'

'হাঁ।'

থোড়েশে জিবিয়ে নাও—'

ওখানেই একটা পাথর দেখে বসে পডল মেয়েটা। কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিয়ে উঠতে উঠতে বলল, 'চল---' কিন্তু পা ফেলতে গিয়ে আবার টলতে শুরু করল।

ভরোসালাল চিন্তিতভাবে বলল. 'মালুম হচ্ছে তুমি হেঁটে যেতে পারবে না। পা ফেলতে গেলেই টলছ, মাথায় চক্কব লাগছে। এক কাম করা যাক—'

মেয়েটি নির্জীব গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কী ?'

'তোমাকে আমি ধরে ধবে নিয়ে যাই। তোমার যা হাল, একেলী চলতে গেলে পড়ে গিয়ে বিপদ হয়ে যাবে।'

মেয়েটি আস্তে মাথা হেলাল। অর্থাৎ ভবোসালাল ধরে ধরে নিয়ে গেলে তার আপত্তি নেই। তা হলে সে বেঁচেই যায়।

ভরোসালাল মেয়েটিকে ধরে ফেলল। এক হাতে তার কাঁধ বেড় দিয়ে আস্তে আস্তে আবার ওপরে উঠতে লাগল। খানিকটা যাবার পর সে টের পেল মেয়েটির হাঁটার শক্তি ক্রমশ ফুরিয়ে আসছে। আর যত ফুরিয়ে আসছে ততই তার শরীরের সব ভাব ভরোসালালের হাতের ওপর এসে পড়েছে। কাদাভর্তি পিছল পথে বাচ্চাসমেত একটি গর্ভিনী মেয়ের গোটা দেহের ওজন একটা হাতের ওপর নিয়ে এগুনো সম্ভব না। ভরোসালাল মেয়েটাকে প্রায় সাপ্টে বুকের ভেতর নিয়ে এল। সেই অবস্থাতেই তাকে নিজের সঙ্গে লেপ্টে নিয়ে পাহাড় ভাঙতে লাগল। আর সমানে বিড় বিড় করতে লাগল, 'হো রামজী. হো রামজী— তেরে কিরপা. তেরে কিরপা—'

এতক্ষণ বৃষ্টির জোর ছিল না ; তবে মিহি চিনির দানার মতো সেটা পড়েই যাচ্ছিল, পড়েই যাচ্ছিল। হঠাৎ আবার তোড়ে নেমে গেল বৃষ্টিটা। হাওয়াটা পড়ে

গিয়েছিল। সেটাও বৃষ্টির মতোই আচমকা উন্মাদ হয়ে পাহাড়ি জঙ্গল-এর ভেতর দিয়ে সাঁই সাঁই ঘোড়া ছোটতে শুরু করে দিল।

এদিকে মেয়েটির দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি শেষ হয়ে গেছে : তার কোমরের তলার দিকটা শরীর থেকে আলগা হয়ে যেন ঝুলে পড়ছে। ভরোসালাল দিশেহারা হয়ে পড়ল। গর্ভিনী মেয়েটাকে সে কথা দিয়েছে, শেরমুণ্ডি পাহাড় পার করে দেবে। কিন্তু এখন এই অবস্থায় কিভাবে যে তার এবং তার পেটের বাচ্চাটাকে রক্ষা করবে— ভেবে পাচ্ছে না।

কয়েকটা মুহূর্ত। তারপরেই মনে মনে ভরোসালাল সব স্থির করে ফেলল।

মেয়েটার শরীরের যা হাল তাতে তাকে আর হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না। তাছাড়া সেই পিপুলগাছটার মতো ঝাঁকড়া মাথা এমন কোন গাছ নেই যার তলায় গিয়ে কিছুক্ষণ মাথা গোঁজা যেতে পারে। আর বৃষ্টিটা এবার যেভাবে শুরু হয়েছে তাতে আদৌ থামবে কিনা কিংবা থামলে কখন থামবে তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনিশ্চিতভাবে ভেজার চাইতে এগুবার চেষ্টা করাই ভালো।

ভরোসালাল করল কি, যেখানে কাদা কম এমন একটা জায়গা দেখে মেয়েটাকে শুইয়ে দিল। তারপর বাঁ কাধে লাঠির ডগায়-বাঁধা সেই চিত্রবিচিত্র ঝুলিটা নামিয়ে তার ভেতর থেকে দুটো ধুতি বার করে দ্রুত একটা বড় ঝোলা বানিয়ে ফেলল। মেয়েটাকে সেই ঝোলার ভেতর বসিয়ে, তার পাশে মাইলেগুলো রেখে নিজের পিঠে ঝুলিয়ে নিল। তারপর কাদার ভেতর বুড়ো আঙুল গিঁথে গিঁথে খুব সাবধানে পাহাড়ের গা বাইতে লাগল। দায়িত্ব যখন নিয়েছে তখন মেয়েটাকে নিরাপদে পাহাড় পার করে দিতেই হবে।

আকাশ থেকে লক্ষকোটি বৃষ্টির রেখা বল্লমের ফলার মতো ছুটে আসছিল। ঝড়ে চারপাশের অর্জুন-শাল-আমলকি আর সিসম গাছগুলো এককেবার মাটিতে নুয়ে পড়ছে; পরক্ষণেই সটান খাড়া হয়ে যাচ্ছে। ঝোপঝাড় উল্টো-পাল্টা খ্যাপা বাতাসে ছিঁড়ে খুঁড়ে লণ্ডভণ্ড হয়ে যাচ্ছিল। আকাশের গায়ে বড় বড় ফাটল ধরিয়ে বিদ্যুৎ চমকে যাচ্ছে। ঝড়বৃষ্টির সর্বনাশা চেহারা দেখতে দেখতে ভরোসালাল সমানে বলে যেতে লাগল, 'হো রামজী তেরে কিরপা; হো রামজী তেরে কিরপা'— বলতে বলতে থকথকে আঠালো কাদায় পায়ের আঙুলগুলোকে গজালের মতো গেঁথে গেঁথে সে ওপরে উঠতে লাগল।

পিঠে একটা ভার গর্ভিনী মেয়ের বাচ্চাসুদ্ধ, দেহের সমস্ত ভার চাপানো। যদিও ভরোসালাল হাট্টাকাট্টা দুর্দান্ত শক্তিশালী মরদ তবু তার শিরদাঁড়া যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছিল; শ্বাস আটকে আটকে আসছিল। তুমুল বৃষ্টি অনবরত চোখেমুখে এমন ঝাপটা দিয়ে যাচ্ছে যাতে সামনের কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না ভরোসালাল। তা ছাড়া দারুণ ঝড়ো হাওয়া তাকে ঠেলে দশ হাত একদিকে নিয়ে যাচ্ছে, পর মুহূর্তেই ধাক্কা মারতে মারতে পনের হাত অন্যদিকে সরিয়ে নিচ্ছে। জলে আর হাওয়ার

তার চোখ অন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। তারই মধ্যেই এই প্রচণ্ড দুর্যোগের বিরুদ্ধে শরীরটাকে ঢালের মতো খাড়া রেখে ভরোসালাল নিশানা ঠিক করে এগিয়ে যেতে লাগল, আর কাতর সুরে একটানা বলে যেতে লাগল, 'হো রামজী তেরে কিরপা, তেরে কিরপা—'

কতক্ষণ পর খেয়াল নেই, শেরমুণ্ডি পাহাড়ের মাথা ডিঙিয়ে যখন সে ওপারে গিয়ে নামল তখন বৃষ্টির দাপট থেমে এসেছে। ঝড়টাও আর নেই। আকাশের গায়ে মেঘ ক্রমশ পাতলা হয়ে যাচ্ছে। পিঠ থেকে মেয়েটাকে নামিয়ে ভরোসালাল দু-হাঁটুতে মুখ গুঁজে অনেকক্ষণ হাঁপাল ; তার শরীরের সব শক্তি তখন প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। ভরোসালালের মনে হচ্ছিল তার শরীরের একটা হাড়ও আর আস্ত নেই ; সব ভেঙেচুরে গেছে। শিরা-টিরাগুলো ছিঁড়ে যাচ্ছে। ঘাড়ের তলা থেকে অসহ্য একটা যন্ত্রণা শিরদাঁড়া বেয়ে কোমরে, কোমর থেকে পা পর্যন্ত চমক দিয়ে যেন ছুটে যাচ্ছিল।

অনেকক্ষণ বাদে খানিকটা ধাতস্থ হবার পর হঠাৎ সেই মেয়েটার কথা মনে পড়ে গেল ভরোসালালের। ধড়মড় করে মুখ তুলতেই দেখতে পেল তার সারা গা, শাড়ি জামা— সব ভিজে সপসপে হয়ে আছে। শরীরের চামড়া আর আঙুলের ডগাগুলো সিঁটিয়ে সাদা হয়ে গেছে। দেখতে দেখতে সেই তার মুখের দিকে চোখ পড়ল অমনি চমকে উঠল ভরোসালাল। মেয়েটার মুখ অসহ্য যন্ত্রণায় কুঁচকে যাচ্ছে ; ঠোঁট দুটো নীলবর্ণ। দাঁতে দাঁত চেপে যন্ত্রণাটা চাপতে চেষ্টা করছে সে। ভরোসালাল ভয় পেয়ে গেল। তাড়াতাড়ি মেয়েটার কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী হল ?'

নিজের পেটের কাছটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে গোঙানির মতো শব্দ করল মেয়েটা 'এখানে বহোত দর্দ। জলদি আমাকে অসপাতাল নিয়ে চল—'

পাহাড়ের তলা থেকে টাউন ভকিলগঞ্জ ঝাড়া পাঁচটি মাইল তফাতে। সেখানে পৌঁছুতে না পারলে হাসপাতালে যাওয়া যাবে না। ভরোসালাল শুধলো, 'তুমি কি হেঁটে যেতে পারবে ?'

'নহী। আমার কোমর পেট ছিঁড়ে যাচ্ছে।'

ভরোসালাল সেটাই আন্দাজ করেছিল। এ অবস্থায় উঠে দাঁড়িয়ে একটা পা ফেলাও মেয়েটার পক্ষে সম্ভব নয়। এদিকে ভরোসালালের শরীরে এমন শক্তি আর অবশিষ্ট নেই যাতে তাকে পিঠে ঝুলিয়ে আরো পাঁচ মাইল যেতে পারে। মেয়েটাকে পাহাড় পার করতেই তার জিভ বেরিয়ে গেছে।

অবশ্য এই শেরমুণ্ডি পাহাড়ের তলাতে ছোটখাটো একটা বাজার আছে। বাজার নামেই। চাল-ডাল-নিমক-মরিচের দোকান, একটা দোকান পান-বিড়ি-খৈনি পাতার, তৃতীয় দোকানটি হল চায়ের। ব্যস, এই হল বাজারের নমুনা। তার গা ঘেঁষে একটা আঁকাবাঁকা কাঁচা রাস্তা জনারের খেত, গেহুঁর খেত, যবের খেত আর এলোমেলো ভাবে ছড়ানো নানা দেহাতের মধ্য দিয়ে টাউন ভকিলগঞ্জের দিকে চলে গেছে।

ওই বাজারটার কাছে গেলে শহরে যাবার বয়েল গাড়ি পাওয়া যায়। তক্ষুনি তার খেয়াল হল, গাড়ি ভাড়া করলে কম করে পাঁচটি টাকা লাগবে। ঠাকুর রঘনাথ সিংহের দেওয়া দশটি টাকা তার ট্যাঁকে গোঁজা আছে। এ-ই তার শেষ সম্বল। ওই টাকা থেকে খরচা করা ঠিক হবে কিনা, ভাবতে লাগল ভরোসালাল। আর তখনই তার কানে অস্পষ্ট গোঙানির মতো আওয়াজটা এসে ধাক্কা দিল। ঘাড় ফেরাতেই সে দেখল, পেটের মাংস এক হাতে খিমচে ধরে থেকে থেকে কাতর শব্দ করে উঠছে মেয়েটা।

আর কিছু ভাবার সময় পেল না ভরোসালাল। কেউ যেন আচমকা টান মেরে তাকে তুলে দিল। তারপর এক দৌড়ে বাজারের কাছ থেকে একটা বয়েল গাড়ি নিয়ে এল সে। তারপর পাঁজাকোলে করে মেয়েটাকে ছইয়ের তলায় নিয়ে শুইয়ে দিল। গাড়িওলাকে বলল, 'জলদি টেউন চল ভেইয়া ; বহোত জলদি—'

গাড়িওলা 'উয্-র্-র্-' বলে একটা শব্দ করে দুটো গুরুরই ল্যাজ মুচড়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে গরু দুটো কাঁচা রাস্তা দিয়ে দৌড় লাগাল।

এদিকে আকাশটা দ্রুত পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। মেঘের গায়ে অল্প অল্প ফাটল ধরিয়ে মরা মরা নির্জীব রোদ বেরিয়ে আসতে চাইছিল। রোদের চেহারায় মনে হচ্ছিল, বেলা ফুরিয়ে এসেছে ; একটু পরেই সন্ধে নেমে যাবে।

গাড়িতে উঠবার পর থেকে ভরোসালাল কোন দিকে আর তাকায়নি : মেয়েটাকেই শুধু লক্ষ্য করে যাচ্ছে। মেয়েটা কাত হয়ে বুকের কাছে হাত-পা গুটিয়ে অনবরত গুঙিয়ে যাচ্ছিল আর চোয়াল শক্ত করে শ্বাস আটকে যন্ত্রণা চাপবার চেষ্টা করছিল। ভরোসালাল ঝুঁকে খুব নরম গলায় শুধলো, 'এ জেনানা, খুব কষ্ট হচ্ছে?'

মেয়েটা শক্ত করে দাঁতে দাঁত চেপে মাথা নাড়ল শুধু ; কিছু বলল না।

ভরোসালাল যে কী করবে, কী করলে মেয়েটার কষ্ট একটু কমাতে পারে—ভেবে পেল না। সে শুধু শ্বাসরুদ্ধের মতো বিড় বিড় করতে লাগল, 'হো রামজী, তেরে কিরপা, হো পবনসুত, তেরে কিরপা—'

পরম মমতায় তার একটা হাত ধরে ভরোসালাল বলল, 'ডর কী?'

মেয়েটার যন্ত্রণা যেন হঠাৎ পাঁচ গুণ বেড়ে গেল। শরীরটা ধনুকের মতো বেঁকে যেতে লাগল তার ; কপাল-গলা-কণ্ঠা সব ঘামে ভিজে যাচ্ছে। গায়ের লোমগুলো হঠাৎ শীত লাগার মতো খাড়া হয়ে উঠেছে। চোখের তারা আস্তে আস্তে স্থির হয়ে যাচ্ছে।

ভরোসালাল অস্থির হয়ে উঠল। এই মেয়েটা পনের মাইল রাস্তা পেরিয়ে মাঝখানে বিশাল পাহাড় ডিঙিয়ে মানুষের জন্ম দিতে চলেছে। মানুষ সম্বন্ধে প্রায় অনভিজ্ঞ ভরোসালাল জানে না কিভাবে তার শুশ্রূষা করবে। ভীতভাবে সে বলল, 'এ জেনানা, তোমাদের এ সময় কী করতে হয়?'

কোমরের কাছটা ধরে মেয়েটা অত্যন্ত দুর্বল স্বরে বলল, 'এখানে একটু সেঁক

দিয়ে দাও—'

এই বয়েল গাড়ির ভেতর কোথায় আগুন, কোথায় বা কী? কিন্তু যেভাবেই হোক সেঁকটা দিতেই হবে। উদ্‌ভ্রান্তের মতো এদিক-সেদিক তাকাতে তাকাতে ভরোসালালের চোখে পড়ল গাড়ির ছইয়ের নিচে একটা হেরিকেন ঝুলছে; সঙ্গে সঙ্গে সে ঘাড় ফিরিয়ে গাড়িওলাকে বলল, 'ভেইয়া তোমার হেরিকেনে তেল আছে?'

গাড়িওলা বলল, 'আছে। কেন?'

'ওটা একটু জ্বালব। এই জেনানাকে সেঁক দিতে হবে।'

জ্বালতে পারো, তবে তেলের জন্য চার আনা দিতে হবে।'

'দেব।

'আর হেরিকেন ভাঙলে তার দাম—'

'দেব'।

—তবে ঠিক আছে।'

'তোমার কাছে অগ্ (আগুন) আছে?

'আছে। গাড়িওলা কোমরের খাঁজ থেকে একটা দেশলাই বার করে ছুঁড়ে দিল।

ভরোসালাল হেরিকেন ধরিয়ে নিল। তারপর নিজের একটা কাপড়ের খানিকটা অংশ চার ভাঁজ করে হেরিকেনটার মাথায় বসিয়ে গরম করতে লাগল। বেশ তেতে উঠলে আস্তে আস্তে মেয়েটার কোমরে সেঁক দিতে লাগল। অনেকক্ষণ সেঁক দেবার পর গোঙাতে গোঙাতে এক সময় মেয়েটা ঘুমিয়ে পড়ল।

সন্ধের অনেক পর বয়েল গাড়িটা টাউন ভকিলগঞ্জের সরকারি হাসপাতালে পৌঁছে গেল।

কিন্তু এত রাতে ডাক্তার সাহেবকে পাওয়া গেল না। তিনি তাঁর কোয়ার্টারে চলে গেছেন।

যারা ছিল তারা বলল, 'আজ তো হবে না; কাল নিয়ে এসো।'

ভরোসালালের মাথায় তখন পাহাড় ভেঙে পড়ার অবস্থা। মেয়েটাকে নিয়ে এই রাত্তিরে কোথায় রাখবে সে? সবার কাছে কাকুতিমিনতি করতে লাগল, 'কিরপা করে জেনানাকে ভর্তি করে নিন।'

হাসপাতালের লোকেরা জানাল, ডাক্তারসাব অর্ডার না দিলে কারোকে ভর্তি করা যাবে না। তখন মরিয়া হয়ে ডাক্তারসাবের কোয়ার্টারের ঠিকানা নিয়ে খুঁজে বার করল। তারপর তাঁর হাতে-পায়ে ধরে কিভাবে কত কষ্ট করে গর্ভিনী মেয়েটাকে পাহাড় পার করিয়ে এত দূরে নিয়ে এসেছে তার যাবতীয় বিবরণ দিয়ে বলল, 'এখন আপনার কিরপা ডাগদরসাব(ডাক্তার সাব)।'

সব শুনে ডাক্তার সাব হাসপাতালে এসে মেয়েটাকে ভর্তি করে নিলেন। এবার ভরোসালালের দায়িত্ব শেষ। গাড়িওলাকে ভাড়াবাবদ পাঁচ টাকা আর তেলের দরুন চার আনা দিয়ে আর রাতের মতো একটা আস্তানার খোঁজে বেরিয়ে পড়ল ভরোসালাল।

পৃথিবীতে কেউ নেই তার। কাজেই পিছুটানও নেই। সে একবোরে ঝাড়া হাত-পা লোক। যখন যেখানে যায় সেখানে নিজের হাতে খানকতক রুটি সেঁকে নেয়। তারপর কারো বাড়ির দাওয়ায় কিংবা মাঠে ঘাটে গাছতলায় শুয়ে পড়ে।

আজ আর কিছুই ভাল লাগছিল না ভরোসালালের। আটা কিনে এনে ছানো, উনুন বানাও, কাঠকুটো জোগাড় করো— এত সব ঝঞ্ঝাট একটা দিনের জন্য সে বাদ দিতে চায়। ভরোসালাল করল কি, একটা দোকানে গিয়ে তেঁতুলের আচার আর নুন-লঙ্কা দিয়ে একদলা ছোলার ছাতু খেয়ে এসে এক বাড়ির খোলা বারান্দায় শুয়ে রইল। কাল সকালে সে সগরিগলি ঘাটে যাবে। সেখান থেকে টাউন পূর্ণিয়া।

পরের দিন সকালে উঠে সগরিগলি ঘাটে যাবার সময় হঠাৎ ভরোসালালের মনে হল, মেয়েটাব একটা খবর নিয়ে গেলে হয়। অন্যমনস্কর মতো হাঁটতে হাঁটতে একসময় সে হাসপাতালেই এসে পড়ল এবং খবর নিয়ে জানলো, এখনও মেয়েটার ছেলেপুলে কিছু হয়নি; তবে যে কোন মুহূর্তে হয়ে যেতে পারে। আর জানলো, মেয়েটা ভয়ানক কষ্ট পাচ্ছে।

শেষ খবরটা পেয়ে মন খারাপ হয়ে গেল ভরোসালালের। পৃথিবীর সব ব্যাপারেই সে উদাসীন। তবু কাল পিঠে চাপিয়ে যাকে পাহাড় পার করিয়েছে, যার জন্য নিজের সঞ্চয় থেকে নগদ সোয়া পাঁচ টাকা খরচও করে ফেলেছে, গরম সেঁক দিয়ে যার সেবা করেছে তার খুব কষ্ট হচ্ছে জেনে আজ আর সগরিগলি যেতে মন করছে না। সে ঠিক করে ফেলল, ভালোয় ভালোয় মেয়েটার বাচ্চা টাচ্চা হয়ে গেলে সে পূর্ণিয়া টাউনে যাবে। গিয়ে হয়ত দেখবে মিউনিসিপ্যালিটির লোকেরা খ্যাপা কুকুর মারার জন্য অন্য লোক লাগিয়ে দিয়েছে। কিন্তু কি আর করা যাবে। হো রামজী, হো পবনসুত।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এদিক-সেদিক খানিক ঘুরে বেড়াল ভরোসালাল। তারপর রুটি বানিয়ে খেয়ে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকল। ঘুম থেকে উঠে বিকেলে আবার সে এল হাসপাতালে। কিন্তু কোন খবর নেই। রাতটা কাটিয়ে পরের দিন সকালে আর বিকালে দু'বার এল ভরোসালাল। খবর নেই।

দু'দিন কাটাবার পর উদ্বেগে তার দম যখন বন্ধ হয়ে আসছে সেই সময় ডাক্তার সাব হাসতে হাসতে বললেন, 'বহুত বড়িয়া খবর—'

ভরোসালাল বলল, 'হো গিয়া'! ডাগদর সাব?'

'রামজীকা কিরপা, পবনসুতকা কিরূপা—'ভরোসালালের চোখে আলো ঝিলিক দিয়ে গেল।

'তোমার জেনানার লেড়কা হয়েছে। বহুত গোরা(ফর্সা) লেড়কা—'

চমক লাগল ভরোসালালের। ডাক্তার সাব নিশ্চয়ই মেয়েটা তার আওরত ধরে নিয়েছে। ভুল শুধরে দেবার জন্য তাড়াতাড়ি সে বলে উঠল 'ও আমার আওরত না ডাগদর সাব।'

'তবে ?' ডাক্তার সাব ভুরু কুঁচকে তাকালেন।

ভরোসালাল বলল, 'রাস্তায় আসতে আসতে জান-পয়চান (আলাপ পরিচয়) হয়েছিল।'

'তুমি না সেদিন বলেছিলে বারিষের মধ্যে ঝড়ের মধ্যে ওকে ঘাড়ে করে নিয়ে এসেছ ?'

'হ্যাঁ।'

'ব্যাপারটা কী ! জানা নেই শোনা নেই, একটা মেয়েমানুষের জন্যে এত সব করলে !' ডাক্তার সাব এবার রীতিমত অবাক !

ভরোসালাল সারা মুখে পৃথিবীর সব চাইতে নিষ্পাপ পবিত্র হাসিটি হাসল, 'দুনিয়ায় একটা মানুষ আসছে। স্রিফ উসি লিয়ে—'

সে একটা হিংস্র বীটার ; একটা নিষ্ঠুর কুকুর-মারা তবু যেন বোঝাতে চাইল পৃথিবীতে একটি মানুষের সন্তান জন্ম নিচ্ছে, তার জন্য সামান্য কষ্টটুকু কিছুই নয়।

ডাক্তার সাব কী উত্তর দেবেন, ভেবে পেলেন না। বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে রইলেন।

ভরোসালাল বলল, 'আচ্ছা চলি ডাগদর সাব ; রাম রাম।' এবার পরম নিশ্চিন্তে সগরিগলি ঘাট পেরিয়ে সে পূর্ণিয়া যেতে পারবে।

হরিণ শিশু

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

বারান্দায় সিঁড়িতে তিন চারটে ছেলেমেয়ে চুপ করে বসে থাকে এসে। ওরা কিছু চায় না, নিজেদের মধ্যেও কোনও কথা বলে না, শুধু নিঃশব্দে আমাদের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। কুচকুচে কালো রং, দশ থেকে বারোর মধ্যে বয়েস, ধুলো রঙের নেংটি মালকোঁচা করে পরা, ওদের মধ্যে একটি মেয়েও আছে, মেয়েটিকে দেখলে অড্রি হেপবার্নের কথা অস্পষ্টভাবে মনে পড়ে। ওরাওঁ না মুণ্ডা কোন জাতের মেয়ে যেন, দশ এগারো বছর মাত্র বয়েস— তার সঙ্গে অড্রি হেপবার্নের কোনোই মিল নেই, তবু মুখের কোথাও কিছু একটা আছে, যেজন্য মনে পড়েই। সেইজন্যই হয়তো একটু মায়া হয়, তা ছাড়া ভিতরে ভিতরে একটা কিছু কাঁটার খোঁচা রয়ে গেছে বোধহয়, তাই ওদের উঠে যেতেও বলতে পারি না। কিন্তু আমাদের অস্বস্তি হয়, নেতারহাটের ডাকবাংলোর বারান্দায় বসে, সামনে বিশাল উপত্যকা ও মহিমার মতন গাঢ়নরম সূর্যালোক, সুবিমল এবং তার স্ত্রী ও শ্যালিকা অরুণা এবং বরুণার সঙ্গে চা খেতে খেতে সামনের ওই সিঁড়িতে-বসা মলিন বাচ্চাগুলোকে দেখে আমাদের অস্বস্তি হয়। পরশু বিকেলে আমরা এখানে আসার পর থেকেই, ওরা আমাদের সঙ্গে আছে, সবসময়।

সামনের সুরকি বেছানো লনে একটা কুকুর, বেশ দেখতে, শীতের জায়গায় পারিয়া কুকুরেরও বেশ ভরাট স্বাস্থ্য ও লোম-ভরতি গা হয় যেমন, কুকুরটা গ্রামাফোন রেকর্ডের কুকুরের মতন ভঙ্গিতে উঁচু হয়ে বসে প্রতীক্ষায় থাকে। আমি পাঁউরুটির মাথার দিকটা পছন্দ করি না বলে টোস্টের শেষটুকু শূন্যে ছুড়ে দিই, কুকুরটা শূন্য থেকেই লাফিয়ে, সেটাকে মুখে পুরে নেয়। আর তখন সেই বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলো আমার হাতের দিকে চেয়ে থেকে দৃষ্টি দিয়ে টোস্টের টুকরোটাকে শূন্যে অনুসরণ করে— একেবারে কুকুরটার মুখ পর্যন্ত।

শিরশির করে বয়ে যাচ্ছে ঠাণ্ডা হাওয়া, কলকাতার লোকেরা এখন কী-রকম গরমে ভুগছে ভেবে ঠাণ্ডাটা আরও ভালো লাগে, সামনে পাতলা বাষ্পের মতন উড়ে যাচ্ছে মেঘ, মেঘ কিনা অবশ্য সন্দেহ হয় — কেননা শুনেছিলাম, প্রায় দু' বছর এখানে বৃষ্টিই হয়নি, অথচ এ-রকম মেঘের ওড়াওড়ি এখানকার পাহাড়ের চূড়ায় তো রোজই দেখা যায়। ডিমের পোচটায় চামচে বসাতে গিয়ে অরুণা অসাবধানে নিজের শাড়িতে খানিকটা তরল হলদে লাগিয়ে ফেললো। তাড়াতাড়ি জলে রুমাল ভিজিয়ে সেইখানটা মুছতে মুছতে অরুণা স্পষ্টই বিরক্ত হয়ে ওঠে এবং ঝাঁঝালো গলায় বলে, তার চেয়ে চলো ঘরে বসে খাই, সব সময় মুখের দিকে ও-রকম তিন চারজন হাঁ করে তাকিয়ে থাকলে কেউ খেতে পারে?

বরুণা বললো, তাই বলে এমন সুন্দর সকালটা ঘরে বসে নষ্ট করবো নাকি? সব জায়গাতেই তো এরা— ! টুরিস্ট স্পটগুলোতে অন্তত ভিখিরি আসা বন্ধ করতে পারে না কেউ?

সুবিমলের চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল, সিগারেট ধরিয়ে সে অন্যমনস্ক গলায় বললো, এরা ভিখিরি নয় বোধহয়। লোকাল লোক। এবার যা অবস্থা হয়েছে এদিকে!

অরুণার শাড়িতে ডিমের কুসুমের চটচটে আঠা হয়ে গেছে, কিছুতেই উঠছে না, তার বিরক্তি তখনও লেগে আছে, বললো, গভর্নমেণ্টও যা হয়েছে, লেফটই বলো, আর রাইটই বলো— এই, এই নে, এদিকে আয়।

অরুণা নিজের প্লেট থেকে দুটো এবং আমার ও বরুণার প্লেট থেকে একটা করে টোস্ট তুলে নিয়ে ওদের দিকে হাত এগিয়ে বললো, এই নে, নিয়ে তোরা এবার যা বাপু।

ছেলেমেয়েগুলো পরস্পরের দিকে চোখ চাওয়া-চাওয়ি করে, একজন দুর্বল ও লাজুকভাবে এগিয়ে বসে টোস্ট চারটে নিয়ে ফিরে গিয়ে নিজেদের মধ্যে বিলি করে দেয়— ওরা সবাই অত্যন্ত ভদ্র ভঙ্গিতে মুখ নিচু করে বিনা শব্দ করে খেতে থাকে।

সুবিমল উদারভাবে হেসে বলে, এদের ক'জনকে আর তুমি কতদিন খাওয়াতে পারবে বলো!

কুকুরটাও এবার ছোট্ট ঘেউ শব্দ তুলে কাছে এগিয়ে আসে। অরুণা এবার হেসে ফেলে। আবার তুই-ও আছিস! নে-। বরুণার বাকি টোস্টটাও অরুণা তুলে নিয়ে ছুড়ে দিল দূরে, কুকুরটা সেটা ছুটে গিয়ে ধরে মুহূর্তের মধ্যে শেষ করে আবার রেকর্ডের ছবির মতন বসলো।

বরুণা বললো, ওরা কিন্তু গেল না।

অর্থাৎ ছেলেমেয়েগুলো তখনও সিঁড়িতে বসে আছে আমাদের দিকে তাকিয়ে। আমি বরুণাকে রাগাবার জন্যে বললুম, এই একটা মুশকিল, আমাদের খাবার সময় যদি একটা কুকুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে— তা হলে খারাপ লাগে না। কিন্তু

যদি আর কয়েকটা মানুষ তাকিয়ে থাকে, তা হলেই বিশ্রী লাগে!

বরুণা আশানুরূপ রেগে উঠলো এবং দর্পিত ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, এইবার বুঝি আপনার লেকচার শুরু করবেন? আমরাই যেন সব দোষ করেছি, না? এরা খেতে পাচ্ছে না বলে আমাদেরও বুঝি না খেয়ে থাকতে হবে?

— তোমার অন্তত তাই-ই থাকা উচিত। দিনদিন যা স্বাস্থ্যখানা করছো।

— আর আপনার নিজের কি? জন্মেও বুঝি আয়না দেখেন না?

— আমার আবার আয়না দেখার দরকার কি? তোমার চোখের মণিতেই তো আমি নিজেকে দেখতে পাই।

— ভালো হচ্ছে না বলছি। সব সময় যদি এ-রকম করেন, আমি তা হলে আজই চলে যাবো একা একা।

সুবিমল ও অরুণা হাসতে থাকে, আমি বরুণার দিকে তাকিয়ে বললুম, সে কি, চলে যাবে কি? তোমাতে-আমাতে যে আজ আলাদা ওয়াচ টাওয়ার যাবো দুপুরবেলা, কথা ছিল! কাল যে বললে, মনে নেই!

— কখন বললুম? কী মিথ্যুক! বয়ে গেছে আপনার সঙ্গে আলাদা যেতে।

— তা হলে যাওয়াই হবে না। এখানকার নিয়ম জানো না, ওয়াচ টাওয়ারে দু'জন দু'জন করে আলাদা যেতে হয়।

— মোটেই সে-রকম কোনো নিয়ম নেই। ভ্যাট্! যদি থাকেও, তা হলে আমি জামাইবাবুর সঙ্গে যাবো।

— কিন্তু সুবিমল কি ওর বউকে আমার সঙ্গে ছাড়বে?

সুবিমল গম্ভীরভাবে বললো, আমি ওর সঙ্গে আমার বউকে কিছুতেই একা যেতে দেবো না! অরুণা ঠোঁট উলটে স্বামীকে এক খোঁচা মেরে বললো, ইস্— ! বরুণা তার সতেরো বছরের ছেলেমানুষী সিরিয়াসনেসের সঙ্গে বললো, তাও যেতে হবে না। প্রথমে আমি আর জামাইবাবু যাবো, তারপর ফিরে এসে জামাইবাবু আর দিদি, তারপর আপনি আর জামাইবাবু কিংবা আপনি একা—

— দিদি আর জামাইবাবু যখন ওপরে যাবে, তুমি তখন নিচে আমার সঙ্গে— এ যে সেই বাঘ, ছাগল আর পানের ধাঁধা হয়ে গেল। জানো ধাঁধাটা?

বরুণা শব্দ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আমার ধাঁধা জানার সময় নেই!— তারপর রাগ প্রকাশের জন্য তীক্ষ্ণ গলায় সেই ছেলেমেয়েগুলোর উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠলো, এই, আভি যাও না! সব সময় জ্বালাতন!

আমি মুচকি হেসে বললুম, দেখো, আমি জানি ওদের কী-রকমভাবে বিদায় করতে হয়। দেখবে?

পকেট থেকে একটা নোট বার করে বললুম, এই বাচ্চা, ইধার কাঁহাপর সিগরেট মিলতা হ্যায়?

ওরা পরস্পরের দিকে আবার তাকালো। একজন উত্তর দিল, হাঁ সাব,

কোপরিটিব মে।

আমি একটা খালি সিগারেটের প্যাকেট দেখিয়ে বললুম, এইসা সিগরেট চার প্যাকেট লে আও। চার আদমি চলা যাও, লানে সে সবকইকো দশ নয়া করকে বকশিস মিলে গা। না, এই লেড়কি হেপবার্নকো পনেরো নয়া।

অরুণা অবাক হয়ে বললো, অড্রি হেপবার্ন?

আমি হাসতে হাসতে বললুম, বাচ্চা মেয়েটাকে ঠিক অড্রি হেপবার্নের মতন দেখতে না? চোখগুলো দেখো?

বরুণা চূর্ণ হাসিতে ভেঙে পড়ে বললো, ইস, অড্রি হেপবার্নকে আপনি ভিক্ষে দেবেন, কী অহংকার?

আমি বললুম, ভিক্ষে তো নয়, পারিশ্রমিক।

দেখবো, কতবার আপনি ওদের দিয়ে সিগারেট আনান।

দুপুরের খাবারটা আমরা ভেতরের ডাইনিং রুমে বসেই খেলুম। ডাক বাংলোর মুসলমান খানসামার রান্নার হাতটা বড় ভালো, চমৎকার বিরিয়ানি আর মুর্গির রোস্ট বানিয়েছে।

আজ সারাদিনেই রোদের তাপ হলো না, মিহিন বাতাসে আজ নরম ছায়ার দিন, এই সব দিনে বেঁচে থাকা বড় রমণীয় মনে হয়। বরুণা ঘরের মধ্যে থাকা একেবারে পছন্দ করে না, তার সতেরো বছরের চঞ্চল বয়েস তাকে সব সময় বাইরে টানে। দূরের পাহাড়ের আলোছায়ার গাঢ়ত্ব সারাদিন অনবরত পালটায়, বহুদূরবিস্তৃত উপত্যকা দেখে দেখেও পুরোনো হয় না, চোখ ক্লান্ত হয় না, সুতরাং এই সব দিনে, দুর্লভ ছুটি" বেড়াতে আসায় বরুণার ঘরের মধ্যে না থাকার ইচ্ছেটাই স্বাভাবিক। সুবিমলের অবশ্য তিন বছর হলো বিয়ে হয়েছে, কিন্তু সে এখনো নানা অজুহাতে অরুণাকে নিয়ে মাঝে মাঝেই ঘরে থাকতে চায়। সুতরাং চা খাবার পর, আমি একাই বরুণাকে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিলাম। জংলা-পথ দিয়ে ঘুরে ওয়াচ টাওয়ারে কিছুক্ষণ কাটিয়ে এলাম দু'জনে। ওয়াচ টাওয়ারে উঠলে— যতদূর চোখ যায় শুধু জঙ্গল আর পাহাড় চোখে পড়ে। বিশাল ব্যাপ্তির মধ্যে যে সৌন্দর্য তা এখানেই।

আরও দু-একটা চোখে পড়ে, অসংখ্য গাছ রোদ্দুরে একেবারে ঝলসানো, এ-বছর তাদের নতুন পাতা জন্মায়নি। বনের মধ্যে একটা শুকনো রেখা— এককালে ওখানে ঝর্ণা বা নদী ছিল বোধহয়। বৃষ্টিহীন রুক্ষতার চিহ্ন চারদিকে ছড়ানো। দূরে দেখা যায়, কোথাও কোথাও পাহাড়ের ঢালুতে জঙ্গল পরিষ্কার করে চাষের জমি। সেখানে শুকনো, রংজ্বলা ধান বা ভুট্টার চারাগুলো মৃত্যুর প্রতীক্ষায় আছে। আমার চোখ এমন, সেই রুক্ষতার মধ্যেও একটা সৌন্দর্য আবিষ্কারের চেষ্টা করে। রুক্ষতার সুদূরপ্রসারী ফলাফলের কথা মনে আসে না। শুধু একদিকে মাত্র একটা জলাশয়, লেকের মতন, পাড়— বাঁধানো, বুঝলুম, আমাদের ডাকবাংলোয় ওখান থেকেই

জল আসছে, এখানকার ইস্কুলেও বোধহয় ঐ জায়গা থেকেই জল যায়। যতদূর চোখ যায়, ঐ একমাত্র জলের জায়গা— অনেক কষ্টে বোধহয় ওটা বাঁচানো। অবিরাম পাম্পের ফটফট শব্দ কানে আসছে।

বরুণা বলেছিল, দেখেছেন, কী সুন্দর, পাহাড়ের ওপরে একটা লেক ? বিকেলে আমরা সবাই ওখানে বসবো, অ্যাঁ ? আচ্ছা, এই জঙ্গলে জন্তু-জানোয়ার নেই ?

আমি বললুম নিশ্চয়ই আছে। এই পালামৌ জেলার সেই বাঘের কথা সঞ্জীবচন্দ্রের লেখায় পড়োনি ? এসব জঙ্গলে হাতি পর্যন্ত আছে শুনেছি। হরিণ-টরিণ তো অজস্র !

—এখান থেকে একটা বাঘ দেখা গেলে বেশ হতো না ?

আমি উৎকটভাবে চিৎকার করে উঠলুম, 'হালুম !' তারপর বললুম, এই তো বাঘ, তোমার এত কাছে, এইবার— !

বরুণা কৃত্রিম কোপে আমাকে ধাক্কা দিয়ে বললো, যাঃ ! এমন জোর চেঁচিয়েছেন। তারপরই ওয়াচ টাওয়ারের নিচের দিকে তাকিয়ে বরুণা তেলেবেগুনে জ্বলে উঠেছিল। এখানেও এসেছে ? পাগল করে ছাড়বে— সত্যি ভালো লাগে না !

সেই তিন চারটে বাচ্চা ওয়াচ টাওয়ারের নিচে এসে দাঁড়িয়েছে, ওপরে মুখ করে আমাদের দেখছে। সেইরকম শব্দহীন, কথাহীন, তাদের চেয়ে থাকা। বরুণা বলেছিল, এখানেও কি আমরা খাবার খেতে এসেছি নাকি ? সব সময় আমাদের সঙ্গে ! কেন ?

আমি আলতোভাবে বরুণার কাঁধে হাত দিয়ে সান্ত্বনার সুরে বললুম, অত বেশি গুরুত্ব দিচ্ছো কেন তুমি ? ওদের দিকে না তাকালেই তো হয়। কত ভালো ভালো জিনিস রয়েছে, এসো, আমরা সেইগুলো দেখি।

—তা মোটেই পারা যায় না। সব সময় ওরকম বুভুক্ষুর মতন চেয়ে আছে— কী দেখে বলুন তো ? সব সময়ই আমরা খাচ্ছি নাকি ? সকালেই তো পয়সা দিলেন।

—পয়সা চাইছে না, হয়তো আমাদেরই দেখছে। আমাদের দেখতে ওদের ভালো লাগে। আমরা যেমন এই পাহাড়, খোলা আকাশ, জঙ্গল দেখতে এখানে এসেছি— তেমনি ওরাও আমাদের চোখ ভরে দেখছে। আমাদের ভালো ভালো পোশাক, আমরা ভালো ভালো খাবার খাই, আমাদের দেখলে তো ওদের ভালো লাগবারই কথা ! ওদের তো আর জঙ্গল কিংবা পাহাড়ের সৌন্দর্য দেখার কথা নয় !

—যাই বলুন, এসব ভালো লাগে না। তা বলে কেউ বেড়াতে আসবে না ? বেড়াতে এসেও যদি সব সময় এ-রকম—

—বেড়াতে এসে আমাদের পক্ষে দু' একটা ব্যাপারে চোখ বুজে থাকাই ভালো। আনন্দ ফুর্তি করতে গেলে দু' একটা ছোটোখাটো জিনিসকে বিদায় দিতেই হয়, মনের ভেতরের দু'একটা ব্যাপারকে মেরে ফেলাই ভালো। তুমি ছেলেমানুষ তো, তাই বুঝতে পারছো না। বেড়াতে আসা তো মানুষের পক্ষে দরকারই। আমরা বেড়াতে এসেছি, আমরা এখন ছুটিতে আছি, আমরা এখন শুধু আনন্দ করবো। বেড়াতে

এসেও না-খেতে পাওয়া মানুষের কথা ভাবলে চলে নাকি? তাহলে তো সবই মাটি— সেজন্য ওসব ভুলে থাকতে হয়, দেখো না, আমরা বড়রা কী-রকম ভুলে থাকতে পারি, বড়জোর দু'চার পয়সা বকশিস, তার বেশি আর আমাদের করবার কীই-বা আছে!

বরুণা তবু মুখ ভার করে থাকে। বিরক্তির সঙ্গে বলে, আর পারি না। এক এক সময় ইচ্ছে করে, ছুটে গিয়ে গুম্ গুম্ করে ওদের পিঠে কিল মারি!

ফেরাব পথেও সেই বাচ্চাগুলো আমাদের পিছু নেয়। ডাকবাংলো পর্যন্ত এসে আবার বিশ্বস্তভাবে সিঁড়িতে বসে থাকে, একটুও গোলমাল করে না, কিছু চায় না, দু'একজন নতুন বাচ্চা এসেও ওদের দলে যোগ দেয়।

শীতের জায়গায় খিদে বেশি পায়, তাছাড়া, অনেকখানি হেঁটে আসার ফলে চন্‌চন করছিল খিদে, পাঁচ-সাত মিনিটেই খাওয়া শেষ হয়ে যায়। ডাইনিং রুমের পর্দা হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝে, সেই ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ে সিঁড়িতে বসে-থাকা এখন আট ন'টি কচি মুখ, আমি সেদিকে পিছন ফিরে বসি। কফিতে চুমুক দিতে দিতে সুবিমল ওর সাউথ ইণ্ডিয়া ভ্রমণের গল্প শোনায়। সেই গল্প শেষ হলে, নেতার-হাট থেকে আমাদের যে মাকক্লাস্কিগঞ্জে যাবার প্রোগ্রাম— কিন্তু আমাদের ফান্ডে কুলোবে কিনা সেই সম্পর্কে আলোচনা করি। আবার এসব অঞ্চলে কবে আসা হয় কে জানে, এবারেই দেখে যেতে পারলে ভালো হতো!

বিকেলবেলা ফ্লাস্কে চা ভরে আমরা সেই জলাশয়ের ধারে গিয়ে বসলুম। মানস সবোবরের হাঁসেরা এই লেকেরও খবর রাখে, বেশ বড় একটা হাঁসের ঝাঁক সাতনরী হারের মতন জলে ভাসছে। একদিকে উঁচু বাঁধানো পাড়, পাহাড়ের চূড়ায় এরকম একটা বড় পুকুর দেখতে পাওয়া সত্যি আশ্চর্যের, বোধহয় পাম্পে পাহাড় খুঁড়ে জল বার করেছে।

সুবিমল অরুণাকে গান গাইবার জন্য খুব খোঁচাচ্ছে, আর অরুণা নানান ওজর আপত্তি তুলছে। রাঁচিতে পচা দই খেয়ে তিনদিন ধরে তার গলা ভেঙে আছে। আসলে খালি গলায় গান করলে নাকি অনবরত স্কেল বদলে যায়— আর সেটা গলার পক্ষে খারাপ, অরুণার এই ধারণা। অরুণার গান যাতে আমাকে না শুনতে হয়,তাই বারবার আমি নানান গল্পের প্রসঙ্গ টানছিলুম। বরুণা গান জানে না, সে উদয়শঙ্করের স্কুলে নাচ শিখছে, আমি ভাবছিলুম, তাকে এখানে একটু নাচ দেখাতে বলে রাগিয়ে দেব কিনা। বরুণা আপনমনে ছোট ছোট পাথরের নুড়ি কুড়িয়ে জলে ছুড়ছিল।

সেই বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলোর মধ্যে মাত্র দু'জন এখনও আমাদের সঙ্গ ছাড়েনি। সেই মেয়েটি, আর একটা ছেলে খানিকটা দূরে চুপ করে বসে আছে। এটা ঠিক, ওরা আমাদের কাছে ভিক্ষে চায় না, কিছু দিলে নেয় বটে, কিন্তু মুখ ফুটে খাবারও চায় না। শুধু চুপচাপ আমাদের দিকে চেয়ে বসে থাকে।

সুবিমল হঠাৎ বললো, সুনীল, তুই ঠিকই বলেছিস, ঐ মেয়েটার সঙ্গে অড্রি হেপবার্নের বেশ মিল আছে। কী সুন্দর চোখ দুটো।

অরুণা বললো, আহা দেখলে মায়াও হয়, কিন্তু আমরা কি করবো বলো, কষ্টও লাগে, অথচ কত আর খেতে দিতে পারি বলো, এই খুকি শোন তো এদিকে—

মেয়েটা সেইরকম বসে বসেই চেয়ে রইলো। অরুণা আবার বললো, এই খুকি, শোন্ না, হিঁয়াপর আও. আও, আও, ভয় কি!

মেয়েটি অত্যন্ত সন্ত্রস্তভাবে এবার আস্তে আস্তে উঠে এলো, অরুণা তার হাত ধরে বললো. কী সুন্দর ঢলঢলে মুখখানা, রংটা যদি ফর্সা হতো, তা কালোই বা খারাপ কী— ! কথার শেষ অংশে অরুণা তার স্বামীর দিকে ভ্রূভঙ্গি করলো। সুবিমলের গায়ের রং প্রায় আমারই মতন, সুতরাং সে উদার সুরে বললো, কালোই তো জগতের আলো।

এই সময় একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটলো। বরুণা হঠাৎ বিষম অবাক হয়ে ফিসফিস করে বললো, ওমা ওকি, দেখো, দেখো, ছাগলছানা, না হরিণ? হরিণ!

আমরাও ঘুরে তাকিয়ে দেখলুম, একটা সত্যিকারের বাচ্চা হরিণ আমাদের থেকে কিছুটা দূরে এসে দাঁড়িয়ে সন্ত্রস্তভাবে তাকিযে আছে! তখনো সন্ধে নামেনি, চারপাশে স্পষ্ট আলো, তার মধ্যে একটা হবিণ এসে আমাদের অত কাছাকাছি দাঁড়িয়েছে! হরিণটা এক পা এক পা করে জলের দিকে এগোচ্ছিল। আমরা সবাই এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি, বরুণা খুব আস্তে আস্তে আমাকে বললো. কী সুন্দর! এত কাছে, ধরা যায় না? কলকাতায় নিয়ে গিয়ে তা হলে পুষবো।

সেই অড্রি হেপবার্ন মেয়েটা সুবিমলের আড়ালে ছিল বলে প্রথমটায় হরিণটাকে দেখতে পায়নি, তারপর, দেখতে পেয়ে সে হঠাৎ একটা দুর্বোধ্য ভাষায় সাঙ্ঘাতিক চিৎকার করে উঠলো। মেয়েটাকে এর আগে আমি কথা বলতেই শুনিনি, সে যে গলা দিয়ে অত জোর শব্দ করতে পারে ভাবিনি— সেই রকম চিৎকার করতে করতে মেয়েটা দৌড় লাগালো।

চিৎকার শুনে হরিণটাও ভয় পেয়ে পিছন ফিরে ছুটলো, বাঁধ পেরিয়ে পেছনের মাঠে নামলো, কিন্তু আশ্চর্য, বেশি দূর গেল না, খানিকটা দূরে গিয়ে থমকে দাঁডিয়ে রইলো। তারপর আবার এক পা এক পা করে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। হরিণটার কাণ্ড দেখে আমি থ, মানুষের এত কাছে আসবার ওর এত ইচ্ছে কেন কে জানে। সুবিমল দুঃখিত গলায় বললো, পুয়োর থিং! হরিণটা আজই মারা যাবে।

বরুণা চেঁচিয়ে উঠলো, মরে যাবে? কেন?

—বুঝতে পারছো না? ও তো মরীয়া হয়ে এখানে এসেছে জল খেতে। জঙ্গলে কোথাও তো এখন জল নেই, বোধহয় তিন চার দিন এক ফোঁটাও জল পায়নি— ছোটা দেখলে না, কী রকম নড়বড়ে, ঐ কি হরিণের ছোটা?

বরুণা ভয়ার্ত গলায় বললো, জল খাবে? চলুন, আমরা এখান থেকে চ'লে যাই, তা হলে ও জল খেতে পারবে, চলুন।

— আমরা সরে গেলেই ও জল খেতে পাবে ভেবেছো? ওর আয়ু শেষ হয়ে এসেছে, আহা, ভালো জাতের হরিণ, স্পটেড ডিয়ার—

সুবিমলের ভবিষ্যদ্বাণী ফলতে দেরি হলো না, সেই মেয়েটার সঙ্গে আট-নটা বাচ্চা ছুটে এলো, সবারই হাতে ছোটখাটো লাঠি, দু'জনের সঙ্গে তীর-ধনুক, হরিণটা ততক্ষণে আবার বাঁধের ওপর উঠে এসেছিল। এবার আবার ভয় পেয়ে ছুটলো, বাঁধের ওপাশে অনেকখানি মাঠ, ছোট ছোট গাছে ভরা, বহু দূর পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়। বাচ্চাগুলো হৈ-হৈ করে হরিণটাকে তাড়া করলো।

বরুণা বললো, ওরা হরিণটাকে মারবে? সুনীলদা বারণ করুন, উঃ না— না, বারণ করুন। কী সুন্দর তুলতুলে হরিণটা। সুনীলদা, আপনি ওটাকে ধরে আনুন না!

যেন বরুণা আমাকে সোনার হরিণ ধরে আনতে বলছে, সেই হিসেবে আমি শুধু বললুম, পাগল! হরিণ কখনো ধরা যায়!

—তাহলে, ওদের মারতে বারণ করুন!

আমি বললুম, আমি বারণ করলেই বা ওরা শুনবে কেন?

সিনেমা দেখার মতন আমরা সমস্ত দৃশ্যটা দেখলাম। হরিণটা এত দুর্বল যে, মোটেই জোরে ছুটতে পারছিল না। বাচ্চাগুলো তীর, পাথর লাঠি অনবরত ছুড়ছে, এবার লাঠির ঘা লেগে হরিণটা মাটিতে পড়ে গেল, আবার উঠে ছুটলো, তারপর একটা মোক্ষম তীর লাগলো ঘাড়ে, এবার চিৎ হয়ে পড়ে ছটফট করতে লাগলো, তীর সমেত আবার খানিকটা ছোটার চেষ্টা করেছিল, ততক্ষণে বাচ্চারা ওর কাছে পৌঁছে গেছে, দু'জনে দমাদম করে লাঠি দিয়ে পেটাতে লাগলো, সঙ্গে সঙ্গেই ছটফটানি শেষ। সমস্ত ব্যাপারটা ঘটতে পাঁচ মিনিটও লাগলো না।

অরুণা বললো, ইস্— এইমাত্রও বেঁচেছিল, কী রকম করুণভাবে জলের দিকে তাকিয়েছিল। চলো এবার বাংলোয় ফিরে যাই।

সুবিমল বললে, দাঁড়াও না, দেখি।

—না, চলো, রুনিটা একেবারে ছেলেমানুষ, এসব সহ্য করতে পারে না একটুও। আরে, কান্নার কি আছে।

বরুণা মুখ ফিরিয়ে বললো, আমি কাঁদছি না।

—কাঁদছিস না তো চোখটা মুছে নে। সত্যি এসব দেখাও পাপ। চলো চলো, আমরা এখান থেকে যাই।

বরুণা আঁচল দিয়ে চোখ মুছে কঠিন গলায় বললো, না, আমি এখন যাবো না!

সুবিমল শ্যালিকার কাঁধে হাত রেখে নরম গলায় বললো, আমার রুণিসোনার

বড় মনে লেগেছে, না? অত মন খারাপ করো না, দেখো বাচ্চাগুলো কী রকম আনন্দ করছে। আজ অনেকদিন বাদে ওরা বোধহয় পেট পুরে মাংস খাবে। ওরকম আনন্দের জন্য তো দু'একটা জিনিস মাঝে মাঝে মারতেই হয়। চোখের সামনে বলে খারাপ লাগছে, কিন্তু তোমাকেও যদি হরিণের মাংস দেওয়া হতো—

বাচ্চাগুলোর উল্লাস তখন দেখবার মতন, হরিণটাকে টানতে টানতে বাঁধের কাছে নিয়ে এসে ওরা প্রায় নাচানাচি শুরু করে দিয়েছে, হরিণটার ঘাড় ভেঙে গেছে, মুখে টাটকা গাঢ় রক্ত, তখনও বোধহয় একটু একটু প্রাণ ছিল, সেই মেয়েটা তীরের ফলা দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে পেটটা ফুটো করে নাড়িভুঁড়ি বার করে ফেললো, কী জ্বলজ্বলে হাসি মেয়েটার মুখে তখন। নিজেদের মধ্যে হাত পা নেড়ে কী যেন আলোচনা করলে, ওরা, আন্দাজে বুঝতে পারলুম, হরিণটাকে ওরা বোধহয় গ্রামের মধ্যে নিয়ে যেতে চায় না— তাহলেই তো আবার অন্যদের ভাগ দিতে হবে। ওরা সেখানেই, মাঠ থেকে ডালপালা জড়ো করে আগুন জ্বালালো।

আমরা বাঁধের ওপারে বসে ওদের দেখতে লাগলুম। আস্তে আস্তে অন্ধকার হয়ে এলো, উজ্জ্বল হয়ে এলো আগুনের রং, হরিণটাকে ওরা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঝলসাতে লাগলো। বরুণা হাঁটুর ওপর থুতনি রেখে এক দৃষ্টে সেই হরিণটার মসৃণ চামড়ায় আগুন লাগা দেখছে। ওদের আর তর সইছে না, মহানন্দে চেঁচামেচি করতে করতে একটু বাদে বাদেই এক এক টুকরো কেটে নিয়ে চিবিয়ে দেখছে, সেদ্ধ হয়ে গেছে কিনা।

আমি সুবিমলকে বললুম, এবার সত্যিই আমাদের চলে যাওয়া উচিত। ওদের খাবার সময় আমরা যদি এরকম একদৃষ্টে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি, তাহলে ওদেরও বোধহয় অস্বস্তি লাগবে।

সুবিমল বললো, যা বলেছিস্! চল উঠে পড়ি, আমারও লোভ লেগে যাচ্ছিল, জিভে জল এসে গেছে প্রায়!

রাজা

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

রেলগাড়ির শব্দ পেলেই বুকটা বড় চনমন করে ওঠে। ছুটি গিয়ে লাইনে কান পাততে ইচ্ছে করে ওর। কেমন যেন গুবগুব করে শব্দ ভেসে এসে বুকের ভেতর জমা হয়। কেমন যেন থিকথিক করে রসালো হয়ে যায় দেহটা। সুখে না দুঃখে ঠিক বুঝতে পারে না রাজা, কেমন যেন এক অপার রহস্য। মনে হতে থাকে, একটা আধকপালে মানুষ জন্ম নিচ্ছে। সারা গা থেকে তার চর্বি ধুইয়ে দেওয়ারও মানুষ নেই। নীলবর্ণ গর্ভধারিণী মা তার অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে একপাশে। কয়লার ধোঁয়া আকাশে ছড়িয়ে গিয়ে বাঘের মুখ রচিত হচ্ছে। লাইন ধরে একপাল নিশি-জাগা শেয়াল পার হয়ে যাচ্ছিল বোধহয়, তীক্ষ্ণ স্বরে হুইসল বাজিয়ে জানিয়ে দেয় ইঞ্জিন, সে আসছে গো, সে আসছে।

হ্যাঁ, এইভাবেই একদিন একটা ইস্টিশনে এসে প্রথমবারের মতো চোখ মেলেছিল রাজা। রেলবাবুরা ওকে নিয়ে জমা দিয়েছিল হাসপাতালে। রেলবাবুদের কৃপা, মাছি পিঁপড়ে ধরবার আগেই ওর গায়ে জল পড়ল, ওষুধ পড়ল, তুলতুলে বিছানা পেল ও। বোতলের দুধ চুষে চুষে ও বেঁচে রইল।

সেই রাজা এখন কুড়ি বছরের পুরুষ।

কুড়িটা বছর যেন হাওয়াই বাজির মতো পার হয়ে গেল। আই বাপ, ভাবতে গেলে গা ঝলমল করে, কুড়িটা বছর কি চাট্টিখানি কথা। সেই যে মায়ের পেট থেকে গাড়ির কামরায় পড়ে ওর বুকের ধুকধুকি শুরু হল, দিব্যি আজও তা চলেছে। বুকের ওপর হাত বিছিয়ে ও শব্দ পায়, হ্যাঁ চলেছে, ঠিক চলেছে। কানাডা ইঞ্জিন চলেছে। ও নিজেই যেন রেলগাড়ি হয়ে যায় মাঝে মাঝে। বয়লারে ঠিক মতো যদি কয়লা পড়ে, আর দেখতে হবে না। ঠিক চলে যাবে। বাকিটা জীবন ঠিক কাটিয়ে দেবে ও।

অথচ ওরকম একটা নামের জন্যই মাঝে মাঝে বিপাকে পড়ে যায় ও, রাজ্য নেই, পাট নেই, বাপ মায়েরই পাত্তা নেই, রাজা। কে যে ব্যঙ্গ করে ওরকম একটা নাম রেখেছিল ওর কে জানে। বাপ মায়ের দেওয়া নাম হলে কিছু থাকত না। কিন্তু এ নামটা ওর কে রেখেছিল; রেলবাবুরা, না হাসপাতালের ডাক্তারবাবুরা, না অর্ফানেজের দিদিভাইরা। যেই রেখে থাক, ব্যঙ্গ করেই রাখুক আর ভালবেসেই রাখুক, ও রাজা। রাজাবাহাদুর।

বাপের জন্য কোনকালেই ওর দুঃখ নেই। না থাকলেও মায়ের একটা আবছা ছবি মাঝে মাঝে ওকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরে। ছেঁড়া কানি ফানি পরা একটা মা। টিংটিংয়ে একটা পেট, ধুলোয় ধুলোয় ফ্যাকাশে কেমন চোখ মুখ। তা, সেই মানুষটা যদি মরে গিয়েও থাকে, নির্ঘাৎ স্বর্গ থেকে ওর দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে আছে। আর যদি এখনো বেঁচে থাকে ওর মা জননী, নির্ঘাৎ কানি পাগলির মতো গাড়িতে গাড়িতেই ঘোরে। গাড়ির এক কোণে বসে ঘা চুলকোতে চুলকোতে শেয়ালদা যায়, আবার ফিরে আসে। কে জানে ঐ কানি পাগলিই ওর মা কি না। রেলবাবুরা ওকে গাড়ি থেকে খোঁচাতে খোঁচাতে নামিয়ে দেয়, পাগলা কুকুর ওকে তাড়া করে করে গঙ্গার ধার অবধি এনে ফেলে। কিন্তু ব্যাপারটা ঐখানেই চুকে যায় না, দেখা যায় কানি পাগলি আবার এক সময় ঠিক উঠে এসেছে গাড়ির কামরায়। কে জানে নিজের ছেলেকেই ও রেলের কামরায় একদিন পেয়ে যাবে আশায় অমন করে বসে থাকে কি না।

অথচ কানি পাগলির জন্য বিন্দুমাত্র ওর ভাবনা নেই। কানি পাগলি ঘোরে বজবজ লাইনে আর ও জন্মেছিল ডানকুনি লোকালে। অর্ফানেজের বড়দির মুখেই শোনা ডানকুনি লোকালের লাস্ট ট্রেনে জন্মেছিল রাজা। ঘুটঘুটে রাত, তায় কামরায় কোন আলো ছিল না, জানালা কপাট ভাঙা, হু হু করে কেবল বাইরের বাতাস, বাইরের বাতাস আর পিচকিরি দিয়ে ছিটিয়ে দেওয়া মাঝে মাঝে কিছু আলো। তোর মা তখন মেঝেয় পড়ে ছটফট করছে ব্যথায়। সহায় নেই, সম্বল নেই, তোর মা আর তুই। গার্ড সাহেব ফ্ল্যাগ নাড়ছে, চালাও হে চালাও। লাইন ক্লিয়ার আছে চালিয়ে যাও। ফায়ারম্যান গনগনে আগুনের দরজা খুলে কয়লা ঠুসে দিচ্ছে বেলচা দিয়ে। ড্রাইভার চেন টেনে হুইসল বাজাচ্ছে, ঝাঁ ঝাঁ ঘুমের বিছানায় নড়েচড়ে ওঠে মানুষ, আশেপাশের গ্রামগুলো কেমন বিরক্ত হয়ে জাগে, আবার ঘুমিয়ে পড়ে। ব্যাস, ঐটুকুই ঘটনা ঘটেছিল তোর জন্মকালে। তুইও শেষ পর্যন্ত ড্যাং ড্যাং করে এই পৃথিবীতে চলে এলি।

— হ্যাঁ বড়দি, আমার মায়ের কি হল তারপর? আমার মা—

— মায়ের কথা বুঝি খুব মনে পড়ে তোর? রাজাকে আদর করে কাছে টেনে নিয়েছিল বড়দি। মায়ের যদি বিবেকই থাকবে তাহলে কি তোকে কাছছাড়া করে!

মানে, আমার মা বেঁচে নেই বলছ! ঘন চোখের আবেগ নিয়ে তাকিয়ে থাকে রাজা।

— তাই বা বলি কি করে। আমরা তো আর চোখে দেখিনি। রেলবাবুরাও নাকি তোর মাকে দেখেনি। নইলে কি আর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে তুই এখানে আসিস।

রাজা আর কথা বলেনি। ডানকুনি লাইনে কানি পাগলির মতো ওর মা এখনো ঘুরে বেড়ায় কিনা কে জানে! দেখতে বড় ইচ্ছে হয়!

বছর দশেক বয়েস হলে একদিন ও আশ্রম থেকে বেরিয়ে পড়ে, পালায। যেন সেদিন থেকেই রাজা ভাগদখলেব দাযিত্ব নেয় সারা পৃথিবীর। সে সব অনেক কথা, অনেক ইতিহাস। আজ শুরু হয়েছিল যেখান থেকে সেখানেই আবার ফিরে আসা যাক।

রাজা আ আ আ—

হঠাৎ কেমন ও চমকে ওঠে। রেললাইনের ধাবে সন্ধে থেকেই ঘুর ঘুর করছিল ও। লাইনে কান পেতে মাঝে মাঝে আবোল-তাবোল কত কি সব যেন ভাবছিল রাজা। চোখ ধাঁধানো আলোর ফোকাস এসে চোখে লাগল। লাগতেই ও বুঝতে পারল, একশ হাতেব ও তফাৎ নয় একটা গাড়ি এসে পড়েছে। আর, কিছুক্ষণ ঐভাবে লাইনের ওপর পড়ে থাকলে গাড়ির চাকা ওকে পিষে ফেলত। কয়েক হাত ছিটকে লাফিয়ে ও সরে এল। তাবপর গাডিটার দিকে রহস্যময় চোখে ও তাকিয়ে থাকল।

—কি রে, কি হল তোর? নিমু এসে ততক্ষণে ওর পাশে দাঁড়িয়েছে।

গাডিটা সামনে দিয়ে চলে না যা ওয়া পর্যন্ত কথা বলতে পারল না রাজা। অনেকক্ষণ পব বলল, কিছু না। হাসল। আসলে নিমুদা রেলগাড়ি দেখলেই না বুকের ভেতর কেমন যেন একটা ব্যাপার হয়।

— কি হয়?

রাজা আসল কথাটা চেপে গেল। বলল, এই খুব দেশ-বিদেশ ঘুরে দেখতে ইচ্ছে হয়।

— যাহ শালা, আমি ভাবলাম, কি না কি বলবি। আমি ভাবলাম গাড়ির চাকা-ফাকা খুলে হজম করার কথা বলতে চাইছিস।

রাজা একটু দমে গেল। ক'দিন ধরেই নিমুদা ওর পেছু লেগেছে। ক'দিন ধরেই অন্য সব প্রসঙ্গ ওকে ফিসফিস করে বোঝাতে চাইছে। নিমুদারা না পারে হেন কাজ নেই। ইচ্ছে করলে নিমুদারা গোটা রেলগাড়িটাই হজম করে ফেলতে পারে।

নিমু আবার চিবিয়ে চিবিয়ে প্রশ্ন করল, কি রে, কথা বলছিস না যে?

রাজা হাসল, কি বলব!

— বটে, তা হলে আমিই তোকে ক'টা কথা শুধোই, সাফ সাফ জবাব দে দেখি।

বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে রাজার, কি কথা কে জানে!

— লাইনের ওপর অমনভাবে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলি কেন? পালাতে চাইছিলি?

— কেন কেন, পালাব কেন!

— তাহলে কি ভেবেছিলি বল।

রাজা বুঝতে পারে না, কি বলবে। সত্যি কথা বললে কি নিমুদা বিশ্বাস করবে। নিমুদা তো আর রেলগাড়িতে জন্মায়নি। ওর বাবা আছে, মা আছে। ও বুঝতেই পারবে না, রেলগাড়ির শব্দ শুনলে কেন অমনভাবে রাজার বুকের ভেতর গুরগুর করে কেঁপে ওঠে।

—তা হলে দেখ, ঠিকই ধরেছিলাম, তুই পালাতে চেয়েছিলি!

— না নিমুদা। বিশ্বাস করো, এমনি এমনি এদিকে চলে এসেছিলাম।

থাবড়া মেরে নিমু ওর পিঠের ওপর হাত রাখল। পালিয়ে আর কতদূর যাবি রে রাজা, আমরা ঠিক তোকে খুঁজে বার করব।

রাজা কেমন এলোমেলো হয়ে যায়। নিমুদা, আমার ওসব খারাপ কাজ ভাল লাগে না।

— খারাপ কাজ! হা হা করে হেসে উঠল নিমু। রেলগাড়ির মাল হাপিস করাটা বুঝি খারাপ কাজ, কোনটা ভাল কাজ তাহলে?

— আমি গরিব মানুষ। একজনের পেট, কোনক্রমে আমার চলে যাচ্ছে।

— বটে! নিমু একটুক্ষণ দাঁতে দাঁত ঘষল, শুনলাম, সাধুর দোকানে আজকাল বিড়ি বাঁধছিস?

রাজা নরম গলায় বলল, বাঁধছি।

— কত পাস?

— এখনো কিছু দেয়নি, এই দিন কয় হল কাজে লেগেছি।

— মাসে কত রোজগার হবে সেটা বুঝিস না।

রাজা মিনমিন করে বলল, যা হবে, তাতে চলে যাবে আমার।

— তুই তোর ভবিষ্যতের কথা ভাবিস না? তুই একদিন বিয়ে করবি, তোর ছেলে মেয়ে হবে। ভাল ভাবে বেঁচে থাকতে হলে কত পয়সা তোর দরকার হবে। এখন থেকে যদি তুই রোজগার না করিস।

— ওভাবে চুরি-ডাকাতি আমার পোষাবে না।

নিমু যেন ঠাস করে একটা থাপ্পড় খেল গালে! কিন্তু রাগটা হজম করে বলল, বিড়ি তো বাঁধছিস, পকেটে স্যাম্পল আছে? ছাড় দেখি।

রাজা বলল, কাল তোমাকে সোনামুখি বিড়ি খাওয়াবো নিমুদা, আজ নেই।

— কাল খাওয়াবি। নিমুর চোখ জোড়া সাপের মতো জ্বলছিল। ধর কাল যদি তুই বেঁচে না থাকিস!

রাজার গা শিরশির করে উঠল, মানে!

— মানে, মানুষের মরা বাঁচার কি বিশ্বাস আছে। যে দিনটা যায় সে দিনটাই আমরা বেঁচে থাকি। পরের দিনটা আবার বাঁচব কিনা দিনটা না কাটলে তো আর বলতে পারি না।

— তুমি যেন কি রকম সব কথা বলছ নিমুদা। আমার ভাল লাগছে না।

— কেন খুব সহজ করেই তো বলছি। আচ্ছা ধর, আরো সহজ করে বলছি, তোর তো এতখানি বয়স হল, তুই তো ভালমন্দ সব কিছু এখন বুঝতে শিখেছিস, তাই না।

রাজা ফ্যাকাশে চোখে তাকিয়ে থাকল।

— তুই তো এখন এটা বুঝেছিস, আমরা বাজে কথা বলি না। তোকে আগেও বলেছি, এখনো বলছি, আমাদের হয়ে যদি কাজে হাত না লাগাস তুই, তোর ঐ তরমুজের মতো পেটটা আমরা ফাঁসিয়ে দেব।

— রেল ইয়ার্ড থেকে আমি মাল সরাতে পারব না। আমি বিড়ি বেঁধেই খাবো।

নিমু হাসল, ক'দিন খাবি? তারপর দাঁত ঘষে ঘষে বলল, ঠিক আছে রেলে যদি কাজ করতে না চাস তুই, অন্য জায়গায় কাজ কর। চারপাশে আমাদের অনেক কাজ।

রাজা চুপ করে থাকল।

— তুই তো আগে কেদারবাবুর বাড়িতে কাজ করতিস?

রাজা অল্প করে মাথা নাড়ল, হ্যাঁ করতাম। কেদারবাবুর ছেলেকে ইস্কুলে নিয়ে যেতাম, ইস্কুল থেকে নিয়ে আসতাম।

— ঐ বাড়ির নাড়ীনক্ষত্র তোর জানা।

— কিছু কিছু জানি।

— ক'জন থাকে ও বাড়িতে?

আঙুলের কড়া গুনে গুনে রাজা বলল, কেদারবাবু, বৌদি, কেদারবাবুর মা, আর এক ছেলে দুই মেয়ে।

— মালকড়ি ওরা কোথায় রাখে?

রাজা সঙ্গে সঙ্গে ছটফট করে উঠে বলল, আমি ও বাড়িতে অনেকদিন নুন খেয়েছি, নিমকহারামি করতে পারব না।

নিমু রাজার পিঠে আবার একটা থাবা কষাল, ঘরেরও খাবি না, বনেরও খাবি না, তা কখনো হয়! সাফ সাফ বলে যাচ্ছি, যে কোন একটা তোকে করতেই হবে।

রাজা পাথরের স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে থেকে শুনল।

— আর যদি বিট্রে করিস, তা হলে, এই দেখ, দেখেছিস?

কোমরের খাঁজ থেকে ঝকঝকে একটা ছোরা বার করল নিমু।

রাজার তলপেটে শিরশির করে কাঁপতে শুরু করল।

— একদিন মাত্র তোকে সময় দিলাম ভেবে দেখতে। একদিন মানে কতক্ষণ সময় জানিস তো! চব্বিশ ঘণ্টা।

ড্যাগারটা রাজার বুকের কাছ তুলে এনেছিল নিমু। আবার তা গুটিয়ে নিয়ে একঝলক হাসল, তারপর অন্ধকাবের মধ্যেই ঝাঁ করে কোথায় মিলিয়ে গেল।

অনেকক্ষণ কেটে গেল রাজার ঘোরটুকু কাটাতে। চারপাশে ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে এতক্ষণ পর যেন বুঝতে পারল ও। রেললাইনেব পাশে স্বল্পস্বল্প ঝোপ। ঝোপের ভিতর দপদপ করে জোনাকি জ্বলছে। বহুদূরে দেখা যাচ্ছে ডিসট্যান্ট সিগন্যালের লাল টকটকে আলো। স্টেশন এখান থেকে এমন কিছু একটা দূরে নয়। স্টেশনের দিকে প্রায়ই ঘুরতে ঘুরতে চলে যায় রাজা।

আজও কি যেন হল ওর, স্টেশনটাই হাতছানি দিয়ে ওকে ডাকল। প্রথমে ধীরে ধীরে, চারপাশে চোখ ঘুরিয়ে নজর করতে কবতে, না নিমুদার আর নাম গন্ধ নেই, তারপর বেশ জোরে জোরেই ছুটতে শুরু করল রাজা।

পায়ের নিচে দৃঢ় কঠিন লাইনের ছোঁয়া পাচ্ছে ও। এই লাইনের ওপর দিয়েই গাড়ি চলে। গুব গুব করে শব্দ হয়। কানি পাগলি কি এখনো সারা গায়ে ঘা জড়িয়ে বেঁচে আছে। কে জানে, কে বলে দেবে ঐ কানি পাগলিই সত্যি সত্যি ওর মা কি না।

বেশ জোরে জোরেই ছুটতে শুরু করল রাজা। লাইনেব পাশে বড বড কয়েকটা গাছ। ঘন জমাট বাঁধা ছায়া তাব। ছায়াগুলো এড়িয়ে এড়িয়ে চলল রাজা। আর ততক্ষণে লাল ডগডগে আলো পাল্টে গিয়ে সবুজ হয়ে উঠল। তবে কি আবার গাড়ি আসছে। কোন গাড়ি এটা।

রাজা পাগলের মতো ছুটে চলল স্টেশনের দিকে। কোন গাড়ি, কোথায় যাবে এই গাড়ি। নাহ্, আশেপাশে কেউ নেই, কেউ লক্ষ্য করছে না ওকে।

আর কিছুক্ষণের মধ্যেই স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে এসে পৌঁছে গেল রাজা। বেলিং ধরে হাঁপাতে শুরু করল ও। হাঁপাতে হাঁপাতে হাঁপাতে এক সময় আবার সারা শবীবটা ওর জুড়িয়ে এল।

দুজন চাবজন লোক ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে দেখতে পেল রাজা। একটু বোধহয় অন্যমনস্কই হয়ে পড়েছিল, হঠাৎ আবার চমকে উঠল, কে।

— ও আপনি। দেখল, বুড়ো পয়েন্টসম্যান ওর পাশটিতে এসে দাঁড়িয়েছে। এক গাল হাসল রাজা, কি গো প[illegible]বু, ভালো ?

— এত রাতে এখানে কি করছিস ? প্রশ্ন করল লোকটা।

অপরাধীর মতো চোখ তুলে রাজা একটু হাসল, চলে এলাম বেড়াতে বেড়াতে।

— বেড়াতে বেড়াতে। লোকটা কেমন সন্দেহের চোখে তাকাল, তারপর সাধু সাধু গলা করে বলল, বাড়ি যা রাজা। ধান্দা ভাল না, বাডি যা।

বলতে বলতে লোকটা চলে গেল।

আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝমঝম করে চলে এল একটা ট্রেন। এল যেন বুকের রক্তে এলোমেলো ঢেউ তুলে দিয়ে। বাপস, একটা যেন দত্যি। একটা যেন ঝড়।

কি যে এখন করা উচিত বুঝতে পারছিল না রাজা। গাড়ি থেকে লোক নামছে, মাল নামছে। গাড়ির কামরায় লোক উঠছে দেখতে পেল ও। ঠায় দাঁড়িয়ে রইল রাজা! ভুলে গেল আজকাল ও বিড়ি বেঁধে খায়। ভুলে গেল কিছুক্ষণ আগেই নিমুদার খপ্পরে পড়েছিল ও। ভুলে গেল কেদারবাবুর কোন লকারে গয়না থাকে।

গাড়িটার কাছাকাছি এগিয়ে এল রাজা। গাড়ির গায়ে হাত বোলাল, আহ্, এমনি একটা গাড়িতেই জন্ম নিয়েছিল ও। সেটাও ছিল এমনি একটা রাত। সেটাও ছিল এমনি এক ঘন দুর্যোগের দিন।

ও কি চলতে শুরু করল নাকি গাড়িটা। এক মুহূর্তে কেমন যেন পাল্টে গেল রাজা। তড়াক করে ও লাফিয়ে উঠে একটা কামরায়। ইস কি অন্ধকাররে বাবা! বগির ভেতর কে কে আছে দেখা যাচ্ছে না। জানালা ভাঙা, আলো নেই, কি হাল হয়েছে গাড়িটার!

রাজা মেঝের ওপরই বসে পড়ল। গুব গুব করে শব্দ। কেমন এক অপার রহস্য যেন জড়িয়ে আছে শব্দটার ভেতর। রসস্থ হয়ে ওঠে ওর রক্ত মাংস মজ্জা। হায় রে, এমনি এক চলন্ত গাড়িতেই জন্ম হয়েছিল ওর। আর ওর জন্মের সময় ঠিক এমনিভাবেই বুঝি হুইসল্ বেজে উঠেছিল গাড়িটার। হুইসলের শব্দে সারা শরীর কাঁপতে শুরু করে রাজার।

আরো কিছুক্ষণ ও ঘোে র মধ্যে কাটাল। হঠাৎ আবার সেই চিৎকার, রাজা আ আ আ---

অবিকল সেই নিমুদার মতো গলা। নিমুদাই কি! না, ভুল। আরো শক্ত হয়ে পা গুটিয়ে বসে পড়ল রাজা। হে ভগবান, নিমুদার সঙ্গে যেন জীবনেও আর দেখা না হয় গো।

সুখে হোক দুঃখে হোক গতির মধ্যেই বসে থাকতে ভাল লাগে ওর।

জলধর ব্যানার্জির মৃত্যু

দেবেশ রায়

সাতান্ন বৎসব বয়সে জলধর বন্দ্যোপাধ্যায় নামক সেই অতি সাধারণ, বাঙালি মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকটি দুটি পুত্র, একটি পুত্রবধূ, স্ত্রী, বিবাহিতা কন্যা রেখে মারা গেলেন। জলধর ব্যানার্জি সেই জাতের লোক, 'বেঁচে ছিলাম' এ-কথাটা ঘোষণা করার জন্য মবা ছাড়া যাদের আর কোন পথই খোলা নেই। রোগা, বেঁটে, একটু কুঁজো, হাতের শিরাগুলি পাকানো, ভুরুর মাঝখানে তিন চারটি ঘন পাতলা রেখা—জলধর ব্যানার্জির এই দেহটা একটা আশ্চর্য ভঙ্গিতে তক্তপোষের ওপর পড়েছিল—সেই তক্তপোষটা যার কাঠের দৃঢ়তা ও অমরতা নিয়ে জলধরবাবু সারাজীবন বাণী প্রচার করেছেন। সেই অমর, একটুও না-নড়া, পাথরের মতো ভারী, একজন রোগা প্যাটকা লোকের পক্ষে বিশাল তক্তপোষটার ওপর জলধরবাবুর শরীরটা অদ্ভুত মহিমা নিয়ে পড়েছিল, যেন বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্র মেদিনী দিতে অস্বীকৃত দুর্যোধন কুরুক্ষেত্রের মাটির ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করছেন।

বাইরে বাঁশ ফাঁড়ার আওয়াজ উঠছে। পাড়ার ছেলেছোকরারা নীরবে প্রায় নিঃশব্দে ব্যবস্থাদি করছে। বাঁশ ফেঁড়ে নারকেল দড়ি দিয়ে বেঁধে বেঁধে জলধরবাবুকে শ্মশানে নিয়ে যাবার পালঙ্ক তৈরি হচ্ছে। সেই বিশাল পালঙ্ক থেকে জলধরবাবুর শরীরটাকে নিয়ে যাওয়া হবে ঐ দেড়হাত চওড়া বাঁশের খাটে।

জলধরবাবুর দেহটাকে ঘিরে বসে তাঁর স্ত্রী, আর পাড়া প্রতিবেশিনীরা। পুত্রবধূ বাইরে, জলভরা চোখে যে যা বলছে করে দিচ্ছে! দুই ছেলে একেবারে বাইরের মাঠে দাঁড়িয়ে। মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে, তার করা হয়েছে। জলধরবাবুর আত্মীয়স্বজনরা কেউ খাটের পাশে, কেউ বাইরে। জলধরবাবুর অফিসের সহকর্মীরা এসেছেন। তাঁদের মধ্যে জলধরবাবুর চেয়ে বয়স্ক একজন বাইরের বারান্দায় চেয়ারে হাসপাতালের মেটার্নিটি ওয়ার্ডের বারান্দায় নতুন স্বামী, হবু-বাবার মতো মুখ করে বসে আছেন।

সমবেত জনমণ্ডলীকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এক, যারা কাজে ব্যস্ত। দুই, যারা এসে একবার মাত্র জলধরবাবুর মরা শরীরটা দেখে, তাঁর কথা আলোচনা করছিল। তিন, যারা একেবারে চুপ— জলধরবাবুকে ধরাধরি করে যখন বাইরে নিয়ে যাওয়া হবে, সেই বিশাল তক্তপোষটা থেকে ঝাঁপিয়ে মেঝেতে পড়ে কাঁদা শুরু করবে এই অপেক্ষায়।

গত পঁচিশ বছর ধরে জলধরবাবু যে এক ও অকৃত্রিম চেহারায় সকলের কাছে প্রত্যহ আবির্ভূত হয়ে নিজের অস্তিত্বটাকে মুছে এনেছিলেন ঠিক সেই চেহারায় তক্তপোষটার ওপর শায়িত দেহটা সবাইকে চমকে দিয়ে জানাল, অ্যাঁ, এ লোকটা বেঁচেছিল এবং মরে গেল। জলধরবাবু সপ্তাহে একদিন দাড়ি কামাতেন। সেই দিনটি আসবার আর দু'দিন বাকি ছিল। একটুখানি চোপসানো মুখ ভর্তি একরাশ সাদা দাড়ি সেই হিসেবটা ধরিয়ে দিতেই জলধরবাবুর দাড়ি কাটার কথা ও দৃশ্য সবার মনে ও চোখে ভেসে উঠল।

দেয়ালে একটা ঘড়ি। গত চারঘন্টা ধরে সেটা নিজের খেয়ালখুশিমতো সময় দেখিয়ে ও ঘন্টা বাজিয়ে জোর করে সবার চোখটাকে নিজের দিকে টেনে এনে জলধরবাবুর দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছে।

বাইরে, কাজকর্ম দৌড়দৌড়ির সুবিধার জন্য একটা সাইকেল দরকার। যতবার সেই দরকারের কথা মনে আসছে, ততবার বাইরের ঘরের কোনায় রাখা সাইকেলটার দিকে সবাই চাইছে আর চাওয়ামাত্রই তাদের মন জলধরবাবুর দিকে ছুটছে।

দেয়ালে একটা ছবি, কাচ ধূসর, ছবিটাও অস্পষ্ট, তবু বোঝা যায় একটা অভিনয়ের কোনো দৃশ্য।

দেয়ালের ঘড়ি, বাইরের সাইকেল, কোনো এক অভিনয়েব বিলীয়মান ছবি আর জলধরবাবুর মুখের দাড়ি জলধরবাবুর বেঁচে থাকার কথা ঘোষণা করছে। ঘড়িটা চলে এবং সময় বলে, তবে তার সঙ্গে পৃথিবীর আহ্নিকগতির ছন্দের কোন মিল নেই। সাইকেলটা চলে, তবে তাকে চালানোর কায়দা পৃথিবীর অন্য সব সাইকেল থেকে স্বতন্ত্র। ছবিটা কোন্ এক অভিনয়ের— তপোবন, কোষমুক্ত তরবারির হাতে রাজা, জানুনির্ভর বক্ষনিবন্ধ-পানি উন্মুক্ত কেশা এক রমণী, মৃত এক তপস্বী, আরো দু-একজন, ঝকমক সাজপোশাক পরে কাঠের দেওয়ালে ঝুলছে— বুড়ো বয়সে প্রথম রামায়ণ শোনার স্মৃতির মতো। ভাঙা তোবড়ানো গালভর্তি দাড়ি সেই বিশেষ পদ্ধতিতে উৎপাটিত হবার আশঙ্কায় যেন কন্টকিত।

এরাই জলধর বন্দ্যোপাধ্যায়। জলধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের তক্তপোষের ওপর শায়িত শরীরটা যেন একটা মিথ্যে ব্যাপার। যে জলধর ব্যানার্জি একা, অদ্বিতীয়, বিশিষ্ট, স্বমহিম, সম্রাজ্ঞীর মতো অদৃশ্য ও উদ্ধত, অর্জুনের মতো একাগ্র ও বীর এবং— ব্যর্থ ব্যর্থ ব্যর্থ— এরাই সেই মধ্যবিত্ত বাঙালি ভদ্রলোকটি।

সবাই যেমন করে সকালে ঘুম থেকে উঠে রাতে ঘুমুতে যায়, জলধরবাবুর দিনযাপন তা থেকে একটুও ব্যতিক্রম ছিল না। এমনকি যেটুকু ব্যতিক্রম না থাকলে অস্তিত্বটাকেই আলাদা করে বোঝা যায় না, সেটুকুও ব্যতিক্রম জলধরবাবুর ছিল না। জলধরবাবুকে নদীর খড়কুটোর সঙ্গে তুলনা করাটাও ঠিক নয়, কেননা স্রোতে অসহায়ের মতো ভেসে গেলেও খড়কুটোটাই স্রোত হয়ে যায় না। জলধরবাবু একেবারে আর পাঁচজনের মতো, জলধরবাবু-ই আর পাঁচজন। পাড়ার অবিনাশবাবু বা মোহিনীবাবু বা মাখনবাবু বা যতীনবাবু যদি বাজারের মাছের দর বা আমেরিকার রাজনীতি নিয়ে জলধরবাবুর সঙ্গে আলোচনা করতে আসেন, জলধরবাবুকে না পেলে তাঁরা সনাতনবাবু বা সুকুমারবাবু বা গিরিজাপ্রসন্নবাবুর সঙ্গে স্বচ্ছন্দে আলাপ করে যান।

প্রাত্যহিক দিনযাপনের কতকগুলো ঘটনার দিকে বা জীবনযাপনের অপরিহার্য প্রত্যহ ব্যবহার্য বস্তুগুলোর দিকে নজর দিলে দেখা যায়, জলধরবাবুর কতকগুলো ব্যাপার ছিল, যে ব্যাপারগুলো প্রতিদিনের ঘর্ষণে সমস্ত অভিনবত্ব হারিয়েও একেবারে পুরানো, মরচে ধরা ও বাতিল হয়ে যায়নি। সেগুলোই জলধরবাবু, আর তার জন্যই, জলধরবাবুর মতো এত সাধারণ, করুণার উদ্রেক করে এত অব্যতিক্রমী, পয়ার ছন্দের মতো নিয়মমাফিক অচঞ্চল ও বিরক্তিকর লোকটির স্ত্রীর পাশে ঠিক অমনি সাধারণ অব্যতিক্রমী অচঞ্চল ও বিরক্তিকর অবিনাশবাবু, মাখনবাবু, যতীনবাবু, মোহিনীবাবু, সনাতনবাবু, সুকুমারবাবু বা গিরিজাপ্রসন্নবাবু রাত্রিবেলা শোন না, যদিও নিজের স্ত্রীর পাশে শুয়ে তাঁরা যত তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়েন, পরস্ত্রীর পাশে শুলেও তার চেয়ে বেশি সময় জেগে থাকতে পারবেন না।

যে যে কারণে জলধরবাবুকে সবাই জলধরবাবুই ডাকতেন, তার অন্যতম হচ্ছে তাঁর বাহনটি। জলধরবাবু যে সাইকেলটি চড়ে সিংহবাহিনী দুর্গার মতো অবলীলায় পথ চলতেন, তাতে তিনি ব্যতীত আর একজন মাত্র বসতে পারত, সে তার দ্বিতীয় পুত্র। সে পুত্র বর্তমানে শোকাভিভূত। তাই সাইকেলের প্রয়োজন থাকলেও সেই সাইকেলটি ঘরের কোণে পড়ে আছে, বিষ্ণুবিহীন গরুড়ের মতো। ঠিক জানা যায় না, জলধরবাবুও বলতে পারতেন না, তবে, আনুমানিক পঁচিশ তিরিশ বছর আগে এই জাপানি সাইকেলটি ও সেই জাপানি দেয়ালঘড়িটি জলধরবাবু কেনেন তখনকার এক পুজো স্পেশ্যাল ট্রেন থেকে। এ দুটো কবে যে ঠিকমতো চলত তা স্বয়ং দেবতাও বলতে পারেন না। সাইকেলটা চলে, চলে, চলে আর পেছনের মাডগার্ড আর চেন হুইলে একটানা অর্কেস্ট্রা বাজে ঝন ঝন ঝন, আবার কখনো কিন্ কিন্ করে আওয়াজ ওঠে— সেতারের সবচেয়ে সরু তারটায় টোকা দিলে যেমন হয়। সিটে বসলেই সিটটা ঘুরে যায়, সিটের সেই মুখটা ঘোরানোতে হাত থেকে হ্যাণ্ডেল ছিটকে যেতে পারে। তখন, একটা বিপরীত চাপ দিয়ে সেটাকে সোজা করে নিতে হয়। আড়াইটি করে প্যাডলের পর একটু বিরাম, আবার এক দুই আধ : বিরাম;

এক দুই আধ: বিরাম। যদি কখনো এই আধটা এক হয়ে যায় বা সোয়া হয়ে থাকে— প্যাডেলটা খসে যাবে। সেই একতালে চলতে হবে এক-দুই-আধ, এক দুই-আধ। ব্রেক কষলেই ব্রেক হয় না, ওটাকে ডানদিকে টেনে ওপরে তুলতে হয়— মোটরের গিয়ার দেবার মতো। এতেই নিশ্চিন্ত নয়। এ সাইকেলটার স্বাধীনতা বোধ আছে। তাই আরোহীর নির্দেশ তার কাছে সদামান্য নয়। নিজের খেয়ালখুশিতে সে কখনো বাঁয়ে যায়, কখনো ডাইনে চলে বেঁকে বেঁকে। তখন আরোহী নিতান্ত অনুগত না থাকলে অবশ্যম্ভাবী ও অনিবার্য পতন।

প্রতিদিন সকালে জলধরবাবু সাইকেলটাকে মেঝেতে শোয়াতেন, তারপর একটা কাঠের বাক্স থেকে নানারকম যন্ত্রপাতি বের করে আমস্তক বল্টু টাইট করতেন, তেল দিতেন, মুছতেন, এক-একটা ফুটোর মধ্যে ফুঁ দিয়ে ধুলো পরিষ্কার করতেন— জন্মরোগা ছেলের যেমন শুশ্রূষা করেন মা!

সাইকেল-সেবার পর ঘড়ি-সেবা। ঘড়িটাকে তিনিই সেই আদ্যিকাল থেকে দম দিয়ে আসছেন। প্রতি ববিবার সকালে সেটা মেঝের ওপর উপুড় করতেন, তার ভেতরের কলকব্জাগুলো সাফ করতেন, তেল দিতেন। কিন্তু এত সেবা ঘড়িটির সহ্য হয়নি। প্রায়ই ছোটখাটো পার্টস হারিয়ে যেত। অনেক খোঁজাখুঁজির পর যখন সেটা পাওয়া যেত না, তখন জলধরবাবু তার কিংবা সুতো দিয়ে সেটার একটা চিরদিনের জন্য আপাতত ব্যবস্থা করতেন। ফলে, ঘড়ির কাঁটা কখনো দু-চার ঘণ্টা আগুপিছু ছাড়া নড়ত না। আর পৃথিবীর এই গোলার্ধের এই দেশটির অন্যান্য সব ঘড়িতে যখন আটটা বাজে, ' ঘড়িটা নির্বিবাদে তখন ছ'টা বা দশটা দেখাত, এবং গম্ভীরভাবে তিনটে ঘণ্টা বাজিয়েই থেমে যেত! সাইকেল যেমন জলধরবাবুর দ্বিতীয় পুত্র এবং তিনি ব্যতীত আর কারো পক্ষে চড়া সম্ভব ছিল না, এ ঘড়িটার দিকে জলধরবাবু ছাড়া আর কারো তাকানো তেমনি অসম্ভব ছিল। এ ঘড়ির সময় একেবারে জলধরবাবুর নিজস্ব, ঘড়ির বাজনা শুনে, কাঁটার দিকে তাকিয়ে মনে মনে একটা যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ করে জলধরবাবু ব্যস্ত বা শান্ত হতেন। জলধরবাবুর এমন আরো কিছু কীর্তি ছিল। বিয়ের সময় পাওয়া তাঁর স্ত্রীর সেলাইয়ের মেশিনটা থেকে তিনি দীর্ঘদিনের চেষ্টায় সুতো বের হওয়াটাই বন্ধ করে দিয়েছেন। এর জন্য তাঁর স্ত্রী মাঝে মাঝে তাঁকে দায়ী করতেন। সে দায়িত্ব নীরবে মেনে নিয়ে জলধরবাবু সাইকেলটাকে বেগবান, ঘড়িটাকে প্রাণবান ও কলটাকে সূত্রবান করবার সাধু প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতেন।

জলধরবাবু দাড়ি কামাতেন সপ্তাহে একদিন। আজ তাঁর মৃত্যু হয়েছে। পরশুদিন তাঁর দাড়ি কামাবার দিন ছিল। এবং সেই মৃত জলধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখের দাড়িগুলো এমন খোঁচা খোঁচা হয়ে আছে যে, পরশুদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকলে জলধরবাবু যে তাঁর সেই বিশেষ পদ্ধতিতে দাড়ি কামাতেনই, এ বিষয়ে কারো কোনো সন্দেহ

নেই।

কাচ-ভাঙা আলমারির উপর থেকে বেরোত টিনের একটা লম্বা কৌটা, তার ভেতর থেকে বেরোত একটা ছোট আয়না, তাতে এক জলধরবাবুই মুখ দেখতে পারতেন, লোম উঠে যাওয়া একটা ব্রাশ, একটা ভাঙা কাচের গ্লাস, একটা ব্লেড, একটা মরচে-পড়া সেফটি-রেজার। এগুলো নিয়ে জলধরবাবু বাইরের ভাঙা বেঞ্চটায় গিয়ে বসতেন। তারপর সেই ভাঙা কাচের গ্লাসটায় জল নিতেন। এরপর সেই ব্লেডটাকে সেই গ্লাসের ভেতরে গুনে গুনে আটাত্তরবার ঘষতেন। এই গোনা আর ব্লেড ঘষার মাঝখানে যদি কেউ এসে কোনো কথা বলত, জলধরবাবু চেঁচিয়ে উঠতেন— "দিলে তো গোনাটা নষ্ট করে।" তারপরে আন্দাজমতো একটা ধরে আবার গোনা শুরু করতেন— পঁয়ত্রিশ, ছত্রিশ, সাঁইত্রিশ।...

বাড়িটা জলধরবাবুর নিজের। তার মেঝের সিমেন্ট চটে, ভেঙে, এবড়োখেবড়ো, খুঁটিগুলো সাবেকি ঢঙে অটুট। বাড়ির কথা উঠলেই আহ্লাদে গদ্‌গদ হয়ে যেতেন জলধরবাবু: "এ-কী আজকালকার বাড়ি হে! একেবারে আসল শালগাছের আস্ত খুঁটি— এত বছর গেল, তবু একটুও নড়চড় নেই। দেখ না, মেঝে ভেঙে গেছে, কিন্তু খুঁটিতে একটুও চিড় খায়নি।" জলধরবাবু নিজের মনেই খুঁটির গায়ে হাত বোলাতেন আর হাসতেন।

বাজারটাও জলধরবাবু নিজেই করতেন। বাজারের থলি নিয়ে তিনি যখন ধাঁ-ধাঁ করতে করতে বাড়ি ফিরতেন তখন সমস্ত ভঙ্গিতে একজন মহা-দিগ্বিজয়ীর ভাব ফুটে উঠত। ভারত জয় করে সুলতান মামুদ যেন ব্যস্ত হয়ে ঢুকছেন গজনির প্রাসাদে—'এসব দেশ জয় করার মতো সামান্য ব্যাপারে আমাকে কেন যে তোমরা ব্যস্ত কর'— এ-রকম একটা সহজ কৃতিত্বও ও অনায়াস-সাফল্যের ভাব ফুটে থাকত জলধরবাবুর সমগ্র চেহারায়। কেউ যদি জিজ্ঞেস করত— "কত করে আলুর সের আনলেন।" অপাঙ্গে দৃষ্টি দিয়ে জলধরবাবু জবাব দিতেন—"সাড়ে তিন আনা।" "বাজারে যে দেখলাম সাত আনা করে।" এ-প্রশ্নের জবাবে জলধরবাবু কোনো জবাব দিতেন না, একটা চাউনি দিয়ে বুঝিয়ে দিতেন, "আমার নাম জলধর বাঁড়ুজ্জে, ওসব ফট্‌ফটি আমার কাছে চলবে না।"

কুমোর প্রতিমা তৈরি করে। সাজে সজ্জায় ঝলমলো দুর্গা প্রতিমাকে সে খরিদ্দারের হাতে তুলে দেয়। কিন্তু তখনো পুজোর প্রতিমা, প্রতিমা হয় না। কুমোর খরিদ্দারের হাতে তুলে দেয় মা দুর্গার বর্শাটি, যেটা অসুরের রক্তাক্ত বুকে বসিয়ে প্রতিমার করন্যাস্ত করা হয় পূজা-মণ্ডপে।

জলধরবাবু মরে পড়ে আছেন। একটা ভাঙা সাইকেল, ভাঙা ঘড়ি, জলধরবাবুর সেই মরে যাওয়াটাকে প্রত্যক্ষ করাচ্ছে। আর দেওয়ালে ঝুলছে যে ছবিটি— সেটাই একটা জীবিত অধুনা মৃত জলধরবাবুর আত্মা।

জলধরবাবু নাকি কোন্ এককালে অভিনয় করতেন। সীতায় তারা, আলমগীরে উদিপুরী, জনায় জনা, নরনারায়ণে দ্রৌপদী সেজে এককালে নাকি জলধরবাবু মঞ্চ কাঁপাতেন। দেয়ালে ঝোলানো ঐ ছবিটা সীতা নাটকের। তারা বেশী জলধরবাবু রামচন্দ্রকে অভিশাপ দিচ্ছেন। তবে সাধারণত আর সকলের মতোই জলধরবাবুও সে কথা ভুলে থাকতেন। যদি কোনো দিন জলধরবাবুর জ্বর আসত, তবে সারাদিন সারারাত ধরে জলধরবাবু দ্রৌপদী, সীতা, জনা বা উদিপুরী বেগম হয়ে চেঁচাতেন। গত দশ বছর আগে আটচল্লিশ ঘণ্টা ধরে। সেই আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে জলধরবাবু একবারের জন্যও পাণ্ডব প্রাসাদ, অযোধ্যা বা মোঘল অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে তাঁর এই অতিপ্রিয় ঘরে ফিরে আসেননি।

গত আটচল্লিশ ঘণ্টা বাদে দশবছর আগের কোনো এক রাত জলধরবাবুকে না ঘুমিয়ে কাটাতে হয়েছিল হস্তিনাপুরে, অযোধ্যায় আর দিল্লীতে। এই দুটি 'অভিনয়ে'র মাঝখানে দশবছরের দীর্ঘ সুস্থতা— সুতরাং অনভিনীত দিনগুলি।

গত দু'রাতের সঙ্গে সে রাতের এই একটিই মিল। তখনো খুকির বিয়ে হয়নি। সে রাতে সিনেমা দেখে ফিরে আর কোনোদিন সিনেমা দেখতে যায়নি জলধরবাবু। সেই সিনেমা দেখার ফলে বিরক্ত মনে, ঝিম ধরা মাথায় বিনিদ্র রাত কাটিয়েছেন, সিনেমা না দেখেও, বিরক্তি আর ঝিম ধরা বোঝার মতো সচেতন না থেকেও বিনিদ্র কাটিয়েছেন গত দু'টো রাত। সেই রাত এবং গত দু'টো রাতই— বিনিদ্র ছিলেন, তাই বলে জাগ্রত ছিলেন না, স্বপ্ন আর জাগরণের মাঝখানে এক মঞ্চের আলো-আঁধারিতে ঘুরপাক খেয়েছেন।

দশবছর আগের সেই সকালে: জলধরবাবু বাইরের ঘরে মেঝের ওপর সাইকেলটাকে শুইয়ে প্যাডেলের জটিলতায় কোনো এক বিশেষ ফুটোয় ফুঁ দিয়ে বাতাস ঢোকাবার চেষ্টা করেছিলেন। খুকি এসে ডেকেছিল— "বাবা"। জলধরবাবু সেই ফুটোটার বিপরীত দিকে আঙুল চালনা, একটা সুতো জিভ দিয়ে ভিজিয়ে সরু করে সেই ফুটোর মধ্যে ঢোকানোর চেষ্টা, ইত্যাদিতে ব্যস্ত ছিলেন, এবং তাঁর নিরুত্তর কণ্ঠের সামনে খুকি সমানে একটা বিশেষ বিরক্তির পর ডাকছিল— "বাবা।" অবশেষে যখন সুতোটা সেই ফুটো দিয়ে ঢোকেনি ময়লার মাঝপথে ঠেকে গেছে, তখন জলধরবাবু খেঁকিয়ে উঠেছেন খুকির ওপর— "কি সকালে এসে বাবা বাবা করছিস। বাবা কি করবে রে, অ্যাঁ।" ঠিক সেই সময়ে ঘরে খুকির মা ঢুকে জবাবটা দিয়েছিলেন— "বাপ আর কী করবে, ঘরে বসে বসে সাইকেল, ঘড়ি আর সেলাইকলটার সর্বনাশ করবে! মেয়েটা একটু সিনেমা যেতে চাইছে, সেদিকে—!" মূল প্রস্তাবের জবাব না দিয়ে জলধরবাবু ভুরু কুঁচকে বলে উঠেছিলেন, "কেন কালই তো আমি সেলাইয়ের কলটায় ছাতা সেলাই করলাম।" স্ত্রী বলে উঠেছিলেন— "তাহলে তো আরো ভালো।" স্ত্রী চলে যাবার পর বহুক্ষণ জলধরবাবু ভুরু কুঁচকে

দাঁড়িয়েছিলেন, "কেন বাবা, কাল তো ছাতার কাপড়টা বেশ সেলাই করলে।" "না— মানে কাল সেলাই করতে গিয়ে দেখলাম চলছে না, হাতেই সেরে নিলাম"— বলতে বলতে জলধরবাবু ঘরে গিয়ে কলটা উপুড় করে নিয়েছিলেন। বহুক্ষণ পর যখন কিছুতেই একটা স্ক্রু খুঁজে পাচ্ছেন না, ঢং-ঢং-ঢং তিনটে ঘণ্টা শুনে তাকিয়ে দেখেন সাতটা পঁচিশ। সেই ঘড়ির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মনে মনে কী একটা হিসেব করে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন— "আরে, সাড়ে দশটা বেজে গেল!" সেদিন, আফিস যাবার সময় জলধরবাবুর হাতে পানের কৌটোটা দিতে দিতে খুকি বলেছিল—" বাবা যাবে তো? অনুরূপা দেবীর মন্ত্রশক্তি।" তাই নাকি?" "হ্যাঁ"। পানটা ঠোঁটের কাছে নিয়ে কিছুক্ষণ কী ভেবে জলধরবাবু বলেছিলেন, "আচ্ছা তৈরি থেকো, তিনটের সময় আমি আফিস থেকে আসব।" "তিনটেয় কি? ছ'টায় শো।" "হ্যাঁ টিকিট না পাওয়া গেলে তোমার জন্য আরো একটা দিন নষ্ট।" তারপর সাইকেলটাকে ঘর থেকে নামাতে নামাতে ডেকেছিলেন, "খুকি৷" খুকি শুধিয়েছিলেন, "বাণী করছে কে রে?" এক চিত্রতারকার নাম করেছিল খুকি। কী একটা ভাবতে ভাবতে সাইকেলে চেপে ঘূর্ণমান সিটটাকে সোজা করে এক-দুই-আধ প্যাডল করতে করতে জলধরবাবু আফিসে গিয়েছিলেন।

আর কী একটা ভাবতে ভাবতেই সে-রাতে সিনেমা দেখে এসে না খেয়ে শুয়ে পড়েছিলেন। জলধরবাবু এককালে বাণীর পাঠ করেছেন। সিনেমার অভিনয় দেখে তাঁর সেই স্মৃতি জেগেছে। আর সেই স্মৃতির অভিনয়ের পাশে নায়িকার অভিনয় অতি তুচ্ছ আর ব্যর্থ হয়ে গেল। জলধরবাবুর কেমন এক বিশ্বাস এল তিনি যা পেরেছেন আর কেউ তা পারেনি, পারে না। নায়িকার ব্যথায় সিনেমা হলে প্রথমে তাঁর বিরক্তি এল, তারপর রাগ হল, তারপর করুণা এল, তারপর বাড়ি ফিরতে ফিরতে দয়া এল, অবশেষে অনেকদিন পর সিনেমা দেখার জন্য মাথাধরায় ও জটিল চিন্তায় ঘুম না আসায় রাতের কোনো একসময় নায়িকার ওপর তিনি খুশিই হয়ে উঠলেন। তার না পারার জন্যই যেন জলধরবাবুর পারাটা এত বড় হয়ে উঠল। সে রাতে বিনিদ্র ও অজাগ্রত জলধরবাবুর চোখের সামনে তাঁরই এক বিগত, অজ্ঞাত, অপূর্ব কীর্তি জেগে উঠেছিল। ফুলশয্যা, চারিদিকে আলো আর ফুল, একটি মেয়ে বেনারসী আর গয়নায় ঝকমক হয়ে বসে আছে পালঙ্কে, ভাদ্রের ভরা নদীর মতো শরীরটা স্থির, ঢিলখাওয়া রাজহাঁসের মতো ঘাড়টা দীর্ঘ, শক্ত, উৎসুক— কিছুদূরে নতমুখে বরবেশী যুবক।... সেই মেয়েটি চিঠি পড়ছে, চোখে আগ্রহ, আশা, ঠোঁটে সঙ্কোচ, হাঁটায় উপেক্ষা। ঠিক ধরে থাকা দশটা আঙুল খেলে খেলে কথা কইছে। চিঠির কাগজ দুমড়ে যাবার খচমচ আওয়াজ, আলসেমিতে শিথিল কণ্ঠস্বর! কখনো ঠোঁট বেঁকানো, কখনো হাসি, কখনো কখনো হাই তোলা ভাব— কিন্তু সবটুকুর মধ্যে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে ফেলতে চেপে রাখা।

সে-রাতে একমাত্র জলধরবাবুর ঘড়িটা তার বিচিত্র ঘণ্টা বাজিয়ে গেছে, কিন্তু তিনি তা শুনতে পাননি।

সে রাতের সঙ্গে মরার আগের দু-রাতের ওটুকুই সাদৃশ্য। সে-রাতের পর জলধরবাবুর কোনোদিন অসুখও করেনি, তিনি সিনেমাও দেখেননি। তাই, দশবৎসর পর মৃত্যুর আগের দু-রাত দু-দিন জলধরবাবু সে রাতের মতো বিচিত্র এক জগতে বাস করেছিলেন।...

.... মোগল অন্তঃপুরে বেগমের প্রকোষ্ঠ। জাফরিকাটা জানলার ওপারে চিক। উদিপুরী বেগম পালঙ্কের ওপর বসে সেতার বাজাচ্ছেন। শাহানশাহ বাদশাহ আলমগীরের প্রবেশ। প্রথমে সেতারের ঘাটের উপর আঙুল থামল উদিপুরীর। খুব জলদে কমোদ বাজাচ্ছিলেন উদিপুরী.... ঐ জলদের মধ্যেই আলমগীরের প্রবেশ। ঢুকে তিন পা হেঁটে উদিপুরীর দিকে চাইলেন, উদিপুরী ঠিক শমের মাথায় ঘাটের ওপর আঙুলটাকে থামিয়ে দেন। উদিপুরী সোজা চেয়ে আছেন আলমগীরের চোখের দিকে, সোজা, সরল দৃষ্টি, দুই দৃষ্টির মাঝখানে থেমে যাওয়া সেতারের গমক।... সেতারের ধ্বনি মিলিয়ে না যেতেই, পালঙ্কের ওপর সেতারটাকে শুইয়ে, লাল সালোয়ার আর বেণীতে সাপের ঝিকিমিকি খেলিয়ে নামলেন উদিপুরী। আলমগীরের দিকে সোজা তাকিয়ে সামনে এগিয়ে কোমর বেঁকিয়ে কুর্নিশ করে বললেন— জাঁহাপনার অসীম অনুগ্রহ। আলমগীর চোখ তুলে চাইলেন।...

.... সম্মুখে নবদুর্বাদলশ্যাম রঘুপতি রাম। শম্বুকের মৃতদেহ থেকে রক্ত গড়িয়ে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে পড়ছে, রামের হাতের ধনু শিথিল, তারার নিশ্বাসে আগুন, কম্পিত কণ্ঠে অভিশাপ— "সহস্র বান্ধব মাঝে রহিবে একাকী, তোমার প্রাণের ব্যথা কেহ বুঝিবে না।"

.... রুক্ষ, পিঙ্গল, সাপের মতো বেণী বাঁ হাতে ধরে গজগমনে দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন— "করিতে সন্ধির ভিক্ষা হস্তিনানগর এখনই কি চলিবে গোবিন্দ ?" জিজ্ঞাসার শেষে একটা মৃদু ঢেউয়ে ব্যঙ্গ।...

...আলুলায়িত কেশ, বিস্ফারিত দৃষ্টি, চঞ্চল চরণ, দু'হাতে তালি বাজাতে বাজাতে হা করে হেসে উন্মাদিনী জনার প্রবেশ— "জনা চলে প্রতিহিংসা প্রতিবিধিৎসিতে।"..

সূর্য যখন উঠছিল, জলধর বাঁড়ুজ্জে নামক সাতান্ন বৎসর বয়সের সেই ভদ্রলোক দ্রৌপদীর মতো গরিমায়, তারার মতো তেজে, সীতার মতো সাহসে জনার মতো মত্ততায় ও উদিপুরীর মতো ঔদাস্যে— মরে গেলেন।

শ্মশানযাত্রার বাঁশের পালঙ্ক তৈরি হল। ক্যামেরাম্যান এল। জলধরবাবুর চারপাশে বিমর্ষ আত্মীয়জন। সাতদিন পর যখন সেই ছবিটি টাঙানো হল তখন দেখা গেল, সারাজীবনে জলধরবাবু মাত্র দুটো ফটো তুলেছেন। একটাতে তারা সেজে রমাকে অভিশম্পাত দিচ্ছেন— "সহস্র বন্ধুর মাঝে রহিবে একাকী," আর একটাতে অনেক

বন্ধুজন প্রিয়জনের মাঝে মরে পড়ে আছেন।

জলধরবাবুর দ্বিতীয় পুত্র সেই সাইকেলটায় চড়তে পারে। শোকটা শেষ হয়ে গেলেই সে সাইকেল চালাবে। তবে তার কব্জিতে ঘড়ি আছে। জলধরবাবুর ঘড়িটা দম না পেয়ে থেমে যাবে।

চিতায় জলধরবাবুর দেহটাকে ঘিরে আগুন এত উচ্ছ্বসিত, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আলাদা করে দেখা যায় না। তীব্র কটু গন্ধ। আগুনের তীব্র আঁচে শিরায় টান লেগে জলধরবাবুর ডান হাতটা একটা ভঙ্গিমতো করে উঠে পাশে প্রসারিত হল আগুনের সীমানায়। শ্মশানে জলধরবাবুর একজন বয়স্ক সহকর্মী ছিলেন, তিনি বললেন : "আমি সম্রাট আলমগীর" বলবার সময় শিশিরবাবু হাতের তেলোটা অবিকল ঐ ভঙ্গিতে উল্টে দিতেন।

সাপ

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

বাপ্পা তার বাবার সঙ্গে এই বাগানে এলো। সে, তার বাবা আর রেণী।

শরৎকাল এখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। বাগানের ফুল, ঘাসের রঙ আর রোদের তাপ থেকে তার আন্দাজ পাওয়া যায়। যে ঘাসগুলো বর্ষার জলে ঘন সবুজ হয়ে উঠেছিল তা এখন নিষ্প্রভ। এই রোদ, ঘাস আর ফুলের রঙ— সব কিছুই যেন স্তিমিত, নিঃশেষপ্রায়। আর এখন না-দুপুর না-বিকেলের সময়টাতে সব কিছুই খুব নিস্তব্ধ। এই শব্দহীনতা যেন সরু সুতোর ঝোলানো কোনো ভারী জিনিসের মত দুলছিল। যেন একটু নাড়া পেলেই সুতো ছিঁড়বে, হরিণের মত ত্রস্ত পায়ে এই নিঃশব্দ সময়টা পালাবে।

বাপ্পা জানে যে ইচ্ছে করলেই এই নিঃশব্দতাকে সে ছিঁড়ে দিতে পারে না। একেবারেই যে শব্দ নেই তা নয়। বাগানের নিষ্প্রভ চারাগাছগুলোর দীর্ঘ ছায়া পড়েছে ঘাসে। সেই আলোছায়ায় কয়েকটা মৌমাছি উড়ছিল। তাদের উড়বার শব্দ ঘড়ির শব্দের মত একটানা, একঘেয়ে। সেই শব্দটাকে শব্দ বলে মনে হচ্ছিল না বাপ্পার।

এখন এই বাগানে লাল কাঁকরের রাস্তার ওপর বাবার হাত ধরে বেড়াতে তার বিশ্রী লাগছিল। রোজই লাগে। কেমন নিস্তেজ, অবসন্ন বিকেল। যাই-যাই ভাব। এক্ষুনি আলোটুকু যাবে। অন্ধকার হয়ে আসবে একটু পরেই।

হাঁটতে হাঁটতে বাপ্পা পথের পাশে সাজানো ত্রিভুজের মতো উঁচু হয়ে থাকা ইটগুলোকে দেখছিল। এক দুই করে গুনে যাচ্ছিল ইটগুলোকে। রেণী মাটি শুঁকতে শুঁকতে এগিয়ে যাচ্ছিল। গেটের কাছে রেণী একবার থমকে দাঁড়াল। ফিরে তাকাল। এমনিভাবে ফিরে তাকালে রেণীর লম্বা সরু শরীরটা ধনুকের মত সুন্দর একটা বাঁক নেয়। চাবুকের মত সরু লেজটা আছড়ে পড়ছে পিঠের ওপর।

এবারে একটা কিছু বলতে পেরে বাপ্পা বেঁচে গেল। বলল, 'বাবা ঐ দ্যাখো।'

—কি! বাবার গলাটা খুব গম্ভীর।

আঙুল উঁচু করে রেণীকে দেখিয়ে বলল বাপ্পা, 'ওই দ্যাখো রেণী পালাচ্ছে।'

বাবার ভ্রূ দুটো জোড়া লাগল। 'কোথায় পালাচ্ছে! ও তো' গেটেব ভিতরেই রয়েছে।'

—ও পালাবার পথ খুঁজছে। আর পালিয়ে গিয়ে ও যা-তা খেয়ে আসে। বাড়িতে এসে বমি করে।

সে ভেবেছিল এবাব বাবা তাব হাতটা ছেড়ে দিয়ে রেণীকে গিয়ে ধরবে। বকলশটা ধরে টানতে টানতে বাবুর্চিখানাব খালি ঘবটাতে নিয়ে বেঁধে রাখবে রেণীকে। সেই ফাঁকে বাপ্পা এক ছুটে গেটটা খুলে বেরিয়ে যাবে, দুই লাফে রাস্তা পার হয়ে ওপাশে শেখ-এর বাড়িতে পৌঁছে যাবে। সমশের হয় এখন মাটি কোপাচ্ছে নয়তো মুর্গিকে দানা দিচ্ছে। যে অবস্থাতেই থাক, তাব ঘাড়টা ধরে কাছে টেনে এনে বলবে, 'রাত্রিতে আমার পড়ার ঘরে আসিস। দুজনে লুডো খেলবো।'

কিন্তু বাবা কিছুই বলল না। তার বাঁ হাতটা যেভাবে বাবার প্রকাণ্ড মুঠোটার মধ্যে ধরা ছিল সেভাবেই রইল। তেমনিভাবেই আস্তে আস্তে সে তার বাবার পাশে পাশে হাঁটতে লাগল। বাবার পায়ের রবারের চটির কোনো শব্দ হচ্ছে না।

হাঁটতে হাঁটতে তারা গেটের কাছে আসে। আবার ফিবে যেতে থাকে বারান্দার সিঁড়িটার কাছে। বাপ্পার পায়ের রবারের 'সোল'ওলা সু'টাব কোনো শব্দ নেই।

কেমন যেন হাঁফ ধরল বাপ্পাব। বলতে ইচ্ছে করল, 'বাবা আমি আর পারছি না।' বাবার মুঠোয় ধরা তার হাতটা ঘামছে। ঘামতে ঘামতে কব্জিটা যেন গলে যাচ্ছে তার।

রোজই তাকে তার বাবার সঙ্গে এই বাগানে আসতে হয়। এমন দিন খুব কমই গেছে যেদিন সে বাবার সঙ্গে এই বাগানে আসেনি। বারান্দা পেরিয়ে চারটে সিঁড়ি ভেঙে লাল কাঁকরের পথ। পুরানো, চেনা পথ, চেনা বাগান, মরা মরা গাছ, ঘাস। জানালা দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে এই দৃশ্যকেই সে সারাদিন দেখে। বিকেলেও আবার এখানেই আসতে হয়। কখনো কখনো গেট পেরিয়ে রাস্তা পেরিয়ে প্রকাণ্ড উদোম মাঠটার মধ্যে বাবার সঙ্গে গিয়েছে সে। সেই মাঠটার মধ্যে অনেকটা চলে গেলে তাদের বাড়িটাকে খুব সুন্দর ছোট্ট একটা ছবির বাড়ির মত দেখায়। ওই মাঠটার মধ্যে খুব ছুটে বেড়াতে ইচ্ছে করে বাপ্পার। কিন্তু একা তার এই বাড়ির কম্পাউণ্ডের বাইরে যাওয়া বারণ। সে একা একা কখনো কোথাও যেতে পারে না।

এক সময়ে তার বাবা দাঁড়িয়ে পড়ল। নিচু হয়ে রাস্তার পাশে ডালিয়া গাছটাকে দেখতে লাগল।

বাবা গাছটা দেখছে। বাপ্পা দাঁড়িয়ে রইল। শুকনো ডালিয়া গাছটা কুঁকড়ে ছোট্ট হয়ে গেছে। গাছটা মরেই গেছে। অস্ফুট স্বরে বাবা বলল, 'আহা মরেই গেল গাছটা। রাখা গেল না।'

বাবা গাছটাকে দেখতে লাগল। বাপ্পা জানে এখন অনেকক্ষণ ধরে বাবা গাছটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবে। আর ততক্ষণ তার কব্জিটা বাবার মুঠোর মধ্যে ধরা থাকবে।

এখন, এইবার কব্জিটা ব্যথা করে বাপ্পার। কেমন যেন অস্বস্তি। কতক্ষণ যে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে কে জানে। ওই একঘেয়ে মরা গাছটা বাবা এখন কতক্ষণ ধরে দেখবে কে জানে।

বাপ্পা সিঁড়িগুলোর দিকে তাকাল। ছোট্ট খোলা বারান্দায় এখন রোদ। ঢাকা-না-দেওয়া রঙ-চটে-যাওয়া কয়েকটা চেয়ার টেবিল এলোমেলোভাবে রেখে দেওয়া। রাত্রিবেলা অন্ধকারে বারান্দায় আসতে গেলে প্রায়ই কেউ না কেউ ঐ চেয়ার-টেবিলগুলোর সঙ্গে ধাক্কা খায়। কেন যে ওগুলোকে সাজিয়ে রাখা হয় না,—বাপ্পা ভাবে। বারান্দায় দুটো দরজা হাট করে খোলা। এখন বাগানের রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে ঘরের ভেতরগুলো অন্ধকার মনে হচ্ছে। কিছু দেখা যাচ্ছে না। দুটো দরজা। একটা ড্রয়িংরুমের, অন্যটা শোবার ঘরের। ঘরে আলো জ্বললে এখান থেকেই স্পষ্ট মাকে দেখতে পেত বাপ্পা।

কম্পাউণ্ডের ওপাশে মরা আমগাছটার ডালে বসে অনেকগুলো কাক। বিচ্ছিরি কালো অনেকগুলি কাক মরা আমগাছটার ডালে অনেক—অনেকগুলো। ক'টা? বাপ্পা গুনতে চাইল। এক, দুই, তিন, চার.....

কিন্তু চেষ্টা করেও অন্যমনস্ক হতে পারল না সে। বাবার মুঠোয় ধরে থাকা বাঁ হাতের কব্জিটা এখন প্রায় অবশ। ইচ্ছে করে খুব জোরের সঙ্গে ঝাঁকিয়ে হাতটা ছাড়িয়ে নেয় কিংবা চিৎকার করে বলে, 'আমার হাতটা ছেড়ে দাও তুমি।'

কিন্তু বাপ্পা কখনো তা বলে না। লিক্‌লিকে সরু কালো একটা চাবুক আছে বাবার। বাড়ির পেছন দিকে কম্পাউণ্ডের শেষে খালি বাবুর্চিখানার দেয়ালে টাঙানো থাকে চাবুকটা। ঘরটা রেণীর, চাবুকটাও রেণীর জন্যেই। মাঝে মাঝে যখন কথা শুনতে চায় না রেণী, ডাকলেও কাছে আসে না তখন বাপ্পা দেখেছে বাবা রেণীর গলার বকলশটা ধরে হিড হিড করে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে বাবুর্চিখানার দিকে। তারপর দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ। তারা কেউ কাছে থাকলে বাবা বলে, 'তোমরা কেউ এসো না এদিকে।' তারা কেউ কাছে যায় না কিন্তু এত দূর থেকেও চাবুকের শ্লিক্ শ্লিক্ শব্দটা সে শুনেছে। বাসনপত্র মেঝেতে ফেলে দিলে যেমন হয় তেমনি কর্কশ বিকট একটা চিৎকার করে রেণী কাঁদতে থাকে।

তখন বাপ্পাও কাঁদতে থাকে ভিতরে ভিতরে। তার সমস্ত শরীরটা কাঠ হয়ে থাকে। ইচ্ছে করে এই মরা মরা গাছওলা শুকনো ম্যাড়-ম্যাড়ে বাগানটা পার হয়ে এক

লাফে 'গেট'টা ডিঙিয়ে অনেক দূরে চলে যেতে যেতে চিৎকার করে বলে : 'আমি কক্ষনো—কক্ষনো এখানে থাকবো না।'

ফিরে ফিরে বাঁ হাতের কব্জিটাকেই মনে পড়ল বাপ্পার। কব্জিটা অবশ হয়ে হয়ে এখন ছিঁড়ে যেতে চাইছে। বাবা নিচু হয়ে গাছের গোড়া দেখছে। সে এক পাও নড়তে পারছে না। বাপ্পা জানে বাবা তাকে যেভাবে দাঁড় করিয়ে রেখেছে সেভাবেই তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। কখনো সে বাবার অবাধ্য হয় না। অবাধ্য হওয়ার কথা মনে হলেই চাবুকে বাতাস কাটবার সেই অদ্ভুত শব্দটা তার কানের কাছে বাজতে থাকে। বুকের ভিতরটা ছলাৎ ছলাৎ করতে থাকে। আর সে তখন খুব শান্ত হয়ে যায়। খুব শান্ত হয়ে থাকে বলেই মাঝে মাঝে বাবা দুই হাতের মধ্যে তার মাথাটা চেপে ধরে বলে : 'কখনো, তুমি আমার অবাধ্য হও না, তাই না! এই তো আমি চাই। খুব শান্ত, সংযত, ভদ্র হতে চেষ্টা করো।'

'কচু। কচু।' বাপ্পা মনে মনে বলল : 'মোটেই আমি শান্ত হতে চাই না, মোটেই না।' পা দুটো ঝিন্ ঝিন্ করছে বাপ্পার। ডেঁও পিঁপড়ে কামড়ানোর মত একটা যন্ত্রণা হাঁটুর কাছে, গোড়ালিতে। বাঁ হাতটা এখন অবশ। অবশ। কি ব্যথা হাতটায়। আঙুলগুলো আছে কি নেই বোঝা যাচ্ছে না।

বাপ্পা এখন রেণীকে দেখছিল। রেণী পথ থেকে নেমে বাগানের উত্তর কোণটার কাছে চলে গেছে। একটা গঙ্গা-ফড়িং রেণীর নাকের ডগায় উড়ছে। আর সেই ফড়িংটাকে তাড়া করে ঝোপঝাড়গুলো ভিতর দিয়ে এঁকে বেঁকে সরে যাচ্ছে।

ফড়িংটাকে ধরবার জন্যে রেণী লাফিয়ে ওঠে। বাপ্পা তাকিয়ে থাকে। রেণীর লম্বা শরীরটা বাতাসে ঢেউ খেয়ে নিঃশব্দে মাটির উপর পড়ে। ফড়িংটা এক ঝটকায় অনেকটা ওপরে উঠে গেছে।

রেণী লাফিয়ে ওঠে আবার! ফড়িংটা উড়তে উড়তে উত্তর কোণ থেকে বাগানের বেড়ার কাছে কেয়া ঝোপটার কাছে সরে যাচ্ছে।

রেণী লাফাচ্ছে, দৌড়াচ্ছে, সরে যাচ্ছে। ডিগবাজী খাওয়ার মত ভঙ্গি করে মাটির ওপর গড়াগড়ি দিচ্ছে।

ফড়িংটা লাফিয়ে উঠল। ফড়িংটা যেন রেণীর সঙ্গে খেলছে।

বাপ্পা তার পা দুটো সামান্য নাড়ল। ডান পা'টা বাড়িয়ে দিল। জুতোর 'হিল্টা' পথের কর্কশ কাঁকরের ওপর ঘষতে লাগল আস্তে আস্তে। খুব মৃদু সাইকেলের 'চেন' ছাড়বার মত কির্‌কির্ কির্‌কির একটা শব্দ হতে লাগল।

বাপ্পা পা'টা জোরে চেপে ধরে পথের ওপর। জুতোটা ঘষতে থাকে। জুতোর তলায় মিহি ফুরফুরে কাঁকরগুলো গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। বাপ্পার ইচ্ছে করছিল কাঁকরের

ওপর ঘষে ঘষে 'হিল'টা ক্ষয় করে ফেলে, তারপর জুতোজোড়া পা থেকে খুলে টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

রেণী এখন কেয়া ঝোপটার পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। ফড়িংটা ওর মাথার অনেকটা ওপরে। রেণী ফড়িংটাকে দেখছে। পাতা ঝরে যাওয়া বিশ্রী শুকনো কুচ্ছিত বাগানটার সঙ্গে রেণীর গায়ের বাদামি রঙটা মিশে আছে।

রেণী পেছনের পা দুটো ভাঙল। ল্যাজটা নামানো। সামনের পায়ে অল্প একটু ভাঁজ। এক্ষুনি লাফ দেবে রেণী!

ফড়িংটা দূরে সরে যাচ্ছে।

রেণী লাফ দেবে।

জুতোর 'হিল'টা মাটিতে জোরে জোরে ঠোকে বাপ্পা।

'আঃ বাপ্পা', বাবা সোজা হয়ে দাঁড়াল, 'এক মিনিট— এক মিনিটও তুমি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারো না!'

তার হাতটা ধরে ঝাঁকুনি দেয় বাবা। বাপ্পা টাল খেয়ে পড়ে যেতে যেতে বাবার হাতটা চেপে ধরে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল।

—কি হয়েছে? জুতোটা ঘষছিলে কেন? বাবা খুব জোর গলায় বলে।

রেগে গেলে বাবা এভাবেই চিৎকার করে। অবাধ্য রেণীকে বাবা এভাবেই চেঁচিয়ে ডাকে। বাবার দুটো চোয়াল শক্ত হয়ে ঢিবির মত উঁচু হয়।

অস্পষ্টভাবে চাবুকে বাতাস কাটবার একটা শব্দ বাপ্পার কানের কাছে বাজতে থাকে।

—একটা কাঁকর আমার জুতোর মধ্যে ঢুকে গেছে।

—কাঁকর! বাবার ভ্রূ দুটো জোড়া লাগে।

এবার বাবা তার হাতটা ছেড়ে দেয়।

—কাঁকরটা বের করে ফেল।

বাপ্পা নিচু হয়ে হাঁটু ভেঙে লাল কাঁকর ছড়ানো পথের ওপর বসে জুতোটা খুলতে যাচ্ছিল।

বাবা একটা হাত তার দিকে বাড়িয়ে দেয়, 'অসভ্য, নোংরা, জানোয়ার কোথাকার।' বাবা বলে। বাড়ানো হাতটা দিয়ে তার ঘাড়ের কাছে শার্টের কলারটা ধরে তাকে আবার দাঁড় করিয়ে দিল বাবা।

—ধুলোর ওপর বসতে তোমার ঘেন্না হল না। দাঁতে দাঁত চেপে বাবা বলে, 'অসভ্য ছোটোলোকদের ছেলের সঙ্গে মিশলে এরকমই হয়।'

আপনমনে মাথা নাড়ে বাবা, 'নাঃ, তোমাকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না। তোমার উপর আমার কোনো আশাই নেই। তুমি নষ্ট হয়ে যাবে, একদম নষ্ট হয়ে যাবে।'

বাপ্পা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। এখন সে বাবাকে দেখছিল না, বাবার কথাও

শুনছিল না। সে দেখতে পেলো ফড়িংটা কেয়া ঝোপের পাশ দিয়ে উড়ে কম্পাউণ্ডের বেড়ার ওপর দিয়ে বাইরে চলে গেল। রেণী দৌড়ে বেড়াটার ধারে গেল।

রেণী এখন বাইরে যাওয়ার একটা পথ খুঁজছে।

বাপ্পা তাকিয়েই রইল।

রেণী অস্পষ্ট শব্দ করল। বাবা ফিরে তাকাল।

রেণী এদিক ওদিক ছুটে একটা পথ খুঁজছে। বাপ্পা তাকিয়ে রইল।

বাবা ডাকল, 'রেণী।'

চোখের পলক না ফেলতেই তারের আর মেহেদী পাতার বেড়ার ভিতরে ছোট একটা গর্তের মধ্যে রেণীর বাদামি লম্বা শরীরটা ঢুকে গেল।

রেণী এখন ওপাশে।

বাবা ডাকলো, 'রে-ই-ণী-ই-ই।'

ছোট একটা নিশ্বাস ফেললো বাপ্পা। এতক্ষণ ধরে সে এইটেই চাইছিল।

বাবার আঙুলগুলো পাক খেল, জোঁকের মতো জড়িয়ে গেল। বাবার মুখটা লাল। চোয়ালেব ওপর দুটো ঢিবি।

বাবা গেটটার কাছে এগিয়ে গেল।

আবার ডাকলো, 'রে-ই-ণী-ই-ই।'

শব্দটা শিস দেওয়ার শব্দের মত তীব্রতর হল। তারপর অনেকগুলো তীরের মত বাতাস চিরে ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু রেণী ফিরল না। রেণীর বাদামি রঙের হিলহিলে লম্বা শরীরটা দুলতে দুলতে দূরে চলে যেতে লাগল।

বাবা 'গেট'টা খুলে বাপ্পার দিকে ফিরল, 'তুমি এখানেই থেকো। বাড়ির বাইরে যাবে না।' বাপ্পা মাথা নাড়ল।

বাবা গেটটা বন্ধ করে রাস্তা পার হয়। জোরে জোরে হাঁটতে থাকে মাঠটার মধ্যে। রেণী এখন ছুটছে। সহজে ধরা দেবে না রেণী— বাপ্পা জানে।

বাপ্পা মাঠটার দিকে একবার তাকাল। তারপর শুকনো ঘাসফুলের বেড়া ডিঙিয়ে এক দৌড়ে বাড়ির পিছন দিকটায় চলে এল। এখানে গাছগুলো বড় বড়। একবার সমশেরের বাড়ি গেলে হয়—ভাবলো বাপ্পা। কিন্তু সামনের দিকে 'গেট' পেরোতে গেলে খোলা মাঠ থেকে বাবা তাকে দেখে ফেলতে পারে।

ভাবতে ভাবতে জামগাছটার তলায় চলে এল বাপ্পা। খুব নির্জন এদিকটা। কেউ নেই। কম্পাউণ্ডের পাশ দিয়ে টেলিগ্রাফের তার চলে গেছে।

বাঁ হাতটা কব্জির কাছে এখনো লাল। যেন কোনো সাড় নেই হাতে। হাতটা পুরোপুবি অবশ হয়ে গেছে কিনা দেখবার জন্যেই বাপ্পা বাঁ হাত দিয়ে একটা নুড়ি কুড়িয়ে নেয়। চারিদিকে তাকায় বাপ্পা। কেউ নেই।

সবচেয়ে কাছে যে টেলিগ্রাফের পোস্টটা ছিল বাপ্পা সেটার দিকে নুড়িটা ছুঁড়ে

মারে। নুড়িটা অনেক দূর দিয়ে চলে গেল।

বাঁ হাতের কব্জিটাতে তেমন জোর পাচ্ছে না সে। সে আর সমশের প্রায়ই এইখানে দাঁড়িয়ে ওই পোস্টটার গায়ে ঢিল মারে। 'সমশেরের চেয়ে আমি ভাল পাবি'— এই ভেবে যেখানে জামগাছের তলায় নুড়িগুলো জড়ো করে রাখত তারা সেদিকে এগোয়।

নুড়ি তোলবার জন্যে হাত বাড়ায় বাপ্পা।

গাছের তলায় ঘাসগুলো লম্বা, ঘন সবুজ। নুড়িগুলো একপাশে জড়ো করা। বাপ্পা নিচু হতে গিয়ে ঝুঁকতেই দেখতে পেল জড়ো করা নুড়িগুলোর পাশে ঘাসগুলো সরু একটা রেখার মত দু'পাশে সরে যাচ্ছে। 'সাপ'—বাপ্পা ফিস্‌ফিস্ করে বললো—'সাপ। একটা সাপ'। তার প্রসারিত হাতটা ঠাণ্ডা।

বাপ্পা স্থির হয়ে থাকে। খুব স্বচ্ছন্দ গতিতে কালো সাপটা এগিয়ে এসে পাথরগুলোর কাছে থামল। চওড়া মস্ত বড় ফণাটা ভেসে উঠল ঘাসের ওপব। আবার ডুব দিল।

বাপ্পা পিছিয়ে আসবার জন্য একটা পা আলগা করল।

সমস্ত শরীরে ঢেউ তুলে, যেন তেল মাখানো কোনো জায়গার ওপর চলছে এমনি পিচ্ছিল গতিতে সাপটা সেই পাথরের স্তূপের ওপর উঠল। চকচকে আঁশগুলোর ওপর হলদে রঙের আলপনা।

বাপ্পা পেছনদিকে একটা প্রকাণ্ড লাফ দিল। ঠিক লাফ নয়, যেন কেউ তাকে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

মাটির ওপর পড়ে গেল ব৴ া। সাপটা এখনো পাথরগুলোর ওপর মুখ তুলে। সেই মুখ থেকে পেট পর্যন্ত ছাই-রঙা।

হামাগুড়ি দিয়ে বাপ্পা সরে যেতে থাকে। খুব তাড়াতাড়ি সবে আসবার জন্যেই মাটিতে ছোট্ট পাথরের টুক্‌রো আর বালিতে তাব হাঁটু আর হাতের তেলো ছ'ড়ে যেতে থাকে।

অনেকটা দূর চলে এসে বাপ্পা সোজা হয়ে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে আবার দৌড় দিয়ে আরো খানিকটা পিছিয়ে এলো বাপ্পা। খুব জোরে চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে করে বাপ্পার। দাঁড়িয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বুকের ভিতরে ছলাৎ ছলাৎ রক্তের শব্দ শোনে।

সাপটা ফণা তুলেছিল। ফণা-টা তুলে যেন তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেই অল্প অল্প পিছিয়ে যেতে থাকে সাপটা। ফণাটাকে দুলিয়ে ঝাঁকানি দিয়ে দিয়ে সাপটা পিছিয়ে যেতে থাকে।

এবার বাপ্পা হাসে। সাপটা ভয় পেয়েছে।

একটা ঢিল তুলে নিয়ে বাপ্পা হাতটা দোলাতে থাকে। সাপটাকে আবো ভয় পাইয়ে দেওয়ার জন্য বলে— 'এই হ্যাট্ হ্যাট্। যাঃ'—

সাপটা একটু করে পেছোয়।

বাপ্পা একটু করে এগোয়।

সাপটা মুখ ঘুরিয়ে চলে যেতে থাকে। ঘাসের ওপর তেমনি আঁকা বাঁকা সরু রেখা উঠল।

বাপ্পা এগোতে থাকে।

বাবুর্চিখানার সামনে ছোট্ট বাধানো চত্বরটায় আবার মুখ তোলে সাপটা।

—হ্যাট্, হ্যাট্। যাঃ—

ধীরে ধীরে চত্বরটা পেরিয়ে যায় সাপটা। মজা লাগে বাপ্পার। কেন যেন হাসি পায়।

সাপটা এগোচ্ছে।

বাবুর্চিখানার দরজাটা খোলা। সাপটা একবার মাথা তোলে।

—হ্যাট্ হ্যাট্— বাপ্পা বলে। এখন বুকের ভিতর সেই ছলাৎ ছলাৎ শব্দটা নেই। কেমন যেন উত্তেজনা বোধ করে বাপ্পা। তার কান দুটো গরম এখন।

পকেটে হাত গুঁজে বাপ্পা দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে দেখতে পায় সাপটা আস্তে আস্তে বাবুর্চিখানাব চৌকাঠ ডিঙিয়ে ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে।

এবার ফিরে আসে বাপ্পা। ফিরে সামনের বাগানের দিকে চলতে থাকে। পা দুটো ঝিনঝিন কবছে। হাঁটুর কাছে ছড়ে যাওয়া জায়গাটায় লাল পুঁতির দানার মত রক্ত জমে আছে। হাতের তেলো দুটো জ্বলছে। এতক্ষণ এই ছড়ে যাওয়া জায়গাগুলো টের পাচ্ছিল না বাপ্পা। এখন তার চলতে কষ্ট হচ্ছে। হাঁটু দুটোয় ব্যথা, হাতের তেলোয় জ্বলুনি।

সামনের বাগানের গেটটার কাছে এসে দাঁড়াল সে। অনেক দূরে মস্ত উদোম খোলা মাঠটার ওপর বাবাকে দেখতে পায় বাপ্পা। মস্ত বড় আকাশ আর খোলা উদোম মাঠটার মাঝখানে বাবাকে ছোট্ট মতো দেখায়। বাবা রেণীর গলার বকলশটা ধরে তাকে টেনে নিয়ে আসছে।

বাবা খুব কাছে এসে পড়ার আগেই বাপ্পা গাঁদা গাছগুলোর কাছে এসে দাঁড়ায়। গাঁদা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে হাঁটুর ওপর ঘষতে থাকে।

'গেট' এর কাছে বাবার গলা শোনা যায় : 'অবাধ্য—অবাধ্য কুকুর! চাবুক দিয়ে শায়েস্তা করতে হয় তোমাকে।' বাবা বাগানের মধ্যে দিয়ে রেণীকে টেনে নিয়ে যেতে থাকে।

—বাপ্পা, বাপ্পা—আ। বাবা ডাকে।

বাপ্পা দৌড়ে বাবার কাছে চলে আসে।

বাবা তার দিকে তাকায়। বাবার চোয়ালের টিবি দুটো এখন উঁচু। মুখটা লাল টক্‌টক্ করছে।

—কোথায় ছিলে তুমি এতক্ষণ? বাবা বলে।

—এখানেই।

তার হাঁটুর দিকে তাকায় বাবা। আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলে, ওগুলো কি? অ্যাঁ। কেটে গেল কেমন করে?'

—আমি পড়ে গিয়েছিলাম।

বাবা আর কিছু বলে না। শুধু কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর আবার রেণীকে টেনে নিয়ে যেতে থাকে। বাবা এখন পেছনদিকের বাগানে যাবে।

—বাবা, আমি কি আসব? বাপ্পা চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করে।

বাবা তার কথা শুনতে পায় না। রেণীকে বকতে বকতে বাবা এগিয়ে যাচ্ছে। এবং তারপর বাবা আর রেণী বাড়ির পেছনদিকটায় চলে যায়।

নির্জন শুকনো ম্যাড়ম্যাড়ে বাগনটায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে বাপ্পা। সাপটা— সাপটা— ও ঘরেই আছে— ভাবে বাপ্পা। তার বাবা এখন ও ঘরেই যাবে।

— বাবা — প্রাণপণে চেঁচিয়ে ডাকে বাপ্পা, তারপর ছুটতে শুরু করে। বুকের ভিতরে ছলাৎ ছলাৎ শব্দটা শুনতে পায় সে। — 'বাবা' — প্রাণপণে ছুটতে থাকে বাপ্পা। ছুটে এসে জামগাছটার তলায় দাঁড়ায়। বাবুর্চিখানার চত্বরে বাবা আর রেণী। বাবা রেণীকে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে। রেণী যাবে না। রেণী চারটে পা ছড়িয়ে দিয়ে জেদী ছেলের মত দাঁড়িয়ে পড়ল। বাবার মুখটা ভয়ঙ্কর লাল। চোয়ালের ঢিবি দুটো খুব উঁচু।

— বাবা— প্রায় ফিস্ ফিস্ করে বলে বাপ্পা। বাবা রেণীকে দরজার কাছে নিয়ে গেল। বাবা তাকে দেখতে পেল, চেঁচিয়ে বলল— 'বাপ্পা, এখন এখানে এসো না, চলে যাও।'

তবু বাপ্পা দাঁড়িয়ে থাকে। তার পা দুটো থর থর ক'রে কাঁপে। ঠোঁট দুটো শুকনো, গলাটা শুকনো। প্রাণপণে চেঁচাতে ইচ্ছে করল বাপ্পার। সে বলতে চাইল— 'বাবা, বাবা গো, ও-ঘরে একটা সাপ। মস্ত বড় ভয়ঙ্কর একটা সাপ, এখন ও-ঘরে তুমি যেও না, যেও না।' কিন্তু সে বলল না। ভাবল— 'থাক্। দেখাই যাক কি হয়।'

'একটা ভীষণ মজা হবে এক্ষুনি। কী মজা—- সাপটা ও-ঘরে আর বাবাও এখন ও-ঘরে।' ভাবে বাপ্পা। তার সমস্ত শরীরটা উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে।

বাবা ভিতর থেকে দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিল। সেই 'দড়াম' শব্দটা বাপ্পাকে যেন ধাক্কা দিল। তার প্রায় অবশ হাঁটু দুটো ভেঙে সে প্রায় পড়ে যাচ্ছিল। জামগাছটার গুঁড়িতে নিজের হাতটাকে চেপে ধরে সে। 'আমি বলে দিইনি, বলে দিইনি ও ঘরে কি আছে। আমি বলে দিইনি, বলে দিইনি— বলিনি'— যন্ত্রের মতো বাপ্পা এই কথাটাই বারবার বলতে লাগল। চাবুকের শ্লিক শ্লিক শব্দটা শুনতে পেলো সে। বাসনপত্রের কর্কশ শব্দের মতো শব্দ করে রেণী কান্না শুরু করল।

বাপ্পা কাঠ।

চাবুকের শব্দটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। রেণীর কান্নাও।

'বাবা' চিৎকার করল, বাপ্পা, 'বাবা, বাবাগো। বাবা, বাবা'— প্রাণপণে ছুটতে শুরু করল বাপ্পা। লম্বা ঘাসগুলোয় তার পা আটকে যাচ্ছিল। পড়তে পড়তেও ছুটতে লাগল বাপ্পা। বাঁধানো চত্বরটা পার হয়ে দরজার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো সে, 'বাবা, বাবা। আমি বাপ্পা।'

"বাপ্পা, বাবার গলা শোনা গেল। স্থির গম্ভীর গলা, 'বাপ্পা, এ ঘরে একটা মস্ত বড় বিষাক্ত সাপ।'

— তুমি দরজাটা খুলে বেরিয়ে এস বাবা। বেরিয়ে এস।

— আমি বেরিয়ে যেতে পারছি না বাপ্পা। সাপটা দরজার কাছেই। আমি দরজাটা খুলতে পারছি না। নিস্তেজ গলায় বাবা বলে।

— তুমি বেরিয়ে এসো বাবা। বেরিয়ে এসো। শুধু এ-কথাটুকুই বলতে পারলো বাপ্পা, 'তুমি বেরিয়ে এসো।'

— 'আঃ বাপ্পা, আমি কেমন ক'রে বেরোবো'—! দরজার ওপাশে যেন অনেক দূর থেকে বাবার গলা শোনা গেল, 'এ ঘরে কিছুই নেই। তুমি আমাকে একটা কিছু দাও। একটা লাঠি কিংবা ঐ ধরনের কিছু।'

—বাপ্পা ছুটে জানালাটার কাছে এল। কাঁচভাঙা ছোট্ট জানালাটার ওপর উপুড় হয়ে পড়ল প্রায়। 'বাবা মরে যাচ্ছে। মরে যাচ্ছে'— বাপ্পা বলে।

ঘরের ভিতরটা অন্ধকার। বাপ্পা বড় বড় করে তাকাল।

— কোথায় তুমি বাবা ? কাঁদতে থাকে বাপ্পা।

— এই যে বাপ্পা। বাবা সিমেন্টের তৈরি বেদীর মতো উনুনটার কাছ থেকে জানালার দিকে তাকাল। বাবার চোখ দুটো বড় বড় । বাবা ভয় পেয়েছে।

বাপ্পা দেখতে পায় উনুনটার ওপরে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে রেণী। বাবার হাতের চাবুকটা স্থির। বাবা এতটুকু নড়ছে না।

— বাপ্পা, আমি নড়তে পারছি না। তুমি দাঁড়িয়ে থেকো না। একটা কিছু এনে আমার হাতে দাও। বাবার গলাটা কাঁপছে।

সাপটা দরজার কাছে। সমস্ত শরীরটা দুটো বাঁক খেয়ে গোল হয়ে রয়েছে। ফণাটা উঁচু করে আস্তে আস্তে দুলছে সাপটা! ফণাটা এত উঁচুতে যে সেটা অনায়াসে তার বাবার বুকের কাছে বোধহয় ছোবল দিতে পারে। বাবা পিছন দিকে হাত বাড়িয়ে কিছু খুঁজছে। সেই হাতদুটো থর থর করে কাঁপে। বাপ্পা দেখে!

'বাপ্পা।' বাবা স্থির দৃষ্টিতে সাপটাকে দেখছে।

সাপটা একটু ঝাঁকানি দিয়ে পিছু হটে গেল। মাথাটা পিছনদিকে হেলাল।

'বাপ্পা দাঁড়িয়ে থেকো না,' বাবা চাপা গলায় বলে।

সাপটা চাবুকের মত ছিটকে লাফিয়ে পড়ল সামনের দিকে। বাবা ডান দিকে

সরে গেল। সরতে গিয়ে উনুনটার ওপর টাল খেয়ে পড়ে গেল বাবা। সাপটা সরে যাওয়ার আগেই বাবা হামাগুড়ি দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

রেণীর দাঁতগুলো বিশ্রীভাবে বেরিয়ে এল। 'ঘ্যাক' করে একটা অদ্ভুত শব্দ করে রেণী। দেয়ালের দিকে সরে যায়। তারপর সেখানেই দাঁড়িয়ে থেকে গোঁ গোঁ করতে থাকে। সাপটা একটা দোল খেয়ে সোজা হয়। আবার দরজার দিকে সরে যেতে থাকে। বাবার কপালের কাছে দুটো শিরা জোঁকের মতো ফুলে আছে। চোখ দুটো বড় বড়। 'বাপ্পা, দাঁড়িয়ে থেকো না' বাবা বলে। চকচকে আঁশ আর হলদে ডোরা কাটা সাপটা তার বাবার দিকে ফেরে। উঁচু ফণাটা দুলতে থাকে।

বাপ্পা চোখ বোজে, ' আমি নডতে পারছি না বাবা, নড়তে পারছি না। আমার হাত-পাগুলো অবশ।' বাপ্পা ফিস্ ফিস্ করে বলে। জানালার কাছ থেকে সরে আসে বাপ্পা। দাঁতে দাঁত চাপে। কোমরটা অবশ। দুটো হাত মুঠো পাকিয়ে ছুটতে শুরু করে বাপ্পা। 'একটা লাঠি— একটা লাঠি— একটা লাঠি' বাপ্পা যন্ত্রের মতো বলতে থাকে। আর ছুটতে থাকে। চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করে তার।

বাপ্পা দেখে ছুটে বাগানটা পার হতে অনেক সময় লেগে যাবে। বাড়ির ভিতর থেকে লাঠি আনতে আনতে—। বাপ্পা থেমে বাঁ দিকে ছোটে। কিন্তু কোথাও একটা লাঠি নেই। কিছু খুঁজে পায় না বাপ্পা। জিওল গাছটার তলায় এসে দাঁড়ায় বাপ্পা। এখন হাঁফাতে হাঁফাতে তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। নিমগাছটার সঙ্গে ঠেস দিয়ে একটা মস্ত বড় ঘুণে ধরা বাঁশ দাঁড় করানো। বাপ্পা একলাফে নিম গাছটার কাছে চলে আসে।

বাঁশটা নিয়ে আবার জানালার কাছে আসে বাপ্পা। বাবা এখন উনুনটার ওপর দাঁড়িয়ে। রেণী গোঁ গোঁ করে দেয়ালের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। 'উঃ বাপ্পা'— বাবা চিৎকার করে বলে— 'বাঁশ দিয়ে কি হবে? বাঁশ নয়। একটা লাঠি এনে দাও। তাড়াতাড়ি বাপ্পা। তাড়াতাড়ি।' বাঁশটা ফেলে দিয়ে বাপ্পা পা বাড়ায়। কিন্তু পা অবশ। একদম নড়তে পারছে না সে। তার বুক মাথা গলা জুড়ে একটা কল চলবার মতো শব্দ। সাপটা পিছলে পিছলে এগিয়ে আসে। ফণাটা বাতাসে দুলে চাবুকের শব্দ করে।

'বাপ্পা দেরি করো না, দেরি কবো না।' বাবা বলে। অস্পষ্টভাবে বাপ্পা দেখতে পায় বাবা রেণীর বকলশটা চেপে ধরে ঠেলে রেণীকে সামনে এগিয়ে দিচ্ছে।

অন্ধের মতো বাপ্পা পা বাড়ায়। তার গাল বেয়ে টপ্ টপ্ করে জল পড়ছে। চোখে কিছু দেখছে না সে। চোখ দুটো জলে ভরা। পা বাড়াতে গিয়ে বাপ্পা পড়ে যেতে থাকে। 'সাপ, সাপ, সা-আ-প' চিৎকার করতে করতে বাপ্পা ছোটে। কোথায় ছুটে যাচ্ছে বুঝতে পারবার আগেই চত্বরটার ওপর তার ক্লান্ত, অবসন্ন শরীরটা

টলে পড়ে যেতে থাকে।

যখন অনেক অনেক বড় হয়েছিল বাপ্পা তখন সে তার ছেলে-মেয়েদের কাছে কিংবা নাতি-নাতনিদের কাছে ফিরে ফিরে এই গল্পটাই বলত। কিন্তু যখন বলত বাপ্পা, তখন গল্পটার কোনো কোনো অংশকে সে ঢাকা দিত। ঢাকা দিত তার কারণ, এই স্মৃতির কোনো কোনো অংশকে সে বুঝতে পারত না। এই বুঝতে না পারা অংশগুলো ছিল ছোট্ট ছোট্ট, অস্পষ্ট, অন্ধকার গর্তের মত। এই গর্তে কি আছে, কোন অদ্ভুত রহস্য তা বাপ্পা বুঝতে পারত না। তাই গল্পটা বলতে বলতে মাঝে মাঝে থামত সে। অনেককিছুই তো আমরা ঢাকা দিই, ঢাকতে চাই,— ভাবত বাপ্পা। ভাবতে ভাবতে অদ্ভুতভাবে একটু হাসত সে। বুকের ভিতরে ছলাৎ ছলাৎ রক্তের শব্দ শুনত। তীব্র একটা উত্তেজনাকে অনুভব করত দেহের ভিতরে। তারপর থেমে থাকা গল্পটাকে শুরু করবার জন্য মনে মনে প্রস্তুত হ'ত।

মনে মনেই সেই অদ্ভুত রহস্যময় অন্ধকার গর্তগুলোকে লাফ দিয়ে পেরিয়ে আসত বাপ্পা।

কলকাতা

দিব্যেন্দু পালিত

ট্রেন ছাড়বে সাতটা পঞ্চাশে। তার আগে না পৌঁছুলেই নয়।

আগে বলতে বেশ কিছুক্ষণ আগে। অন্তত আট-দশ মিনিট আগে। তার কম হলে এক কাপড়ে, ত্বরিত পায়ে এই ছুটে আসার কোনো দরকার ছিলো না।

ট্যাক্সির উত্তেজিত গহ্বরে বসে থাকতে থাকতেই মনীষা ছুটে গেল চার নম্বর প্ল্যাটফর্মে। দীর্ঘ সরলরেখায় বহুদূর পর্যন্ত স্তব্ধ দাঁড়িয়ে আছে ট্রেনটা ; মাথার পর মাথার গিজগিজে ভিড় পেরিয়ে এঞ্জিন পর্যন্ত চোখ পৌঁছয় না। এর মধ্যে কোথায় খুঁজবে রমেনকে। ক'দিন আগে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হলে অন্তত দৌড়নো যেতো রিজার্ভড্ কম্পার্টমেন্টের দিকে। তা হয়নি। কাল সূর্যাস্ত থেকে অনেকক্ষণ পর্যন্ত তারা ছিলো একসঙ্গে। রমেনকে করুণা করার মতো লোক তার পরেও আর রেল বিভাগে থাকতে পারে না।

মনীষা অধৈর্য হয়ে পড়লো। চোখের খুব কাছে কব্জি তুলে এনে সময় দেখলো সাতটা বত্রিশ। ক'দিন আগেই অয়েল করিয়েছে ঘড়িটা— নিশ্চয়ই স্লো নেই। তার মানে সময় যায়নি, ছুটে গেলে এখনো ধরা যেতে পারে রমেনকে। বাহান্ন কিলোর শরীরটাকে পালকের মতো হালকা করে রমেনের কাছাকাছি ছুটে যেতে কী আর এমন অসুবিধে হবে তার! এই তো, দু'বছর আগেও সে টু-টোয়েন্টিতে ফার্স্ট হয়েছিলো কলেজে।

ভাবনা অবশ্য নিজেকে নিয়ে নয়। সঙ্গের চব্বিশ ইঞ্চি স্যুটকেসটার জন্যেও নয়। তিন সেট শাড়ি ব্লাউজ আর টুকিটাকি প্রয়োজনীয় জিনিস ছাড়া স্যুটকেসে এমন কিছু নেই যে সহজে বহনযোগ্য হবে না। এরকম সম্ভাবনার কথা মনে রেখেই আগেভাগে সে নিজেকে যতোটা সম্ভব হালকা করে নিয়েছিলো। ফল খুব ভালো হয়নি। আলমারি খুলে টাকাপত্তর বের করার সময় প্রিয় নেকলেসটা নিতে ভুলে

গেছে। যখন মনে পড়লো তখন সে মাঝ-রাস্তায়, ট্যাক্সিতে। মন খারাপ ভাবটা কাটাবার জন্যেই পরে নিজের সঙ্গে ছোট্ট একটু রসিকতা করে নিলো— 'সুযোগ মতো রমেনকে বলবে মালা পরাবে বলে গলাটা খালি করে এসেছি।'

সমস্যা তার পরের ঘটনা নিয়ে।

অভাবিতকে মেনে নিতে হলে যেরকম উত্তেজিত ও বিমর্ষ হয়ে পড়ে মানুষ, রমেন তার ব্যতিক্রম হবে না। গুণ বা দোষ বলতে তার একটিই— স্বাভাবিকভাবে কখনো সে অতিক্রম করতে পারে না। অ্যাভারেজ হয়ে থাকার মধ্যেই যেন চিরকাল নিরাপত্তা খুঁজছে রমেন। তাহলেও, এখন ট্রেন ছাড়ার সময় যতো এগিয়ে আসবে, মরিয়া হয়ে সে কী আর ঘন ঘন, সিগারেটে টান দেবে না! এটাই তো স্বাভাবিক। সবুজ আলো ঘন সবুজ হবার আগে পর্যন্ত গাড়ির ভিতর না ঢুকে রমেন নিশ্চিত প্ল্যাটফর্মেই থাকবে।

না হয় দৃশ্যটা মিলে গেল হুবহু। রমেনকে খুঁজে পেল মনীষা, হাতে চব্বিশ ইঞ্চি স্যুটকেস, আর বুকভর্তি ক্রমশ মন্থর হয়ে আসা বিসর্জনের বাজনা। রমেনও দেখতে পেয়েছে তাকে। গোড়ার বিস্ময় ও অস্বস্তি কাটিয়ে সে নিশ্চয় ছুটে আসবে দ্রুত, তারপর—-

না, হাওড়া স্টেশনটা হিন্দি ফিল্মের রোমান্টিক দৃশ্য হবার পক্ষে অনুকূল নয়।

রমেন ইতিমধ্যে বৃত্তটা সম্পূর্ণ করার দিকে এগোবে। কথা হলো, সে কী বলবে রমেনকে। 'ভেবে দেখলাম তোমাকে ছাড়া আমি থাকতে পারবো না। তাই চলে এলাম—'

উঁহু এভাবে বলা যাবে না। নিজের কানেই বিসদৃশ্য শোনাচ্ছে কথাটা— 'তোমাকে ভালোবাসি' বলার মতো ; সে-পর্ব তারা তিনবছর আগেই পেরিয়ে এসেছে। দু'জন কিংবা দু'জনের একজন ধরা যাক রমেনই মনীষাকে ছেড়ে থাকতে পারবে না এটা জানাজানি হয়ে গেছে বহুদিন আগে। না হলে কালকের সন্ধ্যাটির দরকার হতো না! দরকার হতো না মনীষা যেরকম ভাবছে সেই রকম করে উদ্‌ভ্রান্ত রমেনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ঘন ঘন সিগারেট টানা বা তার নিজের কব্জিতে বাঁধা ঘড়িটা স্লো যাচ্ছে না ভেবে নিশ্চিন্ত হওয়া! বরং বলতে পারে মনীষা, 'বুঝতে পারছি তোমাকে নিয়েই ছিলো আমার কলকাতা। তুমি থাকলে দু'শো মাইল দূরত্বেও আবার আমি কলকাতা গড়ে নিতে পারবো।'

রমেন ততক্ষণে তাকে কম্পার্টমেন্টে ঠেলে তুলেছে। যদি জায়গা পেয়ে থাকে, নিজের আসনটুকু মনীষাকে ছেড়ে দিয়ে চেষ্টা করবে সপ্রতিভ হতে। এখন থেকে সে পুরোপুরি দায়িত্ববান হয়ে গেল : বিয়ের মন্ত্র না আউড়েও মনীষার সিঁথিতে তুলে দিয়েছে সিঁদুর। আমার ওপর নির্ভর করে ঠকোনি— মুখে এই রকম হাসি ফুটিয়ে তাকাবে দূরত্ব থেকে। ট্রেন ছেড়ে দেওয়ার পক্ষে এইটেই সবচেয়ে উপযুক্ত

সময়।

কিন্তু, সত্যি সত্যিই কী ওই অবস্থায় বমেনকে কিছু বলা দরকার? যে কোনো কথাই তো মনে হবে পুরনো! অর্জুনের তীরের মতো এই ব্যস্ত ছুটে যাওয়ার মধ্যেই কী তার সমস্ত অনুভব, চিন্তা, উদ্বেগ পরিস্ফুট হচ্ছে না!

নিজেতে ফিরে এলো মনীষা। এখন তেমনি সময় যখন কোনো অনুভূতিই পরিষ্কারভাবে ধরে রাখা যায় না। এমনকি কানাকড়িও মনে হচ্ছে উদ্বৃত্ত। মনে হচ্ছে নিঃশেষিত। মনে হচ্ছে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারছে না।

গত কুড়ি মিনিটে ট্যাক্সিটা এক গজও এগোতে পেরেছে কিনা সন্দেহ। তারও কিছুক্ষণ আগে থেকে চারপাশের দুর্ভেদ্য দেয়ালটা চোখে পড়ছে। পিছনে একটা টেম্পো ও লরির আধখানা, বাঁদিকে পরপর দুটো অ্যামবাসাডব, ডানে পুরো একটা ফীয়াট নিয়ে আগুপিছু ট্যাক্সি ও লরি, সামনে একটা ডবলডেকার। ডবলডেকারের পিছনে দাঁত ও মাড়ির স্বাস্থ্যরক্ষায় কোনো একটা মাজন ব্যবহার করার সুপারিশ। মাজনের নামটা চোখে পড়ে না। ডানদিকে ষাট ডিগ্রী কোনাকুনি তাকালে বাসি পোস্টারের ভিতব থেকে সালোয়ার-কামিজ পরা মেয়েটি বেরিয়ে আসে— 'আও প্যার করে'। এত বিস্তৃতভাবে আর কখনো কলকাতাকে লক্ষ্য করেছে বলে মনে পড়ে না। চলে যাবার আগে কলকাতা যেন তাকে সব কিছু উজাড করে দেখাতে চায়— দাঁত-মাড়ি-টাকরা সুদ্ধ সব কিছু! এই কলকাতাকেই সে ভালোবেসেছিল!

শুকনো মুখের ভিতর মরা মাগুরের লেজের মতো লেপটে-থাকা জিভটাকে ঢোঁক গিলে স্বাভাবিক করে নিলো মনীষা। ড্রাইভারের দিকে তাকালো। পাশ থেকে পিঠ ও মাথার পাগড়ি ও চাপা গালের অংশ বিশেষ চোখে পড়ে। স্টিয়ারিং থেকে হাত না সরিয়েও টান-টান হয়ে বসে আছে লোকটা— যেন ধাক্কা দিলেই পড়ে যাবে মুখ থুবড়ে। ট্যাক্সিতে ওঠার পর থেকে একটিও কথা বলেনি। লোকটা জানে সাতটা পঞ্চাশের ট্রেন ধরার জন্যে ট্যাক্সিতে উঠেছে মনীষা, আর সময় নেই— যে কোনো মুহূর্তে ট্রেন ছেড়ে দিতে পারে। কিন্তু সেজন্যে লোকটার কোনো ব্যস্ততা বা আগ্রহ আছে বলেও তো মনে হয় না।

ডানদিকের ফীয়াটের বাঁদিকে বসে থাকা লোকটি সিগারেট ধরানোর আগে মণীষাকে চোখ মারলো। ব্যাকুল হয়ে আবার কব্জিটা চোখের কাছে টেনে আনলো মনীষা।

সাতটা সাঁইত্রিশ। হে ভগবান, সাতটা সাঁইত্রিশ! আর মাত্র তেরো মিনিট, হিসেব মতো আর মাত্র পাঁচ মিনিট! হে ধর্মাত্মা, রমেনকে আমি ভালোবাসি। আমারই সামান্য ভুলের জন্য প্রগাঢ অভিমান নিয়ে আজ সে চলে যাচ্ছে দূরে— বহু দূরে। তাকে চেনো। তার পকেটে আছে চাকরির অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার। দু' বছর বেকার থাকার পর এই মুহূর্তে চাকরি পাবার সমস্ত আনন্দ তার মন থেকে প্রতিমার গায়ের মাটির মতো খসে খসে পড়ছে। তাকে তুমি ধরে রাখো। বলো, মনীষা আসছে।

ব্রিজ অ্যাপ্রোচের কাছে অসংখ্য অনড় ও নিরাকার গাড়ির অন্ধকারে বসে আকণ্ঠ অপেক্ষায় থরথর করে কাঁপছে সে— তার কানে ঢুকছে নিজের হৃৎপিণ্ড আর লরি, বাস, ট্যাক্সি, মোটর, টেম্পোর বিচিত্র বহমান শব্দ। তেরো মিনিট অনেকটা সময়, এর মধ্যে সে নিশ্চয়ই পৌঁছে যাবে। সে ফিরে যেতে আসেনি।

গোটা কলকাতা তার যাবতীয় বিন্যাস ও বিশৃঙ্খলা নিয়ে অতর্কিতে ঢুকে পড়লো মনীষার বুকে।

কাল এই সময়ে সে আর রমেন হাঁটছিলো পাশাপাশি। যেমন হেঁটেছিলো তার আগের দিন বা তারও আগের দিন। সে ঠিকঠাক থাকলেও মনে হয় রমেনই গুছোতে পারেনি নিজেকে। পারলে তিনদিনের জায়গায় একটি দিনই ছিল যথেষ্ট। বেচারা রমেন! গত তিনদিন ধরে ব্যাপারটা মনীষাকে বোঝাবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছে সে— হোক বাইরে, দূর, তবু এই চাকরিটা তাদের পক্ষে কলকাতায় থাকার চেয়ে অনেক বেশি জরুরি। দু'বছরে তার শরীরের ওজন কমেছে সাত কিলো। চাকরি পাওয়া আর না পাওয়ার মধ্যে কাচের পার্টিশনের মতো ছিল মনীষার ভালোবাসা। স্বচ্ছ হলেও শক্ত কাচ, ভেঙে এগনো যায়নি। ভালোবাসা প্রেমিকের শরীরের ওজন বাড়াতে পারে না।

যেতে যেতেই আস্তে আস্তে সহজ হয়ে আসে হাওয়া আর নির্জনতা। দূরে গঙ্গার ওপারে আকাশে জেগে ওঠে গভীর সূর্যাস্ত; লাল গম্ভীর হয়ে সন্ধ্যা নামে। হাওয়ায় উড়ে যাওয়া শাড়ির আঁচলটা কাঁধের ওপর গুছিয়ে নেয় মনীষা। রমেন এতোক্ষণ সিগারেট টানছিলো, এই মাত্র ফেলে দিলো। তার সন্তর্পণ হাত চলে যায় পকেটে— প্রায় হৃৎপিণ্ডের কাছে; অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা সে বার বার ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখে। আজ উনত্রিশ তারিখ, কাল ত্রিশ, পরশু একত্রিশ। তারপর এক তারিখ। তার মানে কালকেই রওনা হতে হবে। কাল, সন্ধে পেরিয়ে, প্রায় এই সময়।

'বলো, মনীষা, কলকাতায় থাকাটাই কী তোমার পক্ষে সব! চাকরিটা পেলাম, ভেবেছিলাম এরপর আস্তে আস্তে—'

মনীষা চেষ্টা করে। তবু নিজের বুকের শূন্যতা স্পর্শ করতে পারে না।

'দু' বছর বেকার বসেছিলে, আরো কিছুদিন থাকলে কী আর এমন দেরি হয়ে যেতো! তাছাড়া—' রমেনকে চুপচাপ দেখে মনীষা বললো, 'হাতে তো আরো চারটে ইন্টারভিউয়ের রেজাল্ট বাকি আছে। সবগুলোই কলকাতায়। এর মধ্যে একটা না একটা হয়ে যাবেই।'

'যদি না হয়?'

'যদি না হয়!' মনীষা চোখ তুললো। অস্পষ্ট আলোয় ক্লোজ-আপের মতো এগিয়ে আসছে রমেনের ধূসর মুখ। বললো, 'এই চাকরিটাও কি হবে ভেবেছিলে!

সময় কারুর একরকম থাকে না।'

'তোমাকে বুঝতে পারি না—'

গলার দ্বিতীয় স্তর থেকে কথা বললো রমেন, মনীষার কানে তাই অন্য রকম লাগলো। রমেন জানে না, যে হাওয়ায় সে এতোকাল ধরে নিঃশ্বাস নিয়েছে তা ফুরিয়ে গেলে সে নিজেও মিইয়ে যাবে। দু-ঘরের একটা কোয়ার্টার্স আর সাড়ে তিনশো টাকার বিনিময়ে কলকাতাকে সে বিকিয়ে দিতে প্রস্তুত— এই মনোভাব থেকে মনীষা নিজেকে বাঁচাতে চায়। রমেন কেন বোঝে না, মনীষাও বাঁচতে চায় নিজের মতো করে।

প্রখর আলো জ্বেলে একটা ট্যাক্সি ছুটে আসছে দ্রুত। অন্যদিকে লরি গুলো সারবন্দি দাঁড়িয়ে। নিজেকে নিয়ে সবে দাড়ালো রমেন। মনীষাকে বোধহয় সে এরই মধ্যে ভুলতে শুরু করেছে।

'আমি ভেবে নিয়েছি, কালই যাবো। তুমি ভেবে দেখো। ইচ্ছে হলে জানিও। না হলে পড়ে থাকলো কলকাতা তোমার জন্যে। এমন কেউ কেউ নিশ্চয়ই আছে যারা কলকাতায় থাকে, কলকাতায় বাঁচে, কলকাতায় মরে যায়—'

মনীষা কিছু বলবে! বললেও কী বলবে! তোষামোদে জন্তুর মতো তার সর্বাঙ্গে জিভ বুলোচ্ছে কলকাতা, তার মৃদু উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ছে সমগ্র চেতনায়। কেন, সে জানে না। কেন, সে বলতে পারে না! বিড়বিড় করে সে শুধু বললো, 'আমি জানি, তুমি যাবে না—'

'ছেলেমানুষ!' ব্যস্তভাবে চুলের ভিতর হাত চালালো রমেন, শব্দ করে হাসলো, 'বড়ো বেশি ছেলেমানুষ!'

এইসব ভেবে ভারী নিশ্বাস পড়লো মনীষার। আজ স্টেশনে পৌঁছে হয়তো এই কথাটিই বলা যেতো তাকে, 'দ্যাখো, কেমন বদলে এসেছি নিজেকে!' একটি কথার বীজে বুক অব্দি শিকড় নেমে যেতো রমেনের।

এতোক্ষণে শব্দকে আড়াল করে থাকার পর আবার সে ঢুকে যাচ্ছে শব্দের ভিতর। সাতটা বেয়াল্লিশ! আশ্চর্য, সে কি ঘুমিয়ে পড়েছিলো!

এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে জ্যাম একটুও নড়েনি। বরং গাড়িগুলো যেন গায়ে গায়ে লেগে এসেছে আরো; বিভিন্ন ও বহুমুখী শব্দের চিৎকারে ঝাঁ ঝাঁ করে উঠেছে মাথা। মনে হচ্ছে পৃথিবীজুড়ে আকার নেই কোথাও, শুধু শব্দ— মনীষা পালিয়ে যাচ্ছে জেনে কলকাতা তার শব্দবাহিনী নিয়ে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরছে তাকে।

আর সময় নেই। পৌঁছতে হলে এখনই কিছু করতে হয়।

মনস্থির করা মাত্র স্যুটকেসের হ্যাণ্ডেলটা মুঠোয় চেপে ধরলো মনীষা। 'সর্দারজি আ[illegible]ন নেমে যাচ্ছি—'

লোকটি ফিরে তাকালো। ঘন ভুরুর নিচে জ্বলজ্বল করছে চোখ দুটো। তারপর

মিটারের আলো জ্বালালো। সাত টাকার কিছু বেশিই হয়েছে ; তবু, সময় বাঁচানোর জন্য মনীষা এখন পুরো দশটা টাকাই ছুঁড়ে দিতে পারে।

কিন্তু, এ কী ! বাঁদিকের দরজাটা খুললেই আটকে যাচ্ছে পাশের অ্যামবাসাডারের গায়ে — মাত্র ইঞ্চি তিনেক ফাঁক দিয়ে সে বেরুবে কী করে।

চেষ্টাটা একটু জোরেই করেছিলো অ্যামবাসাডারের আরোহী হৈ হৈ করতেই সে ফিরে এলো ডানদিকে। পাশে ফিয়াট ; এখানে তবু ইঞ্চি সাতেক ব্যবধান পেলো। ওরই মধ্যে কোনোরকমে নিজেকে টেনে বের করতে চাইলো মনীষা— মাডগার্ডে খোঁচা লেগে শাড়িটা বোধহয ছিঁড়েই গেল। কনুইয়ের ধাক্কা লাগতে ঝন্ ঝন্ করে উঠলো তার শরীব। তবু সে সুটকেস সমেত বেরিয়ে এলো। যে লোকটি তাকে চোখ মেবেছিলো, হাঁসতে হাসতে বললো ‘সাবাস !’ শরীর টেনে টেনে ফিয়াটটাকে অতিক্রম করে গেল মনীষা ; ডবল-ডেকারটাকে পাশ কাটাতে গিয়ে দেখলো বেরুবার জায়গা নেই, তখন সে আবাব বাঁ দিকে ঘুরলো। তারপর দু'তিন পা সোজা। সামনে আর জায়গা নেই— একটা সাদা হ্যেরাল্ড নাক ঘষছে ট্যাক্সির গায়ে। হ্যেবাল্ডের মহিলাটি তার পাশের পুরুষটিকে কনুই ঠেলে বললো, ‘এই দ্যাখো দ্যাখো— !’

সকলের দৃষ্টি এখন মনীষার দিকে। একটি মেয়ে তার প্রেমিকের কাছে পৌঁছতে চায়— সময় বড়ো অল্প, কেউ তা ভাবছে না। এই অসম্ভব জ্যাম থেকে অন্তত কিছুক্ষণ চোখ ফেরানোর কৌতূহল সৃষ্টির জন্য স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে সকলে তাকে ধন্যবাদ দিলো।

প্রথম জীবন দ্বিতীয় জীবন

সমরেশ মজুমদার

বেশ কিছুদিন ধরে বিপন্নপালকের মনে হচ্ছিল এভাবে বেঁচে থাকার কোনও মানে হয় না।

মধ্যবিত্ত বাঙালি যা যা পেলে খুশি হয় বিপন্নপালকের তা আছে। সল্ট লেকের খোদ বিডি মার্কেটের পেছনে একটা দোতলা বাড়ি, সাত হাজার টাকা মাইনের একটা চাকরি, ব্যাঙ্ক, ইউনিট ট্রাস্ট, এন এস সি এবং জীবনবীমায় ভাল টাকা। চাকরি ছাড়া তার একটা বিরাট রোজগার, লেখার টাকা। সেটা বছরে ছ লাখের কম হয় না কুড়িয়ে বাড়িয়ে। বিপন্ন বিবাহিত। স্ত্রী তপতীব বয়স গত শ্রাবণে চুয়াল্লিশ, ছেলে দিব্য জয়েন্ট দিয়ে শিব্‌পুরে পড়ছে। একজন বাঙালির এসব থাকলে তাকে নিশ্চয়ই সুখী বলতে অসুবিধে নেই। বিপন্ন একটি মারুতি গাড়ির মালিকও। গাড়িটা এখন চমৎকার চলছে।

তপতী সম্পর্কে বিপন্নর কিছু অভিযোগ ছিল। কোন বাঙালি স্বামীর তা না থাকে! বাইশ বছরের বিবাহিত জীবনে যদি অভিযোগগুলি থেকেই যায় তাহলে তার ধার ভোঁতা হতে বাধ্য। এক্ষেত্রে তাই হয়েছে। তপতী একটু অলস প্রকৃতির। হুটহাট বাইরে বেরুতে চায় না। শরীরের দিকেও নজর নেই। তার মধ্যাঙ্গ যে স্ফীত হচ্ছে তাতে কিছুই এসে যায় না। পেটের গোলমালে কানের দু'পাশের চুল রঙ বদলেছে কিন্তু তা লুকোবার চেষ্টা নেই। বিউটি পার্লারে তাকে পাঠানো যায় না। নিজেকে বয়স্কা দেখানোর ব্যাপারে ওর কোন আপত্তি নেই। তবে সংসারের যাবতীয় কাজ সে-ই করে। দু'বেলা স্বামীকে ভাল রান্না খাওয়াতেই স্ত্রীর দায়িত্ব শেষ— এরকম একটা ধারণা থাকলেও থাকতে পারে।

শরীর ভারী হয়ে যাওয়ায় তপতীর শরীরের চাহিদাও কমে গেছে। বিপন্ন আজকাল আর বেশি অনুরোধ করতে চায় না। রাত্রের কাজ চুকিয়ে বিছানায় শরীর এলিয়ে

দিয়ে ঘুম ছাড়া অন্য কিছুর ভাবনা তপতী ভাবতে চায় না। সামান্য জেগে থাকলেই নাকি তার রাত্রের ঘুম ঘণ্টা তিনেকের জন্যে চলে যায়। বিপন্ন এখন চমৎকার নিরাসক্ত হয়ে থাকে।

তবে তপতীর সুনাম আছে। আত্মীয়স্বজন ওর প্রশংসায় পঞ্চমুখ।দেওয়া থোওয়ার ব্যাপারে ওর জুড়ি নেই। কার কবে জন্মদিন তা ও ঠিক মনে রাখে। বয়স্কারা বলেন, এরকম বউ পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। বিপন্ন এ ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করতে চায় না।

বিপন্নের বয়স এই আশ্বিনে আটচল্লিশ। রোজ ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠে তিন কিলোমিটার হাঁটে সে। সেই সঙ্গে একটু ফ্রিহ্যাণ্ড করে নেয়। পেটে যে মেদ জমছিল সেটা নিয়ন্ত্রণে এসে গিয়েছে। হাঁটা চলায় চনমনে ভাব। রঙিন শার্ট প্যাণ্টের নিচে গুঁজে পরে। জুলপি সাদা হয়ে গেলেও পাঁচজনে সেটা বুঝতে পারে না দামি কলপ ব্যবহার করায়। বিদেশি পারফিউম একবার গায়ে ছড়াবেই সে। আটচল্লিশের বিপন্নকে চল্লিশ বলে ভুল করতে অসুবিধে নেই।

প্রাতঃভ্রমণ সেরে বাড়ি ফিরে চাকরের দেওয়া খবরের কাগজ দেখে, চা খেয়ে বাথরুমে ঢোকে বিপন্ন। একটু পরিষ্কার হয়ে লিখতে বসে। বেলা ন'টা পর্যন্ত সেটা চলে। এই সময়টায় তাকে বিরক্ত করার নিয়ম নেই এই বাড়িতে। টেলিফোনও ধরে না। ন'টায় উঠে তৈরি হয়ে অফিসের জন্যে বেরুনোর সময়টা ঝড়ের মত কাটে। খেতে বসলে তপতী দিনের প্রথম কথা বলে। টাকা পয়সা চাওয়া বা কোনও জরুরি খবরের সঙ্গে আর একটু ভাত দেবে কিনা জানতে চায়। ঠিক সওয়া দশটায় অফিসে ঢুকে পড়ে বিপন্ন। বিদেশি ফার্ম। তাদের কাজের চাপও বেশি। লাঞ্চের আগে মাথা তোলার সময় পাওয়া যায় না। এমনকি ওর পাশের চেম্বারে সুন্দরী গুজরাতি মহিলার দিকে তাকানোও সম্ভব হয় না। সাড়ে পাঁচটায় অফিস থেকে বেরিয়ে কলেজ স্ট্রিটে প্রকাশকদের আস্তানায় চলে আসতে হয় কাজ থাকলে। নইলে মাঝে মধ্যে ক্লাবে। রাত্রে লেখে না বিপন্ন। নিত্য নিয়ম করে ওষুধ খাওয়ার মত দু-পেগ হুইস্কি গলায় ঢালে বই পড়তে পড়তে। রাতের খাওয়ার শেষে তপতীর ঘুমন্ত শরীরের দিকে একবার কি তাকায় না সে। বিছানায় পড়লে এখনও রাতভর ঘুম।

এটা একটা জীবন হল ? একে কি বেঁচে থাকা বলে ? প্রশ্নগুলো ইদানীং বিপন্নকে কেবলই ঠোকরাচ্ছে। সে অনেক ভেবে দেখেছে, তপতীর তাকে বিশেষ প্রয়োজন নেই। মাসের প্রথমে থোক টাকা পেয়ে গেলেই তার সমস্যা শেষ। গত কয়েক মাসে তপতী তাকে কোনও ব্যক্তিগত কথা বলেনি। বাড়িতে মেয়ে ঝি চাকর যেমন আছে তেমনি স্বামীও রয়েছে, এমনই যেন ভাবখানা। ছেলে শিবপুর থেকে প্রথম প্রথম শনিবারে বাড়ি আসত। এখন বন্ধু-বান্ধব বেড়ে যাওয়ায় আসার সময় পায় না। মাসিক টাকার বাইরে প্রয়োজন হলেই সেটা মায়ের কাছ নিবেদন করে। মাঝে

মাঝে লেখার টেবিলে বসে বিপন্ন সেই বাড়তি টাকার চিরকুট পায়। অর্থাৎ বাপ যদি বেঁচে থাকে এবং টাকার নিয়মিত যোগানের ব্যবস্থা হয় তাহলে ছেলে দিব্যি থাকবে।

এসব কথা ভাবলেই বুকে অস্বস্তি জমে। বিয়ের পর তপতীর ব্যবহার, ছেলের শৈশব ঝাঁপিয়ে চলে আসে সামনে। কী সুন্দর, নরম ছিল সেইসব ছবি। সময় কেমন করে সবকিছু উদাস করে দিল। এই নিয়ে লেখার চেষ্টা করেছে বিপন্ন কিন্তু কিছুতেই জমেনি। সময় কখন কেমন করে দাঁত বের করে এই কায়দাটা লেখায় ধরতে পারেনি সে।

এভাবে চলতে পারে না। এই একভাবে অর্থহীন বেঁচে থাকা। অবশ্য কোনটা অর্থপূর্ণ তাও তো জানা নেই। জানবার সুযোগ পেলে অবশ্য জানা সেই সুযোগটার জন্যে মনে মনে আজকাল ছটফট করে সে। মানুষের একটাই জীবন, একবার শুরু হয়ে শেষ হয়ে যায়। ভারতীয় নারীপুরুষ যে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হয় তাই বহন করে যায় শেষ পর্যন্ত। কিন্তু এক শরীরে দুইরকম জীবনযাপন করা যাবে না ? আমি বিপন্নপালক, ছাত্রাবস্থা পর্যন্ত একরকম ছিলাম, বিবাহিত জীবনে তপতীর স্বামী, দিব্যর বাবা, আটচল্লিশ পর্যন্ত একভাব কাটানোর পর আমার বাকি জীবন অন্যভাবে শুরু করে শেষ করতে পারব না কেন ? সন্ন্যাসীরা যেমন বলেন পূর্বাশ্রমের কথা। অনন্ত হালদার তিরিশ বছর বয়স পর্যন্ত সংসার করে স্ত্রী পুত্রকে ভাসিয়ে সন্ন্যাস নিয়ে যদি পরমানন্দ মহারাজ হয়ে দিব্যি বেঁচে থাকতে পারে মাথা কামিয়ে তবে বিপন্ন পারবে না কেন ? অনন্তর যুক্তি ছিল তাকে ঈশ্বর ডেকেছে। বিপন্নর যুক্তি যদি হয় তাকে হৃদয় মুক্ত হতে বলেছে তাহলে সেটা কি অন্যায় হবে ? না, সন্ন্যাস টন্ন্যাস তার দ্বারা হবে না। ওসব তাকে কখনই টানেনি। সে একজন সুস্থ মানুষের মত অন্যরকম জীবনযাপন করতে চায়।

শনিবার ছুটির দিন। লেখা ছেড়ে হিসেব নিয়ে বসল বিপন্ন। ব্যাঙ্ক, ইউনিট ট্রাস্ট, এন এস সি, এন এস এস, ইনস্যুরেন্স মিলিয়ে সাত লক্ষ টাকা এতদিন ধরে লগ্নী করেছে সে। এগুলো নির্দিষ্ট সময় পার হলে চোদ্দ লক্ষ টাকায় পৌঁছবে। এছাড়া আছে প্রকাশকদের পাঠানো নিয়মিত টাকা। অফিস ছেড়ে দিলে লাখ দুয়েক হাতে আসবে। প্রতি মাসে তপতী যদি দশ হাজার হাতে পায় তাহলে তার রাণীর হালে চলে যাবে। সুদ এবং আয়ের টাকার ওপর আয়কর ধরে তপতী ওই টাকা পেতে পারে। এর ফলে কেউ অভিযোগ করতে পারবে না, সে ওদের জলে ভাসিয়ে দিয়ে গেছে। মাস তিনেক আগে বিপন্নর এক সহকর্মী হঠাৎই মারা গেলেন। তাঁর অভাব তো পরিবারের সবাই এখন স্বাভাবিকভাবে মেনে নিয়েছে। আর সেই ভদ্রলোক তো বেশি কিছু রেখে যেতে পারেননি।

একটি ব্যাপারে দোটানায় পড়ল বিপন্ন। এক জীবনে দুই জীবনযাপন করতে গেলে প্রথম জীবনের কোনও স্মৃতি বহন করা উচিত নয়। এতদিনের অভ্যাস,

ধ্যান-ধারণা সব পাল্টাতে হবে। খুব কঠিন কাজ কিন্তু চেষ্টা করলে হয়ত সম্ভব হবে। কিন্তু দ্বিতীয় জীবনযাপনের জন্য টাকার দরকার। সেই টাকা সে প্রথম জীবনের অর্জিত টাকা থেকে কী করে নেবে। আটচল্লিশ বছর বয়সে বিপন্নপালক নতুন জায়গায় গিয়ে করুণাসুন্দর নাম নিয়ে চাকরি পেতে পারে না। চাকরির জন্যে তাকে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট দেখাতে হবে। এতদিন কী করছিল তার কৈফিয়ত চাইবে নিয়োগকর্তা। তার মানেই প্রথমজীবনের কাছে হাত পাতা। অবশ্য নতুন লেখা লিখে কাগজ এবং প্রকাশকদের কাছ থেকে টাকা পেতে পারে। কিন্তু সম্পাদক প্রকাশকরা বিপন্নপালকের লেখা ছাপতে যেভাবে উৎসাহিত হবে করুণাসুন্দরের লেখায় নিশ্চয়ই হবে না। করুণাসুন্দর তাঁদের কাছে একজন নতুন লেখক। টাকা আসবে বিপন্নপালকের নামে। সেক্ষেত্রে লেখালেখি থেকে কোনও রোজগার হবে না দ্বিতীয় জীবনে যদি সে বিপন্নপালককে মেরে ফেলে। এই সমস্যায় বিব্রত হয়ে সে শেষ পর্যন্ত স্থির করল একটু সমঝোতা করা যাক। বিপন্নপালক যদি করুণাসুন্দরকে কিছু দান করে তাতে অন্যায় কী! এই শরীরটাই তো বিপন্নপালকের যা সে করুণাসুন্দরকে দিয়ে দিচ্ছে। মাসে চার হাজার টাকার ব্যবস্থা থাকলে দ্বিতীয় জীবনটা চমৎকার কাটানো যাবে একা একা। চার হাজার মানে ব্যাঙ্কে জমা থাকতে হবে চার লক্ষ টাকা। এই টাকাটাব ব্যবস্থা করতে হবেই।

অনেকদিন থেকেই মাথায় একটা ইচ্ছে ঠোকর মারছিল। বেশ ছিমছিম নির্জন পাহাড়ি জায়গায় থাকলে কেমন হয়! ঠাণ্ডা তার খুব পছন্দের। কুয়াশা দলবেঁধে উঠে আসবে, ইউক্যালিপটাস গাছের পাতা থেকে জলের ফোঁটা ঝরবে, বেশ স্বপ্ন স্বপ্ন ব্যাপার। ভারতবর্ষের পাহাড়ি শহরগুলো তার দেখা হয়ে আছে। বড় শহর দার্জিলিং, সিমলা, মুসৌরিতে নয়। সেখানে বহু মানুষের ভিড়, নিত্য ট্যুরিস্টদের আনাগোনা। একটু অখ্যাত অথবা নির্জন জায়গা প্রয়োজন। দুটো নাম মনে এসেছে। একটি ডালহৌসি, অন্যটি ঘুম। বাঙালি ট্যুরিস্ট চট করে ডালহৌসিতে বেড়াতে যায় না। ঘুমের ওপর দিয়ে দার্জিলিং-এ যেতে হয় বলে, যায় বেড়াতে সেখানে থাকতে নামে না। ডালহৌসি অনেকদূর। কিন্তু ঘুম চেনাজানার মধ্যে। বিপন্নকে ঘুমই টানতে লাগল। কিছুদিন আগে সে শিলিগুড়িতে সাহিত্যসভা করতে গিয়ে ফাঁক পেয়ে ঘুমে বেড়াতে গিয়েছিল। ছবির মত জায়গা। তার কল্পনার সঙ্গে চমৎকার মিল। ব্যাঙ্ক, পোস্ট-অফিস। কিছু সরকারি অফিস। পাহাড়ের অন্যধারে কিছু সুন্দর বাংলোবাড়ি। দুটো বাড়ির গেটে টু-লেট সাইনবোর্ড দেখেছে বিপন্ন।

অনেক চেষ্টা-চরিত্র করে তপতীর ভবিষ্যতের দিকে হাত না বাড়িয়ে বিপন্ন চারলক্ষ টাকার ব্যবস্থা করে ফেলল। এই সময় তার মনে হল, শরীরটাকে যখন বদলাতে পারছে না তখন নাম পরিবর্তনের চেষ্টা কেন। কেউ চিনতে পারলে তাকে জালিয়াত বলে ভাবতে পারে। নামে কী এসে যায়! সে শুধু দ্বিতীয় জীবনের স্বাদ একজীবনে নিতে চাইছে। তার জীবনযাপন হবে একেবারে অন্যরকম। নামের সঙ্গে তো কোন

সংঘাত নেই। ঘুমে যে ব্যাঙ্ক দেখে এসেছিল তার কলকাতার শাখায় সে বিপন্নপালক নামেই চারলক্ষ টাকা রেখে অ্যাকাউন্ট খুলল। ঘুমে পৌঁছে টাকাটা ওই ব্যাঙ্কে ট্রান্সফার করিয়ে নেবে।

এ যেন একটা যুদ্ধযাত্রার প্রস্তুতি। প্রস্তুতি নিতে হচ্ছে অত্যন্ত সতর্কভাবে যাতে কেউ বুঝতে না পারে। কিছু ব্যাপারে অবশ্য অসুবিধে হচ্ছে। যে সব প্রকাশক সম্পাদক আগামী বছরের পরিকল্পনা তাকে নিয়ে করেছেন তাঁদের সরাসরি না বলে দিতে হচ্ছে। তাঁরা অবাক হয়ে কারণ জানতে চাইলে বিপন্ন বলছে সে এখন কিছুকাল বিশ্রাম নেবে, কোনো নতুন লেখা নয়। এ ব্যাপারে প্রচুর উপদেশ শুনতে হচ্ছে কিন্তু সে তার সিদ্ধান্তে অটল। প্রকাশক সম্পাদকরা ভাবছেন, সে চাপ দিয়ে নিজের দাম বাড়াতে চাইছে।

প্রথম জীবনের কোনও আকর্ষণ তাকে টেনে রাখতে পারছে না, শুধু—। হ্যাঁ, লেখালেখির ব্যাপারটা তাকে কিছুটা ভাবিয়েছে। প্রথম জীবন বাতিল করতে হলে লেখালেখিও ছাড়তে হয়। সেই কবে কলেজে পড়ার সময় লেখার নেশায় পড়েছিল বিপন্ন। একদিন না লিখতে পারলে পৃথিবীটা অন্ধকার হয়ে যেত। লিখতে লিখতে সে একসময় লেখক হয়ে গেল। প্রথম প্রথম লেখার প্রশংসা শুনলে কী ভালই না লাগত। নিন্দে শুনলে বিশ্রী হয়ে যেত দিনটা। অন্যের লেখা পড়ার জন্যে তখনই সময় পেত এবং ইচ্ছেও থাকত। তারপর যখন ধাপে ধাপে জনপ্রিয়তা এল তখন ওইসব বোধগুলো ভোঁতা হয়ে গেল কখন কোন ফাঁকে। এখন একটা উপন্যাস মানে অগণিত পাঠকদের মন জয় করা. একটা উপন্যাস মানে বছরে অন্তত তিনটে সংস্করণ। একটা উপন্যাস মানে বছরে পঞ্চাশ হাজার টাকা। হিসেবটা অজান্তেই স্থায়ী হয়ে গেছে। লিখতে লিখতে বিপন্ন বড্ড বুঝে গেছে পাঠকদের প্রিয় হবার জন্যে যেসব লেখক ফর্মুলার ওপর নির্ভর করেন তাঁদের আয়ু বোঝার আগেই শেষ হয়ে যায়। এখনও বাঙালি পাঠক আদর্শবান চরিত্র পছন্দ করে, সামাজিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করা নারীচরিত্র এখনও পাঠকের প্রিয়তমা হয়ে ওঠে। পাঠক নিজের জীবনে যা পারেন না তাই সাহিত্যের কোনো চরিত্র করতে দেখলে উৎসাহিত হন। আর এই সঙ্গে গল্প বলার সাবলীল ভঙ্গি যদি মিশে থাকে তাহলে কথাই নেই। হয়ত এটাও এক ধরনের ফর্মুলা কিন্তু সেটা সাইনবোর্ডের মত সামনে ঝুলে থাকে না বলেই বিপন্ন আজ সফল। শুরু করলে শেষ না করে উপায় নেই, ওর লেখা সম্পর্কে নিন্দুকদেরও এই অভিমত।

আর এই পর্যায়ে পৌঁছে গিয়ে লেখা এখন প্রয়োজনীয় কর্ম ছাড়া অন্য কোন ভূমিকায় নেই বিপন্নর কাছে। লেখার টেবিলে না বসলে দিনটা নষ্ট হয়ে গেল এই অনুভূতিও অনেককাল আগেই মরে গেছে। অন্যের লেখা সে পড়ে না, ধারাবাহিক না হলে নিজের লেখাও পড়তে ইচ্ছে করে না। ধারাবাহিকের ক্ষেত্রে যোগসূত্র বজায় রাখতেই পুরোনো কিস্তি পড়তে হয়। তাই দ্বিতীয় জীবনে লেখা ছেড়ে দিলে

খুব একটা কষ্ট হবে বলে তার বিশ্বাস হয় না। গত পুজোর পর দেড়মাস সে একটা শব্দও লেখেনি, কই, তাতে তো কোন কষ্ট হয়নি। বরং লিখতে হবে না বলে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল। হয়ত একটু বাড়াবাড়ি, তবু আজ বিপন্নের মনে হল, সে বেশ সহজভাবেই লেখা ছেড়ে দিতে পারবে।

মানসিকভাবে তৈরি হবার পর আজ রাত্রে সে তপতীর সঙ্গে কথা বলল। রাত্রে তপতী যেমন ব্যস্ত থাকে এবং ব্যস্ততার পরে বিছানার দিকে শরীর এলিয়ে দিতে এগোয় তেমনি আজও তার ব্যতিক্রম ছিল না। বিপন্ন গম্ভীর গলায় বলল, 'শুয়ো না, তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে।'

তপতী হাই তুলল, 'এত রাত্রে আবার কী কথা?'

'তুমি আগে বসো।'

না বাবা। ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। সারাদিন ধরে এত খাটুনির পর এখন আর বসতে পারব না। এমন নাটক করার কী আছে।'

তপতী শুয়ে পড়ল।

'তোমার কি আমার সঙ্গে কথা বলতেও ইচ্ছে করে না?'

'মানে, সারাদিন ধরেই তো বলছি।'

'সারাদিন? আজ তুমি আমার সঙ্গে ক'টা কথা বলেছ?'

শুয়ে শুয়েই তপতী মনে করার চেষ্টা করল, 'দূর! আমার অত মনে থাকে না।'

'তপতী, আমার এইরকম জীবন ভাল লাগছে না!'

'আমার জন্যে?' তপতী বেশ অবাক।

'না। তুমি নও। সব মিলিয়েই। এ জীবন আমার খুব একঘেয়ে লাগছে।'

'একঘেয়ে তো সবার লাগে। আমার লাগে না? শনি রবি খোকা এলে অন্যরকম মনে হয়। বাকি ক'দিন কাটতেই চায় না। এ আর নতুন কী!'

'তোমার কি মনে হয় না এই একঘেয়েমি থেকে মুক্তি দরকার?'

'দূর। ঘুমাতে দাও তো। তিনকাল চলে গেল এখন উল্টোপাল্টা ভাবনা!'

'আমার তো মনে হয় না।'

'বেশ তো, কোথাও বেড়িয়ে এসো, একঘেয়েমি কেটে যাবে। যতদিন ইচ্ছে ততদিন থাকো বাইরে।'

'তোমার কোনো অসুবিধে হবে না?'

'আমার কিসের অসুবিধে। সংসারের কোন কাজে লাগ তুমি? মাসকাবারি টাকাটা পেলেই হল। তবে বাইরে গেলে লিখতে পারবে?'

'আমার আর লিখতেও ইচ্ছে করে না।'

'না লিখলে চলবে কী করে?'

'যা জমেছে, যা পাবে তাতে দিব্যি চলে যাবে।'

তপতী পাশ ফিরে শুলো, 'যা ভাল বোঝ তাই কর।'

বিপন্ন স্ত্রীর দিকে তাকায়। একটু বাদেই নাকের পাটা ফুলবে। সে বিছানার পাশে চলে এল, 'তপতী, বেড়াতে গিয়ে আমি যদি আর কখনও ফিরে না আসি—!

তপতী তাকাল, 'মতলবটা কী?'

'আমার এই সংসারে থাকতে ভাল লাগছে না।'

'সন্ন্যেসী হবে?'

'না! কোথাও চলে যাব।'

'আমাকে ঘুমোতে দাও।' আবার চোখ বন্ধ করল তপতী।

বিপন্ন সরে এল জানলায়। অন্ধকারে কলকাতা বড্ড চুপচাপ। এই বয়সে এসে তপতী আর নতুন কিছু ভাবতে চায় না অথবা ভাবার ক্ষমতাটাই চলে গেছে। বিয়ের বছরখানেক পরে এইসব কথা শুনলে কেঁদেকেটে একসা করত। এরই নাম জীবন। থাকগে, কথা তো বলাই হল। অন্তত কেউ বলতে পারবে না— সে না বলে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে।

পরেব দিন অফিসে গিয়ে পদত্যাগপত্র দাখিল করল বিপন্ন। ভেবেছিল এই নিয়ে খুব হইচই হবে। কিন্তু দেখা গেল সবাই ব্যাপারটাকে খুব স্বাভাবিক ভাবেই দেখছে। এত নামী লেখক, যাব লেখার টাকায় ছাতা পড়ছে, সে এতদিন অফিসের আইনে নিজেকে আটকে বেখেছিল সেটাই যেন আশ্চর্যেব। পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়ে গেল। অফিস থেকে মোটা টাকার চেকও পেয়ে গেল সে। তার ব্যাঙ্ক-অ্যাকাউণ্টে তপতীর নাম জড়িয়ে আছে। অবর্তমানে টাকা তুলতে কোন অসুবিধে হবে না তপতীর। শুধু ব্যাঙ্ক-অ্যাকাউণ্ট নয়, যাবতীয় সঞ্চয়ে দুজনের নাম আছে। এ ব্যাপারে, তাকে কোনো প্রয়োজন হবে না। কলেজস্ট্রিটে ঘুরে প্রকাশকদের নির্দেশ দিয়ে দিল লিখিতভাবে, তার প্রাপ্য টাকা যেন নিয়মিত তপতীর কাছে পৌঁছায়। কিছুদিনের জন্যে বাইরে যাচ্ছে সে। না ফেরা পর্যন্ত এই ব্যবস্থা, প্রকাশকদের বোঝাল বিপন্ন। একটা ফাইল তৈরি করে তার কোথায় কী আছে, প্রকাশকদের কাছে ওইদিন পর্যন্ত কত টাকা পাওনা আছে তার বিশদ বিবরণ লিখে রাখল তপতীর সুবিধের জন্যে।

এক বিকেলে বাড়ি ফিরে বিপন্ন ঘোষণা করল, 'আজ সন্ধের ট্রেনে বেড়াতে যাচ্ছি।'

তপতী ভি-সি-আরে ছবি দেখছিল কাজের লোকদের নিয়ে, জিজ্ঞাসা কবল, 'কোথায়?'

'দ্বিতীয় জীবনে।'

ঠোঁট উল্টালো তপতী। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'কখন ট্রেন?'

'সাতটায়।'

'স্যুটকেশ গুছিয়ে দেব?'

'না। তোমাকে কষ্ট করতে হবে না। আমিই নিচ্ছি।'

ঘরে ঢুকে স্যুটকেশ নামিয়ে ফাঁপরে পড়ল বিপন্ন। যা নিয়ে যাবে তাই তো প্রথম জীবনের। প্রথম জীবনের স্মৃতি বহন করা কি উচিত হবে? শরীর বাতিল করা যায় না বলেই পরিবর্তনের কথা ওঠে না।

বেরুবার সময় সে আবার তপতীর সামনে এসে দাঁড়াল, 'চললাম।'

'কবে ফিরছ?'

'জানি না।'

'কোথায় যাচ্ছ?'

'পাহাড়ে।'

'গরম জামা-কাপড় নিয়েছ?'

'নিয়ে নেব।'

'স্যুটকেশ কোথায়?'

'সবই তো ওখানে পাওয়া যায়। সঙ্গে বয়ে নিয়ে গিয়ে কি হবে?'

'কী ব্যাপার বল তো?' টিভির সামনে থেকে উঠে এল তপতী।

'কিসের কী!' হাসল বিপন্ন।

'তোমার কথাবার্তা অন্যরকম লাগছে।'

'কী রকম?'

'বেঁকা বেঁকা। তুমি তো এমনভাবে কথা বল না।'

'তোমার কানের দোষ!'

'তা তো বলবেই। যা কিছু ত্রুটি আমারই। এতই যদি দোষ তাহলে বিয়ে করলে কেন?'

তপতীর গলা আচমকা টিভির আওয়াজ ছাপিয়ে গেল। কাজের লোকগুলো মুখ ঘুরিয়ে দেখল। অনেকদিন কাজ করেও তারা তপতীকে এমন গলায় বিপন্নর সঙ্গে কথা বলতে শোনেনি।

প্রচণ্ড রাগ হয়ে গেল বিপন্নর। 'তুমি এদের সামনে এভাবে চেঁচাচ্ছ?'

'ঠিক করেছি। ক'দিন থেকে শুধু ঠারেঠুরে আমাকে ঠোকা হচ্ছে। আমি মোটা হয়ে গেছি, শরীরের যত্ন নিই না, একঘেয়ে হয়ে গেছি। নিজে কার্তিক সেজে থাক বলে আমাকেও সেই সঙ্গে পাল্লা দিতে হবে? ছেলের মুখ চেয়ে আমি বেঁচে আছি।' হঠাৎ গলায় যেন কিছু আটকাল, তপতী দৌড়ে শোওয়ার ঘরে চলে গেল।

বিপন্ন তাকে অনুসরণ করল, 'ন্যাকামি করো না। আমি যা বলেছি তার কোনটে মিথ্যে? বলো? তোমাকে বলতেই হবে। জীবনে বৈচিত্র্য আনার জন্যে তুমি কিছু করেছ?'

বিছানায় বসে কান্না থামিয়ে তপতী ফুঁসে উঠল, 'তুমি কি করেছ?'

বিপন্ন চিৎকার করল, 'যথেষ্ট করেছি। যখন আমাকে বিয়ে করেছিলে তখন

মাইনে পেতাম পনের শ' টাকা। আজ তোমার ঝি-চাকর-ড্রাইভারের মাইনে তার বেশি।'

'ও!' অদ্ভুত সুরে টানল শব্দটি তপতী, 'তুমি আমায় টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছ, না?'

'বাজে বকো না। টাকা না রোজগার করলে এই বাড়িতে থাকতে পারতে না, ছেলেকে শিবপুরে পড়তে পাঠনোও যেত না। আমার কথা কিছু ভেবেছ তুমি? আমি যাতে খুশি হই এমন কাজ কখনও করেছ? তুমি— তুমি সংসারসর্বস্ব স্ত্রীলোক ছাড়া আর কিছুই নও।'

'তুমি এই ভাষায় আমার সঙ্গে কথা বলছ?'

'বেশ করেছি। অনেক আগেই বলা উচিত ছিল।'

'এতদিনে তোমার মুখোশটা তবে খুলল।'

'তোমারও। আজ ঝি-চাকরের সামনে আমাকে অপমান করেছ তুমি!'

'তুমি করোনি? সভা সমিতির নাম করে সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে এত ঢলাঢলি, এতে আমার অপমান হয়নি? আজ বর্ধমান, কাল দুর্গাপুর, সভা লেগেই আছে। সেখানে সভা হচ্ছে না ফূর্তি হচ্ছে তা কে জানতে পারছে?'

'তপতী?' চেঁচিয়ে উঠল বিপন্ন। তার শরীর কাঁপছিল।

'চিৎকার করো না। সেদিন, একটা কুড়ি বছরের মেয়ের সঙ্গে কী মিষ্টি গলায় কথা। মেয়েটা এসে যেই বলল— আমি আপনার অন্ধ ভক্ত, কী সুন্দর লেখেন আপনি, আপনাকে একবার দেখতে পাব বলে অনেকদূর থেকে ছুটে এসেছি— অমনি কোয়ালিটির আইসক্রিম -য়ে গেলে। ছি ছি ছি। একবারও মনে হল না মেয়েটা তোমার ছেলের বয়সী।'

'তুমি এত নীচ, তোমার মন এত নোংরা?'

'হ্যাঁ, আমি নীচ হব, নোংরা হব! আর উনি চুলে কলপ মেখে হাঁটুর বয়সী মেয়েদের সঙ্গে কেষ্টলীলা করবেন, সেটা মহৎ ব্যাপার।'

'মুখ সামলে কথা বল তপতী?'

'কেন? মারবে নাকি? মারো। এসো। তাতেও বুঝব পৌরুষ আছে।'

'ঠিক আছে। তোমার সঙ্গে কথা বলতে ঘেন্না করছে আমার। এতদিন মনে এই প্যাঁচ পুষে রেখেছিলে! আমি যাচ্ছি, এজীবনে তোমার কাছে ফিরে আসব না।'

ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলল তপতী, 'তা তো যাবেই, নিশ্চয়ই কোন শাকচুন্নিকে মনে ধরেছে। আমি তখনই বুঝেছি, অত সাজের বাহার যখন তখন নিশ্চয়ই কোনো মতলব আছে। মর্নিং ওয়াক! হুঁ। রোগা হয়ে যুবক সাজা। এসব আমার জানা ছিল।'

'তোমার মন কী নোংরা হয়ে গেছে তপতী! স্টেশনে চল, গিয়ে দেখবে কেউ

সঙ্গে যাচ্ছে কিনা।' ফোঁস করে উঠল বিপন্ন।

'আমার বয়ে গেছে স্টেশনে যেতে।'

'না। তোমাকে যেতেই হবে। নইলে দুনিয়ার লোককে এই মিথ্যেটা বলে বেড়াবে। তৈরি হও।' বিপন্ন নিচে নেমে এল। চাকরকে ব নল ট্যাক্সি ডাকতে। ওপর থেকে তপতী চেঁচাল। চাকরকে ডেকে বলল, 'ট্যাক্সি াকবি না। স্টেশনে যখন নিয়ে যেতে চাইছে তখন সেখানে শাকচুন্নি নিশ্চয়ই নেই। যেখানে যাচ্ছে সেখানেই তিনি রয়েছেন। দেখতে হয় সেখানেই যাব আমি।'

বিপন্ন দৌড়ে ওপরে উঠে এল, 'তুমি আবার চাকরের সামনে আমাকে অপমান করছ?'

'বেশ করেছি। তুমি ফুর্তি করতে যাবে আর আমি তোমাকে পুজো করব?

ঠিক আছে। ভালই হল। যেটুকু বন্ধন ছিল আজ শেষ হয়ে গেল। কিন্তু আমার নামে তুমি বদনাম দেবে তা আমি সহ্য করব না। তোমাকে ঘুমে যেতে হবে।'

'ঘুম? তুমি আমাকে ঘুম পাড়াতে চাও? ঘুমের ওষুধ খাওয়াবে নাকি? আমাকে মেরে ফেলার মতলব?' তীব্র চিৎকার ছিটকে বেরিয়ে এল তপতীর গলা থেকে।

'দূর অশিক্ষিতা! ঘুম হল একটা জায়গার নাম। সেখানে আমি বাকি জীবন থাকব।'

'কার সঙ্গে?'

'একা। স্রেফ একা।'

'আমি বিশ্বাস করি না।'

'ঠিক আছে, চল, দেখে এসো। কিন্তু একটা শর্ত, কাউকে ঠিকানা দেবে না।'

'কেন?'

'আমি এই জীবনের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখতে চাই না। আমার কাউকে ভাল লাগছে না। তোমাকে না, এ বাড়িকে না, কাউকে না।'

'আমাদের চলবে কী করে?'

'সব ব্যবস্থা রেখেছি। ওই ফাইলে সব হিসেব পাবে। শোনো, আমি ভদ্রলোক বলে তোমাকে জানিয়ে যাচ্ছি, নইলে না বলে কেটে পড়লে তুমি টেরও পেতে না।' বিপন্ন ঘড়ি দেখল। ট্রেন ছাড়তে আর আধ ঘণ্টা বাকি। সে ছটফটিয়ে উঠল।

তপতী মুখ ঘোরাল, 'হুট বললেই যাওয়া যায় না। সংসার গুছিয়ে যেতে হবে। কালকের আগে পারব না। তোমার আর কি! এই সংসারটাকে নিজের বলে তো কোনোদিন মনে করোনি।'

ট্রেনে নয়, বাড়তি পয়সা খরচ করে বিপন্ন স্ত্রীকে নিয়ে প্লেনে চেপে বাগডোগরাতে নামল। কাল সন্ধের পর আর কোনো কথা হয়নি। গতরাত্রে একটু বেশি মদ্যপান হয়ে গিয়েছে বিপন্নর। সেই সময় মনে হচ্ছিল দিনটা অন্যদিনের থেকে একদম

আলাদা। এই জীবনের যা কিছু স্মৃতি ছেড়ে যাওয়ার সময়ে অমন আলাদা হওয়াটাই স্বাভাবিক। অনুভূতি তাই বেশ নতুন। মানুষ মরে যাওয়ার পরেও প্রিয়জনের হাতের আগুন মুখে নেয়, নিতে বাধ্য হয়, তেমনি তপতীকে নিয়ে এই শেষযাত্রা। বিপন্নর অবশ্য মনে পড়ল না শেষবার কবে তপতী তার সঙ্গে বেরিয়েছে।

ট্যাক্সি থেকে নেমে বিপন্ন জিজ্ঞাসা করল, 'চা খাবে?'

'না।' গম্ভীর মুখে বলল তপতী।

'শালটায় ঠাণ্ডা আটকাচ্ছে?'

তপতী জবাব দিল না।

বিপন্ন দেখল ঘুম শহরটাকে যেন আগের চেয়ে সুন্দর দেখাচ্ছে। সে ভেবে রেখেছিল একদিন হোটেলে থেকে আগেরবার দেখা বাড়িগুলোর তল্লাস নেবে, কোনটে ভাড়া পাওয়া যায়! স্টেশনের কাছেই একটা ভদ্র হোটেলে ওরা উঠল। এখন বিকেল হয়ে এসেছে। সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না। বিপন্ন বলল, 'তুমি বিশ্রাম নাও, আমি বাড়ি দেখে আসছি।'

'অসম্ভব!'

'মানে?'

'আমাকে একা রেখে সেই শাকচুন্নির সঙ্গে দেখা করার মতলব তোমার। আগেভাগে গিয়ে তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে রাখবে এ আমি হতে দেব না।'

'বেশ তুমিও চল আমার সঙ্গে।'

তপতী এক পায়ে খাড়া। বেশ ভারী হয়ে গেল বিপন্নর মন। কিন্তু সে নিজেকে বোঝাল তপস্যার পথে মুনি ঋষিরা এর চেয়েও বেশি প্রতিবন্ধকতার সামনে পড়েন! হোটেলের ম্যানেজার অবাঙালি। দেখে মনে হয় সজ্জন। বিপন্ন তপতীকে দাঁড় করিয়ে লোকটির সঙ্গে আলাপ করল। উদ্দেশ্য জানাতে ভদ্রলোক বললেন, 'ক'টা বাড়ি চান বলুন। আগে হলে মুশকিল হত। আন্দোলনের পর সব খালি পড়ে আছে। আপনার বাজেট কত?'

সেই সন্ধের মধ্যেই একটা দু-কামরার বাংলো ভাড়া পেয়ে গেল বিপন্ন। মাসিক ভাড়া আটশো। বাড়িওয়ালা সেই হোটেলের মালিকই। স্টেশন থেকে মিনিট পাঁচেকের হাঁটা পথ আর সুবিধে হল বাড়িটা সাজানো। টেবিল চেয়ার থেকে আলমারি পর্যন্ত রয়ে গেছে। আগের ভাড়াটে আন্দোলনের সময় চট জলদি চলে গিয়েছেন বলে কিছুই নিয়ে যেতে পারেননি। পরদিন সকালে বিছানাপত্তর, স্টোভ হাঁড়ি বাসন কিনে গৃহপ্রবেশ করল বিপন্ন। তপতী তার সঙ্গে সবসময় কিন্তু একটা কথাও বলেনি।

হোটেলের মালিকই এক বৃদ্ধা নেপালি মহিলাকে ঠিক করে দিয়েছিলেন। দু'বেলা এসে রান্না এবং অন্যান্য কাজ করে দেবে সে। নতুন বাড়িতে খোলা জানলার পাশে বসে পাহাড় দেখতে দেখতে বিপন্ন চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল, 'আঃ, এই হল জীবন। তা দেখলে তো, আমার এখানে কোন মহিলা নেই। খালি খালি

সন্দেহ কর।'

এই প্রথম তপতী বলল, 'এখানে তুমি বাকি জীবন থাকবে?'

'ইয়েস ম্যাডাম।'

'ঠাকুরঘর নেই, এঁটোকাটার বাদ বিচার নেই, এইভাবে?'

'গুলি মারো ওসবের। প্রথম জীবনের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।'

'আমাব আছে।'

'তুমি তো 'ফিরে যাবো' বলেই এসেছ। সন্দেহভঞ্জন হয়েছে, চলে যেতে পাব।'

'যাবই তো।'

এগারটা নাগাদ রান্না শেষ করে বৃদ্ধ চলে গেল। কলকাতা থেকে আনা ভদকার বোতল খুলল বিপন্ন। তপতী হতভম্ব, 'তুমি এখন মদ খাচ্ছ? এই সময় কখনও খাও?'

'নতুন জীবনে সব কিছু নতুন। ফ্যাচ ফ্যাচ করো না।' বিপন্ন গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল, 'আঃ। আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমোচ্ছে।'

'তুমি নিজের হাতে খাবার বেড়ে খাবে?'

'ইচ্ছে হলে খাব।'

'পারবে?'

'ওঃ, সব পারা যায়।'

তপতী পাশের ঘরে চলে গেল।

একটা নাগাদ বেশ ঢুলু ঢুলু নেশা হল বিপন্নর। চারপাশে কুয়াশার দঙ্গল। সে টলমল পায়ে দরজায় দাঁড়াল। ইটস নিউ লাইফ, নতুন জীবন।

'স্নান করবে না?' পেছনে তপতীব গলা।

'স্নান? নো স্নান। এখন আমি ঘুমোবো।' ফিরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ল বিপন্ন। পড়তেই ঘুম।

ঘুম ভাঙল বিকেলে। বেশ খিদে পাচ্ছে। চোখ মেলে দেখল তপতী গম্ভীর মুখে চেয়ারে বসে। হাই তুলে বিপন্ন বলল, 'যাই খাবার গরম করি? তুমি খেয়েছ? আমার জন্যে অপেক্ষা করা কেন?' তিনটে দেশলাই খবচ করে সে স্টোভ জ্বালালো। মাংস গরম করা যায়, কিন্তু ভাত? অবশ্য গরম ভাত খেতে হবেই এমন কোন মানে নেই। যেটুকু পারল করে সব টেবিলে নিয়ে এল সে, 'এসো। খাবে তো।'

'এই বিকেলে আমি ভাত খাব না।'

'অলটারনেটিভ কিছু নেই। আমি খাচ্ছি।' ভাতে মাংস ঢালল বিপন্ন। প্রথমবার মুখে দিয়ে বুঝল অসম্ভব ঝাল। লঙ্কা খাওয়ার অভ্যেস নেই তার। সব তরকারিতে মিষ্টি দিয়ে দিয়ে অভ্যেসটা পাল্টে দিয়েছে তপতী। দু-গ্রাস গিলে সে হাত গুটিয়ে নিল, 'বড্ড ঝাল দিয়েছে। বলতে হবে বুড়িটাকে।' সে হাত ধুয়ে নিল। নিয়ে হাসল, 'কলকাতায় হলে রাগারাগি করতাম। এখন করলাম না। নতুন জীবনে এসব

হবেই।'

তপতী কিছু বলল না।

'তুমি চুপ করে আছ যে?'

'দেখে যাচ্ছি।'

বাঃ। চমৎকার! কবে যাচ্ছ?

'এখনও কিছু দেখা বাকি আছে।'

'ও। যাই বলো, আজকের দিনটা একদম আলাদা। কোনো একঘেয়েমি নেই।'

'আজ নেই। পরশু হবে কিংবা তার পরের দিন।'

'দূর! অত ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবি না। বাইরে যাবে?'

'বেড়াতে?'

'হ্যাঁ। মানে, হোটেলে গিয়ে কিছু একটা খেয়ে আসা যাক।'

হোটেলে খেয়ে ফিরতে ফিরতে রাত। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে ফিরে এল ওরা। এসে দেখল কাজের বুড়িটা জড়োসড়ো হয়ে বসে। দরজায় তালা দিয়ে গিয়েছিল।

তপতী তাকে আজকের মত ছুটি দিয়ে দিল।

ঘরে ঢুকেই বিছানায় লেপের তলায় ঢুকে গেল বিপন্ন। টেবিলে তখনও এঁটো ভাত-মাংস ছড়িয়ে। তপতী জিজ্ঞাসা করল, 'এগুলো কী হবে?'

'বুড়িটা চলে গেল, না। যাকগে। কাল ও এসে পরিষ্কার করবে।'

তপতী কথা না বলে টেবিল পরিষ্কার করতে লেগে গেল। মিনিট পাঁচেকের জন্যে তাকে দেখা গেল না। তারপর সে ফিরে এল দু-কাপ কফি নিয়ে।

উৎফুল্ল হল বিপন্ন। হাত বাড়িয়ে কফি নিয়ে বলল, 'গ্রান্ড। নেপালি বুড়িটা আর তোমার পার্থক্য কি জান? না বললেও তুমি মনের কথা বুঝে নাও।'

'তাই? ভাবছি কলকাতায় ফিরে গিয়ে কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেব।'

'কেন?' থমকে গেল বিপন্ন।

'আমার একটি বউ চাই।' কেটে কেটে বলল তপতী।

'বউ? তোমার? তুমি একজন স্ত্রীলোক।'

'তাতে কী হয়েছে? তোমার দ্বিতীয় জীবনে সব কিছু উল্টো হতে পারে যদি তবে আমার হবে না কেন?'

'যদি কোন মেয়ে রাজি হয় তাহলে তাকে বিয়ে করবে?'

'নিশ্চয়ই। সে আমার মনের কথা বুঝে নেবে, তার ওপর সব রকম অত্যাচার করতে পারব, রাতদিন সে খেটে যাবে আমার জন্যে, বিয়ে করব না কেন?

নিশ্বাস ফেলল বিপন্ন, 'তোমার দ্বিতীয় জীবনটা দেখতে লোভ হচ্ছে। আমারটা তো তুমি দেখে গেলে।'

'কাল সকালেই আমি ফিরে যাব।'

'কালই !'

'হ্যাঁ।'

'বেশ।'

রাত্রে পাশাপাশি শুযে বিপন্ন নিজেকে বোঝাল, তপতী তার প্রথম জীবনের স্ত্রী। এখন কোন সম্পর্ক নেই। এটা ভাবতেই শরীরে বোমাঞ্চ এল। আজকেব এই দিনটার সঙ্গে ফেলে আসা জীবনের কোনো মিল নেই। এমন ঠাণ্ডাতেও তার ঘুম আসছিল না। সে লেপেব তলায় শুয়ে নড়াচড়া করছিল। তপতী ধমকালো, 'কী হচ্ছে ?'

'ঘুম আসছে না। হুইস্কি খাইনি তো।'

'খেতে কে নিষেধ করেছে ?'

'ইচ্ছে হচ্ছে না।'

তপতী হাসল, 'তোমার দ্বিতীয় জীবনটাকে এতক্ষণে ভাল লাগল। প্রথম জীবনে যা যা কবতে তা দ্বিতীয় জীবনে করা উচিত নয়। দুপুরে ভদকাও খেও না।'

'ঠিক আছে।' বিপন্ন জড়িয়ে ধবল তপতীকে।

'একি ?' অস্ফুটে বলে উঠল তপতী।

'প্রথম জীবনে ইদানীং তোমাকে জড়িয়ে ধবার কথা মনে আসত না। ধরতামও না। দ্বিতীয় জীবনে সেটা নিশ্চয়ই করা যায। কাছে এসো, বড্ড ঠাণ্ডা।' জড়ানো গলায় বলল বিপন্ন।

শাজাহানের জতুগৃহ

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

অক্ষয়চন্দ্র মেমোরিয়াল হাসপাতালের চোদ্দ নম্বর বেডে আমার মা শুয়ে আছেন। মাথায় পুরু ব্যান্ডেজ। কপাল ঢেকে আছে। চোখদুটো আধবোজা। বিছানার পাশে একটা লম্বা স্ট্যান্ডে বোতল ঝুলছে। বোতল থেকে একটা স্বচ্ছ নল ওপর হাতের শিরায় গিয়ে ঢুকেছে। এই আমার মা। আমার মা, ছোট বোন শিখার মা।

আমরা নয়নজুলির তিনতলা একটা ফ্ল্যাটবাড়ির ওপরের ফ্ল্যাটে থাকি। আমরা দুই ভাই-বোন, মা আর বাবা। বাবার কথা আমার লিখতে ইচ্ছে করে না। আমার বাবা অতি খারাপ লোক। খারাপ ছেলের কথা অনেক শুনেছি, খারাপ বাবা এই প্রথম দেখলুম। মা যে এমন একটা মানুষকে কেন বিয়ে করেছিলেন, কে জানে? অবশ্য বাবা-মার বিয়ের ওপর ছেলেদের কোন হাত থাকে না। বিয়ের পরই তারা বাবা-মা হন।

আমার বয়স সতের। আমার বোনের বয়স তের।

মা তার বাঁ হাতটা অল্প একটু তুললেন। বুঝলাম, আমি যে এসেছি তিনি দেখতে পেয়েছেন। বিছানার পাশে ছোট টুল। আমি সেই টুলে বসলুম। আমি মায়ের জন্যে কিছু আনতে পারিনি। কারণ আমার কাছে হাসপাতালে আসা আর যাওয়ার পথখরচ ছাড়া আর কিছু ছিল না। বাজারে এখন আপেলের দাম আট টাকা কেজি। একটা মুসুম্বি প্রায় এক টাকা দাম। পঞ্চাশ পয়সার কম দামের যে সন্দেশ তা ছুন্নিগুলির মত এবং অখাদ্য।

মা ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোরা কেমন আছিস?'

বললুম, 'ভালো।' কিন্তু আমরা মোটেই ভালো নেই। এই পৃথিবীতে একা একা থাকতে কার ভালো লাগে! অনেক বইয়ে পড়েছি, জীবন একটা সংগ্রাম। সেই সংগ্রাম যে এই সংগ্রাম, কে জানত।

মা আবার ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন, 'বাবা ফিরেছে?'

বাবার কথা শুনে কেমন একটা ঘৃণা হল। এমন মানুষের ফেরা আর না ফেরা'

'না ফেরেননি। তুমি কি মনে কর ফিরে আসবেন?'

আমার প্রশ্নের কোন জবাব নেই। মা চুপ করে গেলেন। বোতল থেকে কি একটা জল টিপ টিপ করে নলে পড়ছে। নল থেকে মায়ের শরীরে।

'শিখা কি করছে রে?'

'শিখাকে নিচের ফ্ল্যাটের মাসিমার কাছে রেখে এসেছি।'

'আজ তোরা কি খেলি?'

'চিনি আর পাউরুটি।'

মা আবার আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। চোখের কোণে দু'ফোঁটা জল নামল।

দূর থেকে জুতোর শব্দ তুলে নার্স হেঁটে আসছেন। সাদা ধবধবে পোশাক। পৃথিবীটা এত ভালো, তবু কত খারাপ।

'তোমার মাকে বকিও না, এবার উঠে পড়। আবার কাল।'

সিস্টার বোতলটা একবার ঝাঁকিয়ে দিলেন। মায়ের মাথার ব্যান্ডেজটার দিকে এক নজরে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। এমন রোগী, এমন বিপদ এঁরা সারাদিনে কত দেখছেন। মনে সব সয়ে গেছে।

উঠতে যাচ্ছি, মা আবার বাঁ-হাতের ইশারায় কাছে ডাকলেন। নিচু হয়ে মুখটা মায়ের মুখের সামনে নামিয়ে আনলাম। মা ফিসফিস করে বললেন, 'বিনু, তুই আমার কানের দুলদুটো খুলে নিয়ে যা। বেচে কিংবা বাঁধা দিয়ে যেমন করে পারিস, কিছু টাকা যোগাড় কর। তা না হলে কি করে চলবে রে!'

'না মা, ও আমি পারব না। বরং আমার হাতঘড়িটা—।'

মায়ের মুখ বড় করুণ হয়ে উঠল। মাকে কি ভীষণ অসহায় দেখাচ্ছে। ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল— 'ঘড়িতে হবে না রে, বিনু। কত আর পাবি! অনেক খরচ। তুই খুলে নে বাবা! পরে আবার সব হবে।'

মানুষের দিন কি ভালো হয়! আমার এই সতের বছরের জীবনে কোন ভালোই তো দেখিনি। মাও বেশ ভালোই জানেন, জীবনে ভালো দিন আর আসবে না। টাকা সত্যিই চাই। আজকের দিন চলে গেলে কাল কি হবে, তা কেউ জানে না।

অনেক ভেবে নিচু হয়ে মায়ের কান থেকে একে একে দুলদুটো খুলে নিলুম। মায়ের নিশ্বাস পড়ছে ধীরে ধীরে। উষ্ণ বাতাসের মত গায়ে লাগছে। বেশ জ্বর হয়েছে। জীবন যেমন ক্ষয়ে যায়, সোনার অলঙ্কারও তেমনি শরীরের স্পর্শ লেগে লেগে কেমন বিবর্ণ, কেমন ক্ষয়া-ক্ষয়া হয়ে যায়। দুলদুটো হাতের তালুতে রাখতেই মনে হল, এ সুখের শরীর থেকে আসেনি, এসেছে দুঃখের ছোঁয়া লাগা, জর্জরিত কোনও শরীর থেকে বিষণ্ণ, ক্ষত-বিক্ষত চেহারা নিয়ে। দুলদুটোর দিকে তাকাতেই আমি যেন আমার মায়ের জীবনের অতীত দেখতে পেয়ে গেলুম। যিনি হাসতে

চেয়ে কেঁদে গেলেন, যিনি বাঁধতে গিয়ে বাঁধা পড়লেন, যিনি ভরাতে গিয়ে ক্ষয়ে গেলেন, যিনি ভালোবাসতে গিয়ে পুড়ে গেলেন। আমার মায়ের কিছু হল না। এ যেন সেই গাড়ি, যার চালক জানে না যে পথে ছুটে চলেছে সেই পথের শেষে বিশাল একটা খাদ।

সন্ধে নেমেছে শহরে। আজ বৃহস্পতিবার। রঙ্গমঞ্চে এতক্ষণ আমার বাবা রেশমের পোশাক পরে ফুটলাইটের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। মুখে মিহি মদের গন্ধ। তিনি আমার বাবা নন। শাজাহান। একান্নতম রজনীর সফল অভিনেতা। মঞ্চে এসে দাঁড়ালেই দর্শকের প্রশংসার হাততালি।

দুই

বিরাজবাবু আমার বাবার বন্ধু। আমরা বলি বিরাজকাকু। একসময় দু'জনে একই সঙ্গে থিয়েটার করতেন। বাবাও তখন অ্যামেচার। বাবা অভিনয়কে পেশা করে নিলেন। বিরাজকাকু একটা চাকরি পেয়ে অভিনয়ের জগৎ থেকে ক্রমশ দূরে সরে গেলেন। বাবার সঙ্গে মায়ের প্রেম, বিয়ে সব কিছুর পেছনে বিরাজকাকুর হাত ছিল। বিয়ের পরেও বেশ কয়েক বছর বাবার সঙ্গে বিরাজকাকুর অন্তরঙ্গতা ছিল। তারপরই বাবা পেশাদারী অভিনয়ের জগতে যত খ্যাতি পেতে শুরু করলেন ততই তিনি সংসার থেকে, সমাজ থেকে, বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে লাগলেন।

বিরাজকাকু বলেন, আমি লাইন দিয়ে বেবি ফুড কিনে এনে তোর দুধ খাবার ব্যবস্থা করেছি। ঘাড়ে করে চাইল্ড স্পেশালিস্টের কাছে নিয়ে গেছি। আমিই তোর রিয়েল ফাদার।

মানুষটি বড় ভালো। মাঝে মাঝে মনে হয়, মা কেন বিরাজকাকুকে বিয়ে করলেন না! মা তো দুজনেরই বন্ধু ছিলেন। আমি জানি আমার এই ভাবনাটা খুব দোষের। তবু মনে হয়। বিরাজকাকুকে ভীষণ ভালো লাগে। আসলে আমার মা খুব বোকা। আমাদের নিচের ফ্ল্যাটের শ্যামলীর মত। সে চঞ্চলকে ভালোবাসে। অথচ চঞ্চল ছেলেটা খুব বাজে ধরনের। চঞ্চলের একমাত্র গুণ ভালো গান গায়। চঞ্চল নেশা করে, চঞ্চল সংবাদ দেখে না, চঞ্চল কাপ্তেন, চঞ্চলের সব কিছুই বাজে। আমার মাও ঠিক শ্যামলীর মত। কত শ্যামলী যে আছে এই সংসারে!

রাতের দিকে বিরাজকাকু এলেন। আমরা না খেয়ে আছি ভেবে খাবার এনেছেন। শিখা ঘুমিয়ে পড়েছে। শিখার জন্যে আমার খুব দুঃখ হয়। আমি তো ছেলে আমার আর কি। যেমন করেই হোক চালিয়ে নেবো। শিখার কি হবে?

বিরাজকাকু খুব পান খান জর্দা দিয়ে। সুন্দর একটা গন্ধ বেরোয়।

'খাওয়াদাওয়া কিছু করেছিস, বিনু? করিস নি!'

'এইবার করব কাকু।'

'নে, ঠোঙায় খাবার আছে। কাল থেকে অন্তত একবেলা তোদের জন্যে ভাতের ব্যবস্থা করতে হবে। কোথায় করি! নিজেরই চালচুলোর ঠিক নেই। তবু করতে হবে। মেয়েটার ঘাড়টা বেঁকে আছে রে, বিনু। সোজা করে দে।'

শিখা এঁকেবেঁকে শুয়ে আছে। পড়ার বই চারপাশে ছড়িয়ে আছে। মেয়েটার গা দিয়ে একটা ছেলেমানুষ ছেলেমানুষ গন্ধ বেরোচ্ছে। শিখাকে ঠিক করে শোয়াতে শোয়াতে মনে হল, আমার বাবা কত নিষ্ঠুর।

বিরাজকাকু চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, 'ব্যাপারটা কি হয়েছিল বল তো?'

'খুব বাজে ব্যাপার কাকু।'

'বাজে তো বটেই। হঠাৎ এত ক্ষেপে গেল কেন?'

'আমি তো সবটা জানি না। অনেক রাতের ঘটনা। আমরা যখন জেগে উঠে ছুটে গেছি তখন আমার মা মাটিতে পড়ে আছেন। চারপাশ ভেসে যাচ্ছে রক্তে। সিঁড়ির কাছে অল্প আলোতে দু'হাতে মুখ ঢেকে বাবা দাঁড়িয়ে। মুখে তখনও মেকআপ। থিয়েটারের ডায়লগের মত বলে চলেছেন, এ আমি কি করলুম, এ আমি কি করে ফেলেছি! তারপর হঠাৎ জাহানারার ডায়লগ বলতে শুরু করলেন, উঠুন, দলিত ভুজঙ্গের মত ফণা বিস্তার করে উঠুন, হৃতশাবক ব্যাঘ্রীর মত প্রমত্ত বিক্রমে গর্জে উঠুন, অত্যাচারে ক্ষিপ্ত জাতির মত জেগে উঠুন। তারপর ফুপিয়ে ফুঁপিয়ে কিছুক্ষণ কেঁদে টলতে টলতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন।'

বিরাজকাকু কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে থেকে বললেন, 'তোর বাবা কাঁদতে চায়। দুঃখ দিয়ে দুঃখ পেতে চায়। তোর মায়ের মত মেয়ে হয় না রে।'

'তাই তো বাবা অত বাড়তে পেরেছে।'

'ভুল বললি বিনু। লোকটা মনেপ্রাণে শাজাহান হয়ে গেছে। শাজাহানকে যে কাঁদতেই হবে।'

'তা বলে মাকে মেরে?'

'তোর মা ছাড়া পৃথিবীতে ওর আপনার লোক আর কে আছে বল?'

'আপনার কথা আমি কিছুই বুঝি না। বাবা যদি শাজাহানই হবেন আমার মা তো তাহলে মমতাজ! এই কি বাবার তাজমহল।'

'বিনু, তোর বাবার ওপর রাগ করিস না রে। লোকটার মনটা বড় ভালো রে। কত বড় অভিনেতা। ইতিহাসে নাম থাকবে।'

'আমাদের মনের ইতিহাসে কি থাকবে কাকু? হাসপাতালে গিয়ে মাকে একবার দেখে এলেই বুঝবেন। মাকে কারা হাসপাতালে নিয়ে গেল? জানেন, মায়ের হাতে আজ একটাও পয়সা নেই। এই দেখুন কানের দুলদুটো মা আজ বেচে দেবার জন্যে আমার হাতে খুলে দিয়েছেন।'

'ও দুটো তোমাকে বেচতে হবে না বিনু, তুলে রেখে দাও। মা হাসপাতাল

থেকে ফিরে এলে যে হাতে খুলেছ সেই হাতেই আবার পরিয়ে দিও। জেনে রাখ, শিল্পীদের হাতে কখনও পয়সা থাকে না। আসে আর উড়ে যায়। তাদের সংসার এই ভাবেই চলে। পাঁচজনে চালিয়ে দেয়। শিল্পের জন্মভূমি হল অভাব, অশান্তি, হতাশা, বিচ্ছেদ। ওসব বোঝার বয়স তোর হয়নি। নে উঠে পড়।'

'কোথায় উঠব কাকু?'

'যেতে হবে না?'

'কোথায়?'

'কোথায় আবার! আমার আস্তানায়। মনে নেই তোকে আমি বলেছিলুম একদিন, আমিই তোর রিয়েল ফাদার! তুই ভাবিস কি ব্যাটা! আমি কি তোর বাপের চেয়ে কম বড় অভিনেতা ছিলুম। আমার ঔরঙ্গজীব দেখেছিস? দেখিসনি। তুই তখন এতটুকু। মায়ের কোলে ট্যাঁ ট্যাঁ। স্টেজ ছেড়ে চাকরি ধরেছি কেন জানিস, আমি এক নতুন ঔরঙ্গজীব। শাজাহানকে আগ্রা দুর্গ থেকে মুক্ত করে দিয়ে বলব, শাজাহান, ওই তোমার মসনদ, ওই তোমার মমতাজ, ওই তোমার জাহানারা। নে, জাহানারাকে টেনে তোল, অনেক রাত হল। ভালো তালা আছে?'

'হ্যাঁ, আছে।'

'নে, হৌজখাসে তালা মেরে আমার সঙ্গে চল। মা ভালো হয়ে ফিরে এলে তারপর আসবি।'

বিরাজকাকুর সঙ্গে ট্যাক্সি করে আমার দুই ভাই-বোন মাঝরাতের কলকাতার মধ্যে দিয়ে চলেছি। শিখা আমার কাঁধে মাথা রেখেছে। মাঝে মাঝে আলোর রেখা মুখে হাত বুলিয়ে দিয়ে সরে সরে যাচ্ছে। শিখা কেমন হয়ে গেছে। মুখটা কি আমার মায়ের মুখের মতই। কিন্তু কি ভীষণ ক্লান্ত। ঘটনার রাত থেকে আজ পর্যন্ত শিখার মুখে এতটুকু হাসি নেই। চলে ফিরে বেরিয়েছে যেন কলের পুতুল। সত্যিই জাহানারা। শাজাহানের সঙ্গে একই দুর্গে বন্দী। মায়ের জন্যে আমার যেমন দুঃখ হয়, শিখার জন্যেও তেমনি দুঃখ হয়। শিখা যেন এই বয়সেই মায়ের মত বুড়িয়ে গেছে।

বিরাজকাকু একলা মানুষ। দেড় কামরার ফ্ল্যাট। পরিচ্ছন্ন করে সাজানো। ঘরের একদিকের দেওয়ালে বিশাল একটা সিন টাঙিয়ে রেখেছেন। সেই শখের থিয়েটারের স্মৃতি। থিয়েটার গেছে, সিনটা আছে। রোজই ঝাড়ামোছা করেন। তা না হলে ঘরটা এমন থাকে কি করে! রঙ জ্বলজ্বল করছে। দৃশ্যটা বড় সুন্দর, বনে বসন্ত লেগেছে। গাছে গাছে আগুন। দেখলেই গান গেয়ে উঠতে চায় মন, 'ওরে ভাই, আগুন লেগেছে বনে বনে'।

বিরাজকাকুকে দেখাশোনা করার জন্যে একজন রাঁধুনী আছেন। সেই ভরসাতেই আমাদের তুলে এনেছেন। বয়েস বেশী নয়। বিরাজকাকুর সঙ্গে সম্পর্কটা যেন আপনার লোকের মত। তাকে ডেকে বললেন, 'রাতকা খানা লে আও।'

আমার বাবাকে আমি কখনও এমন হাসিখুশি দেখিনি। সকালে বিরক্ত বিষণ্ণ। রাতে মাতাল।

'বুঝলি বিনু।' বিরাজকাকুর হাতে সিগারেট, 'তোর বাবাকে বুঝতে শেখ।'

'তার মানে?'

'শিল্পী মাত্রেই বড় একা।'

'আমরা তাহলে কি জন্যে আছি কাকু?'

'তোরা থেকেও নেই। তোরা অন্য জগতের মানুষ। জানিস কি?'

'কি?'

'আগামী রবিবার শাজাহানের শেষ অভিনয়। বই উঠে যাচ্ছে। ঐতিহাসিক নাটক আর পাবলিক স্টেজে চলবে না। এখন এসেছে আধুনিক নাটক। জোতদার মারা রাজনৈতিক নাটক। প্যানপেনে সামাজিক নাটক। আর এসেছে ড্যান্স। অভিনেতাদের যুগ শেষ। স্টেজ, লাইট, নাচ, কায়দা। তোব বাবার হতাশাটা কোথায় বুঝেছিস? যে লোকটা রাতের পর রাত পাদপ্রদীপের সামনে দাঁড়িয়ে দর্শকদের চমকে দিয়েছে, চোখের জলে ভাসিয়ে দিয়েছে, সেই লোকটা আর কয়েকদিন পরেই শূন্যতার জগতে ফিরে আসবে। বাত আসবে, চোখের সামনে দর্শক থাকবে না, হাততালি থাকবে না, এনকোব, এনকোব চিৎকার থাকবে না। পরচুল, মেকআপ, গ্রীনরুম, আলো ঝলসানো আয়না, রঙ-তুলি কিছুই থাকবে না। নিঝুম রাত, চারটে দেওয়াল, একটা খাট, কয়েকটা চেয়ার, একফালি রাস্তা, ঝাপসা আলো, ছায়া ছায়া মানুষ, রিকশার ঠুন ঠুন, শাজাহান তখন সত্যি সত্যিই আগ্রার দুর্গে বন্দী। কে তখন ঔরঙ্গজীব? এই সমাজ, তোদের এই আধুনিক রুচি। তাই তো লোকটা মাঝে মাঝেই খেপে উঠেছে পাগলের মত।'

'বাবা তো আধুনিক নাটকেও অভিনয় করতে পারে কাকু?'

'দূর পাগল, ক্ল্যাসিক্যাল গাইয়ের মেজাজে কি আধুনিক আসে রে পাগল!'

'তা হলে কি হবে?'

'তোর বাবা অতীতের স্মৃতি নিয়ে নাড়াচাড়া করবে আর তোরা মানুষ হয়ে উঠে সংসারের হাল ধরবি। তবে জানিস তো, শিল্পীর ছেলেরা মানুষ হয় না।'

'কেন হয় না?'

'সংসার জ্বলতে থাকে, চরিত্ররা পুড়তে থাকে। শিল্পীর সংসার এক জতুগৃহ। তবু চেষ্টা করতে হবে। জয়ে, পরাজয়ে দুলতে দুলতে ফাঁক খুঁজতে হবে, পথ করে নিতে হবে। শাজাহান তো পড়েছিস। মনে পড়ে সেই অংশটা, যেখানে মহামায়া যশোবন্তকে বলছে, চেয়ে দেখ ঐ রৌদ্রদীপ্ত গিরিশ্রেণী, দূরে ঐ ধূসর বালু-স্তূপ। চেয়ে দেখ ঐ পর্বতস্রোতস্বতী যেন সৌন্দর্যে কাঁপছে। চেয়ে দেখ ঐ নীল আকাশ যেন সে নীলিমা নিংড়ে বার করছে। তোকে চেয়ে চেয়ে দেখতে হবে। দেখতে হবে ছায়ার দিকে নয়, রোদের দিকে। জীবন থেকে নিংড়ে বের করতে হবে আকাশের নীলিমা। নে ওঠ। খেয়ে আসি।'

তিন

রাত তখন ক'টা হবে, বলতে পারব না। মনে হয় মাঝরাত। আমি মাকে স্বপ্ন দেখছিলাম। বিশাল চওড়া, একেবারে ফাঁকা একটা রাস্তায়, আমি আর আমার মা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছি। ভীষণ হাওয়া দিচ্ছে। মায়ের বয়েস যেন অনেকটা কমে গেছে। যেমন ছিল মায়ের প্রথম বয়েসের ছবিতে। মাথায় অনেক চুল ছিল। হাওয়ায় চুল উড়ছে। নীল শাড়ির আঁচল উড়ছে। আমার হাতে একটা সুটকেস। সামনের আকাশে সারি সারি পাহাড়। পাহাড়ের কোলে ঘন সবুজ বন। কি সুন্দব যে জায়গাটা। পাশে মা। মায়ের মুখে সেই হারিয়ে যাওয়া হাসি।

ঘুম ভেঙে গেল। স্বপ্ন হারিয়ে গেল। কে যেন ভারি গলায় ডাকছেন, 'বিরাজ, বিরাজ।' বিরাজকাকুর একটাই ঘর। খাটে শুয়ে আছি আমি আর শিখা। সোফা কাম বেডে কাকু শুয়ে আছেন চিৎ হয়ে। ঘুমের ঘোরেই শুনছি, কাকু দরজা খুলছেন। ঘরের আলো জ্বেলেছেন। চোখে আলো লাগছে। দরজা খুলতেই, গলাটা খুব চেনা মনে হল। 'বিবাজ, বিরাজ।'

বাবা। বাবাব গলা। এত রাতে বাবা এখানে? বাবার কি তাহলে কোথাও যাবার জায়গা নেই। সারারাত কলকাতার নির্জন পথে পথে ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে, কুকুরের তাড়া খেয়ে, পুলিসেব খোঁচা খেয়ে আশ্রয় খুঁজতে এখানে এসেছেন। নাকি শাজাহান এসেছেন ঔরঙ্গজীবকে মাঝরাতে খুন করতে। ভয়ে কাঠ হয়ে শুনছি, বিরাজকাকুর গলা,— 'আয, আয ভেতরে।'

ভেতরে আসতে গিয়ে বাবার পা টলে গেল। দরজাটা ধবে সামলে নিলেন। ভীষণ একটা শব্দ হল। দরজাব সঙ্গে দেওয়ালের ধাক্কা। শিখা ঘুমের ঘোরে চমকে উঠল। বাবা ঘরে ঢুকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে শাজাহান নাটকের পঞ্চম দৃশ্যের সেই সংলাপ বলে উঠলেন, 'পৃথিবীর কি অন্তিম সময় ঘনিয়ে এসেছে জাহানারা?'

জাহানারা তো এখন বাড়ি গিয়ে মেক-আপ তুলে ঘুমেব ওযুধ খেয়ে শুয়ে পড়েছে। জাহানারার সংলাপ কে বলবে? ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দু'হাত দিয়ে মাথা চেপে ধরে বাবা সেই বিখ্যাত অভিনয়টা আর একবার দেখালেন, 'সত্যই তো, আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি নাকি? না না না। জানি পাগল হব না। ঈশ্বর, এই শীর্ণ, দুর্বল, জরাজীর্ণ নেহাতই অসহায় শাজাহানকে দেখ ঈশ্বর! তোমার দয়া হচ্ছে না? দয়া হচ্ছে না? আমি এমন কি পাপ করেছিলাম খোদা!'

মাথার দু'পাশ থেকে হাতদু'টো নামিয়ে হাঁটুর সামনে নামাজের ভঙ্গিতে উপুড় করে বাবা ধীরে ধীরে পেছোতে পেছোতে সোফা কাম বেডে ধপাস করে শরীরটা ফেলে দিলেন। শরীরের ভারে স্প্রিং নেচে উঠল শব্দ করে।

আমার বাবার নামটা ভারি অদ্ভুত— 'ঋভু'। বিরাজকাকু খুব ধীরে ধীরে বাবার নাম ধরে ডাকলেন, 'ঋভু'।

বাবা ফ্যালফ্যাল করে বিরাজকাকুর মুখের দিকে শিশুর মত তাকিয়ে রইলেন। ষাট পাওয়ারের আলোতে বাবার মুখটা যতখানি দেখতে পাচ্ছি তাতে মনে হচ্ছে, একটি আপনভোলা শিশু যেন মাঝরাতে খাটের ধারে বসে আছে। ঘুম ভেঙে দেখেছে মা কি করছে। বাবার একবার অসুখ করেছিল। যেদিন জ্বর ছেড়ে গেল সেদিন মা বাবাকে খাটের ধারে বসিয়ে গেঞ্জির উপর তোয়ালে রেখে ঠাণ্ডা জলে মাথা ধুইয়ে দিলেন। উশকো-খুশকো চুলে বাবা বসে আছেন। কিছু দূরেই মা থালায় ঝোল আর রুটি সাজাচ্ছেন। বাবা কেমন খিদে খিদে মুখে তাকিয়ে আছেন। সেদিনের সেই মুখ, আজকের এই মুখ! মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল।

বাবা খুব ধীরে ধীরে জিজ্ঞেস করলেন, 'ক'টা বাজল?'

বিরাজকাকু বললেন, 'প্রায় তিনটে।'

'রাত শেষ হয়ে এল। এখুনি সকাল হবে। তাই না? সকাল হবে না?' বাবা জানলার দিকে তাকালেন। যেন আলো খুঁজছেন। আকাশ এখনও অন্ধকার। শেষরাতের তারা সোনার টাকার মত আকাশে ছড়িয়ে আছে। বাবা বললেন, 'ঘরের আলো নিভিয়ে দাও। দিনের আলোর পথ করে দাও। কে সেই মূর্খ, লণ্ঠন জ্বেলে সূর্য খুঁজছে!'

বিরাজকাকু আলোটা তাড়াতাড়ি নিভিয়ে দিলেন।

সেই অন্ধকার ঘরে বাবার সুন্দর গলায় গান শোনা গেল—

আমি সারা সকালটি বসে বসে এই
সাধের মালাটি গেঁথেছি।
আমি, পরাব বলেই তোমারি গলায়
মালাটি আমার গেঁথেছি।
আমি সারা সকালটি করি নাই কিছু,
করি নাই কিছু বধূ আর
শুধু বকুলের তলে বসিয়ে বিরলে
মালাটি আমার গেঁথেছি।

আগেও দেখছি, আজও দেখলাম। শেষরাতে একটা পেঁচা ডাকবেই ডাকবে। ডেকে জানিয়ে দেবে দিন আসছে। রাত যেন টান টান সভা সাজিয়ে বসে থাকে। জলসাঘরে জাজিমের মত। ক্রমশ জমতে জমতে একসময় হালকা থেকে হালকা হয়ে মিছিলের মত সরে যেতে যেতে একেবারে মুছে যায়। পেঁচার ডাক শুনে বাবা চমকে উঠলেন। গান থেমে গেল। ঘরের চারপাশে তাকালেন। রাত ফিকে হতে চলেছে। বাবার নেশাও ফিকে হচ্ছে। আমাদের দেখতে পেয়েছেন।

'বিরাজ, তোমার ঘরে এরা কারা? তুমি কি বিয়ে করেছ?'

বিরাজকাকু সামান্য হেসে বললেন, 'এরা তোমারই ছেলেমেয়ে, ঋভু। দীপাকে তো তুমি মেরে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছ।'

বাবার মুখটা কেমন যেন বেঁকে গেল। কি যেন মনে করার চেষ্টা করছেন। সেই রাত। সিঁড়ির ধাপে মা পড়ে আছেন। অসম্ভব রক্ত ঝরছে। চারদিক নিস্তব্ধ। শুধু ঘরের দেয়ালে একটা ঘড়ি টিকটিক করছে। দূরে কল থেকে বালতিতে জল পড়ছে টিপটিপ করে।

বাবার মুখ দেখে মনে হল, সেই রাত তাঁর চোখের সামনে ফিরে আসছে। মুখটা ভাঙতে ভাঙতে কান্নায় ভেঙে পড়ল। দু'হাতে মুখ ঢেকে বাবা আকুল হয়ে কাঁদছেন। এভাবে আমি কখনও কাউকে কাঁদতে দেখিনি। কিছু ভেঙে ফেলে এ যেন শিশুর অসহায় কান্না।

একটা কাক ডাকছে। দিনের প্রথম কাক। কি তীক্ষ্ণ, কর্কশ আওয়াজ।

চার

বাবা অপরাধীর মত মুখ করে বসে আছেন। বিরাজকাকুর আজ আর অফিস বেরোন হল না। গোটাআষ্টেক খালি চায়ের কাপ সারা ঘরের এখানে ওখানে ছড়ান। কোনটায় চায়ের তলানির সঙ্গে সিগারেটের টুকরো আর ছাই। কোনটায় পোড়া দেশলাই কাঠি। কোনটায় অ্যাসপিরিনের ফেলে দেওয়া সাদা কাগজ। বাবা সকাল থেকে কাপের পর কাপ চা খাচ্ছেন। সিগারেটের পর সিগারেট। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ঘর ছেয়ে গেছে। আমার আর শিখার সঙ্গে একটাও কথা বলেননি।

আমার বাবা হলেন রাতের মানুষ। দিনের আলোয় কেমন যেন অসহায়। রাতের প্রাণী দিনের আলোয় যেমন অস্বস্তি বোধ করে, বাবার চোখে মুখে ঠিক সেইরকম এক ধরনের অস্বস্তি। বিরাজকাকু একবার সেই রাতের প্রসঙ্গ তুলতে চেয়েছিলেন, বাবা চোখের সামনে হাত আড়াল করে বললেন, 'আমাকে ভুলতে দাও, ভুলতে দাও।'

বাবা যেন চোখের সামনে আমার রক্তাক্ত মাকে দেখে শিউরে উঠলেন।

বেলা তিনটের সময় বাবা বললেন, 'বিরাজ, একটা ট্যাক্সি ডাক।'

'কোথায় যাবে?'

'হাসপাতালে।'

'খুব ভালো কথা।'

বিরাজকাকু ট্যাক্সি ডাকতে গেলেন। আমরা তখন রাস্তার দিকের বারান্দায়। বাবাকে চিরকালই কেমন যেন অচেনা মনে হয়। সকাল থেকে আজ যেন আরও বেশি অচেনা মনে হচ্ছে। আমার মায়ের চেয়ে কত বেশি স্বাস্থ্যবান, বলিষ্ঠ, কত বেশি যুবক! চোখ মুখ যেন বড় বেশি কঠোর আর নিষ্ঠুর।

বাবা ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন। কেন দিলেন? বোধহয় একটু একা থাকতে চান নির্জনে। বাইরের থেকে আমি শুধু একবার গেলাসের আওয়াজ পেলুম ঠুন

করে। কি জানি, কোনও ওষুধ খাচ্ছেন হয়ত।

শিখা ফিসফিস করে বলল, 'বাবা আমাদের সঙ্গে কোনও কথা বলছে না কেন রে দাদা?'

'আমি কি করে বলব! আমি বাবার মনের খবর কতটুক জানি। সে জানেন আমার মা।' বারান্দা থেকেই দেখলাম ট্যাক্সি আসছে।

বিরাজকাকু ওপরে এসে দরজায় টোকা মারলেন। ভেতর থেকে গম্ভীর গলায় বাবা বললেন, 'দাঁড়া খুলছি।'

বেশ কিছুক্ষণ পরে বাবা বেরিয়ে এলেন। পরনে ধুতি, পাঞ্জাবি। চোখে সোনালী চশমা। চোখদুটো গোলাপী লাল। পায়ে চকচকে জুতো। বাবাকে দেখে আমার ভীষণ হাসি পেল মনে মনে। বাবা যেন বিয়ে করতে যাচ্ছেন।

বিরাজকাকু আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কি তোরা রেডি তো!'

বাবা যেন কেমন কুঁকড়ে গেলেন, 'ওরাও যাবে নাকি!'

'যাবে না? মাকে দেখতে যাবে না?'

বাবা হঠাৎ একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করলেন, 'তোমরা কি পুলিসে ডায়েরি করিয়েছ?'

বিরাজকাকু অবাক হয়ে বললেন, 'সে কি! ডায়েরি করব কেন? তোদের স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপার; এ তো হতেই পারে।'

বাবা বললেন, 'না, মারাও তো যেতে পারে।'

'তুই একটা পাগল! মাথায় সামান্য লেগেছে। তাতে মারা যাবে কেন?'

বাবা মুখ নিচু করে কি যেন ভাবলেন, তারপর বললেন, 'আমি কি করেছিলুম, কেন করেছিলুম, কিছুই আর মনে নেই। আমাকে তোমরা ভুলতে দাও, আমাকে তোমরা শাস্তি দাও।'

বিরাজকাকু এবার ধমকে উঠলেন, 'তুই খুব বাড়াবাড়ি করে ফেলছিস ঋভু। এখন তুই আবার ওসব খেলি কেন?'

বাবা চাবুক খাওয়া মানুষের মত চমকে উঠলেন। মুখে রাগ। শক্ত রেখা।

'কি বললি! খেয়েছি কেন? বিরাজ, হু ইজ মাই ফ্রেণ্ড? কে আছে আমার? রঙ্গমঞ্চ খালি হয়ে যাবার পর আমার পাশে কে থাকে? শেষ দর্শক চলে যাবার পর কে থাকে? আমার পাশে কে থাকে? আমি থাকি। আমি যখন নির্জন রাস্তায় পায়ে পায়ে বাড়ির দিকে ফিরতে থাকি, তখন কারা আসে আমার পেছনে? একপাল নেড়ি কুকুর। তখন মুগ্ধ দর্শকের হাততালি, তাদের বাহবা নয়, কুকুরের ঘেউ ঘেউ আমার পেছনে ফেরে! কেন ঘেউ ঘেউ? আমি যে অপরিচিত। মধ্যরাতের মাতাল। দীপা কি সেই কুকুরের একটি?'

'এ কি, এ কি কথা তুমি বলছ ঋভু?'

'ঠিকই বলছি। দীপা সেদিন আমাকে মাতাল বলেছিল। লম্পট বলেছিল। আমি নাকি থিয়েটারের ওই মেয়েটার সঙ্গে, যে জাহানারা সাজে, তার সঙ্গে রাত কাটাই।

ফুল, ফুল, মূর্খ! জাহানারা আমার মেয়ে। চরিত্রের সঙ্গে জীবন না মেলাতে পারলে অভিনয় হয় বিরাজ! হয় না। অভিনয়, অভিনয় নয়। জীবন, জীবন। কে বুঝবে, কাকে বোঝাব ?'

বাবার সারা শরীর ঠকঠক করে কাঁপছে। বিরাজকাকু বাবার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'ঋভু, তোকে আমরা বুঝতে পারিনি রে। তুই যে কত বড, কালই তার বিচার করবে। চল, চল। গাড়িটা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে।'

পাঁচ

হাসপাতালে গিয়ে বুঝলাম, বাবা এখনও কি ভীষণ জনপ্রিয়। সমস্ত কর্মচারী, ডাক্তার, নার্স সবাই ছুটে এসেছেন। এমনকি রুগীরাও বিছানায় উঠে বসেছেন। স্টেজে বাবার একটা আলাদা নাম আছে। সারা শহরে মাঝে মাঝে যখন পোস্টার পড়ে তখন সেই নাম দেখা যায়। নামের আগে একটা উপাধি থাকে— নটনারায়ণ চন্দ্রকুমার।

ডাকসাইটে অভিনেতার চালচলনই আলাদা। কখন মনকে গুটিয়ে রাখতে হয়, কখন ছড়িয়ে দিতে হয়, সবই যেন হাতের মুঠোয়। বাবা সোজা এগিয়ে চললেন দু'সার বেড়ার ফাঁক দিয়ে আমার পেছনে পেছনে। এখন যেন আমার বেশ গর্ব লাগছে। যার বাবার এত সম্মান তার গর্ব একটু হবে না? হাসপাতালের কেউই জানে না মার কি ভাবে লেগেছে। শুধু জানে সাধারণ ঘরের এক মহিলা হাসপাতালে এসেছে। পয়সার তেমন জোর নেই তার, ফ্রি বেডে রয়েছে। পেয়িং-বেড বা কেবিনে থাকতে পারেনি। এইটুকুই যা লজ্জার। এত বড় একজন অভিনেতার স্ত্রী, তার তো কেবিনেই থাকা উচিত।

আমি জানতাম না, বাবা শুধু স্টেজেরই বিখ্যাত অভিনেতা নন, জীবনেও কত বড় অভিনেতা। জীবন আর অভিনয় যেন এক করে ফেলেছেন। মায়ের বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে চারপাশ একবার ভাল করে দেখে নিলেন। বাবার চারপাশে আমরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছি। মায়ের অবস্থা আগের চেয়ে ভালো। বিছানার পাশ থেকে সেই স্ট্যান্ড, বোতল সব চলে গেছে। ও সবের এখন আর প্রয়োজন নেই। মায়ের মাথার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন সেই ভীষণ খিটখিটে সিস্টার। নরম একটা হাত মায়ের কপালে আদর ঢেলে দিচ্ছেন। বাবার প্রতি অনুরাগ তাঁকে মিষ্টি করে তুলেছে। কিছু দূরেই হাসি হাসি মুখে ডাক্তারবাবু। গলায় স্টেথোসকোপ। এই প্রথম হাসপাতালের ডাক্তারবাবুকে হাসতে দেখলাম।

বাবা বললেন, ' এ কি? এ তুমি কি করেছ বিরাজ। একটা কেবিনের ব্যবস্থা করতে পারনি? এই ভাবে ফেলে রেখেছ এখানে? ডক্টর. কেবিন নেই?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আছে। আপনি চাইলে না থাকলেও আছে।

'প্লিজ, আপনি এখুনি আমার স্ত্রীকে একটা কেবিনে সরিয়ে দিন। শি ইজ মাই

ইনসপিরেশন। আমার যা কিছু সব ওরই জন্যে।'

বাবা কথাকটা বলেই মায়ের বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে সামান্য হেলে গিয়ে মায়ের একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিলেন। দু'হাতের মুঠোয় মায়ের হাত। বাবা ঘাড় ঘুরিয়ে মিষ্টি হেসে ধীরে ধীরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন আছ তুমি ?'

সত্যি বলছি, আমি এইসব দেখছিলাম একটু দূর থেকে। দেখে মনে হচ্ছিল, আমি কোনও নাটকের হাসপাতাল দৃশ্যে নায়ক-নায়িকার অভিনয় দেখছি। জানি না, কোন্‌টা ঠিক, কোন্‌টা বেঠিক। বিরাজকাকু বলেছিলেন, তোর বাবা জীবন আর অভিনয়কে এক করে ফেলেছে। তাই হয়ত হবে। ডাক্তার বললেন, 'সিস্টার, তাহলে ইমিডিয়েটলি রুগীকে কেবিন নাম্বার সিক্‌সে ট্রান্সফার করার ব্যবস্থা করুন। আমি স্যারকে বলে পারমিশান করিয়ে আনছি।'

বাবা এক হাতে মায়ের একটা হাত ধরেছেন। আর একটা হাত মায়ের গালে। বিছানার পাশে কোনওরকমে পেছন ঠেকিয়ে বসেছেন। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকে দুজনের মুখ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে আছেন। আমি বেশ বুঝতে পারছি বাবার দুটো চোখ ছলছল করছে। ভেতরটা কাঁদছে। কি জানি। এও অভিনয় কি না। যে জীবনে জীবন আর অভিনয় এক হয়ে গেছে সে জীবন কেমন যেন বিশ্বাস করা শক্ত। আর অবাক হয়ে এও দেখলুম মায়ের চোখেমুখে কোনও ঘৃণা নেই, অভিযোগ নেই, রাগ নেই, অভিমান নেই। মায়ের ভাসা ভাসা বড় বড় চোখ বেয়ে জল নেমে এসেছে মুক্তোর দানার মত। আমি ভালোবাসার মুখ চিনি। মা যখন ভালোবেসে আমার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়েন, সে মুখ তো তখন আমি দেখেছি। মা বাবার দিকে ঠিক সেই মুখে চেয়ে আছেন। আমি পড়েছি কখনও কখনও নীরবতা ভাষার চেয়ে বড়। আজ তা চোখে দেখলাম।

শিখা কখন সরতে সরতে মায়ের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ভয়ে ভয়ে বাবার মুখের দিকে তাকাচ্ছে। মা যে কতখানি কার সে জানে না। মা হয়ত জানেন। ডান হাত বাড়িয়ে শিখার হাত ধরেছেন। বড় সুন্দর দৃশ্য। কোথায় লাগে নাটক! একদিকে বাবা, একদিকে মা, আর একদিকে শিখা। এর নাম পরিবার। সুখী পরিবার কিনা বলতে পারব না। বিরাজকাকু একদিন বলেছিলেন, সুখ মানুষের মনে রে বিনু। বাইরে তার সন্ধান পাওয়া যায় না।

বাবা ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কবে ছাড়বেন ?'

'দু-এক দিনের মধ্যেই।'

বাবার মুখটা খুশি খুশি হয়ে উঠল। এও কি অভিনয়! হতে পারে। আবার নাও হতে পারে। সত্য আর মিথ্যার ব্যবধান কোনও কোনও জীবনে বড় সঙ্কীর্ণ। আমার কি করার আছে! আমি এক দর্শক।

ছয়

আজ আমার মা বাড়ি ফিরে আসবেন। বাবা বাইরে গেছেন কয়েক দিনের জন্য। কলশো আছে উত্তরবঙ্গের কোনও এক শহরে। বিরাজকাকুই দায়িত্ব নিয়েছেন হাসপাতালের সব দেনা-পাওনা শোধ করে মাকে নিয়ে আসার। অনেক টাকা লাগবে। জানি না কে সেই টাকা দিচ্ছেন! বাবা না বিরাজকাকু!

হাসপাতাল থেকে ফিরে দুজনে সেদিন অনেক আলোচনা হয়েছে। সে আলোচনা থেকে ভবিষ্যতের কোনও চেহারা দেখেছি বলে মনে হয় না। সবই অনিশ্চিত। বাবা নাকি স্টেজ ছেড়ে যাত্রায় যাবেন। যাত্রায় এখন টাকা উড়ছে। ঐতিহাসিক আর পৌরাণিক পালা কলকাতার বাইরে এখনও নাকি বেশ জমে ওঠে। তা হয়ত হবে। আমি ওসব জানি না। তবে আমার যা মনে হচ্ছে, তা হলে একটা বড়সড় বুদবুদ তৈরি হচ্ছে, যে কোনও মুহূর্তে ফাটল বলে। আমার কেবলই মনে হচ্ছে, একটা খারাপ কিছু ঘটবে। সাংঘাতিক একটা ঘটনার মুখোমুখি হতে চলেছি। আমরা সেই জাহাজের যাত্রী, যার ক্যাপ্টেন কম্পাস পড়তে জানেন না। আমার বাবা যখনই কিছু বলেন সবই মনে হয় এক একটি নাটকের সংলাপ। বাবার সমস্ত পরিকল্পনাই রঙিন ফানুসের মত আকাশে উঠেই হারিয়ে যায়।

আমি সেই কবিতায় পড়েছিলুম, সে কবিতা বোধ হয় আমার বাবাকে দেখেই লেখা—

কুশের ফুৎকারজাত বুদ্বুদের
    স্ফটিকমণ্ডল
. .স্ফুরিত বর্ণচ্ছটা অন্তর্হিত হলে
    মহাকাশে
সনির্বন্ধ শিশু যথা ডুবে যায় অশ্রুর
    অতলে
বিশ্বের বৈচিত্র্য খোঁজে আপনার
    ভাবালু বিলাসে।

আমি এখন কবিতায়, উপন্যাসে, নাটকে আমার বাবা আর মাকে খুঁজি। খুঁজি এর শেষ কোথায়? শেষ দৃশ্যের শেষ সংলাপ এক এক লেখকের কলমে এক একরকম।

মা এলেন তাঁর ফেলে যাওয়া সংসারে। মাথার চুল রুক্ষ। চোখদুটো অসম্ভব উজ্জ্বল। বয়েস হয়েছে, তবু আমার মা কত সুন্দর! আমার মায়ের পাশে থিয়েটারের সেই জাহানারা মাসি কি দাঁড়াতে পারবেন। তবে কেন ওসব কথা মাঝে মাঝেই এ সংসারে ভেসে আসে। কারা রটায়! কাদের স্বার্থ আছে এর পেছনে!

বিরাজকাকু বললেন, 'নিজের সংসার বুঝে নাও। আমি আদুরীকে এনে কয়েকদিন

এখানে রাখছি। দিনকতক তুমি কোন কাজ করবে না। যা করার আদুরী করবে।'

'আমি পারব। আমি ঠিক হয়ে গেছি।'

'তুমি বেঠিক কবে ছিলে! তুমি সব পারবে তাও জানি। তবে সেই পারাটা এখনও অন্তত সপ্তাহখানে বন্ধ রাখতে হবে।'

মা বারান্দায় একটা গোল চেয়ারে বসে পড়লেন। সামনেই বড় রাস্তা। লোকজন, গাড়ি, ঘোড়া, দোকানপাট। মা সেই দিকে তাকিয়ে বসে রইলেন। আমার হঠাৎ মনে হল, আমরা সবাই এক একটা শাজাহান। এই জীবন হল এক একটি দুর্গ। ঔরঙ্গজীব সেই ভাগ্য! শাজাহানদের জীবনের দুর্গে বন্দী করে রেখে সরে পড়েছে। আমাদের ইচ্ছে হল জাহানারা। তাকে সঙ্গী করে সারাদিন যত বিলাপ আর কান্না।

আদুরী এসে গেছে। বিরাজকাকু কয়েকদিন এ বাড়িতেই থাকবেন। মনে একটা সুখ সুখ ভাব আনতে চাইছি। আসছে কই? সব ব্যাপারটাই এত অনিশ্চিত, সমুদ্রের বালিতে বালি দিয়েই ঘর তৈরির মত। এই আছে এই নেই। কার টাকায় কার সংসার কে চালাচ্ছে!

রাতে বিছানায় শুয়ে মা জিজ্ঞেস করলেন, 'তোর বাবা কবে ফিরবে রে?'

মায়ের মন থেকে সে রাতের লজ্জা আর অপমানের ভাবটা এখনও কাটেনি। ছেলেমেয়ের সামনে মা মাথা উঁচু করে থাকতে চান। সেই মাথা বাবা এমন করে নিচু করে দিয়ে গেছেন। কারুরই গৌরব বাড়েনি। বাইরের চোখে বাবা কত বড়। আমাদের চোখে আজ কত ছোট। মা আর আমরা কোথায় কি ভাবে দাঁড়িয়ে আছি, তা আজ খুবই স্পষ্ট।

'কাল সকালেই তো আসার কথা আছে মা! শাজাহানের শেষ অভিনয় সামনের রবিবারে। পোস্টার পড়েছে শহরের দেয়ালে। চ্যারিটি শো।'

বিরাজকাকু বারান্দায় বসে আছেন। সিগারেটের আগুন দেখা যাচ্ছে।

মা বললেন, 'শুয়ে পড় এইবার। সারাদিন অনেক খেটেছ।'

বিরাজকাকু হঠাৎ গান গেয়ে উঠলেন, 'সব মিছা কথা ভাবিতে যে ব্যথা, বড় লাগে প্রভু পরাণে। কেন বঞ্চিত হব চরণে।'

কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। স্বপ্ন দেখছি, বিশাল এক ফাঁকা মাঠ। কেউ কোথাও নেই। একটা জল টলটলে দিঘি। চারপাশে লম্বা লম্বা ঘাস। দূর থেকে হেঁটে আসছি। একটা ঝাঁকড়া গাছ। গোটাকতক ডাল নুয়ে পড়েছে জলের দিকে। গাছের ডালে ডালে জরি বসান রেশমের পোশাক ঝুলছে। রাজার পোশাক। ঝলমল করছে রোদের আলোয়। গাছের তলায় পড়ে আছে একটা মুকুট। দুপাটি জরির কাজ করা নাগরা জুতো। একটা কোমরবন্ধনী পড়ে আছে সাপের মত এঁকেবেঁকে। আমি ভাবছি এসব কার পোশাক! দিঘির নিথর জলে একটা ঢেউ গোল থেকে গোলাকার হতে হতে তীরের দিকে চলে আসছে। কেউ যেন এইমাত্র ডুব দিয়েছে। আমি অনেকক্ষণ জলের দিকে তাকিয়ে রইলাম। একটা মানুষ কতক্ষণ ডুবে থাকতে

পারে। ঢেউ মিলিয়ে এল। দু'একটা ফড়িং উড়ছে জলের ওপর নেচে নেচে। কেউই উঠছে না দেখে ছাড়া পোশাকের দিকে তাকাতেই দুটো পরিচিত জিনিস চোখে পড়ল। এতক্ষণ দেখতে পাইনি। এটা লাল সিগারেটের প্যাকেট, একটা সাদা লাইটার। দুটোই খুব চেনা। বাবা এই সিগারেটই খান। লাইটারটা জাহানারা মাসি বাবাকে জন্মদিনে উপহার দিয়েছিলেন। আমি চিৎকার করে ডাকলাম— বাবা! আমার ডাক চাপা পড়ে গেল। দূরে মাঠের কিনারা দিয়ে একটা রেল চলেছে গুমগুম শব্দ করে বাঁশি বাজাতে বাজাতে। আর ঠিক তখনই কোথা থেকে একটা ঝড়ো বাতাস উঠল। গাছের ডাল থেকে পোশাকগুলো একে একে উড়ে গিয়ে জলে পড়ে ভাসতে লাগল। আমি ভীষণ ভয় পেয়ে আবার ডাকলাম— বাবা।

ঘুমটা ছ্যাঁত করে ভেঙে গেল। সকাল হয়ে গেছে। বেশ সকাল। এখনও কারোর ঘুম ভাঙেনি। মা শুয়ে, পাশে শিখা। মেঝেতে আদুরী। ওপাশের ঘরে বিরাজকাকু। আমি দরজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়ালুম। আকাশে সামান্য ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘ। শরৎ এসে গেছে। মনে হল নিচের রাস্তায় অনেক লোক। আমাকে দেখতে পেয়েছে একজন বলে উঠলেন— 'ওই যে, ওই যে।'

আমি অবাক হয়ে রাস্তার দিকে তাকালাম। বেশ কিছু মানুষ। কারুর বগলে ভাঁজ করা বাজারের ব্যাগ। কারুর হাতে খালি দুধের বোতল। আমাকে তাকাতে দেখে একজন প্রশ্ন করলেন, 'কোনও খবর পেলে ?'

'কি খবর ?'

'কখন আসছেন ?'

'কে আসছেন ?' আমি তাই অবাক হয়ে গেছি।

'কেন তোমরা শোননি! ভোরের রেডিওতে বলেছে তো!'

'কি বলেছে ?'

জনতা স্তব্ধ হয়ে গেছে। বিরাজকাকু আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, রেলিঙে কনুইয়ের ভর রেখে। বিরাজকাকু জিজ্ঞেস করলেন, 'কি খবর ? আমরা তো শুনিনি!'

সকলেই তখন সমস্বরে বলে উঠলেন, 'প্রখ্যাত নট চন্দ্রকুমার ও চন্দ্রকুমারী দার্জিলিঙের কাছে পথদুর্ঘটনায় নিহত। আমরা গভীর বেদনার সঙ্গে জানাচ্ছি....।'

আর কোনও কথাই আমার কানে এল না। খুব একটা দুঃখ নয়, কেমন একটা বিস্ময়ে মন ছেয়ে গেল। কি আশ্চর্য স্বপ্ন! কত স্পষ্ট! দিঘির জলে ঢেউ মিলিয়ে আসছে। রাজার পোশাক গাছের ডাল থেকে বাতাসে উড়ে উড়ে জলে পড়ছে। সাদা একটা সিগারেট লাইটার, লাল একটা সিগারেটের প্যাকেট। কানে ভেসে আসছে, মাঝরাতের স্তব্ধ প্রেক্ষাগৃহ থেকে বাবার কণ্ঠস্বরে শাজাহানের সেই বিখ্যাত সংলাপ—

চেয়ে দেখ্ এই সন্ধ্যাকালে ঐ যমুনার দিকে, দেখ্ সে কি স্বচ্ছ! চেয়ে দেখ্ ঐ আকাশের দিকে— দেখ্ সে কি গাঢ়! চেয়ে দেখ্ ঐ কুঞ্জবনের দিকে— দেখ্

সে কি সুন্দর!

আর চেয়ে দেখ্ ঐ প্রস্তরীভূত প্রেমাশ্রু, ঐ অনন্ত আক্ষেপের আপ্লুত বিয়োগের অমর-কাহিনী।

আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে। এখন দিন, তবু মনে হচ্ছে গভীর রাত। আমার কাঁদতে ইচ্ছে করছে না, বাবাবই এক বন্ধু, এক গুণমুগ্ধের মত বলতে ইচ্ছে করছে—

হিরণ নদীর বিজন উপকূলে
আচম্বিতে পথের অবসান,
পরপারে নাম না-জানা গ্রাম।

গৃহযুদ্ধ

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

পর পর দু'দিন রুদ্ধশ্বাস ঘরবন্দি থাকার পর তৃতীয় দিন কয়েক ঘণ্টার জন্য কার্ফু শিথিল হল। পরমেশ সকালে ঘুম থেকে উঠেই বলল, বাজার যা তো সফিকুল, রান্নাঘরে সব বাড়ন্ত।

অতবড় দোতলা বাড়িখানার নিচে তারা দুটি মাত্র প্রাণী। উপরে গোটা দোতলা জুড়ে অফিস। সোম, মঙ্গল দু'দিন বাংলা বন্ধ, ভারত বন্ধ ছিল বলে খাঁ খা করেছে অফিস ঘর। নিচতলায় সামনের দিকে ম্যানেজারবাবুর কোয়ার্টার। ম্যানেজার মুখার্জিবাবু শনিবার সপরিবারে দেশের বাড়ি গিয়েছিলেন। সোমবার আসার কথা ছিল। বন্ধ হওয়ায় আটকে পড়েছেন। কোয়ার্টারের পেছনে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। তারপর নাইট-গার্ডের ঘর। ঘরখানা অবশ্য বড়ই। এতকাল পরমেশ একাই থাকত। মাস দুয়েক হল সফিকুল এই পিওনটি বদলি হয়ে এসে এ শহরে কোথাও থাকার সম্ভাবনা পায়নি বলে ম্যানেজারবাবু বলেছেন, যদ্দিন না ঘর পায়, পরমেশের ঘরেই থাকুক। সেই থেকেই দুজনে— তা ছিলও ভাল। কিন্তু গত দু'দিন ধরে শহরে তাণ্ডব চলেছে। এক ধর্মস্থান ভাঙা নিয়ে গোটা দেশ জুড়ে খুনোখুনি, লড়াই। তার আঁচ এসে পড়েছে পরমেশদের এই মতিশীল রোডেও। দুটো দিন অত বড় রাস্তাঘাট জনমনিষ্যিহীন। দিন দুপুরেও মানুষ বেরোয়নি ভয়ে। পরমেশ আর সফিকুল গোটা বাড়ির দরজা জানলায় খিল এঁটে নিঃশ্বাস বন্ধ রেখে কাটিয়েছে প্রতিটি মুহূর্ত। ঘরে যে ক'টা চাল ডাল ছিল কুড়িয়ে বাড়িয়ে রান্না করে খেয়েছে দু'জনে। আজ সব বাড়ন্ত।

পরমেশের কথা শুনে সফিকুল হিসহিস শব্দ করে বলল, আমি কেন যাব, তুই যা—

পরমেশের মেজাজটা তিরিক্ষি হয়ে ওঠে, কেন, আমি কি একা খাব? তুই খাবিনি?

— না, ইদিককার গতিক ভাল নয়। আমি এখন বেরুব না। ইদিকে সব হিন্দুদের বাস।

পরমেশ ভুরু কুঁচকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল সফিকুলের মুখ চোখের দিকে। তারপর নিজের মনে গজ গজ করতে করতে থলিটা হাতে ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়ল বাজারের দিকে।

ঘণ্টাখানেক পর ঘরে ফিরে চাল-ডাল-সব্জি মেঝেয় ঢালতে ঢালতে বলল, তুই ততক্ষণে উনুনটা ধরাতি লাগ্। আমি আলু কুটে চাল ধুয়ে হাঁড়িতে রাখতিছি—

সফিকুল পরমেশের আনা বাজার দেখতে দেখতে হঠাৎ বলল, তেল আনুনি?

— না, ঘরে যা আছে তাতে আজ দিনটা কুলিয়ে যাবে'খন।

পরমেশের কথায় সন্তুষ্ট হয় না সফিকুল। সে বলল, এ ক'টা চালে কী হবে! এ বেলা পেরোয়ে বড় জোর ও বেলা। কাল দুপুরেও তো চলবে না। কাল যদি দোকানপাট না খোলে?

পরমেশ ঝেঁকে উঠে বলল, কেন, দোকানপাট খুলবেনি কেন বল্? বাজারে গে তো শুনে আলাম, কাল থে আর কারফু থাকবেনি। আমাদের ইদিকে তো কিছু হয়নি। যা হয়েছে ওই মেটিয়াবুরুজে। ওখানে তোর কেউ আছে নাকি?

মেটিয়াবুরুজের কথা শুনে হঠাৎ বদলে গেল সফিকুলের মুখ চোখের চেহারা। দু'চোখ জুড়ে থর থর করে ওঠে এক ধরনের শাণিত দৃষ্টি। সেই চাউনি দেখে বুকের ভেতরটা কেমন গুর গুর করে উঠল পরমেশের। মাত্র দু'মাস হল কলকাতায় এসেছে সফিকুল। লোকটা কেমন তাও এখনও সে ঠিকঠাক বুঝে উঠতে পারেনি। গত দু'দিন ওর সঙ্গে থাকতে গিয়ে কেমন গা ছমছম করেছে। কাজের মধ্যে কাল রাতে ঘুমের ভেতর লোকটা হঠাৎ চমকে উঠে বসেছিল একবার। তাতে পরমেশের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। সফিকুল বলেছিল, কে যেন কড়া নাড়ল না?

পরমেশ ভীতভাবে বলেছিল, কই, না তো—

দু'জনেই একটু পর যার যার বিছানায় শুয়ে পড়েছিল। সফিকুল ঘুমিয়েছিল কিনা কে জানে, কিন্তু পরমেশের চোখে আজ ঘুম আসেনি।

এখন দিনের বেলা অবশ্য সেই গা-ছমছমে ব্যাপারটা নেই। রাস্তায় লোকজন চলাচল করছে। সবাই আগের মতো বাজারহাট করছে। বাজারে সব জিনিসপত্রের দাম একটু যেন বেশি বেশি। দোকানদাররা বলছে, কার্ফুর জন্য ট্রাক আসেনি তো, তাইই। তাতে ভয় পেয়ে লোকজন আরও বেশি বেশি কিনে রাখছে। কিন্তু পরমেশ যে বেশি করে কিনে রাখবে তার রেস্ত কোথায়। তাদের মাইনে হয় মাসের সাত-আট তারিখে। আজ ন'তারিখ হয়ে গেল, তাদের ম্যানেজারবাবু অফিসে না এসে পৌঁছোনয় মাইনে হয়নি। যদি আজ আসেন—

দু'দিন পর সেদিন অফিস খুলতে অফিসের সব কর্মীই হামড়ে এসে পড়ল। মাইনে পাওয়ার আশায়। কিন্তু বেলা দুটো পর্যন্ত দেখা নেই ম্যানেজারবাবুর। বড়বাবু

মাখন সমাদ্দার বললেন, নাহ্ আজ আর হল না। চল, চল, সবাই বাড়ি চল। তিনটের পর আবার বাস বন্ধ হয়ে যাবে। চারটে থেকে ফের কার্ফু। ব্যাঙ্কও বন্ধ হয়ে গেছে এতক্ষণে—

বিকেল গড়াতে না গড়াতে আবার মতিশীল রোড সুনসান। ঝপাঝপ বন্ধ হয়ে গেল রাস্তায় দু'পাশের সব বাড়ি ঘরের দরজা জানলা। পরমেশও দ্রুত হাতে উপরের নিচের সব ঘরের দরজা জানলা বন্ধ করতে করতে চেঁচিয়ে বলল, ফটকের হুড়কোটা দিয়ে দে, সফিকুল—

ফটকের হুড়কো লাগিয়ে সফিকুল পরমেশের কাছে এসে বলল, গতিক ভাল নয় বাইরে। ক'জন লোক তেমাথার মোড়ে দাঁড়িয়ে শলা করতিচে যেন।

পরমেশ ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে তিরিক্ষি মেজাজে বলল, তুই বড় সন্দবাতিক।

সেদিন রাতের দিকে ঘুমোতে ঘুমোতে ফের ধড়মড় করে উঠে বসল সফিকুল। বলল, কারা যেন রাস্তা দিয়ে ছুটে গেল মনে হল? আওয়াজটা পরমেশের কানেও গেছে। তবু শব্দটা সে ঝেড়ে ফেলল মন থেকে, ও কিছু নয়, তুই ঘুমো।

কিন্তু সফিকুল বসেই রইল। পরমেশের চোখে ঘুম ঘুম ভাব ছিল। তবু জোর করে চোখ খুলে রেখেছে অন্ধকারে। একটু দূরেই বসে থাকা সফিকুলের ঝুপসি চেহারাটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে সতর্ক দৃষ্টিতে।

বাইরে ততক্ষণে হইচই, চিৎকার, চেঁচামেচির শব্দ বেড়েছে। দূর থেকে কান্নার সম্মিলিত আওয়াজ। সফিকুল লাফ দিয়ে উঠে ছুটে গেল জানলার দিকে। খিল খুলে একটুখানি পাল্লা ফাঁক করতেই চেঁচিয়ে উঠল সে, আগুন।

— আগুন? পরমেশ লাফিয়ে গিয়ে জানলার চিলতে ফাঁকে চোখ লাগাল, হুঁ, পিলখানা বস্তিতে মনে হচ্ছে। বাপরে বাপ, কী শিখা

— পিলখানা? উখানে তো আমাদের লোক আছে!

— আমাদের মানে? তুই তো মোটে দু'মাস হল এখানে এয়েছিস। তুই এত কথা জানলি কী করে? উখেনে আমাদের লোকও আছে।

বলতে বলতেই হঠাৎ চোখে পড়ল দু'তিনটি পরিবার সন্ত্রস্ত হয়ে ছুটে আসছে রাস্তার দিক থেকে। জনা তিনেক পুরুষ। চারজন বউ মেয়ে। তিন চারটে বাচ্চা। কারও গলায় 'হা ভগবান' শব্দটি শোনা গেল। পরমেশ জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে বড় বড় নিশ্বাস নিল, দেখিছিস?

লোকগুলো পার হয়ে যেতে একটু যেন আশ্বস্ত দেখায় দু'জনকে। পরক্ষণেই রাস্তায় আবার গোঙানির আওয়াজ। অন্ধকারের ভেতর আগুনের শিখার আলো এদিকেও দু-চার ছ'টা আসছে। তারই আলোয় কী যেন দেখে সফিকুল হঠাৎ ফুঁসে উঠল, এরা আমাদের লোক।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর মনে হল, কারা যেন ছুটে আসছে মোতিবাগানের দিক থেকে। বাচ্চাদের ফোঁপানি। নারী কণ্ঠের আর্তস্বর। একজন পুরুষ যেন তাদের

জড়ানো গলায় কিছু বলতে বলতে নিয়ে আসছে। সে আওয়াজ শুনে সফিকুল হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে জানালার খিল খুলতে চাইল। কিন্তু পরমেশ তৎক্ষণাৎ বাধা দিল, খুলিসনি সফিকুল—

তাদের ঝটাপটির মধ্যেই হঠাৎ কে বা কারা এসে আছড়ে পড়ল ফটকের সামনে। একটা প্রবল কলরব, চিৎকার, আর্তস্বর। তারপরই 'বাঁচাও, বাঁচাও!'

সে শব্দ শুনে ঘরের ভেতর দুজনে স্থানু হয়ে গেল কয়েক মুহূর্তের জন্য। দুজনের বুকের ভেতরই ধানকল। অন্ধকারের ভেতর দুজন দুজনের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে কতক্ষণ। পরমেশের মনে হল, সফিকুলের চোখ দুটো অন্ধকারে জ্বলছে।

বাইরে আবার জড়ানো গলার আওয়াজ। তারপর জোরে জোরে কড়া নাড়ার শব্দ। সফিকুল কী যেন শুনতে পেয়ে হিস হিস করে উঠল, খোদাতালার নাম করছে না?

পরমেশ অনুচ্চ কণ্ঠে ধমক দেয়, চুপ। কথা বলিসনে—

সফিকুল হঠাৎ মরিয়া হয়ে ওঠে, দরজাটা খুলে দি।

— না। পরমেশ আবার ধমক দেয়।

— দরজা খুলি না দিলি ওরা খুন হয়ি যাবে। সরো— বলে পরমেশকে এক ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে সফিকুল ছুটে যায় দরজার দিকে। দরজার হুড়কো খুলে দিতেই হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে একটি পরিবার। তারা ঢুকতেই সফিকুল মুহূর্তে হুড়কো লাগিয়ে দেয় দরজায়।

পরমেশ হামড়ে পড়ে সফিকুলের উপর, তুই দরজা খুলি দিলি যে বড়—

— বেশ করিছি, সফিকুলকে আত্মতৃপ্ত দেখায়।

যারা ভেতরে ঢুকে পড়েছে, তারা পাঁচজনের পরিবার। স্বামী-স্ত্রী ছাড়াও বছর ন' দশের একটি মেয়ে, ছেলে দুটো আরও ছোট। পাঁচজনে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে পরমেশের দিকে।

পরমেশ তাদের চাউনির দিকে তাকিয়ে একটু নরম হয়, অন্যদিকে তাকিয়ে গম্ভীর হয়ে বলে, এটা অফিস। উদিকে ম্যানেজারবাবুর কোয়ার্টার। এখেনে বাইরের লোকের থাকার নিয়ম নেই। রাতটুকুন থেকি সকাল হলিই চলি যেতি হবে কিন্তু—

সফিকুল ততক্ষণে তাদের নিয়ে গেছে সিঁড়ির কোণের দিকে, একটা চট বিছিয়ে দিয়ে বলল, এখেনে একটু আরাম করতি লাগো।

স্বামী-স্ত্রী দু'জনেরই বয়স বেশি নয়। একজনের তিরিশ, অন্যজনের পঁচিশের কাছাকাছি। বউটির মাথায় একগলা ঘোমটা। ঘোমটার বাইরে শুধু চোখ দুটো। চোখে মুখে একরাশ ভয় থম্ হয়ে আছে। সঙ্গের বাচ্চা তিনটির মুখেও লেগে আছে ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসের চিহ্ন।

সফিকুলের কাছ থেকে চটটুকু পেয়ে চারদিকের দেয়াল-ঘেরা নিরাপদ আস্তানায় তারা বর্তে গেল যেন।

বাইরে তখনও বোমাবাজির শব্দ, আগুন, চিৎকার, কোলাহল, আর্তস্বর অব্যাহত। বোমার শব্দে আশ্রিতরা বার বার চমকে উঠছে। যেন একটু আগের ভীতিপ্রদ দৃশ্যটুকু এখনও তাড়া করে আসছে তাদের পিছনে।

সে রাত বড় দীর্ঘ রাত। তাণ্ডব সেরে পশুরা ফিরে গেলেও তার আতঙ্ক থেকে গেল। সকাল হতে না হতেই শোনা গেল অনির্দিষ্টকালের জন্য জারি হয়েছে কার্ফু। গভরমেণ্টের হুকুম হয়েছে, রাস্তায় দেখামাত্র গুলি করা হবে।

পাঁচজনের পরিবার গোটা রাত চটের আস্তানার উপর জুবুথুবু হয়ে বসে থাকে। তাদের চোখেমুখে থম্ হয়ে আছে আতঙ্ক। খুবই ঝামেলায় পড়ে গেছে পরমেশ। বাইরের রাস্তা সকাল থেকেই ফের সুনসান। শুধু মাঝে মধ্যে পুলিশের জিপ হর্ন বাজিয়ে চলে যাচ্ছে গোঁ গোঁ শব্দ তুলে। রাতের আর্তচিৎকার আর শোনা যাচ্ছে না। গোটা এলাকায় হিম স্তব্ধতা।

বাইরের অনেকগুলো বস্তি ততক্ষণে শ্মশান। তারই পোড়া ঝাঁঝ বিকট গন্ধ নিয়ে ঠোনা মারছে নাকের লতিতে। চায়ের জল বসিয়েছিল পরমেশ, সফিকুলকে আড়ালে ডেকে বলল, তুই যে এদের ঘরে ঢোকালি, এখন যদি অফিসের কেউ দেখে ফেলে? যদি ম্যানেজারবাবু এসে যায়?

সফিকুল ঢোক গিলল, তা তুই এদের কি করতে বলিস? চলে যেতে? বাইরে মিলিটারি ঘুরতি লেগেছে। হাতে উঁচোনো বন্দুক।

— মিলিটারি! পরমেশ থমকে যায়। সফিকুল এতক্ষণ জানালার পাল্লার ফাঁক দিয়ে নিশ্চয় তাইই দেখছিল।

চায়ের জল গরম হয়ে গে... সফিকুল হঠাৎ বলল, আমরা একলা চা খাব? এদের একটু দিতি হবে না?

— উদের? পরমেশ থমকায়, সবারে দিতি পারব কেমন করে? এইটুকুন চা—

— বাচ্চাগুলোর খিদে পেয়েছে মনে হয়। ঘরে কিছু নেই?

— আমাদের ঘরে আবার কী থাকবে? আমাদের সঙ্গে কি বাচ্চাকাচ্চা থাকে যে কিছু দোব? পরমেশ ঝাঁঝিয়ে ওঠে।

সফিকুলকে অসহায় দেখায়, খানিক হতাশ চোখে তাকিয়ে থাকে পরমেশের দিকে, তারপর হঠাৎ বলে, ম্যানেজারবাবু এখেনে থাকলি ভাবীজির কাছে বিস্কুট চেয়ে নেতাম।

পরমেশ সফিকুলের মুখের দিকে তাকায়, কী যেন কয়েক মুহূর্ত দেখে, তারপর গুটিসুটি হয়ে বসে থাকা বাচ্চা তিনটের দিকে তাকায়, তারপর হঠাৎ বলে, কিন্তু ম্যানেজারবাবুরা ফিরি আসলি যদি কিছু বলে?

সফিকুল ঠিক বুঝতে পারে না পরমেশ কী বলতে চায়, বলল, কী বলবে

ম্যানেজারবাবু'?

পরমেশ উঠে দাঁড়ায়। দেশে যাওয়ার সময় ম্যানেজারবাবু বিশ্বাস করে তার কাছে ঘরের চাবি রেখে যায়। সেই চাবি দিয়ে ম্যানেজারবাবুর কিচেনের দরজা খোলে। বয়াম খুঁজে খুঁজে বিস্কুট বার করে সফিকুলের হাতে দেয়, যা তো, বাচ্চাগুলোর হাতে দে—

সফিকুল একেবারে বর্তে যায়। সে এক ছুটে গিয়ে বাচ্চাগুলোর হাতে বিস্কুট ধরিয়ে দেয়। তারপর দুজনের চা ভাগ করে চারজনে খায়। তবু একটা স্থির নৈঃশব্দ বিরাজ করতে থাকে বাড়ির ভেতর। একটা অস্বস্তি, একটা আতঙ্ক, একটা ভয়। বেলা খানিক গড়িয়ে গেলে পরমেশ ফের বলে, তুই যে লোকগুলোরে জোটালি এখন কী হবে ?

সফিকুল ভুরু কোঁচকায়, কেন ?

— যা চাল আছে, তাতে তো আমাদের দু'জনেরই হবে না। তোরে তখন পই পই করে বললাম, ঢোকাসনি, ঢোকাসনি—

সফিকুলকে হতাশ দেখায়, বাইরে কারফু, কিনে আনবার কোনও উপায়ও নেই। কিনে যে আনবে তার রেস্তও বা কোথায়! সে হঠাৎ পরমেশের দিকে তাকায়, ম্যানেজারবাবুর রান্নাঘরে গে দ্যাখ্‌গা ?

পরমেশের মুখ চোখ মুহূর্তে কঠিন হয়ে ওঠে, প্রায় গর্জে উঠে বলে, না—

সফিকুলের ভুরুতে ফের কোচ পড়ে, তারও ঠোঁট জোড়া শক্ত হয়, বলল, তা'লে কি এতগুলো লোক না খেয়ে থাকবে'?

পরমেশ হিস হিস করে ওঠে, ম্যানেজারবাবু আমারে বিশ্বেস করে চাবি দে যায়—

আমি ম্যানেজারবাবু এলি বুঝোয়ে বলবানে, বলতে বলতে পরমেশের হাত থেকে চাবিটা প্রায় ছিনিয়ে নেয় সফিকুল। দ্রুত হাতে রান্নাঘরের তালা খুলে বার করে নিয়ে আসে চাল-ডাল, তেল। পরমেশের দিকে সেগুলো বাড়িয়ে দিয়ে বলে, আগে তো মানুষ বাঁচুক—

সফিকুলের চোখ মুখে এখন এক ধরনের কঠিন উল্লাস। সেদিকে তাকিয়ে পরমেশ আর কথা বাড়াতে সাহস পায় না। সে ফের উনুন ধরায়।

বাইরে লোকজনের চলাচল নেই। বাস-ট্রামের শব্দ নেই। জীবনযাত্রার চিহ্নমাত্র নেই। শুধু পুলিশের গাড়ির হর্ন, মিলিটারির ভারী বুটের শব্দ, কুচকাওয়াজের ধ্বনি। রেডিও টিভিতে ঘন ঘন খবর পড়ার আওয়াজ। পাঁচটি প্রাণী নিঃশব্দে জড়সড় হয়ে রয়েছে ঘেরা বাড়ির মধ্যে। যেন এক আতঙ্কের ঝড় বয়ে চলেছে তাদের মন আর শরীরের উপর। পাঁচজনের চোখের দৃষ্টি শূন্য। পাঁচজনের মুখেই কোনও রা নেই।

দুপুরে, রাতে দু-বেলাই তাদের সামনে ভাত পেতে তাদের চোখে শুধু জমা

হতে থাকে কৃতজ্ঞতাবোধ। এর মধ্যে হঠাৎ বউটি তার ঘোমটার ভেতর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠল, হা ভগবান।

পরমেশ সফিকুল দুজনেই চমকে উঠল হঠাৎ। একে অপরের দিকে তাকাল এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে। সে চাউনিতে বিস্ময়, সন্দেহ, আক্ষেপ। মুহূর্তে কেমন গুটিয়ে গেল সফিকুল। আর পরমেশ হঠাৎ তাদের উপর সদয় হয়ে উঠল। চটের বিছানায় তারা কষ্ট পাচ্ছে দেখে কোত্থেকে একটা ছেঁড়া কাঁথা এনে তাদের দিকে এগিয়ে দিল সে, নাও, এটা পেতে নাও দেখি---

পরদিন সকাল হলে পরমেশের তৎপরতা আরও বেড়ে যায়। বাইরে তখনও কার্ফু চলছে। পাঁচজনের পরিবার শূন্য দৃষ্টি নিয়ে একইরকমভাবে জবুথবু হয়ে বসে। তাদের চলে যাওয়ার কথা কেউ আর মুখ ফুটে বলতে পারছে না। পরমেশ সফিকুলের দিকে একবার তেরচা চোখে তাকিয়ে চাবি হাতে গুটি গুটি এগিয়ে যায় ম্যানেজারবাবুর রান্নাঘরের দিকে। ফের দু'বেলার মতো চাল-ডাল-তেল বার করে নিয়ে আসতেই সফিকুল বিড় বিড় করে ওঠে, এখন ম্যানেজারবাবুরা এসে আর কিছু বলবে না!

পরমেশের ভেতরে-ভেতরে কাঁপন ছিল। ভাবীজির ভাঁড়ার প্রায় শূন্য করে ফেলেছে তারা। জানতে পারলে ম্যানেজারবাবু তাদের কী বলবেন কে জানে। তবু মুখে সাহস এনে সফিকুলের দিকে না তাকিয়েই বলল, মানুষ বিপদে পড়লে তারে সাহায্য করতে হবে না?

সফিকুল কেমন জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকায়। এক লহমা সে চাউনি পরমেশের চোখে পড়তে শিরশির করে ওঠে তার শরীর। তার মধ্যেই দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়। বিকেল ক্রমে সন্ধে হয়ে আসে। বাইরের রাস্তায় এখনও কেবল মিলিটারির টহল আর জিপের হর্ন ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। যতটা গুটিয়ে গিয়েছে সফিকুল, ততটাই দরদ উথলে দিচ্ছে পরমেশ। রাতের খাওয়ার পর কোত্থেকে একটা চাদর জোগাড় করে আশ্রিতদের দিকে ছুড়ে দিল সে, নাও, গায়ে দাও। জব্বর ঠান্ডা পড়েছে।

সফিকুল বিড় বিড় করে ওঠে, হুঁ। সোহাগ দেখাতিছে।

রাতের তিন নৈঃশব্দ থির হয়ে জেগে থাকে বাড়ির মধ্যে। মাঝেমধ্যে পরমেশের মনে হয়, অন্ধকারে চোখ দুটো জ্বলছে সফিকুলের। কেমন একটা রাগ রাগ ভাব। দেখে তার বুকের ভেতর গুর গুর করে ওঠে। তার চোখে ঘুম আসে না। সফিকুলও ঘুমোচ্ছে কি না কে জানে। দুজনের ভেতরে একটা লড়াই চলছে নিঃশব্দে।

ভোরে উঠে রেডিও-র ঘোষণা থেকে ওরা জানতে পারে, কার্ফু শিথিল। বাইরে আবার বাস-ট্রামের শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। লোকজনের চলাফেরার আওয়াজ। জীবনযাত্রা আবার আগের মতো সচল হয়ে উঠেছে। সেই মুহূর্তে আশ্রিত পরিবারের বউটি কী যে অস্ফুটে বলতেই তার পাশে বসে থাকা মানুষটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে উঠল, খোদা যা করেন—

পরমেশ আর সফিকুল ফের ভীষণভাবে চমকে উঠল তার কথা শুনে। দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে থাকে অবিশ্বাস্যভাবে। সফিকুলের চোখের জ্বলন্ত দৃষ্টি হঠাৎ নরম হয়ে যায়। পরমেশের মুখচোখ শক্ত। পট্ করে সে বলে ফেলল, যা, উদের চলি যেতি বল্। ম্যানেজারবাবুরা হয়তো এসে পড়বে'খন।

তার গলার কর্কশ শব্দে সফিকুল ঝেঁকে উঠে কিছু যেন বলতে গিয়েও বলল না। মুখ গম্ভীর করে উঠে গেল আশ্রিতদের কাছে। লোকটার সঙ্গে ফিস ফিস করে কথা বলল কিছুক্ষণ। লোকটাও কিছু বলল, ফ্যাসফেসে, জড়ানো গলায়। সফিকুল আবারো কিছু বলল। লোকটাও। কিছুক্ষণ কথা বলে উঠে এল পরমেশের কাছে, বলল, আমি উদের চলে যেতি বলিছি।

পরমেশ কিছু হুঁ-টু করল না। শুধু জ্বলন্ত চোখে তাকাল।

খানিক পর সফিকুল আবার বিড় বিড় করল, লোকটা মোছলমান, হিন্দুর মেয়ে বে করেছে।

পরমেশ চমকে উঠল। বিস্ফারিত চোখে তাকাল প্রথমে বউটির দিকে, তারপর লোকটার দিকে। মনে মনে ঘাড় নাড়ল, ও, সেই জন্যেই—

ততক্ষণে আশ্রিত পরিবারের সবাই উঠে দাঁড়িয়েছে। জিনিসপত্র গোছগাছ করে বেরিয়ে যাওয়ার আগে একবার তাকাল স্থাণু হয়ে থাকা পরমেশ আর সফিকুলের দিকে। সে চাউনিতে কিছুটা ভয়, কিছুটা অনিশ্চয়তা। কিছু কৃতজ্ঞতাও।

তারা ফটকেব দরজা পেরিয়ে রাস্তায় পা দেওয়ার পর পরমেশ আর সফিকুল তাকিয়ে থাকে একে অপরের দিকে। নিশ্চল হয়ে, হতভম্ব হয়ে। অনেক, অনেকক্ষণ পর পরমেশ শুধু বলতে পারল, দুর! আমরা শুধুমুধু ঝগড়া করলাম—

জনক জাতক জননী

সমীর রক্ষিত

কে একজন দক্ষিণদিক থেকে ছুটে এসে ফাঁকা হাটখোলার ভেতর দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে উত্তর মুখে চলে গেল। তার পায়ের আওয়াজে মুহূর্তে কদমগাছের কয়েকটা কাক আচমকা ত্রাসে ডানা ঝটপটিয়ে কা কা করে ওঠে। রাত্রির জড়োসড়ো হাওয়া হঠাৎ নাড়া খেয়ে দোকানের ঝাঁপে এসে ভয়ে থরথরিয়ে কাঁপতে থাকে। তারপর ক্রমে ছুটন্ত পায়ের সে শব্দ দূরে বিশাল মাঠের মধ্যে মিলিয়ে যেতেই আবার হাটখোলা এমন নিস্তব্ধ এমন শীতল হয়ে যায় যে, হঠাৎ সন্দেহ লাগে সত্যি কেউ গেল তো?

নিবারণ দরজাটা খুলে একবার দেখবে কিনা ভেবেছিল। কিন্তু তার কীরকম ভয় ভয় লাগল। দিনকালের গতিক তেমন ভাল নয়। ক'দিন থেকেই চারিদিকে কেমন যেন থমথমে ভাব, কখন কী হয়!

এ সময় চকিতে গোপালের মুখটা আবার তার বুকের মধ্যে লাফিয়ে ওঠে। বস্তুত দুপুর থেকেই গোপালের জন্য তার মন ছটফট করছে। শুধু দ্রুত পায়ের চমকা আওয়াজে খানিকক্ষণের জন্য গোপালের ভাবনাটা চাপা পড়েছিল। বজ্জাত ছোঁড়াটা সেই যে পালাল দুপুরে তারপর থেকে একেবারে নিপাত্তা। এদিক সেদিক চারিদিকে তন্ন তন্ন করে গরু খোঁজা করা হল, তবু হদিস মিলল না। সেই থেকে নিবারণের মনে নানা আগড়ম বাগড়ম চিন্তা, নানা কু-ভাবনা পাক দিয়ে বেড়াচ্ছে, ভয়ে ডরে প্রাণটা তার শুকিয়ে এইটুকু হয়ে যাচ্ছে। পায়ের আওয়াজে মনটা আনচান করে উঠেছিল, কিন্তু সে শব্দ মিলিয়ে যেতে বুকটা আরো ভারী, শরীরটা আরো শিথিল হয়ে আসে তার।

ভাবনার কী অন্ত আছে তার? বিপদ তো কখনো একদিক দিয়ে আসে না। কাজকারবারের অবস্থাও সঙ্গিন। শনিবার থেকেই বিক্রিবাটা মন্দা, দেওয়ানগঞ্জের হাট মঙ্গলবারেই জমে বেশি। কিন্তু আজ হাটে না-লোক না-জন, যে দু'চারজন এদিক-ওদিক এসেছিল, তারাও, যেন পালিয়ে গেলে বাঁচে। আজ হলদিবাড়ি থেকে হাট-বাসও আসেনি। কোন দোকানেই হ্যাজাক পর্যন্ত জ্বলেনি— অবশ্য জ্বালানোও নিষেধ। মদনলাল ব্রিজমোহনের কাপড়ের দোকান, খগেন ঘোষের মিষ্টির দোকান, বলাই কর্মকারের কামারশালা আর নিবারণের মুদিখানাতেও টিমটিম করে লণ্ঠন জ্বলছে, তাও ওই সাঁঝবেলায়— ধূপধুনা দেবার সময়টুকু। তারপর আঁধার গাঢ় হবার আগেই ঝাঁপ বন্ধ।

নিবারণ দোকানের এককোণে তক্তপোশের ওপরে গালে হাত দিয়ে বসে থাকে, তার কনুয়ের তলায় কাঠের ক্যাশবাক্স। সামনে সিলিং থেকে নামা তারে লণ্ঠন ঝোলে, টিনের বেড়ার গায়ে নিবারণের ঢাউস ছায়াটা কাঁপে। বড় একটা নিশ্বাস বেরিয়ে আসে তার— হাটজমা দূরে থাকুক লোকে এখন হাতের মুঠোয় যে যার প্রাণ নিয়ে ঘরে সেঁধিয়েছে। ঘরেও কী ছাই বিশ্বাস আছে? বাড়িঘর ছেড়ে পালাচ্ছে যে যেদিক পানে পারছে। যাদের আত্মীয়স্বজন আছে উত্তরে হলদিবাড়ি জলপাইগুড়ি ময়নাগুড়ি কিম্বা শিলিগুড়ির দিকে। কিন্তু এখানে আর এক মুহূর্তও না। দেওয়ানগঞ্জ হাটের থেকে ওপার বাংলার বর্ডার বড়জোব তিন কি চার ক্রোশ; দিন তিনেক থেকে সেদিক পানে মিলিটারির লাইনবন্দি ট্রাক চলছে শয়ে শয়ে। বিশেষ করে রাত্রে— গোঁ গোঁ শব্দ উঠছে চারিদিকে, টালমাটাল বাতাসে ছুটে ফিরছে সারাক্ষণ এ-গাঁ থেকে ও-গাঁয়ে।

হাটের পাশেই মেটে রাস্তার দু'পাশে আবাদী জমি। কাছে দূরে ধঞ্চের জঙ্গল আর মাঝে মধ্যে ন্যাড়া বাবলাগাছ। দূরে গাছ-গাছালির মধ্যে সুতাডাঙা মীরপুর দরগা গোরস্থান— ওইখানে রাস্তা ডানদিকে বাঁক নিয়ে সোজা বর্ডারে। আর পিছনপানে ওই পথ নেতাজীনগর অরবিন্দপল্লী ইস্কুল পোস্টাপিস হয়ে হলদিবাড়ির পাকা সড়কে পড়ে একটানে উত্তরে জলপাইগুড়ি শিলিগুড়ি।

হাটের এ তল্লাট সারাদিনভর ধুঁকছিল; চারিদিক খাঁ খা— সুনসান্ ফাঁকা। ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরে দুপুরবেলায় হাটখোলা জ্বলছিল যেন, চোখ ঝলসে যায় এত তাপ, মাঠের ভেতর থেকে সাপের জিভের মত লক্‌লকে গরম হাওয়া ছুটে আসছিল, হাটের শূন্য চালাগুলো যেন দম আটকে দাঁড়িয়েছিল, দোকানে একা ঠায় বসে বসে কখন ঢুলুনি এসে গিয়েছিল নিবারণের। হঠাৎ গৌরীর চিৎকারে ধ্বক্ করে উঠেছিল বুকটা, সেই সঙ্গে গোপালের দপ্‌দপানো চেচামেচি। খিট্‌কেল ছোঁড়াটা আবার কোন্ কাণ্ড করল! দোকানের পেছনেই সামান্য তফাতে বাড়ি নিবারণের।

চড়া গলায় গৌরীর উদ্দেশে —'আবার কী হইল তোমাগো ?'— বলতে বলতে ছুটে গিয়েছিল সে। রান্নাঘরের দাওয়ায় গৌরী তখন হাঁপাচ্ছে— রান্নাঘরের ঝাঁপ হাট করে খোলা। গৌরীর দু'চোখ লাল, সারা মুখ টসটসে, গালে তীক্ষ্ণ নখের আঁচড়ের দাগ— দাগের কোথাও কোথাও রক্তের ফুট্‌কি।

'দেখ কী হা কইরা ?'—গলাভর্তি রাগ গৌরীর তখন। থতমত খেয়ে নিবারণ বলেছিল, 'গোপাইল্যার কীর্তি বুঝি ?' 'আবার কার ?'—ভ্রূকুটি করেছিল গৌরী। 'কোথায় হেয় হারামজাদা ?' কর্কশ গলায় চেঁচিয়েছিল নিবারণ। তারপর ক্ষিপ্ত হাতে একটা চেলাকাঠ তুলে নিয়ে ছুটেছিল পেছনের সব্‌জি বাগানে। জামগাছের তলায় যেতে যেতে তার চোখে পড়েছিল— গোপাল ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে, খগেন ঘোষের বাড়ির পাশ কাটিয়ে আখ খেতের আল দিয়ে মাঠের ওপাশে বড় রাস্তায় হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল।

গৌরী নিবারণের পেছন পেছনই এসেছিল ;'ঘরে কী করচে দেখ আইসা।' —বলে নিবারণের হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গিয়েছিল গৌরী। ঘরে পা দিতে গিয়ে থমকে গিয়েছিল সে— ঘরময় লণ্ডভণ্ড কারখানা। জলের মেটে কলসি ভাঙা— ঘরময় জলের ঢল, আলনার কাপড়-চোপড মাটিতে তছনছ, পুবের দেয়ালে গৌরী আর নিবারণের বাঁধান ছবিটা টাল খেয়ে ঝুলছে, বিয়ের পরে গিয়ে ছবিটা তুলিয়েছিল নিবারণ— গৌরীর মাথায় ঘোমটা একটু বেশিই টানা, মুখে চাপা ভয় মেশানো হাসি, নিবারণের গোঁফটা একটু বেশিরকম কালো— ছবির মাঝখানে ঢিল পড়ে খানিকটা তুবড়ে গেছে, কাচ ভেঙে চৌচির।

সমস্ত দেখেশুনে পায়ের নখ থেকে ব্রহ্মতালু অবধি জ্বলে গিয়েছিল নিবারণের। চুলের মুঠি ধরে হারামজাদাকে গোপেটা করতে ইচ্ছে করছিল, যাতে নাকমুখ ফেটে রক্তারক্তি কাণ্ড হয়ে যায়, যাতে কোনদিন আর ঢ্যাবনামি করতে সাহস না পায়। কোনদিন একেবারে খতম করে দেবে— চোয়াল শক্ত করে ভাবছিল নিবারণ। তারপর ক্রমে হাতের মুঠি আলগা করতে করতে মনে হয়েছিল তার, মারতে তো কোনদিন কসুর করেনি সে—বেধড়ক ঠেঙিয়েছে কতদিন বাখারি দিয়ে— কিলচড় লাথিও ঝেড়েছে। কিন্তু আট ন'বছরের এই রত্তি ছেলেটা— গায়ে যেন মোষের চামড়া, ঘাড় গোঁজ করে মার খেয়ে যায়, টুঁ শব্দটি করে না। চোখ দিয়ে জল গড়ায়, মুখ লাল হয়ে যায়— নাকের পাটা ফুলে ঢোল— ফোঁসফোঁস নিশ্বাস ফেলে কিন্তু চেঁচায় না। তাজ্জব কাণ্ড। যতদিন যাচ্ছে তত যেন ছেলেটার আক্রোশ বেড়ে যাচ্ছে। শরীরটা পাকিয়ে দড়ির মত হয়ে যাচ্ছে— চোখ দুটো খ্যাপা শেয়ালের মত, মাঝে মাঝে তার দিকে এমন চোখে তাকায় ভয়ে নিবারণের বুকটা শুকিয়ে যায় ভেতরে ভেতরে।

'যেমন মা তার তেমনি ছা।' গজ গজ করতে করতে হেঁসেলে ঢুকে গিয়েছিল গৌরী। কথাটা একটা সূঁচের মত খচ্‌ করে বিঁধেছিল নিবারণের বুকে। গোপাল দুলালীর পেটের। দুলালী তার প্রথম পক্ষ। দুলালী বেঁচে থাকতে গোপালকে মারধর করা দূরস্থান ধমকটি দেবারও জো ছিল না। তখন অবশ্য ছেলেটাও ছিল অন্যরকম। তখন নিবারণের সব ঝড়-ঝাপ্‌টা যেত দুলালীর ওপর দিয়ে। নিবারণ তাকে দু'চোখে দেখতে পারত না। দিনরাত গলামন্দ করত খুঁটিনাটি নিয়ে, উঠতে বসতে গঞ্জনা দিত, চড়চাপড়ও বাদ যেত না। কিন্তু দুলালী রা কাড়ত না, মুখ বুজে সব সয়ে যেত। কারণ দুলালী জানত তাকে নিবারণের মনে ধরেনি। আর নিবারণ ছাড়া কেই বা নিত তার ফ্যাকাশে কুচ্ছিৎ হাড় জিরজিরে শরীরটা ? নেহাৎ ডাক্তার জ্যাঠা ছিল।

ডাক্তার জ্যাঠা যখন বিয়ে ঠিক করে দেয়, নিবারণ দেখতেও চায়নি, তার উপায়ও ছিল না। ধারে কাছে তখন নিবারণের কেউ নেই । বাপ মারা যায় পাকিস্তানে থাকতেই দাঙ্গায় ; আর মা অসুখে ভুগে এপারে আসে। মা আর দু'বোনকে নিয়ে বর্ডার পার হয়ে যখন সে এপারে এসেছিল তখন একেবারে নিঃসম্বল। জ্যাঠাই টাকা-পয়সা দিয়ে ছোটখাট একটা মুদি দোকান চালু করে দিয়েছে এই হাটখোলায়। বোনেদেরও পার করেছে সে-ই।

দেশ ভাগাভাগির আগের থেকেই জ্যাঠা ডাক্তারি করত হলদিবাড়িতে। একই গাঁয়ের লোক তারা। ডাক্তারিতে তার যা আয় তা বেরিয়ে যায় দশজনের পেছনেই। বিয়ের আগে থেকেই দুলালীর চিকিৎসা করত জ্যাঠা বিনা পয়সায়, একপাল ভাইবোন তারা, দাদা দরজিগিরি করত, দু'বেলা জুটত কী জুটত না। জ্যাঠা বিয়ে ঠিক করলো। বিয়ের আসরে দুলালীকে দেখে মেজাজ খাপ্পা হ'য়ে গেল নিবারণের। শুকনো চামড়া কুঁচকে হাড়ের সঙ্গে লেপটে আছে— গায়ে গতরে না মাংস, না রসকষ : পাটের আঁশের মত কয়েকগাছি চুল মাথায়— বিয়ের পর এসব খুঁটে খুঁটে দেখেছে আর মেজাজ বিগড়েছে নিবারণের। জ্যাঠা বলত— 'কী ছেলে কী মেয়ে সময় মত বিয়ে না হলে কী শরীর ঠিক থাকে ? দেখবি এখন—।' সত্যি সত্যি বিয়ের ছ'মাসের মধ্যে দুলালীর অন্য চেহারা একেবারে অন্যরূপ ফুলেফেঁপে কলার থেড ক'মাসের মধ্যেই। আহ্লাদে দুলালী আটখানা বছর দুয়েক ঘুরতে না ঘুরতেই ছেলে বিয়োল দুলালী— গোপালের জন্ম আট ন'বছর আগে।

তারপর আবার যে কে সেই, আজ মাথা ধরা, কাল শরীর ব্যথা, জ্বর-জ্বর, এটা-ওটা সাতপাঁচ লেগেই থাকত। শরীরে না এক ফোঁটা রক্ত, না বল, চোখমুখ ফ্যাকাশে হলুদ বর্ণ, হাতে-পায়ে শোথ আসত অমাবস্যা পূর্ণিমায়, সাতরোগের ডিপো একটা। সারা রাত নিবারণের পাশে শুয়ে কঁকিয়ে টেঁকিয়ে রাত কাবার ক'রে দিত।

তার আদরটা পর্যন্ত নেবার সামর্থ্যও ছিল না গায়ে, রাত-বিরেতে নিবারণ যখন ভোগ করত তাকে, যেন দাঁতে দাঁত চেপে চিরতার জল গেলার মত করে পড়ে থাকত দুলালী। মাথায় আগুন ধরে যেত নিবারণের। তাকে হাড়েমাসে দীর্ঘকাল জ্বালিয়ে শেষমেষ একদিন টেঁসে গেল দুলালী। সারাদিনে বার কয়েক পায়খানা করে সন্ধ্যার দিকে পায়খানার কাঠের সিঁড়িতে মুখ থুবড়ে পড়েছিল সে। ছেলের চিৎকার আর খগেন ঘোষের বউয়ের মড়া কান্নায় দোকান থেকে যখন ছুটে গিয়েছিল নিবারণ— তখন সব শেষ হয়ে গেছে। তারপর অন্ধকারে শ্মশানবন্ধুদের পেছনে পেছনে ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে গেল নিবারণ শ্মশানে এবং ছেলের হাত ধরে নিজেই মুখাগ্নি করল দুলালীর। সেই মুহূর্তে যেন তার সব জ্বালা যন্ত্রণা আর ঘেন্নার বস্তায় আগুন জ্বালিয়েছিল সে।

এরপর ছ'মাস বছর ঘুরতে না ঘুরতেই মৃত চরণ মণ্ডলের বৌ গৌরীকে ঘরে এনে তুলল নিবারণ। মণ্ডল বাড়িতে তার আনাগোনা ছিল আগে থেকেই — চরণের ভাই জীবন মণ্ডলের সাথে তার দোস্তি। এ নিয়ে নানাজনে নানা কথা বলে— গৌরীর সঙ্গে নাকি তার ফষ্টিনষ্টি চলছিল অনেকদিন থেকেই। কাজেই দুলালীর মরার ব্যাপারেও নাকি একটা রহস্য আছে সবার ধারণা। এ নিয়ে চারিদিকে কানাঘুষো—কখনো আড়ালে-আবডালে, কখনো প্রকাশ্যে। খগেন ঘোষের সঙ্গে তার বনিবনা কম, সে ত বড় গলাতেই বলে বেড়ায়— 'মরচে না অন্য কিছু— কেডা জানে?' নেতাজীনগর অরবিন্দপল্লী তামাম দেওয়ানগঞ্জে এই নিয়ে ঢিঢি। সেই থেকে বড় একটা কেউ তার ধারে কাছে ঘেঁষে না, কারো সঙ্গেই তার ওঠবস নেই— সে প্রায় একঘরে। পারতপক্ষে কেউ তার সঙ্গে কথাও বলে না। মরার আগে আগে দুলালীও বলত না, খুব রাত হত যেদিন মণ্ডলবাড়ি থেকে ফিরতে, রেগে যেত সে আর গজগজ করত, 'অত যদি পিরীত তয় বাকি রাইতটা অইখানে কাটাইলেই হয়?' 'যদি মনে লয় তো তাই করুম, তর কথায় নাকি হারামজাদী?'— নিবারণ ফুঁসে উঠত।

আজ আর কারো ওপর ফুঁসে উঠতে পারে না সে, একমাত্র গোপাল ছাড়া। সারা হাটে কে আছে তার সোদরবান্ধব? একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে লণ্ঠনের আলোটা হাত বাড়িয়ে চড়িয়ে দেয় নিবারণ। কিছুতেই যেন অন্ধকার যায় না। অন্ধকার ঘোলাজলের মত পাকে পাকে ঘুরিয়ে তাকে ডুবিয়ে দিচ্ছে। নিজেকে ভীষণ একা, ভীষণ নিঃস্ব লাগে তার। কেউ নেই তার যার কাছে মনের স্তূপাকার সুখদুঃখের কথাগুলো বলে বলে বুকটা হাল্কা করা যায়। চিন্তা ভাবনায় মাথাটা ভারী, দমটা খাটো হয়ে আসে। ছোঁড়াটা দৌড়তে দৌড়তে একবার পেছন ফিরে তাকিয়েছিল— মনে পড়ে নিবারণের, তারপর আরো জোরে ছুটেছিল। হয়তো তার মারমূর্তি দেখে

আঁতকে উঠেছিল। কোথায় গেল, কী হল ছেলেটার কে বলবে? পায়ের আওয়াজটা শুনে মুহূর্তে মনের মধ্যে একটা আশা ঝপ্ করে উঠে বসেছিল, কিন্তু পায়ের শব্দটা দূরে মিলিয়ে যেতে আশাভঙ্গে ভেতরটা চৌচির হয়ে গেছে।

হাটখোলা এখন শ্মশানের মত নিস্তব্ধ। সুরেন কামারের হাপরের ফোঁসফাঁস নেই, হাতুড়ির ঠকাঠক আজ বন্ধ। নিজের দোকানের মাচার তলায় চিকচক শব্দে ছুঁচো ছুটে বেড়াচ্ছে। আর কখনো কখনো মিলিটারি ট্রাকের একটানা গোঁ গোঁ শব্দ ভেসে আসছে, দু'হাতে কারো গলা চেপে ধরলে যেমন গোঙানি তেমনি বুক কাঁপানো আওয়াজ। কখনো আচমকা হয়তো বা দুমদাম শব্দও কানে আসে। গতকালই নাকি হলদিবাড়ির ওধারে ওপার থেকে কামানের গোলা এসে পড়েছে। মাঝে মধ্যে তারস্বরে একঝাঁক শেয়াল রারা করে উঠছে। দিনরাত্রি রেডিও বলছে— যে কোন সময়ে লেগে যেতে পারে যুদ্ধ পাকিস্তানরে সঙ্গে। আর মুখে মুখে নানান গুজব ছড়িয়ে যাচ্ছে এবং চারিদ্দিক আতঙ্কে উত্তেজনায় কেঁপে উঠছে। মদনলাল ব্রিজমোহন নাকি কাল সকালেই জলপাইগুড়ি তার সব মাল পাচার করে দেবে, মহাদেব সা'রও সেই ধান্দা। সবাই তাল কষছে, ষড় করছে, কে কোথায় পালাবে। ওপার থেকে কামান.দাগলে দেওয়ানগঞ্জে ওসে পড়তেই পারে।

ভয়চকিত শূন্য দৃষ্টিতে একবার নিজের মুদিখানার মালপত্রের ওপর চোখ বোলাল নিবারণ। গৌরী ছাড়া তার আর কে আছে শলা-পরামর্শ করবার! সুখে দুঃখে এখন ভরসা শুধু গৌরী, গৌরী হয়তো এখন সামনে ভাত নিয়ে বসে আছে। কিংবা চিন্তা ভাবনায় সে-ও হয়তো ঘরবার করছে, রাগ করে হয়তো বা শুয়েই পড়েছে এতক্ষণে। নিবারণের পা সরে না বাড়ির দিকে যেতে; ছেলেটাকে সারা বিকেল ধরে খোঁজাখুঁজি করেছে সে দেওয়ানগঞ্জের এ-মুলুক থেকে ও-মুলুকে। সে কথা কি মানবে গৌরী? নাকি তার নিজের মনটাই মানছে? গৌরীর গোঁ-ও কী কম! ছেলেকে না নিয়ে ফিরতে পারলে গৌরী কি তাকে এমনি ছেড়ে দেবে?

গৌরীর মনটা নিবারণ ভালভাবেই জানে। গোপালের প্যান্ট জামাটা কোথাও ছিঁড়ে গেলে অমনি সে সুঁচ-সুতো-নিয়ে বসবে, নয়তো তাকে এসে ধরবে নতুন কিনে দাও। এ ব্যাপারে গৌরী নাছোড়। অথচ নিজের শাড়িটা ব্লাউজটা নিয়ে কোন কাড়াকাড়ি নেই। ছেলেটার চোখ একটু ছলছল করলে কিংবা গায়ে তাপ উঠলে— অমনি বলবে, 'যাও হাসপাতাল থাইক্যা অষুধ লইয়া আস।' গোপাল রাগারাগি করে রাত্রে না খেয়েই মাঝেমধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে কত দিন দেখেছে নিবারণ, রাত হলে ঘুমন্ত গোপালকে কোলে বসিয়ে গৌরী তাকে হাত ধরে খাইয়ে দিচ্ছে, তার চোখে-মুখে করুণ মমতা, গোপাল তখন ঘুমের ঘোরে হয়তো জানতেই পারে না, কিংবা সে তখন হয়তো ঘুমের মধ্যে দুলালীকে— তার মাকে স্বপ্ন দেখতে থাকে।

ছেলেটা কি আর গৌরীর মনটা বোঝে? গৌরী ওর দু'চোখের বিষ। ছেলেটা দিনরাত মুখিয়েই আছে— ওই ভাত দিতে একটু দেরি হল, কী খাবার পছন্দ হল না, কিংবা গৌরী তাকে একটু ফাইফরমাস করল— অমনি চেঁচামেচি বাঁধিয়ে তুলকালাম করবে। ছুটে বাড়ির পেছনে সব্জিক্ষেতে গিয়ে টিনের চালে ঢিল ছুঁড়তে থাকবে, গালিগালাজ করবে আর অপেক্ষা করে থাকবে কখন গৌরী এক চিম্টি রা-কাড়ে; তক্ষুনি খ্যাপা শেয়ালের মত তেড়ে এসে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে— দু-হাতে কিলচড় ঘুষি মারবে, চুল টেনে ছিঁড়বে. চোখমুখ খাম্চে রক্তারক্তি কাণ্ড করে দেবে। তারপর ফের বাগানে গিয়ে জামরুল গাছের তলায় পা ছড়িয়ে বসে থাকবে, বাখারি দিয়ে মাটি খুঁচিয়ে কেঁচো বার করবে কিংবা ব্যাঙ মারবে, তারপর হয়তো কখন ওখানেই ঘুমিয়ে পড়বে।

ওর মনের মধ্যে যেন আগুন— চোখমুখ ভর্তি আক্রোশ। সবাই যেন ওর শত্রু। বাবা বলে তাকে একটা ডাক পর্যন্ত দেয় না— কতকাল ওই ডাকটা শোনে না নিবারণ। মনটা বড় আঁকুপাকু করে তার। সে আদর করে ডাকলেও সাড়া দেয় না, বরং পাছে সে ডাকে এই ভয়ে যেন তফাতে থাকে, পালিয়ে বেড়ায় ছেলেটা। অথচ ওর মুখে যখন প্রথম বোল ফোটে, তখন ভরদিন শুধু —বা-বা-বা করত। দুলালী দু-হাতে ছেলেকে মুখের কাছে তুলে রাগের ভান করত— 'বাপে তো পোঁছে না, ইদিকে ছাওয়ালের মুখে শোন খালি বা-বা। কেন, মা মুখে আসে না?' দুলালীর হাত থেকে গোপালকে ছিনিয়ে নিয়ে নিবারণ তাকে আদরে আদরে তুমুল কাণ্ড করত— 'হ হ বাপের ব্যাটা!' বলে তাকে উঁচুতে ছুড়ে আবার লুফে নিয়ে বলত—'ডাক্ —ডাক্ দেখি,শুনি পরাণ্ডা ভইর‍্যা।' কোথায় সে ডাক? হাঁকডাকের আর কোন বালাই নেই। উল্টে মাঝেমধ্যেই ওই দজ্জাল ছেলে তার মাথাটা খারাপ করে দেয়। কতদিন রাগে বেসামাল হয়ে বেদম পিটিয়েছে ওকে। পরে মাথা ঠাণ্ডা হলে অনুতাপে বুকটা ফেটে যায় তার, দু'চোখ ছলছল করে ওঠে। তখন নিজের চুল নিজে টেনে ছিঁড়তে মন চায়, কী চণ্ডালের মত রাগ তার শরীরে? রাগ উঠলে আর মাত্রাজ্ঞান থাকে না।

আর কি ফিরবে ছেলেটা? কার টানেই বা ফিরবে? কোথায়ই বা যাবে ছেলেটা? খুঁজে দেখার এতটুকু কসুর করেনি নিবারণ, সারা দেওয়ানগঞ্জ আঁতি পাঁতি করে খুঁজেছে দুপুর থেকে সন্ধে পর্যন্ত। আজ রাস্তাঘাটে লোকজন কম, পাড়ায় পাড়ায় খালি বৈঠক আর গুটিচালা হচ্ছে। তবু যাকে সামনে পেয়েছে, তাকেই ছেলেটার কথা জিজ্ঞেস করেছে সে। কারো কাছে খবর পাওয়া দূরের কথা, কেউ একটু সান্ত্বনা দেয় না। গরজ দেখায় না। সারা দিনের হাঁটাহাঁটি ক্লান্তি আর উদ্বেগে যখন সে বিপর্যস্ত তখন সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে ইস্কুলের মাঠে ছোটখাট একটা ভিড়

দেখে তার আশা জেগেছিল ; অনেকে মিলে কিছু একটা আলাপ-আলেচনা করছিল। সে ভীরু পায়ে কাছে যেতেই গুঞ্জন থিতিয়ে এসে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, অস্বস্তিতে ক'মুহূর্ত নির্বাক দাঁড়িয়েছিল সে, তারপর বৃদ্ধ হীরু সরকারকে দেখতে পেয়ে কথা বলতে পেরেছিল—'হীরাকা, খবর কী?' হীরু সরকার মুখটা এগিয়ে নিয়ে এসে বলেছিল— 'কেডা নিবারণ নি? খবর তো খুবই খারাপ, যুদ্ধ নাকি লাগবই! কোথায় যাইবা টাইবা ঠিক করব নি?' নিবারণ ক্লান্ত গলায় বলছিল—'আমার আরেক বিপদ হইচে হীরুকা, ছাওয়ালডা পলাইচে দুপুরবেলায়, খুঁইজা পাইতাচি না।' 'কও কী সাংঘাতিক কথা?'—হীরুকা বলার সঙ্গে সঙ্গে ভিড় থেকে কে যেন একটা বিকট হাসি হেসে উঠছিল সজোরে, খগেন ঘোষই বোধহয়। বুকটা কেঁপে উঠেছিল নিবারণের মুহূর্তে, আর দাঁড়ায়নি, 'আমি যাই হীরকা।' —বলে সে যখন হাঁটতে শুরু করেছে পেছন থেকে বিদ্রূপমেশানো খগেন ঘোষের রূঢ় গলা সে শুনতে পেয়েছিল— 'হালার রাইক্ষসে বউডারে খাইচে, এইবার পোলাডারেও খাইব।'

সে দ্রুত পা চালিয়ে দিয়েছিল। আর খগেন ঘোষের হাসি আর কথাগুলো যেন তাড়া করে নিয়ে এসে তাকে দোকানে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। নিঃশব্দে অপরাধীর মত দোকানে বসে আছে সেই থেকে। মাঝেমধ্যে দুলালীর ওপর অতিষ্ঠ হয়ে সে দুলালীকে ক্ষিপ্ত গলায় বলত— 'এত লোকে মরে, তরে যমেও চোখে দেখে না।' দুলালীও তখন খ্যাপা গলায় বলত— 'তুমিই আমারে খাইবা একদিন, তুমিই আমার যম।' —দুলালীর সেই হিসহিস শব্দ এখন শুধু কানে বাজছে। রাত যত বাড়ছে, বাইরে সাড়াশব্দ যত কমে আসছে, তত যেন নিজের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে নিবারণ, অবসন্ন মাথার ভেতরে সব চিন্তা তার জট পাকিয়ে যাচ্ছে আর পেছনের দিনগুলো হু হু করে ঝড়ো হাওয়ার মত ছুটে এসে আছড়ে পড়ছে তার বুকের ভেতরে। লণ্ঠনের ঘোলাটে আলোয় কাঁপছে সেই সব পুরানো দৃশ্য।

এখন তার কানে দুলালীর শ্মশান থেকে উঠে-আসা সেই সাঁ সাঁ শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই, দুলালীর মুখটা ছাড়া আর যেন কিছু তার নজরে পড়ছে না। সামান্য হাঁ হয়ে আছে সে মুখ— ওপরের পাটির কয়েকটা দাঁত দেখা যাচ্ছে শুধু। সধবার মরণ, খগেন ঘোষের বউ দুলালীর পায়ে আলতা মাখিয়ে দিয়েছিল, কপালে লেপে দিয়েছিল সিঁদুর। সে সিঁদুর নাক চোখ গালে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল। রুক্ষ চুলগুলো ছড়িয়েছিল, আলুথালু কয়েক গোছা কপাল নাক পেরিয়ে বুকে এসে পড়েছিল। আর দুলালীর সর্বাঙ্গে একটা গাঢ় লাল শাড়ি জড়িয়ে দিয়েছিল খগেনের বউ, যেন সমস্ত শরীরটা রক্তে ভেসে যাচ্ছিল, একটা লোক খুন হলেও এত লাল দেখায় না— এমন ভয়ঙ্কর। নিবারণের চোখে একবিন্দু জল ছিল না, তার দৃষ্টি

ঝাপসা হয়ে যায়নি, তবু দু-চোখ মেলে তাকাতে পারেনি ভাল করে নিবারণ। হঠাৎ এ সময়ে কে একজন আচমকা 'বল হরি'— হেঁকে উঠতেই খগেন ঘোষ, মহাদেব সা আরো আট-দশটা ছেলে ছোকরা একসঙ্গে চেঁচিয়েছিল 'হরিবল।' তারপর ঘোর অন্ধকারে অনেক পথ হেঁটে গিয়ে মড়কখোলা। একগোছা পাটকাঠিতে আগুন ধরিয়ে খগেন তার হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল। চিতার ওপরে দুলালীর উলঙ্গ শরীর তখন কাঠ-চাপা অন্ধকারে। সেই আগুনে শুধুই তার মুখটা দেখা যায়— দু'ঠোঁট ফাঁক হয়ে আছে—ওপরের পাটির কয়েকটা দাঁত চোখে পড়ে—চকিতে গোপালের দু'হাত ধরে দুলালী। সেই হাঁ-মুখের মধ্যে আগুন গুঁজে দিয়েছিল নিবারণ ত্রস্ত হাতে। দেখতে দেখতে দুলালীর মুখের সে আগুন হা-হা করে ওপরে উঠে গিয়েছিল। সাঁ সাঁ শব্দে ছুটে এসেছিল বাতাস। আগুন আবো লেলিহান হতেই কে যেন হাতের দীর্ঘ বাঁশের বাড়িতে দুলালীর মাথাটা চৌচির করে দিয়েছিল, আর ধ্বনি উঠেছিল 'বলহরি'।

গোপালকে বুকে চেপে ধরে কাঠ হয়ে দূরে বসেছিল নিবারণ। দুলালীর হাঁ-মুখে নিস্পন্দ দু'ঠোঁটে তার শেষ কোন্ অভিযোগ, কোন্ অভিসম্পাত স্থির হয়েছিল? কোন্ কথাটা সে শেষ করতে পারেনি? শরীরটা নিবারণের হাওয়াব ঝাপটায় শিউরে শিউরে উঠছিল।

আর শুধু সেদিনকার কথাগুলোই মনে পড়েছিল নিবারণের তখন। শেষ রাত থেকেই পায়খানা যেতে শুরু করেছিল দুলালী। সেদিন ছিল হাটবার। সকালে ধুঁকতে ধুঁকতে তাকে চা করে দিয়েছিল সে। দুপুরে খেতে গিয়ে নিবারণ দেখেছিল রোজকার মতই তার খাবার পরিপাটি করে ঢেকে রেখেছে দুলালী। শুধু রোজ যেমন কাছে এসে বসে থাকে তেমনি ছিল না, ঘরে চৌকিতে নির্জীব হয়ে পড়েছিল। খাবার পরে ঘরে ঢুকলে শালিকছানার মত চিঁ চিঁ করে দুলালী বলেছিল—'একবার হাসপাতালের থিক্যা এট্টু-আধটু আইনা দেও না।' 'অষুধ?'—নিবারণ ব্যঙ্গ করে হেসেছিল— 'অষুধে তর রোগ সারব? অষুধ তো তুই কম খাস নাই।' বিমর্ষ এবং ক্ষীণ গলায় দুলালী বলেছিল— 'বুকটা বড় ধড়ফড় করতাচে।' 'ভয় নাই তর'— ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে নিবারণ বলেছিল— 'অত সহজে তর মরণ নাই।' পেছন থেকে প্রায়অশ্রুত কণ্ঠে টেনে টেনে যেন কী বলেছিল দুলালী—বোধ হয় 'কথায় কথায় অত মরণ মরণ কইরো না— ভাল হইব না—'

কী ভাল হবে না, কী খারাপ হবে— এসব শোনার জন্য দাঁড়ায়নি নিবারণ, কে জানে তখন আরো কী বলেছিল দুলালী, কে জানে শেষ নিশ্বাসটা ফেলার সময় কী ভেবেছিল সে? সেই মুহূর্তে কোন্ কথাটা উচ্চারণ করতে গিয়ে তার দু'ঠোঁটের ফাঁক নিঃসাড় হয়ে গিয়েছিল?

দোকানে কেনাবেচার ধান্দায় ডাক্তার ওষুধ এসবের কথা ভুলেই গিয়েছিল সে। সন্ধ্যার দিকে ভিড় যত কমে আসছিল, গমগমে হাট যত নিঝুম হয়ে উঠছিল, ততই তার মনে মণ্ডলবাড়ির রাস্তাটা ভেসে ভেসে উঠেছিল। ভেতরে ভেতরে সে ছটফট করছিল কখন ঝাঁপ বন্ধ করবে, সব সেরেসুবে দরজায় তালা দেবে, তারপর অন্ধকার পথে মণ্ডলবাড়ির দিকে ছুটবে। জলে-ভরাট নদীর মত টৈটম্বুর শরীরে আঁটোসাঁটো শাড়ি জড়িয়ে, টান টান চোখে চড়ুইয়ের ছটফটানি নিয়ে, মাথাভরা চুল খোঁপা বেঁধে তখন গৌরী অপেক্ষা করত হাসিমুখে। দেরি হলে অভিমান করত। তার মনটা পড়ে থাকত ওদিকেই। দুলালীর অসুখের কথা দিনমান তার একবারও মনে আসেনি। ব্যস্ত হাতে ঝাঁপও বন্ধ করেছিল নিবারণ, কিন্তু দরজায় তালা দেবার ঠিক আগেই হঠাৎ গোপালের চিৎকার আর খগেনের বউয়ের মড়াকান্নায় ধড়াস করে উঠেছিল তার বুকটা। ছুটে গিয়েছিল সে বাড়ি। পায়খানার কাঠের সিঁড়িতে মুখ থুবড়ে পড়েছিল দুলালী। আর ঠিক তক্ষুনি ওষুধ ডাক্তার— এ সবের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল নিবারণের।

ডাক্তার এসেছিল শেষ পর্যন্ত, তার হাতে ওষুধ আর ইনজেকশনের ব্যাগটাও ছিল কিন্তু সে সবের আর কোন প্রয়োজন ছিল না তখন। - সব শেষ হয়ে গেছে তার আগেই। চোখে একফোঁটা জল ছিল না নিবারণের, তার বিশুষ্ক দৃষ্টি কেমন অনির্দিষ্ট উদ্‌ভ্রান্তভাবে স্থির হয়ে গিয়েছিল, বুকের ভেতর থেকে দীর্ঘ একটা নিশ্বাস বেরিয়ে আসতেও যেন ভয় পাচ্ছিল, পাথরের মত ওজন হয়ে উঠেছিল বুকটার। আর ঠিক সেই মুহূর্তে কলজেটা দু'ফাঁক করে দিয়ে ধারালো ছুরির মত একটা ভাবনায় রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছিল নিবারণ--- তবে কি তার জন্যই দুলালী শেষ হয়ে গেল?

বোঁ করে উড়ে গিয়ে একটা গুবরে বোকা কোথায় যেন ঝপ্ করে উল্টে পড়ে, লণ্ঠনের চিমনির চারিদিকে ফর্‌ফর্ করে মেঠো পোকা উড়তে থাকে। অন্ধকার মাঠের থেকে দমচাপা মানুষের গোঙানির মত অসংখ্য মিলিটারি ট্রাকের একটানা গোঁ গোঁ শব্দ ডিগবাজি খেতে খেতে আসছে। গভীর ঘূর্ণিস্রোতের ভেতর থেকে সহসা যেন ভেসে ওঠে নিবারণ, তার দু'হাতের শূন্য তালু ঘামে জব জব করছে, সারা মুখে বিন্দু বিন্দু স্বেদ ফুটে উঠছে। লণ্ঠনের আলোটা কমজোরি হয়ে আসছে। পাশে দেওয়ালের গায়ে নিজের ঢাউস ছায়াটার ওপর চোখ পড়তেই আঁতকে ওঠে নিবারণ। নিজের ছায়াটার ওপরে বিরক্তি ধরে যায়— নিজের শরীরটার ওপরেই রাগ হয় তার। এই মুহূর্তে চড়া গলায় বুক ফাটিয়ে নিজের ছায়াটাকে খিস্তিখেউড় করতে ইচ্ছা করে। কিন্তু কার্যত অসহায় ভঙ্গিতে নিজের চুলের ভেতর দিয়ে আঙুলগুলো চালিয়ে দিতে দিতে অকারণে চুলগুলো খামচে ধরে সে। ভারী মাথাটা যেন তার ধড়ের মধ্যে ঢুকে যেতে থাকে।

কিছুতেই উঠতে ইচ্ছা করে না, যেন দীর্ঘকাল ধরে নিবারণ এইখানে বসে আছে এবং এমনি বসে বসে তার সমস্ত পরমায়ু নিঃশেষ করে দিতে পারলে যেন সে বেঁচে যায়। তবু বাড়ি তাকে ফিরতেই হবে। গৌরী হয়তো ছটফট করছে— আশা নিয়ে উদ্বেগ নিয়ে অপেক্ষা করছে। হয়তো তাকে একলা ফিরতে দেখে কান্নাকাটি জুড়ে দেবে, তাকে গালমন্দও করতে থাকবে। তবু গৌরী ছাড়া তার আর কে আছে? রোদে তাতল অকূল মাঠের মধ্যে গৌরী একমাত্র গাছের মত এখনো তার কাছে, তার কাছে ছাড়া আর কার কাছে সুখ-দুঃখ বর্তমান-ভবিষ্যতের কথা সে বলবে? তবু সব কথা কি বলা যায়? এমন অনেক কথা আছে বুকের মধ্যে যা কোনদিন মুখ ফুটে কারোর কাছে বলা যাবে না, বলা যায় না, সে সব কথা শুধু ভেতরে ভেতরে তীক্ষ্ণ নখে আঁচড় কেটে খামচে দিনরাত তার বুকটা রক্তাক্ত করে দেবে। অসহ্য জ্বালায়পোড়ায় তাকে খাক্ করে দেবে।

ক্লান্ত শীর্ণ হাতে ভর দিয়ে উঠে পড়ে নিবারণ। লণ্ঠনটা নামিয়ে নিয়ে দরজাটা খুলতেই সামনে মাটির ওপর লাফিয়ে পড়ে আলো—ভয়েডরে অন্ধকার নড়েচড়ে ওঠে, চিকচিক শব্দে ত্রস্ত ছুঁচো ছুটে বেড়ায়। তালা-চাবি হাতে নিয়ে স্থির চোখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে দেখে সারা হাটখোলা কদমগাছের ওপাশের চালাটায় একদিন রাত্রে গৌরীর সঙ্গে রাগ করে এসে শুয়েছিল গোপাল। শেষে ভোর রাত্রে নিজেই আবার ফিরে গিয়েছিল। আর কি ভয়ডর আছে ছেলেটার? দরজায় তালা লাগাতে গিয়ে আনচান মনটা হঠাৎ মরা পাতার খসখস শব্দে উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। কেউ কোথাও নেই। শুধু অনেককাল আগের গোপালের ছেলেবেলার কথাটা মনের মধ্যে ছুটে আসে নিবারণের।

হাটবারের দিন বাড়ি ফিরতে তার রাত হত। বিক্রিবাটা শেষ করে ক্যাশ মেলানো—টাকা রেজগি খুচরো পয়সা সব আলাদা আলাদা গোনা, সাজানো— রাত বাড়ত খেয়াল থাকত না। হঠাৎ তার চমক ভাঙত দরজার বাইরে গোপালের আওয়াজে—'ঐ বাবা আয়, ঐ বাবা আয়'— হাতে ছোট্ট একটা বাতা-- লাঠির মত ধরে যেন তাকে শাসন করত গোপাল। আর ওই একটা মুখস্থ করা কথাই বার বার উচ্চারণ করত। তক্তপোশ থেকে লাফিয়ে নেমে দুহাতে ছেলেকে তুলে নিত, আদর করে তার গালে চুমু খেত নিবারণ— 'বাপুই কী চাই তোমার?' ছেলে আদেশের মত করে বলত—'লজেন।' হাসতে হাসতে নিবারণ তার হাতে লজেন্স তুলে দিত, আর চুকচুক করে লজেন্স চুষত গোপাল। অদূরে কদমগাছটার তলায় লণ্ঠন হাতে দাঁড়িয়ে থাকত দুলালী—বলত,'আর আদরে কাম নাই, বাড়ি ফিরলেই হয় অখন।' নিবারণ দরজায় তালা লাগিয়ে গোপালকে কাঁধে বসিয়ে ভরাট মনে বাড়ি ফিরত।

গোপাল আর কোনদিন লজেন্স চাইবে না, কোনদিন আর তার কোলে কাঁধে

উঠবে না, বাবা বলে আর ডাকবে কি কোনদিন? না ডাকুক তাকে, না বলুক তার সঙ্গে কোন কথা, তবু গোপাল থাক কাছাকাছি— বেঁচেবর্তে থাক তার চোখের সামনে, গোপাল যেন কোথাও পালিয়ে না যায়, কোন অঘটন যেন না ঘটে গোপালের। আর তখুনি নিবারণের মনে হল, গোপাল যদি এখন এই মুহূর্তে ফিরে আসে আর যদি সে তার ছোটবেলার সেই হাতে ধরা বাতা কুড়িয়ে নেয়, কুড়িয়ে নিয়ে সে যেমন গোপালকে মারে, যদি গোপাল তাকে পিটতে থাকে তবে নিবারণ স্বেচ্ছায় উবু হয়ে হাঁটু মুড়ে বসে সারা শরীরে সে মার আজ মাথা পেতে নেবে। গোপালের মতই টুঁ শব্দটি করবে না সে। এরকম একটা দৃশ্য আজ মনে ভাবতে ভাবতে চোখের ভেতরটা কিচ কিচ করে ওঠে নিবারণের ।

তালা লাগিয়ে লণ্ঠন হাতে দীর্ঘ নির্বাসনের পর জেল ফেরত একটা কয়েদীর মত— সর্বস্বান্ত একটা লোকের মত হাঁটতে থাকে নিবারণ। পায়ে পায়ে পরিত্যক্ত কাগজ আর মরা পাতার খসখস শব্দ হতে থাকে। মাঠের থেকে অন্ধকার বাতাসে দম চাপা মানুষের গোঁ গোঁ শব্দ ভেসে আসে। লণ্ঠনের স্তিমিত আলো পড়ে কদমগাছের কাণ্ডে, পুরানো ছাল-বাকলে আলো অন্ধকার কিলবিল করে ওঠে। পরিত্রাহি চিৎকারে প্রহর জানিয়ে একটা প্যাঁচা ডেকে ওঠে। কদমগাছে কা কা শব্দে কাক ডানা ঝাপটায়। মনটায় ধুকপুক করে নিবারণের। পা চালিয়ে দেয় সে, কদমগাছটার ওপাশে যে চালাটায় একদিন সন্ধ্যায় শুয়েছিল গোপাল সেদিকে মোড় ফিরে যেতে যেতে হঠাৎ থমকে যায় নিবারণ। কদম গাছের উঁচু শিখরে আঁধার জমাট বেঁধে আছে। দু-চোখ হঠাৎ জ্বলে ওঠে তার। লণ্ঠনের আলোটা চড়িয়ে দিয়ে দু-পা এগিয়ে লণ্ঠনটা বাড়িয়ে ধরতেই যেন তার দম বন্ধ হয়ে যায় সহসা।

আঁকাবাঁকা শিকড়ের ওপরে মাথাটা কাত করে শরীরটা মুচড়ে দুমড়ে জড়সড় হয়ে ঘুমিয়ে আছে গোপাল। মশা উড়ছে অসংখ্য—শীর্ণ শীরবটা যেন বলহীন —অভুক্ত অশক্ত গোপালের দিকে কয়েক মুহূর্ত পলকহীন তাকিয়ে থাকে নিবারণ। ঘুমিয়ে পড়লে মানুষকে কেমন অসহায় লাগে। গোপালকে দেখেও দু-চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না নিবারণ। তার হাত পা মৃদু কাঁপতে থাকে। সত্যি গোপাল— তার রাগী ছেলেটা— কম্পিত হাতে লণ্ঠনটা অবশেষে নামিয়ে রেখে উপুড় হয়ে দু-হাত বাড়িয়ে ঘুমন্ত গোপালের শরীরটাকে টেনে তোলে নিবারণ। গোপাল হয়তো জেগে যায় কিন্তু ক্ষুৎপিপাসায় ক্লান্ত তার শরীর, সে কোন বাধাই দেয় না— নিস্তেজভাবে নিবারণের কাঁধে মাথা হেলিয়ে পড়ে থাকে। শুধু তার উষ্ণ চাপা নিশ্বাস নিবারণের পিঠে এসে পড়তে থাকে।

আর তখন যেন...অনেকদিনের একটা দৃঢ় বাঁধ হঠাৎ বুকের ভেতরে ভেঙে চুরে তছনছ হয়ে যায় নিবারণের— বহুদিন ধরে ধীরে ধীরে জমে থাকা জল হু হু

করে এসে তার দু-চোখ প্লাবিত করে দেয়। যে নিবারণ কোনদিন কাঁদেনি— এমনকি শ্মশানে কজনের রক্তমাংসের শরীরটা চোখের সামনে পুড়ে ছাই হয়ে গেলেও যার চোখে জল আসেনি, সেই নিবারণ বেভুল বেহুঁশ হয়ে কাঁদতে থাকে। গোপালের গালে গলায় কাঁধে মুখ গুঁজে বিলাপ করতে করতে কাঁদে নিবারণ—'গোপাল আমার গোপাল।' গোপালের হাত মুঠো করে ধরে নিজের কপালে মুখে স্পর্শ করতে থাকে আর নির্জন হাটখোলা গাঢ় অন্ধকারে নিজেকেই শুধু সাক্ষী রেখে নিবারণ গভীর শোকে ডুবে যেতে থাকে।

এ সময়ে— হয়তো নিবারণের কান্নার আওয়াজেই— লণ্ঠন হাতে ত্রস্ত পায়ে গৌরী বেড়ার গায়ে টিনের গেটটা খুলে সেখানে একমুহূর্ত দাঁড়ায়। তারপর উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় দ্রুত পায়ে নিবারণের দিকে এগিয়ে আসে। আত্মবিস্মৃত নিবারণ হয়তো সেসব কিছুই লক্ষ্য করে না, তার কান্না থামে না। গোপালের মুখের কাছে নিজের বিপর্যস্ত মুখটা নিয়ে অপরাধীর মত সে বলতে থাকে 'তর মায়েরে বড় কষ্ট দিচি— তর মায়ের আমিই মারচি রে গোপাল।' গৌরী থমকে যায়। বিলাপের কথাগুলো তার কাছে স্পষ্ট হয়। এই প্রথম সে নিবারণকে কাঁদতে দেখল, এই প্রথম তার মুখে বিলাপ শুনল। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে শিথিল হাতে অনুসন্ধিৎসু আলো তুলে সে একবার নিবারণের সারা শরীর, তার অশ্রুপ্লাবিত শোকার্ত মুখটা দেখল। তারপর নিবারণ সচকিত হতেই যেমন দ্রুত সে এসেছিল তেমনি দ্রুত পায়ে সে চলে গেল।

বিস্মিত নিবারণ অবাক হয়ে গৌরীর চলে যাওয়া দেখল। এরকম সে ভাবতে পারেনি, সে ভেবেছিল গৌরী সাধারণত যেমন করে থাকে তেমনি করবে। নিবারণের কোল থেকে গোপালকে তুলে নেবে তারপর ঘরে নিয়ে তার চোখে জল দিয়ে কিংবা না দিয়েই নিজের কোলে বসিয়ে ঘুমন্ত গোপালকে নিজে হাতে খাইয়ে দেবে গৌরী। তখন তার সারা মুখ করুণ কোমল অথচ প্রশান্ত দেখাবে। কিন্তু গৌরীর চলে যাওয়া দেখে বিপন্ন বোধ করল নিবারণ। তার কান্না থেমে গেছে। নীরবে ডান হাতে লণ্ঠন তুলে নিয়ে শঙ্কিত পায়ে বাড়ির দিকে এগোল নিবারণ।

ধীর পায়ে উঠোন পেরিয়ে বারান্দায় উঠে দু-পা এগিয়ে থমকে গেল নিবারণ। মেঝের ওপরে দুটো পিঁড়ি পাশাপাশি পাতা—জলের ঘটির মুখ গ্লাস দিয়ে ঢাকা— যেমন থাকে। রাতে সাধারণত শোবার ঘরেই খাওয়াদাওয়া হয়। গৌরী নিবারণ আর গোপালের জন্য সব গুছিয়ে পরিপাটি করে রেখেছে। কিন্তু গৌরীকে দেখে অবাক হয়ে গেল নিবারণ। ঘরের মাঝখানে লণ্ঠন— গৌরী দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে— তার সারা পিঠে খোলা গাঢ় কালো চুল ছড়িয়ে আছে— দেয়ালের গায়ে তার বিশাল ছায়া পড়েছে। হয়তো ওখানেই— গোপালের টিলে তার আর নিবারণের বাঁধানো কাচ ভাঙা তোবড়ানো ছবিটা টাল খেয়ে ঝুলছে।

নিজের ছায়ার দিকে মুখ করে নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে গৌরী। তার এমন রূঢ় রুক্ষ ভঙ্গি কখনো দেখেনি নিবারণ।

নিবারণের কাঁধে ক্লান্ত মাথা রেখে নিস্তেজ হয়ে গোপাল পড়ে আছে। তাকে নিয়ে ঘরের ভেতরে পা দিতে গিয়ে অপলক চোখে গৌরীর কঠিন শরীরটা দেখে হঠাৎ নিবারণের মনে হল— গৌরী কি তার বিলাপ শুনতে পেয়েছে— সে কি বুঝতে পেরেছে নিবারণের আজকের কান্না দুলালীর জন্য ? কিছুতেই পা তুলে চৌকাঠ পার হতে পারল না নিবাবণ। এপারেই ছেলেকে বুকে নিয়ে নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে।

তখন রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙেচুবে খান্ খান্ করে দিয়ে...অসংখ্য সাঁজোয়া গাড়ি ক্রুদ্ধ ঘর্ঘর শব্দ তুলে বিপজ্জনক সীমান্তের দিকে এগিয়ে যেতে থাকল। আর ক্ষিপ্ত বাতাসে সেই দুরন্ত শব্দ বিশাল মাঠ পেরিয়ে ক্রমাগত এগিয়ে আসতে লাগল।

কিছু পাওয়ার দিন

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

নগেনের ফিরতে দেরি হচ্ছিল। আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসার কথা। দেখতে দেখতে দু' আড়াই ঘণ্টা কেটে গেল।

সকালের রোদের তাপ বেড়েছে। উনুনেও গনগনে আঁচ। তবু অচলা আরও কয়েকটা কাঠের টুকরো গুঁজে দিল উনুনের গর্তে। ভাত ফুটছে। বাষ্প জমেছে এনামেলের ডেকচিতে। বুক-চাপা কষ্টে ডেকচিব ঢাকনাটা ছিটকে পড়ে যেতে চাইছে হেঁশেলঘরের মাটির মেঝেতে। কাঁচা কাঠের ধোঁয়া, ফুটন্ত ভাতের ধোঁয়া গলা টিপে ধরতে চাইছে অচলার। ভাত কেন যে তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয় না। আর নগেনকেই বা সে কী বলবে। হাট থেকে বেছে বেছে এমন চাল এনেছে, হাড় সেদ্ধ হয়ে যাবে, তবু চাল সেদ্ধ হবে না। সস্তায় আকাড়া চাল কিনে কিছু পয়সা বাঁচানো যায়, কিন্তু সে-চাল সেদ্ধ হতে দেরি হলে জ্বালানি খরচও তো বাড়ে। সংসারের সাদামাটা হিসেবটাও বোঝে না নগেন।

হেশেলঘর থেকে বেরিয়ে এল অচলা। ঝাঁই ঝাঁই করে উঠল, "হরি, ও হরি। দেখেছিস তোর বাবার কাণ্ড !"

বেলা যতই বাড়ুক হরির এখনও ঘুম থেকে ওঠার সময় হয়নি। ওর ঘরটা হেঁশেলঘরের ঠিক সামনে। মাঝখানে অনেকটা উঠোন। কিছুদিন আগে বৃষ্টি হয়েছে। উঠোনের কাদা এখনও শুকোয়নি। এখান ওখান থেকে কয়েকটা ইট এনে উঠোনের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাও, যত ইট দরকার ছিল পাওয়া যায়নি। হরির ঘরের সামনেই কাদা জমে আছে। হাঁটা-চলা করতে করতে সে কাদা অবশ্য কিছুটা শুকিয়ে এসেছে, তবু তো কাদা। হরির ঘরেই অচলা দু'বেলা ভাত পৌঁছে দেয়। বাড়িতে যেটুকু সময় থাকে, দরকার না হলে নিজেব ঘর থেকে বিশেষ বেরোয় না হরি।

অচলা আবার হাঁক পাড়ল। অচলার গলা এমনই যে, মড়ার কানেও তা পৌঁছে যায়। ঘুমন্ত হরির কানেও যে পৌঁছয়নি, তা নয়। সে আবার পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল। জানলা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে বিছানায়। পাশ ফিরে শোওয়ার আগে হরি খ্যানখেনে গলায় মান্তিকে বলল, "জানলা খুলেছ কেন ? বন্ধ করে দাও।"

"তুমি বন্ধ করে নাও না।"

মান্তি বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল। কিন্তু হরি ওকে সাঁড়াশির মতো হাত দিয়ে এমনভাবে জড়িয়ে আছে যে চেষ্টা করেও সে উঠতে পারল না।

"তোমার না হয় লজ্জার বালাই নেই। কিন্তু লোকে কী বলবে আমাকে! কত বেলা হয়েছে, জানো!" মান্তি সাঁড়াশির হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। ভোর হতে না হতেই ওর ঘুম ভেঙে যায়। বিছানায় শুয়েই টের পায় কুয়ো থেকে জল তুলে অচলা বাসন মাজছেন। খুব খারাপ লাগে মান্তির। শাশুড়ি ভোরবেলা উঠে বাসন মাজবে, কাঠকুটো জ্বেলে চা করবে, হরিকে ডেকে ডেকে ঘুম থেকে তুলে সেই চা পৌঁছে দেবে, অথচ বাড়ির বউ হয়েও সে শাশুড়ির কোনও কাজে লাগবে না। এটা ভাবা যায় না। মান্তি এর আগেও বহুদিন চেষ্টা করেছে চুপি চুপি বিছানা ছেড়ে উঠে আসার। কিন্তু পারেনি। প্রতিবারই হরি ওকে আটকে রেখেছে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও হরি কি সব টের পায় ? মান্তি ভাবে। না হলে নিঃশব্দে বিছানা ছেড়ে উঠে আসার মুহূর্তে সে কেন এভাবে ওকে জড়িয়ে ধরে। কিংবা এক ঝটকায় আবার পাশে শুইয়ে দেয়!

"শোনো, মা ডাকছেন।"

"কবে আর ডাকেন না ? বলে দাও আমি আর চা খাব না।"

"আচ্ছা, আমি বরং চা-টা নিয়ে আসি।"মান্তি ওর মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল। আসলে, ওর হাত থেকে ছাড়া পাওয়ার একটা সুযোগ তৈরি করে নিতে চাইল।

"বললাম তো, চা খাব না। চা তো নয়, যেন পাঁচন। সেই সকালে কয়েক ঢোক গেলার পর থেকেই মুখটা তেতো হয়ে আছে।"

হরির মুখ সব সময়ই তেতো। মেজাজ সবসময়ই ওর খিঁচড়ে থাকে। নগেন, অচলা, মান্তি কেউই ওকে ঘাঁটায় না। বলা যায় না, কিছু যদি করে বসে।

মতিগঞ্জের একটা গ্যারেজে মেকানিকের কাজ করে হরি। বাড়ির লোক অন্তত এটাই জানে মতিগঞ্জের 'বাঁশরী' সিনেমাহলের লোকেরা অবশ্য জানে, হেনাজুড়ি থেকে একটা ছোকরা এসে বাপির চায়ের দোকানে আড্ডা মারে। চায়ের দোকানটা সিনেমাহলের সামনে। আর ওই ছোকরা আসে দুপুরবেলা। ম্যাটিনি-শো শুরু হওয়ার ঠিক আগে। সাড়ে দশটা নাগাদ রাতের শো ভাঙার পর বাড়ি ফেরে। রোদ, জল, ঝড়— কোনওদিনই এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না।

হরির আসলে কোনও কাজই করতে ভালো লাগে না। নগেনই মতিগঞ্জের

বীরেনবাবুকে বলেকয়ে একটা গ্যারেজে ওর চাকরি করে দিয়েছিল। বীবেনবাবু তখন বলেছিলেন, "তোমার ছেলে কি গায়ে-গতরে খাটতে পারবে? দেখে তো মনে হয় না।"

ময়লা জামা আর ঢোলা ফুলপ্যান্ট পরে হবি সেদিন মাথা নিচু করে দাঁড়িযেছিল। বাবার সঙ্গে তখন বীরেনবাবু কথা বলছিলেন, তার ফাঁকে ফাঁকে চোখ তুলে সে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল। বীরেনবাবুব জমিজমা অনেক। তবে গাঁয়েব বাড়ি ছেড়ে এসে মতিগঞ্জেই বাড়ি তৈরি করেছেন। ব্যবসাপত্র আছে। মিউনিসিপ্যালিটির ভোটে দাঁড়িয়ে জিতেওছেন বছর কয়েক আগে। শহরে ওঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি কিছু কম নেই। তিনিই একটা গ্যাবেজে বেকার হরির চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। সেই থেকে রোজ দুপুরবেলা খেয়েদেয়ে বাড়ি থেকে রওনা হয় হরি। বড়িব লোকেবা সেই থেকে জানে, হ্রি গ্যাবেজে কাজ করছে!

যেমন চাকবিই হোক, তার তো কিছু মাইনেপত্র আছে। না হলে আর চাকবি কি! কিন্তু নগেন বা অচলা দু'জনেই হবির কাছে হাত পাততে ভয় পায়। গ্রামের মুদিব দোকানে কাজ কবে মাসের শেষে নগেন যা পায়, তা বাড়ি আনতে না আনতেই ফুরিয়ে যায়। ধার দেনা লেগেই আছে। কিন্তু হবির সে সব দিকে নজর নেই। দু'বেলা থালায় সাজানো ভাত পাওয়াটাই ওর অধিকার বলে সে মনে কবে। সে ভাত কোথা থেকে আসছে, কীভাবে আসছে তা জানার প্রয়োজন নেই ওর।

নগেন ও অচলা যা পারেনি, তা অবশ্য পেরেছে মাস্তি। মুখ ফুটে কথাটা হরিকে বলেছে।

"মা চকোত্তিদের বাড়ি থেকে চাল ধার করে এনেছেন। এক আঁচল চাল। ফুরলো বলে।"

"আমি কী করব।"

তুমি যে চাকরি করো, মাইনে পাও না?

"মাইনেয় কী হয়?

"চাল, ডাল আনাজপত্র তুমিও তো এক আধবার কিনে আনতে পাবো।"

"পারি না।"

"তোমার কর্তব্য বলেও কি কিছু নেই!"

"সাতসকালে বেশ জ্বালালে দেখছি। কে গা তুমি আমাকে আমার কর্তব্যেব কথা মনে পড়াতে এসেছ!" বিছানায় এক ঝটকায় উঠে বসেছিল হরি। বিয়ের রাতের শুভদৃষ্টির পর সেই প্রথম ওর চোখের দিকে তাকিয়েছিল মান্তি। মনে হয়েছিল, মাঠের ধুলোমাখা একটা গোসাপের চোখ যেমন হয়, হরির চোখদুটো যেন ঠিক সেইরকম। তার ওপর আবার চোখদুটো লাল টকটকে। এমনও চোখ হয় মানুষের। মান্তি ভয় পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। সেদিন আর ওকে বিছানায় আটকে রাখেনি হরি। ঘব থেকে বেরোনোর আগে মান্তিকে ধমক দিয়ে বলে উঠেছিল,

"খবরদার বলছি। আর যদি এসব কথা আমাকে বলো মুখ ভেঙে দেব।"

সেদিনও উঠোনে ছিল কাদা। সেই কাদার মধ্যে দুড়দাড় করে নেমে গিয়ে মান্তি হেঁশেলঘরে উঠেছিল। চোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়ছে মান্তির। অচলা দেখেও দেখেনি। হরির কোনও কিছুরই সে বিরোধিতা করে না। মান্তি চোখের জল মুছে হেঁশেলঘরের দাওয়ায় গিয়ে বসেছিল।

হরির বিয়ে অচলারই দেওয়া। নগেনের মত ছিল বলে মনে হয় না। কিন্তু এই সংসারে নগেনের কোনও ভূমিকা নেই। রোজগার করে যে সংসার চালাতে পারে না, যার বউকে মাঝেমধ্যেই অন্যের বাড়ি গিয়ে চেয়ে-চিন্তে চাল নিয়ে আসতে হয়, না হলে বাড়ির লোকদের মুখে অন্ন জোটে না, তার সত্যিই কোনও ভূমিকা থাকতে পারে না। পৃথিবীটা এই নিয়মেই চলে।

"শোনো, হরির বিয়ে দেব ভাবছি।"রাত্রে শোওয়ার আগে লণ্ঠনের পলতে কমাতে কমাতে বলেছিল অচলা।

"সংসারে তো তিনটে মানুষ। তাদের মুখেই অন্ন যোগাতে পারছি না। আর একজনকে নিয়ে আসবে ?"

প্রশ্নের মধ্যে দিয়েই নগেনের আপত্তি ফুটে উঠেছিল। সে কখনও জোর গলায় কিছু বলে না। বলতে শেখেনি।

"তোমার সবেতেই আপত্তি।" মুখ ঝামরে উঠেছিল অচলা।

"আমার আপত্তির ওপর কি কিছু নির্ভর করছে ? তা ছাড়া, আপত্তিই বা জানালাম কোথায় !" অজানা ঠাকুরের উদ্দেশে রাত্রে প্রণাম জানিয়ে শোয় নগেন। বিছানায় গা ঢেলে দিয়ে দু'হাত জোড় করে সে প্রণাম শুরু করল। অন্ধকারে অচলা তা টের পায়নি।

"স্পষ্ট করে বলছ না কেন, তুমি রাজি। মেয়ে দেখবে ?" নগেনের কাছ থেকে কোনও সাড়াশব্দ আসছে না দেখে অচলা এবার অস্থির হয়ে উঠল।

"ঠিক আছে, তুমি যখন চুপ করেই থাকতে চাও, আমিই না হয় মেয়ে দেখব।"

"সেটা কি ভালো দেখাবে ? তুমি একা মেয়ে দেখতে যাবে ?" নগেন বলল।

"লোকের বাড়ি চাল ধার করতে তো আমিই যাই। তুমি জানতে চাও, না আমার সঙ্গে যাও ?"

"চাল আনা আর মেয়ে দেখতে যাওয়া তো এক কথা নয়।"

"তোমাকে যেতে হবে না। আমি একাই পারব। তুমি ওই মুদির দোকানে গিয়ে বাটখারা দিয়ে চাল-ডাল ওজন করো, তা হলেই চলবে।"

"ভাবছি কাজটা ছেড়ে দেব।"

"ছেড়ে দেবে ? কী আমার লেখা-পড়া জানা লোক রে। বলি, চাকরিটা তোমাকে দিচ্ছে কে ?"

"চেষ্টা করব, নতুন করে বাঁচব।"

“আর বয়স পেলে না, নতুন করে বাঁচার! যার বরং ভালো করে বাঁচা দরকার তার জন্যেই কিছু করো।”

“হরির জন্যে তো ?”

“তা ছাড়া আর কে আছে আমাদের। ওর বিয়ে-থা দাও, সংসারে মন বসবে।”

“বউকে খাওয়াবে কী ? গ্যারেজে চাকরিটা করে দুটো পয়সাও তো সংসারে ছোঁয়ায়নি।”

“বিয়ে-থা দাও, দেখবে কেমন বদলে গেছে। নতুন বউ এলে, সংসারে শ্রী-শান্তি আসবে।” নতুন বউ হয়ে এল মান্তি। ঠাকুরনগরের মেয়ে। মান্তির দাদা বীরু সম্বন্ধটা এনেছিল। মান্তিরা পাঁচ ভাই-বোন। ওর বয়স যখন পাঁচ, সেইসময় ওর বাবা মারা যান। বীরুই ওকে মানুষ করেছে। দু'বেলা সংসারের হাঁড়ি ঠেলে গোয়ালের গাই-গরুদের খাইয়ে এবং তারই ফাঁকে বছরে একবার নিয়ম করে চাঁপা-চন্দন ব্রতে গাঁয়ের বুড়োশিবের মাথায় জল দিয়ে হয়তো মান্তি নিজেই বড় হয়ে উঠত। ফ্রক ছেড়ে শাড়িও একটা জুটত ওর গায়ে। তবু দাদা ওর জন্য যা করেছে, তা সে কখনও ভুলবে না। মান্তিকে সে ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়িয়েছে। তারপর যে সে আর পড়াশোনা করেনি, তার জন্য বীরুকে দোষ দেওয়া যায় না। বীরু ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করে ঠাকুরনগর থেকে দমদম। একটা কড়াইয়ের কারখানায় প্রথমে লোহা গালাত। গলন্ত লোহা পাত্র থেকে নিয়ে ছাঁচে ঢালত। একদিন সেই লোহা ছাঁচে ঢালতে গিয়ে নিজের পায়েই কিছুটা উছলে পড়ল। তিন মাস শুয়ে থাকতে হয়েছিল। কারখানার মালিক হাবলুবাবু সেই তিন মাস ওর বাড়িতে মাইনে পৌঁছে দিয়েছিলেন। তবে তিন মাস পর বীরু সুস্থ হলেও তার ডান পায়ের তিনটে আঙুল কুষ্ঠ রোগীর মতো গলে গিয়েছিল।

বিছানায় শুয়ে থাকার সেই সময়টায় বীরু সেই প্রথম মান্তিকে খুঁটিয়ে দেখেছিল। ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করতে গিয়ে এই সুযোগটা সে পায়নি। বিছানায় শুয়ে বীরু বিড় বিড় করে বলেছিল, “গলন্ত গরম লোহার পায়েস পায়ে পাড়েছিল বলেই না মান্তি যে বড় হয়েছে বুঝতে পারলাম। ছোট বোন সবচেয়ে আদরের হয়। কিন্তু ও তো কিছুই পায়নি আমার কাছে। নিজে থেকে মান্তি কত কিছু শিখেছে! পুরনো শাড়ি ছিঁড়ে রোজ কী সুন্দর ব্যান্ডেজ করে দিয়ে যায়।

“মান্তি শোন।” বীরু একদিন ডাকল ওকে। মান্তি তখন ঘরের কোণ থেকে নড়বড়ে টুলটা এনে দাদার বিছানার কাছে রাখছিল। টুলটা রেখে খাবার নিয়ে আসবে। বীরু দেখল মান্তির শাড়ি ফালা ফালা হয়ে ছিঁড়ে গেছে। কয়েক জায়গায় বেপরোয়া সেলাই দিলেও, যে কোনও মুহূর্তেই আরও ছিঁড়ে যাবে। হঠাৎ কী মনে করে পায়ের ব্যাণ্ডেজের দিকে তাকাল বীরু। যা বোঝার, বুঝতে সময় লাগল না।

“বাড়িতে পুরনো শাড়িও নেই তাই না রে ?” বীরু জিজ্ঞেস করল।

মান্তি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

"তা বলে নিজের পরনের শাড়ি ছিঁড়ে ব্যাণ্ডেজ করে দিবি?" লোহার কারখানায় কাজ করতে করতে যে বীরু লোহার মতো শক্ত হয়ে গেছে সেও আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারল না।

" এই সংসারে তোকে কষ্ট ছাড়া আমরা আর কিছুই দিতে পারলাম না।"

বাবা মারা যাওয়ার পর বছরও ঘোরেনি, ওদের মা'ও চোখ বুজলেন। সামান্য জ্বরজ্বালা, সেটাই যে তাঁকে চিরদিনের মতো দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবে ওরা ভাবেনি। আট ভাইবোনের মধ্যে কেউ কেউ এখানে-ওখানে ছিটকে গেছে, কেউ বিয়ে-থা করে সংসার পেতেছে আলাদা জায়গায়, থেকে গেছে শুধু বীরু আর মান্তি।

"আমি তোকে খুব কষ্ট দিলাম মান্তি। দেখি, যদি তোর বিয়ে-থা দিতে পারি।"

"আমি কী দোষ করলাম যে আমাকে পর করে দেবে?" কান্নায় মান্তির গলা বুজে এসেছিল।

'উপায় কী বল। সারাদিন আমি থাকি না। ফিরতে রাত হয়। তারপর খেয়েদেয়ে মড়ার মতো ঘুম। আবার সকাল হতে না হতেই ট্রেনের তাড়া। তোকে আর কতটুকু সময় দিতে পারছি?'

তারপর একদিন বীরুই মান্তির বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিল নগেনের বাড়ি। হরির সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব। হরি সুপাত্র নয়। তবে বাবা-মায়ের এক ছেলে, গ্যারেজে মেকানিকের চাকরি করে। চাই কি দেখতে দেখতে নিজেও হয়তো একদিন একটা গ্যারেজ খুলে বসবে। বাস, সরকারি জিপ আর বাবুদের গাড়ি সারাতে নিজেই দু'দশটা মেকানিক রাখবে— এরকম একটা ছবি বীরুকে দিয়েছিল কড়াই-কারখানারই এক কর্মী। বলেছিল, "দ্যাখো বাবু, সুপাত্র চাইলেই বা পাবে কোথায়। নিজের অবস্থাটাও তো তোমাকে দেখতে হবে।"

বীরু আর আপত্তি করেনি। ছুটির দিন দেখে সকাল সকাল বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিল। সেদিন বীরুর প্রস্তাব শুনে নগেনের চেয়েও বেশি খুশি হয়েছিল অচলা। দুপুরে নগেনের পাশে বীরুকে আসন পেতে খেতে বসিয়ে বলেছিল, "হরি আমার খুব পয়া ছেলে। ওর বিয়ে দেব—কথাটা ভাবতে না ভাবতেই সম্বন্ধ এসে পড়ল।"

বীরু বলল, "আমার বোন মান্তিকে দেখবেন, খুব ভালো মেয়ে। আপনাকে হেঁশেলে ঢুকতেই দেবে না। সংসারের কাজ করতে পেলে ও আর কিছু চায় না।"

মান্তির সঙ্গেই একদিন বিয়ে হয়ে গেল হরির। তার আগে যা যা করা দরকার, সবই করেছিল নগেন। বীরু যেদিন বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল সেদিন জেলেপাড়ায় গিয়ে ধারে কিছু চারাপোনা এনেছিল। হরির বিয়ের আগেও ধারদেনা করে ছেলের বউয়ের জন্য শাড়ি, রোল্ডগোল্ডের হার, চুড়ি কিনে এনেছিল। এমনকি অচলাকেও চেয়েছিল একদিন মেয়ে দেখাতে নিয়ে যেতে। অচলা যায়নি। তবে, বহু বছর পর সেদিনই প্রথম অচলার মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠতে দেখেছিল নগেন। রোল্ডগোল্ডের হার ও চুড়ির চেয়েও চকচকে হয়ে উঠেছিল অচলার এবড়োখেবড়ো

মুখ।

"তুমি যাচ্ছ। আবার আমাকে নিয়ে যাওয়ার কী দরকার!" অচলা বলেছিল।

"আমি ঠিক পছন্দ করতে পারব তো?"

"তোমার সঙ্গে হরিও তো যাচ্ছে। বিয়েটা তো ওরই। ও যা বলবে, তা'ই হবে।"

হরি যে অসম্মতি জানায়নি, তার প্রমাণ মান্তির সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে। কিন্তু বীরুর কথাটা সত্যি হয়নি। বীরু সেই যে অচলাকে বলেছিল, "আমার বোন মান্তিকে দেখবেন, খুব ভালো মেয়ে, আপানাকে হেঁশেলে ঢুকতেই দেবে না"—এই কথাটা বানচাল করে দিয়েছে হরি। ভোরবেলা উঠেও কোনওভাবেই হরির হাত থেকে ছাড়া পায় না মান্তি। বিছানাতেই ছটফট করতে থাকে। হরি ঘুমোচ্ছে ভেবে যেই উঠতে যাবে, অমনি ওর গলা কিংবা কোমর জড়িয়ে দুটো হাত ওকে অবশ করে দিয়েছে। মান্তি প্রথম প্রথম এটাকে আদর বলে ভুল করত, পরে বুঝতে পেরেছে এটা অত্যাচার। লজ্জায়, দুঃখে সে কুঁকড়ে যেত। দুঃখ হত অচলার জন্য। ওঁকে কেন বাসন মাজতে হবে, রান্না করতে হবে! আমি তো আছি। নতুন বউ হলেও না হয় কথা ছিল। কিন্তু এ বাড়িতে তো আমার অনেকদিন হয়ে গেল। মান্তি শুয়ে শুয়ে এ সব কথা ভাবে, আর বিছানায় তার পাশে নেতিয়ে থাকা লোকটার ওপরে ঘৃণায় কুঁকড়ে যায়।

"শোনো, মা কী বলছেন।" মান্তি সেদিন হরিকে বিছানা থেকে তোলার চেষ্টা করল।

"মা আর নতুন কী বলবেন?"

ওদিকে অচলা সমানে চেঁচিয়ে যাচ্ছে। "ও হরি, শোন বাবা। তোর বাবা এখনও ফেরেনি। কয়েকদিন ধরে ওর শরীরটা ভালো নেই। মাথা ঘুরছে। গিয়ে দ্যাখ না বাবা, কোথাও পড়ে-টড়ে থাকল না কি।"

"শোনো, মা বলছেন বাবা এখনও ফেরেননি। বাবার শরীর খারাপ।" মান্তি সেদিন হরিকে বিছানা থেকে তোলার চেষ্টা করল।

"মা আর নতুন কী বলবেন?"

ওদিকে অচলা তখনও আকুতি-মিনতি করছে, "ও হরি, শোন বাবা। তোর বাবা এখনও ফেরেনি।"

"শোনো, বাবা এখনও ফেরেননি। মা বলছেন।"

"এমন তো নয় যে, বাবা বেপাত্তা হয়ে গেছে।" হাই তুলে বলল হরি। "বেরিয়েছে তো সকালে। ঘণ্টা-দুই বাবাকে না দেখেই কি মায়ের মন ছটফট করে উঠল? এদিকে তো শুধু ঝগড়া আর ঝগড়া।"

"ওঠো, তুমি গিয়ে দেখে এসো, কোথায় গেলেন।"

"যাবে আর কোথায়? যাওয়ার কি আর জায়গা আছে?" হরি আবার হাই

তুলল। এত হাই ওঠে মানুষের। মান্তি ভাবল। হরির হলুদ দাঁত, চড়া-পড়া জিভ, মুখের ভেতর পুঁজ-টসটসে ফুসকুড়ি দেখেই গা ঘিনঘিন করে। মাথার চুলে ময়লা জমেছে। এত ময়লা যে, মোটা দানার চিরুনিও হোঁচট খাবে। চ্যাটচেটে চুল কপালে ঝুলে থেকে চোখের খানিকটা ঢেকে দিয়েছে। চালাঘরের রোদেপোড়াড়া, জলে ভেজা কালো কালো খড়ের নুড়োগুলোও এর চেয়ে সুন্দর। মান্তির গা গুলিয়ে উঠল।

"তোমাকে দেখলেই গা বমি বমি করে—" মান্তি এক ঝটকায় হরিকে সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। হরির গা থেকে সব সময় একটা বোঁটকা গন্ধ বেরোয়। সেই গন্ধটা এখন আরও তীব্রভাবে মান্তির নাকে এল। দম বন্ধ হয়ে আসছে। সে দরজা খুলে বাইরের উঠোনে গিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে। কিন্তু তখনই দরজা আগলে দাঁড়িয়েছে হরি। ওর চোখ দুটো জ্বলছে।

"ছেড়ে দাও বলছি। আমি গিয়ে দেখি বাবার কী হল।"

"আমার বউ কখন কী করবে, কোথায় যাবে তা আমি ঠিক করব, বুঝেছ? আমার কথার অবাধ্য হলে আমি ছেড়ে দেব না, জেনে রাখো।"

"কী করবে তুমি? মারবে? তোমার কাছে থাকতেও আমার ঘেন্না করে।"

মান্তিও আজ ছেড়ে কথা বলবে না। উত্তেজনায় সে কাঁপছে উঠোনের বাতাসী লাউ-লতাটার মতো।

সে যে এভাবে রুখে দাঁড়াবে হরি ভাবতেও পারেনি। হরি ভাঙবে, তবু মচকাবে না। তা ছাড়া একবার মেজাজ দেখিয়ে দুম করে গুটিয়ে যাওয়াও ঠিক হবে না। হরি ফুঁসে উঠল, "ভালো হবে না বলে দিচ্ছি।"

"আর ভালোটা হওয়ার আছেই বা কী!" মান্তি আজ মরিয়া হয়ে উঠছে।

"খুন করে ফেলব। তুমি আমাকে চেনো না।"

দরজায় দুম দুম করে শব্দ উঠল। কাদা পেরিয়ে অচলা প্রায় ছুটে এসেছে।

"হরি, দরজা খোল বাবা। সকালবেলা এমন করতে নেই।"

হরি একবার মান্তির দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবল। তারপর দরজার হুড়কোটা খুলতে গিয়ে থেমে গেল। বলল, "এসব ঝামেলা আমার ভালো লাগে না। তুমি যাও, দরজা খোলো গিয়ে।"

মান্তি দরজা খুলল। দেখল অচলার পাশে নগেনও দাঁড়িয়ে আছে। নগেনের হাতে ছোট একটা থলি।

"হরি, কী হয়েছে, বাবা? সকালে এমন তিরিক্ষে মেজাজ।" নগেন আরও কিছু বলত। কিন্তু অচলা ওকে থামিয়ে দিল।

"দ্যাখ হরি, তোব বাবার কাণ্ডটা দেখ। রেশনে চাল দিচ্ছিল। সস্তায় ভালো চাল। রেশন আনতে গিয়ে খালি হাতে ফিরে এসেছে।"

"না, মানে জামার বুক পকেটেই তো দশ টাকার নোটটা রেখেছিলাম। রেশনের

লাইনে দাঁড়িয়ে যখন ডাক পড়ল, আমার কার্ডের চাল ওজন হল তখন টাকা মেটাতে গিয়ে দেখি নোটটা নেই। এদিক ওদিক কত খুঁজলাম। ভাবলাম যদি কোথাও পড়ে থাকে। পেলাম না। কোথায় যে হারালাম—"

"তোমার এই কাঁদুনি শুনতে ভলো লাগে না। দশ টাকার নোটটা সত্যিই ছিল কি না বলো তো?" অচলা জানতে চাইল। উনুন থেকে ভাতের হাঁড়ি সে নামিয়ে রেখে এসেছে। কাঠকুটোর আগুনে ঝলসে-যাওয়া চেহারাটার জ্বালা এখনও জুড়োয়নি। "সত্যিই ছিল। আমি মিথ্যে বলব কেন?"

"হরি শুনলি তো। আগে তো তুমি কখনও মিথ্যে বলতে না।"

বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়েছিল হরি। এবার এগিযে এসে বাবার সামনে দাঁড়াল। তারপর চেঁচিয়ে বলে উঠল, "তুমি মিথ্যে কথা বলছ। মিথ্যে কথা বলতে পুরুষ মানুষের লজ্জা করা উচিত।"

"মা, আপনি এ কী করছেন। ছেলেকে দিয়ে বাবাকে অপমান করাচ্ছেন?" মান্তি দু'হাত জড়িয়ে ধরল শাশুড়ির।

"আমি কেন ওকে অপমান করাতে যাব? ও তো নিজেই চায় লোকে ওকে অপমান-করুক।" অচলা বলল।

"আমি তো আপানার ছেলেকে জানি। ওর সবসময় মাথা গরম। কখন কী করে বসে—"

"তোমার একটু শিক্ষা হওয়া উচিত। কুঁড়েমি করে করে আমাদের সবার জীবনটা নষ্ট করে দিলে। লোক-দেখানো একটা চাকরি করেই ভাবছ পার পেয়ে যাবে। সারাজীবনই আমাদেব ঠঁ য়ে গেলে—" অচলা কান্নায় ভেঙে পড়ল।

হরি ওর বালিশের নিচ থেকে দশ টাকার একটা নোট বের করে এনে অচলার হাতে দিয়ে বলল, "মা, এই নাও। নোটটা বাবা হারায়নি। মিথ্যে কথা বলছে।"

"তা হলে কোথায় ছিল নোটটা?"

"কোথায় আবার! আমার বালিশের নিচে। নিজেই চোখেই তো দেখলে। ইচ্ছে করে আমিই ওটা সরিয়ে এনে বালিশের নিচে রেখেছিলাম।"

"ইচ্ছে করে? মানে? কী বলছ তুমি?" মান্তি ছটফট করে উঠল। কান্না ওর চোখে শুকিয়ে গেছে। মাথাটাও কাজ কবছে না। উঠোনের কাদার মতো তলতল করছে সমস্ত শরীর।

কিন্তু উত্তর যার কাছে চাওয়া হয়েছে, তার মধ্যে অস্থিরতার কোনও লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। কেনই বা সে অস্থির হবে! উঠোনের কাদা আর লাউ-লতা তো সে নয়।

"হরি, এটা কি তুই ভালো করেছিস বলতে চাস?" অচলার গলাতেও কী যেন আটকে গেছে। ফুটন্ত ভাত্তেব ডেকচির ঢাকনাটার মতো সে থর থর করে কাঁপছে। সে-রকমই বুক-চাপা একটা কষ্ট।

অচলা আরও কী যেন বলতে চাইছিল। কিন্তু নগেন ওর হাতে হাত রেখে বলল, "ডেকচিটা বসাবে চলো। দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

রোদে একটু একটু করে শুকিয়ে আসছে উঠোনের কাদা। অল্প হাওয়ায় লাউ-লতাটা দুলছে। হেঁশেলঘরের দাওয়ায় এখন ছেঁড়া একটা চট বিছিয়ে বসে আছে নগেন। এনামেলের তোবড়ানো বাটিতে কিছুটা মুড়ি ঢেলে দিয়ে গেছে অচলা। দিয়ে গেছে কাঁচা একটা লঙ্কা। মুড়ি চিবোচ্ছে নগেন।

"হ্যাঁ গো, একটু চা হবে নাকি?" এক সময় সে বলল। কিন্তু তার আগেই উনুনে চায়ের জল চাপিয়েছিল অচলা। কিছু পরে গ্লাসে চা নিয়ে এসে সে নগেনের পাশে বসল।

"তুমি কখনও ওকে কিছু বলোনি। সেইজন্যেই ছেলেটা নষ্ট হয়ে গেল।" অচলার কষ্ট আরও বেশি করে আজ ফুটে উঠেছে।

"কার কথা বলছ?"

"কার কথা অবার! বাড়িতে ছেলে আর কে আছে?"

"ও হো! হরি, তুমি হরির কথা বলছ?"

"আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলাম! সাতসকালেই তুমি আমাকে যে কষ্ট দিলে। তোমার না হয় কিছু গায়ে লাগে না—"

"কষ্ট কেন! আজ তো কিছু পাওয়ার দিন। হরি তো স্বীকার করল।"

"কী স্বীকার করল? ছেলেটা একেবারে শয়তান।"

"ও কথা বোলো না। মুখ ফুটে ক'জনই বা স্বীকার করে! হরির সাহস আছে। সৎ সাহস।

"তুমি বলেই ওকে ক্ষমা করতে পারলে। বালিশের নিচ থেকে যখন নোটটা বের করল তখনই তো তোমার কিছু বলা উচিত ছিল।"

"আঃ, ওসব কথা ছাড়ো। বললাম না, আজ কিছু পাওয়ার দিন। কেউ তো আমাকে কখনও কিছু দেয়নি। হরি তো দিল।"

"কী দিল? তোমার টাকাটাই তো বালিশের নিচ থেকে বের করল—"

"সেটাও তো দেওয়া। যদি বেমালুম চেপে যেত, আমি কি কিছু বলতে পারতাম। তুমিও কি বিশ্বাস করতে, আস্ত দশ টাকার একটা নোটও আমার পকেটে থাকতে পারে। গরিব হওয়ার এটাই তো অসুবিধে। হরি আমার সম্মান বাঁচিয়েছে। ওরও অসম্মান হয়নি। বাবার কাছে ছেলের আবার লজ্জা কী!"

দাওয়ার রোদ এসে পড়েছে। সেই রোদে সম্পূর্ণ অচেনা একটা লোক যেন অচলার কাছে বসে আছে। তাকে কেন এতদিন সে বুঝতে পারেনি, এটা ভেবেই আরও বেশি কষ্ট হল অচলার। হেঁশেলে ফিরে যেতে যেতে সে শুধু বলল, "যাই, ভাতটা নামাই।"

সংবাদ

আশিস সান্যাল

শহবতলিব ত্রিপল ঘোমটা বাড়িটাব মাথায তখন অবেলাব বোদ্দুব লেপটে পড়ে চিক্ চিক্ কবে হাসছে। যেন ঘোষণা কবছে, কিছুক্ষণেব মধ্যেই অন্ধকাব এসে গ্রাস কববে তাকে। এই সময়ে প্রতিদিন-ই একটা অদ্ভুত উত্তেজনা শেখবেব মনে দাপাদাপি শুরু কবে দেয। একটা অকাবণ আহ্লাদকে আস্বাদ কববাব জন্য চঞ্চল হয়ে ওঠে তাব মন। দবজা খুলে বাবান্দায এসে দাঁড়ায সে। তাবপব ইজি চেযাবটায বসে শবীবটা এগিযে দেয। তাব দৃষ্টি চলে যায দূবেব কচি কলাপাতা বঙ আকাশটাব দিকে। হযত তখন সেখানে এক টুকবো সাদা মেঘ অতি ধীব পদক্ষেপে দক্ষিণ থেকে চলেছে উত্তবেব দি..। অন্য সময শেখবেব কাছে এসব খুবই বহস্যময মনে হয। কিন্তু এখন এসব দৃশ্যেব আহ্বানে সে সাড়া দিতে পাবে না। কেবল-ই একটা দুর্লভ সংবাদেব আশায তাব মন অধীব আগ্রহে ছট্‌ফট্ কবতে থাকে।

তাবপব একসময সে দেখতে পায, সামনেব গলিপথ ধবে সেই খাকিপ্যান্ট পবা লোকটা এগিযে আসছে' ওই লোকটাকে দেখলেই কেমন যেন চঞ্চল হযে ওঠে শেখবেব মন। অনেকদিন সে বিষযটাকে বিশ্লেষণ কবতে ে্ষ্টা কবেছে। কিন্তু কোন সঙ্গত সিদ্ধান্তে আসতে পাবেনি। কেবল অনুভব ক্বেছে, এই লোকটাব আবির্ভাব তাব মনে একটা প্রত্যাশাব শিহবণ জাগিযে দিযে যায। যেন এই লোকটাই একমাত্র সেই দুর্লভ সংবাদ বহন কবে নিযে আসবাব অধিকাবী।

কোন কোন দিন লোকটা তাদেবও দবজায এসে কড়া নাড়ে। শব্দ শোনামাত্র শেখব দ্রুত ছুটে যায সেদিকে। হাত থেকে প্রায কেড়ে নেয় চিঠিটা। খামটা খুলে তাড়াতাড়ি চিঠিটা বেব কবে নেয। কিন্তু মুহূর্তেব মধ্যে একটা দাকণ অবসাদে তাব ভাবনাগুলো মাতালেব মত টলতে থাকে। কেননা, যে চিঠিটা পাবাব জন্য সে অপেক্ষা কবে আছে, সেই চিঠিটা আব আসে না। অসহাযেব মত সে আবাব এলিযে পড়ে চেযাবটায। এভাবে কতক্ষণ যে কেটে যায, তাব কিছুই আব সে

তখন অনুভব করতে পারে না। তবে বুঝতে পারে, তার চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে টুকরো টুকরো অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মধ্যে সে যেন নিশানাহীন ভাসমান। তার অস্তিত্বের শিকড়ে সেই অসহায় অনুভূতির সঞ্চরণ। ভাবতে ভাবতে একসময় ভয়ানক ক্লান্ত হয়ে পড়ে শেখর।

'কিছু খবর পেলে ?'

'না।'

'কতদিন আর এভাবে চলবে ?'

কোন উত্তর দেয় না শেখর। মধুশ্রীই আবার বলে, 'জানো, সুশান্ত একটা চাকরি পেয়েছে।'

'চাকরি!' যেন আঁতকে উঠতে চায় শেখর।

'হ্যাঁ, চাকরি।' উত্তর দেয় মধুশ্রী। 'একটা প্রফেসরি। ওর বাবার সঙ্গে প্রিন্সিপালের খুব জানাশোনা আছে। উনিই ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।'

একটু থেমে আবার বলতে থাকে মধুশ্রী, 'তাছাড়া ওর বাবা ওখানকার ইনফ্লুয়েনসিয়াল লোক। মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান।'

'তাই বুঝি ?' অসহায়ভাবে উত্তর দেয় শেখর। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র শেখর। সে মনে মনে ভাবে, হ্যাঁ সুশান্তর চেয়ে তার রেজাল্ট তো অনেক ভাল ছিল। তবে ?

'কি হলো ? এই খবরটা শুনে এত বিমর্ষ হয়ে পড়লে যে ? তুমিও পাবে একদিন।' মধুশ্রী একটু হাসতে চেষ্টা করে। শেখরের হাতে একটা হাল্কা চাপ দিয়ে বলে 'তুমি ভীষণ নার্ভাস। সব কিছুর জন্যই ধৈর্য এবং সাহস দরকার।'

'সাহস।' কথাটা উচ্চারণ করতে গিয়ে শেখরের কণ্ঠস্বর ভীষণ কেঁপে উঠলো। কথাটার সার্থকতা সম্বন্ধে সে সচেতন হতে চেষ্টা করে।

'কি ভাবছো ?'

'কিছু না।'

'না মানে ?' চোখে-মুখে ভাবনার রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

'তাই বুঝি।' নির্লিপ্তের মত উত্তর দেয় শেখর।

মধুশ্রী বলে, 'তুমি যেন আজকাল কেমন হয়ে যাচ্ছো ? কি হয়েছে তোমার বলো না ?'

'হবে আবার কি ?' উত্তর দেয় শেখর।

'তাহলে এমন হয়ে যাচ্ছো কেন ? সব সময় একটা মর্মাহত ভাব। আগে তো সব সময় হাসি-খুশি থাকতে।'

'সময় সব কিছুকেই পাল্টে দেয়। আজ আমি যা আছি, কাল সেরকম নাও থাকতে পারি। পরিবর্তিত পরিবেশের প্রভাব মনকেই কি সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করে না ? আমরা তো পুরোপুরিভাবে সময়ের অধীন।'

'হুঁ, এক অর্থে তা ঠিক। কিন্তু শেখর, সময় কি মনকে পুরোপুরি গ্রাস করতে পারে ? মন কি এক-ই সঙ্গে সময়ের অধীন আবার স্বাধীন নয় ?'

শেখর আর উত্তর দেয় না। কলেজ স্ট্রিটের কফি হাউসের এক কোণের সেই টেবিলটার আবহাওয়া কেমন যেন গম্ভীর হয়ে ওঠে। মধুশ্রী তাকে হাল্কা করার জন্য এক সময় বলে ওঠে—

'চলো না কোথাও বেড়িয়ে আসি।'

'কোথায় ?'

মধুশ্রী একটু ভাবতে চেষ্টা করে। তারপর ঠোঁটে একটা চপল হাসি জড়িয়ে নিয়ে বলে—

'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মাঠটায়। আকাদমি অব ফাইন আর্টসে একটা ছবির এক্সিবিশন হচ্ছে, সেটাও দেখে আসা যাবে।'

তখন সূর্য অনেকটা হেলে পড়েছে পশ্চিমে। গাছের পাতায়-পাতায় তখন বিদায়ী রোদের হাতছানি। বাস থেকে নেমে তারা কিছুটা পথ এগিয়ে গেলো। কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ইতস্তত ঘুরে বেড়ালো তারা। দেখতে দেখতে বিকেল গড়িয়ে গেলো। চতুর্দিকে নেমে এলো সন্ধ্যার প্রায়ান্ধকার ছায়া। আকাশের এক কোণে একটা তারা দপ্ দপ্ জ্বলতে শুরু করেছে। রাস্তার বিদ্যুৎ বাতিগুলো থেকে আলো ঠিকরে পড়ছে এখানে সেখানে। দূরে দেখা যাচ্ছে, লাল-নীল আলোর সে কি ঝল্কানি। মধুশ্রীর মনেও যেন উন্মাদনার দোলা। শেখরকে লক্ষ্য করে সে বললো—

'চলো, ওদিকটায় যাই।'

'কোথায় ?'

উত্তরে মধুশ্রী ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল জায়গাটার অবস্থিতি। শেখর কোন আপত্তি জানালো না। খুব পাশাপাশি তারা হেঁটে চলেছিলো উত্তরের দিকে। এভাবে হাঁটতে হাঁটতে বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামটা বাঁ পাশে রেখে ডান দিকে মোড় ঘুরল তারা। তারপর আরো কিছুটা এগিয়ে গিয়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সেই প্রশস্ত ময়দানে প্রবেশ করলো তারা। ছোট হ্রদের মতো জলাশয়টার পাশে একটা বেঞ্চের উপর গিয়ে বসে পড়লো। অন্ধকার ততক্ষণে আরো গভীর হয়ে উঠেছে। আকাশের এখানে সেখানে ছড়ানো ছেটানো তারাগুলি তখন মিট্‌মিট্ করে জ্বলছে। মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা হাওয়ার থাবায় গাছের ডালপালাগুলো ইতস্তত কেঁপে উঠছিলো।

শেখর এক সময় লক্ষ্য করলো মধুশ্রী তন্ময় হয়ে কি যেন ভাবছে। তার কানের কিনার ঘেঁষে হাওয়ায় উড়ছে একরাশ চুল। কপালে ঈষৎ লাল রঙের টিপটায় ওকে মানিয়েছে বেশ। একটা অদ্ভুত উত্তেজনা অনুভব করলো শেখর। হাতটা রাখলো ওর পিঠের উপর। কোন আপত্তি জানালো না মধুশ্রী। বরং আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলো শেখরের কাছাকাছি।

'বকুলের গন্ধ পাচ্ছো ?' হঠাৎ প্রশ্ন করে মধুশ্রী।

'হুঁ।'

'আমার কিন্তু খুব ভালো লাগে।'

'আমারও। বিশেষ করে যখন...।'

'কি ?'

'যখন তোমাকে কাছে পাই।'

'ইস!' খিলখিল করে হেসে ওঠে মধুশ্রী।

পেছন থেকে যেতে যেতে কে একজন ওদের দেখে একটা অশ্লীল ইঙ্গিত করলো। কিন্তু বিষয়টাকে খুব একটা পাত্তা দিলো না ওরা! কেননা, এরকম কথা ওরা প্রায়ই শুনে থাকে। তাছাড়া এসব ক্ষেত্রে প্রতিবাদ করতে যাওয়া নিরর্থক। তার চেয়ে আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলো ওরা। শেখর একটা কবিতার কয়েকটি পংক্তি আবৃত্তি করতে শুরু করল—

"Escape me?"
Never—
Beloved!
While I am I, you are you.
So long the world contains us both,
Me the loving and you the loth,
While the one eludes, must the other pursue."

"ভারি সুন্দর তো কবিতাটি।' মধুশ্রী হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানালো।

'কার লেখা?'

'ব্রাউনিংয়ের।'

'তুমি ব্রাউনিংয়ের খুব ভক্ত, না?'

'কেন বল তো?'

'প্রায়ই ওঁর কবিতা থেকে আবৃত্তি করতে শুনি।

'হতে পারে। ওঁর মতই মাঝে মাঝেই আমারও বলতে ইচ্ছে করে—

'বি অল, হ্যাভ্, সি, নো, টেস্ট, ফিল অল।'

এতক্ষণ সময়ের দিকে বেশি লক্ষ্য ছিল না। হঠাৎ ঘড়ির দিকে লক্ষ্য করে মধুশ্রী বলে উঠলো, 'এবার উঠতে হয়। অনেক রাত হয়ে গেছে।'

'আবার কবে দেখা হবে?' শেখর জিজ্ঞেস করে।

'আমি তো আসতে পারি প্রতিদিনই।'

'আসছে রোববার, চল না কোথাও বেড়িয়ে আসি।'

'সত্যি। কতদিন যাইনি।' খুব জোরেই শব্দগুলো উচ্চারণ করলো মধুশ্রী।

আর কথা না বাড়িয়ে এবার উঠে পড়ে তারা। আবার সেই প্ল্যানেটোরিয়ামটাকে বাঁ পাশে রেখে হাঁটতে থাকে। দেখতে দেখতে মেন রোডে এসে দাঁড়ায় তারা। মধুশ্রীকে বাসে তুলে দেবার জন্য বাস স্টপে অপেক্ষা করতে থাকে শেখর। এবং এই সময় মধুশ্রীর জন্য একটা অদ্ভুত বেদনা অনুভব করে সে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাস এসে যায়।

'তাহলে চলি।'

'রোববারের কথা মনে থাকে যেন।'

'থাকবে, থাকবে।' একটা মৃদু হাসির রেখা ফুটে ওঠে মধুশ্রীর ঠোঁটে। বাসে

ওঠার আগে শেখরের দিকে তাকিয়ে বলে,

'চাকরির খবরটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু আমাকে জানিও।'

এখনও মধুশ্রীকে সেই সংবাদটা জানানো হলো না। দেখতে দেখতে কেটে গেছে দু'টো বছর। এরমধ্যে কত জায়গায় চেষ্টা করেছে শেখর। ইন্টারভিউও দিয়েছে দু'এক জায়গায়। কোন লাভ হয়নি। তবু চেষ্টার ত্রুটি নেই। যেখানেই খবর পেয়েছে, সেখানেই অ্যাপ্লিকেশন পাঠিয়েছে যথারীতি। তারপর প্রতীক্ষা। প্রতিদিনই ডাক পিওন আসার সেই সময়টায় অধীরভাবে অপেক্ষা করে শেখর। প্রতিদিনই সে ভাবে, আজকে সেই চিঠিটা সে পাবে। অর্থাৎ সেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার। সঙ্গে সঙ্গে সে লিখবে মধুশ্রীকে তার নতুন জীবনের ইঙ্গিত জানিয়ে।

শেখর অনুভব করে, দীর্ঘ দু'বছর ধবে ওই লোকটার আসার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে লোকটার সঙ্গে কেমন যেন সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেছে তাব। কখনওসখনও লোকটাকে না দেখলে একটা অদ্ভুত সহানুভূতি জেগে ওঠে তার মনে। ভাবে হয়ত লোকটার অসুখ করেছে। কোথায় সে থাকে জানে না। জানলে নিশ্চয়ই সে একবার গিয়ে খবরটা নিয়ে আসতো। আবার হয়তো পরদিনই লোকটাকে দেখে তাব মনের সমস্ত বেদনা মুছে যায়। আশ্চর্য, এই দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করে করেও লোকটার প্রতি সে বিন্দুমাত্র অসন্তুষ্ট হতে পাবে না। কারণ, সে জানে, এই লোকটাই একদিন তাকে কোন একটা সংবাদ পৌঁছে দেবে।

এর মধ্যে ঘটনাব পব ঘটনা ঘটে গেছে। নিজের ভেতরে পরিবর্তিত হয়েছে শেখর। চারিদিক থেকে শেখব দেখেছে, দেশেব বিকৃত মানুষগুলির আস্ফালন। তাদের জয়জয়কাব। আব যারা মনুষ্যত্বকে বুকেব ভেতরে আঁকড়ে বাখতে চায়, তাদের সর্বত্র পবাজয়। এক এক সময় মনে হয় শেখরের, সে যেন একটা বাজপড়া তালগাছ। একমাত্র অস্তিত্ব ছাড়া সব কিছুই যেন কেড়ে নেওয়া হয়েছে, তার কাছ থেকে। ক্রমে অস্তিত্বও বিপন্ন জেনে ক্লান্ত হয়েছে শেখব। অন্ধকারের মধ্যে আর এক পা-ও অগ্রসর হওয়া যাবে না জেনে একটা ভয়ংকর যন্ত্রণার ঘাতে প্রতিঘাতে বার বাব নিজেকে করছে বক্তাক্ত।

সেদিন কি একটা কাজে বেরিয়েছিলো শেখর। এলগিন রোডের বাসস্টপে দাঁড়িয়েছিলো সে বাসেব জন্য। ঠিক সেই সময় মধুশ্রীর সঙ্গে দেখা। একটা কৃত্রিম সহানুভূতি জড়িয়ে সে প্রশ্ন করল, 'এখানে ?'

'একটা কাজে এসেছিলাম।' উত্তর দিল শেখর।

'কিন্তু তুমি ?'

'আমি এসেছিলাম শমিতাদের বাড়িতে।'

'শমিতা ?'

'বা-রে, শমিতাকে চেন না? আমাদের সঙ্গেই তো পড়তো।' একটু থেমে আবার বলে উঠলো, 'ওর একটা বাচ্চা হয়েছে।'

'তাই নাকি ?' ম্লান হাসল শেখর। মধুশ্রী পুরোনো প্রসঙ্গের রেশ টেনেই বলল, 'এখন শমিতাকে চেনো না। ক'দিন বাদে দেখছি আমাদেরও ভুলে যাবে। আচ্ছা,

তোমার খবর কি?'

'মানে?'

'মানে আবার কি? একটা চিঠি লিখতেও কষ্ট হয় না কি?'

'কষ্টের আর কি? কিন্তু লেখারই বা আর কি আছে?'

'কেন কিছুই কি নেই?'

'কি আর আছে বলো? কেমন আছো; ভাল আছি ইত্যাদি ছাড়া আর কি আছে যা চিঠিতে লেখা যায়। খারাপই হোক, ভালই হোক, কিছু একটা ঘটলে তবে তো তা সংবাদ হয়। আর তাহলেই কিছু একটা লেখা যায়। কিন্তু এখন আমার জীবনে এসব কিছু নেই। আমি চাই কিছু একটা ঘটুক। খারাপ কিংবা ভালো— যাই হোক, একটা কিছু ঘটুক।'

মধুশ্রী কথাটার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয় না। অন্য প্রসঙ্গে গিয়ে বলে, 'শুভোকে এর মধ্যে একটা চিঠি দিয়েছি। ও একটা চিঠি পাঠিয়েছিলো কিনা।'

'শুভো?' নামটা উচ্চারণ করতে গিয়ে কেমন যেন একটা বিস্ময় প্রকাশিত হলো শেখরের কণ্ঠে। মধুশ্রী বললো।

'ঈর্ষা হল নাকি?'

'না, না।' উত্তর দেয় শেখর।

'কি যে বল! আমি ভাবছিলাম অন্য কথা।'

'যাই বল, ছেলেটা কিন্তু খুব ব্রাইট।'

'হ্যাঁ, অন্তত একটা ভাল চাকরি তো পেয়েছে।'

'তাই বা ক'জন পায়?'

'খুঁটিতে জোর থাকলে তেমন কঠিন নয়।'

'তুমি তো এতদিন চেষ্টা করে কোলকাতার একটা স্কুলেও মাস্টারি পেলে না।'

'মধুশ্রী!' প্রায় চিৎকার করে উঠে শেখর। তারপর নিজেকে সংযত করে নিয়ে বলতে থাকে, 'অন্তত তুমি জান মধুশ্রী, আমি ওদের চেয়ে খাটো নই। বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেটও তার সাক্ষ্য দেবে। তবে হ্যাঁ, আমি এমন কোন ব্যক্তির পুত্র বা জামাই নই, কিংবা এমন কোন সংগঠনের সদস্য নই— যা আমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারতো।'

'চেষ্টা তো করতে পারতে।'

'হ্যাঁ পারতাম। নিজের বিবেকের বিনিময়ে।'

'কিন্তু এটাও তো এক ধরনের যোগ্যতা।'

'স্বীকার করি মধুশ্রী, এখন এটাই যোগ্যতা। কিন্তু কেন? কেন সুস্থ স্বাভাবিক পথে আমরা চলতে পারবো না। কেন?'

'থাক ওসব কথা।' মধুশ্রী যথার্থ উত্তর না খুঁজে পেয়ে বলে ওঠে, 'এতো সিরিয়াস হতে এখন ভালো লাগছে না।'

'সময় আছে তোমার?'

'কেন?'

'চলো না কোথাও একটু বসি।'

শেখর সম্মতি জানায়।

এলগিন রোড ধরে তারা দু'জনে এগিয়ে চলতে থাকে। এদিকে ট্রাম বাসের তেমন কোলাহল নেই। লোক চলাচলও খুব বিরল। হাঁটতে হাঁটতে শেখরের মনে হয় যেন কোন নিশানাহীন অভিসারে সে ছুটে চলেছে। কিন্তু সে ভীষণ ক্লান্ত। চারপাশের দৃশ্যাবলী যেন তার অসহায় অবস্থাকে উপহাস করছে। যেন তার অস্তিত্বের দিকে তীব্র কটাক্ষ হানছে। এক সময় সে ভাবতে চেষ্টা করে— প্রেম, মানবতা ইত্যাদি শব্দগুলির এখন আর কোন মূল্য আছে কিনা। বজ্রাহতের মত হঠাৎ সে বলে ওঠে, 'মধুশ্রী!'

'কিছু বলবে?' স্বাভাবিকভাবেই জিজ্ঞেস করে মধুশ্রী।

'হ্যাঁ। অনেকদিন ধরেই তোমাকে কথাটা জিজ্ঞেস করবো ভাবছি।'

'এতো ভণিতার কি আছে? বলোই না।'

'বলছিলাম কি, আর কতদিন অপেক্ষা করবে তুমি।'

'স্পষ্ট করে বল।' দৃঢ় এবং সংযতভাবে উত্তর দেয় মধুশ্রী।

'আমাদের বিয়েটা তাড়াতাড়ি হয়ে গেলে কেমন হয়?'

'বিয়ে। বিয়ে করে তোমার চলবে কেমন করে?'

'একটা ভাল চাকরি নিশ্চয়ই কোনদিন পাবো।'

উত্তর দেয় না মধুশ্রী। পরিবেশটা কেমন যেন থমথম করতে থাকে। ঝড়ের প্রাক্ মুহূর্তে যেমন চতুর্দিকে একটা স্তব্ধতা নেমে আসে, তেমনি একটা দুর্বোধ্য স্তব্ধতা নেমে এলো তাদের মধ্যে। এভাবে হাঁটতে হাঁটতে তারা চৌরঙ্গী রোডে এসে দাঁড়ায়। সামনে একটা চায়ের দোকান দেখে মধুশ্রীই বলে, 'চলো, একটু চা খাওয়া যাক।'

'এখানে নয়। সামনে আর একটা ভালো দোকান আছে।' মুহূর্তেই মধুশ্রীর চোখে মুখে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ্য করে শেখর। যেন অনেক দিনের একটা পুরোনো ইচ্ছাকে ভেঙে চুরমার করে দেবার প্রচণ্ড উদ্দামতা তার চোখে জ্বলজ্বল করতে থাকে। শেখরের প্রস্তাবে আপত্তি জানিয়ে বলে, 'আজ থাক।'

'কেন?'

'একটা কাজ আছে আমার। এখুনি চলে যেতে হবে।'

আপত্তি জানাতে পারে না শেখর। নিজেকে ভীষণ অসহায় মনে হচ্ছিলো তার। মনে হচ্ছিলো, মধুশ্রীকে জোর করে 'না' করার মত কোন অধিকারই আজ আর তার নেই। মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিতে চাইলো সে। মধুশ্রী চলে যাবার পরও সে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলো বাসস্টপে। তার মনের ভেতরে একটা গভীর যন্ত্রণা কেবলই দপ্‌দপ্ করছিলো: মানুষ, ভালোবাসা, সভ্যতা— সব কিছুর প্রতিই একটা তীব্র অবিশ্বাস ঘনিয়ে উঠছিলো তার মনে। শেখর এখনও ঠিক জানে না, এ অবিশ্বাসের পরিণাম কোনদিকে। দূরের মনুমেন্টের উঁচু চূড়ার দিকে তাকিয়ে একবার নিজেকে বিলীন করে দেবার কথা মনে হল তার। কিন্তু বিনাশের পথে সে কিছুতেই যাবে

না। সে খুঁজবে। আরো খুঁজে দেখবে।

কয়েক মাস পরের কথা। সেদিনও সেই নির্দিষ্ট সময়ে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলো শেখর সেই লোকটার জন্য। তার মনে একটা অকারণ উল্লাস টগ্‌বগ্‌ করে বেড়াচ্ছে। কেবলই মনে হচ্ছিলো, সেদিন যে ইন্টারভিউটা দিয়ে এসেছিলো, নিশ্চয়ই তার একটা উত্তর পাবে। কারণ খুব ভালো ইন্টারভিউ দিয়েছিলো সে। অনেকক্ষণ ধরে তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিলো। সব ক'টি প্রশ্নেরই সে যথাযথ উত্তর দিতে পেরেছে। একটা প্রবল অস্থিরতার ভেতর দিয়ে কেটে যাচ্ছিল তার সময়।

অবশেষে এক সময় সেই লোকটিকে সে দেখতে পেলো। পরনে খাকি প্যান্ট। হাতে একগাদা চিঠি। দেখতে দেখতে লোকটি এসে তাদেরও দরজায় কড়া নাড়ল। শেখর প্রায় ছুটে গেলো সেদিকে। দরজা খুলে লোকটার হাত থেকে প্রায় কেড়ে নিল চিঠিটা হ্যাঁ, তারই চিঠি। খামের ওপর বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে তারই নাম। আর অপেক্ষা কবতে পারে না শেখর। তাড়াতাড়ি চিঠিটা খুলে পড়তে থাকে। কিন্তু না, সে যা ভেবেছিল, তা নয়! মধুশ্রীর চিঠি। সে লিখছে
:

'ভেবেছিলাম নিজে গিয়েই খবরটা তোমাকে দেবো। কিন্তু বিশেষ কাজে আটকে যাওয়ার জন্য যেতে পারলাম না। আশা করি, এজন্য তুমি কিছু মনে করবে না। আসছে সোমবার সন্ধ্যায় যদি আমাদের বাড়িতে একবার আসো, তাহলে খুবই খুশি হবো। সেদিন আমার বিয়ে। পাত্র তোমার বিশেষ পরিচিত। নাম শুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অর্থাৎ শুভো। এসো কিন্তু।'

শেখর ভেবেছিলো, সে ভীষণ দুঃখিত হবে। কিন্তু অনুভব করলো তার মনে দুঃখের কোন আভাস নেই। ববং একটা অনাগত আহ্লাদের রেখা ক্রমাগত তার বুকের মধ্যে প্রসারিত হচ্ছে। স্থির নিশ্চল জীবনধারায় তবুও এ একটা পরিবর্তন। একটা নিয়মিত ভাবনা থেকে মুক্তি পেয়ে ভয়ানক অস্থির হয়ে উঠলো শেখর। সে লক্ষ্য করলো, এক অপরিসীম অন্ধকার ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। সেই অন্ধকার সমুদ্রে সাঁতার কেটে সে যেন একটা নতুন দ্বীপের দিকে এগিয়ে চলেছে। আর ঠিক সেই সময় কলকাতার বেতারকেন্দ্রের সংবাদ ঘোষকের অস্পষ্ট কণ্ঠস্বরে সে শুনতে পেল : বিগত চব্বিশ ঘণ্টায় কলকাতা ও শহরতলিতে বিভিন্ন ঘটনায় সাতজন প্রাণ হারিয়েছে এবং তিনজন হয়েছে গুরুতর জখম।

মোটর গাড়ি, চন্দ্রবোড়া ইত্যাদি

অমর মিত্র

খয়রা বলে, পুঁটির মা এখনো ফেরে না কেন বল দেখি?

বুড়ি বলে, সাত বাড়ির কাজ।

খয়রাব কোলে কাতলা, পুঁটি, তপসে কোথায় ধুলো খেলে বেড়াচ্ছে।

খয়রা কোল থেকে কাতলাকে মাটিতে নামাতেই ছেলে কেঁদে উঠে ধুলোয় গড়াগড়ি দিতে লাগল। খয়রা উবু হয়ে বসে মনসা থানের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে, মনসায় কাটে না কেন?

বুড়ি চমকে ওঠে, কী বলিস?

যা বলি ঠিক বলি, দুটো ভেড়ি বুঁজায়ে দিল, জলের চিহ্ন নাই।

কাদের কথা বলিস?

কুম্পানি, থু থু থু।

বুড়ি তেমন আর চোখে দ্যাখে না। এই খয়রার ছেলে মেয়েগুলোর মুখও খুব ভালো করে দেখতে পায় না। পুঁটি, তপসে, কাতলা, নাতনির পর দুই নাতিকেও ভালো চেনা যায় না। ধোঁয়া ধোঁয়া লাগে। অথচ এই গাঁ, ওই ধানী মাঠ, ভেড়ি সব সে চিনত পায়ে পায়ে। এখন ওদিকে যায় না ভয়ে। জমি বদলে গেছে। হাজার বিঘে জমিতে মাটি পড়ছে, কল-কারখানা বসে যাবে। আকাশে মেঘ এসেছে, কিন্তু জমিতে মানুষ নেই, শুধু কালোমাটির পাহাড়, বুলডোজার সমতল করছে তা।

খয়রাকে জিজ্ঞেস করে বুড়ি, সাধুর কথাটা সত্যি?

বলছে তো তাই, বুলডজার দু'খানা হয়ে গেছে।

অমন বটবিরিক্ষ কেটে দিল, কাটতি নেই বটবিরিক্ষ।

খয়রা বিড় বিড় করে, কিছুই থাকবে না, কিছুই না।

দু'খানা হওয়া সাধুরে তুই দেখিছিস ?

মাথা নাড়ে খয়রা। সাধু হল পুরনোকালের চন্দ্রবোড়া, বটের কোটরে থাকত। বট কাটা পড়েছে, সাপও নাকি। পালাচ্ছিল সাধু, পারেনি। লোকে বলে খয়রা বাপ, ওই বুড়ির ছেলে মিরগেন— মিরগেনকে কেটেছিল ওই চন্দ্রবোড়া। বুড়ি বলে, না, সে অন্য আর এক। সাধু সত্যিই সাধু। মানুষের অনিষ্ট করেনি কোনো কালে। বুড়ো হয়েছিল। বুড়ির সে কতকালের না সঙ্গী। ছেলেটা সাপে কেটে মরলেও সাধুর উপর মায়া কাটেনি বুড়ির।

বুড়ি জিজ্ঞেস করে, সাধুর খবর দিল কেডা ?

আতঙ্ক দাস, কিন্তু ধড় পেয়েছে মুণ্ডু দ্যাখেনি।

মুণ্ডু কোথায় গেল ?

জানিনে। খয়রা বিরক্ত হয়, তুমার বেটারে কেডা খেয়েছিল ?

বুড়ির দু-চোখ স্থির। মাথা দোলে ধীরে ধীরে, বিনবিনিয়ে বলে, কতবাব তো এ কথা বলেচি রে খয়রা, সাধু কাউরে কাটেনি কখনো, ও হল সন্নিসী সাপ।

তুমার সবকথা সত্যি না।

আমি তো সত্যি বলে জানি।

তুমি তারে দেখেচো কখুনো, এত যে সাধু সাধু কর।

এখেনে এসে দুধকলা খেয়ে গেচে। বুড়ি বলল।

তখন আমার বাপ বেঁচে ?

মাথা নাড়ে বুড়ি, তোর বাপ মরল জস্টিমাসে, সে এল ভাদ্র সংকেরান্তিতে, দুধ কলা খেয়ে ঘুমোতে গেল, মাথায় মণি দে আলো বেরোচ্ছে, এই উঠান আলো।

খয়রা এ কথা একবার শোনেনি, বহুবার। বহুবার যে প্রশ্ন করেছে সে, আজও তাই। প্রত্যেকবার বুড়ি এক জবাব দেয়। মিথ্যে হলে এক একবার কথাটা টাল খেত না কি ? সাপটা সে দ্যাখেনি। কে দেখেছে তা নিয়েও সন্দেহ আছে। এই যে মরেছে, শুধু কাটা ধড় দেখা গেছে, মুণ্ডু উধাও, এ সাপ যে সেই সাপ তাই বা কে জানে ? আর আতঙ্ক দাস লোকটা কী বলে কী বলে না তার ঠিক নেই। তাকে ডেকে বলে গেল, কুম্পানি একটা কাজ করল বটে, বট বিরিক্ষ কেটে ওই চন্দরবোড়া, যমরাজাকে কে মারতে পারত !

এখন দুপর গড়ানে বেলা। আষাঢ় মাসের সাতদিন কেটে গেছে। কাল অম্বুবাচি লাগবে। আকাশে এক খণ্ড মেঘ আছে, সেই মেঘ তার মর্জিমতো ছায়া ফেলতে ফেলতে চলে যাচ্ছে দক্ষিণ থেকে উত্তরে। এই মুহূর্তে সেই ছায়া পড়ল এই প্রাচীন কুটিরে। ছেলেটাকে কোলে তুলে খয়রা বলল, এ ভিটেমাটিও নাকি কুম্পানি নেবে, আমাদের গাঁ বসায়ে দেবে ওধারে।

কোন ধারে?

মাথা নাড়ে খয়রা, তা জাননে।

সব ধার তো নে নেচ্ছে।

আতঙ্ক দাস খপর জানে। বিড়বিড় কবল খয়রা।

খয়রার বয়স কত? খয়রা নিজে জানে না। বুড়ি বলে তিরিশ চল্লিশ। খয়রা বলে পঁচিশ তিরিশ হবেও বা। ডিগডিগে রোগা, একটা পা শুকনো বাঁশের মতো, পোলিওয়। ওই পা নিয়েই ভেড়ির মেছো ছিল। জল নেই, সে ঘরে বসা। এদিক ওদিক যায় বটে, কিন্তু কেন যায় জানে না। কী কাজ জুটবে? হাজার বিঘের ধানজমি, ভেড়ি, পুকুর সব এখন মাটির তলায়।

বুড়ি ডাকে, ও খয়রা, খযবা।

খয়রা তো সেই জায়গাতে‌ ‌ ‌ড়িয়ে, জবাব দেয়, কী বল?

ও গাছে টিয়ের ঝাঁক ছিল।

ছিল, সব পলায়েছে।

কোনদিকে গেল?

যে যেমন পারে গেছে, খালপাড়ের গাছে তো বসেছে।

সাধু সাপ কোনোদিন একটা পাখির ছানাও খায়নি।

কে বলেছে?

বুড়ি বলে, জানি।

এইডা জানো, ডিম পর্যন্ত খেয়ে আসত।

কে বলেছে?

খয়রা চুপ করে থাকে। বুড়ির কথা সত্যি হতে পারে। সাপে যদি পাখির ছানা খায় তো গাছে অত পাখি বাস করত কী করে? কত টিয়ে! তারা কি খালপাড়ের শিরীষ গাছে গিয়ে বাসা বাঁধল? জায়গা আছে? ও গাছে না শকুন বসে ধাপার ময়লা থেকে উড়ে এসে। শকুনের ধূসর রঙে কি টিয়ার সবুজ থাকে? কাতলা ঘুমিয়ে পড়েছে। খয়রা বাচ্চাটাকে বুড়ির পাশে শুইয়ে দিয়ে পথের উপর দাঁড়ায়। ছেলেমেয়ের মা বেরোয় ভোরে। সাত বাড়ির ঠিকে ঝি। ফিরে এসে সাত বাড়ির সাত রকম গল্প বলে উনুনধারে বসে ভেপে যেতে যেতে। খয়রা পথের দিকে তাকিয়ে। আজ ময়না কী আনে? হাত ছ্যাঁচড়া আছে। বউয়ের যে এ স্বভাব তা কবে জানত সে? শাড়ির ভিতরে লুকিয়ে ওটা-ওটা, একদিন আস্ত একটা কাঁসার বাটি এনেছিল। ও বাটি এ ভিটেয় কী হবে, আর একজনের হাতে চলে যাবে কোন ফাঁকে। এই তো গাঁ, সব মাজা ভেঙে বসে আছে, কোনো ঘরেই সোনা রুপো নেই, রেডিও, টিভি নেই, কাঁসার থালাবাসন নেই; তবু এটা ওটা, এনামেলের ঘটি পর্যন্ত চলে যায়। কাঁসার বাটিটাকে খয়রা বামনঘাটা বাজারে বেচে দিয়ে এসেছে লেংচে লেংচে।

বুড়ি ডাকে, ও খয়রা, খয়রা।

খয়রা পথে দাঁড়িয়েই জবাব দেয়, দেখতিছি বাজবানি আসতেছেন কিনা।

বুড়ি বলে, ও বটের নিচে খুব আরাম ছেল, কি ঘুম!

হ্যাঁ, মরণ ঘুম। হেঁকে ওঠে খয়রা।

পাতা ঝিলমিল আলো! বুড়ির মনে পড়ে। মন তো সবচেয়ে বড় চোখ, যতই ছানি পড়ুক দু-চোখে, ময়লার পরতে ঢেকে যাক চোখের মণি, মনে এখনো সব আলোয় আলোয় ঝিলমিল। আলোর ঢেউ খেলছে সবসময়। বুড়ি বিড়বিড় করে, কী ছায়া, ছায়ার ভিতরে চাকা চাকা আলো, তার ভিতরে কালো গাই গিয়ে দাঁড়াল একদিন, হয়ে গেল বাঘ, শুয়ে আছে মিরগেলের বাপ, যেন আর একটা বাঘ। বাঘ তো কবে চলে গেছে এ দেশ ছেড়ে, মিরগেলের বাপ বাঘের গল্প বলত।

খয়রা হেঁকে ওঠে, মাগিটা আসে না কেন?

সাত বাড়ি কাজ।

কাজ তো কাজ, সমসার বয়ে গেল।

খাবি কী?

ছাই খাব। খয়রা পা টেনে টেনে ফিরে আসে বুড়ির কাছে, আতঙ্ক দাসটা এক লম্বরের দালাল, কুম্পানির চাকর হয়েছে।

তুই পারলি নে?

দালাল, দালাল।

কী করল?

দেখ কুম্পানি যখন গাঁ দেবে, সবচে' বড় ভিটে পাবে ও।

গাঁ দেবে তো? বুড়ি ব্যগ্র গলায় জিজ্ঞেস করে।

না দিলে যাব কুথায়?

বুড়ি বলে, যখন দেবেই, তখন তারে মারল কেন দু'খণ্ড করে?

ওদেরও ভিটে দেবে নাকি, ও কাল সাপ।

যাবে কুথায়?

খয়রা খ্যা খ্যা করে হাসে, আচ্ছা বুড়ি তুমি, বাবুদের ভেড়িতে যে জলঢোঁড়াগুলো ছিল, তারা সব মাটি চাপা পড়ে মরেচে, এতকাল মাছ খেয়ে খেয়ে মজা মারতিল, যত মারি তত হয়, এবার! সব নিচে পচছে।

উঠে আসতি পারল না?

টেরাক টেরাক মাটি, সঙ্গে ওই ষাঁড়, বুলডজার, কত যে ওই বুলডজার চাকায় পড়ে মরল, ওর দাঁতে কুচি কুচি হয়ে গেল!

বুড়ি দীর্ঘশ্বাস ফেলে, বলে, ব্যাঙগুলো?

এক হাল, কোথাকার এক ঢ্যামনা সাপ পলাচ্ছিল কাল মাঠ লম্বালম্বি, দেখতে পেল কুম্পানির লেবার, তরা না করল কিন্তু বুলডজার চলে গেল।

ভিটের সাপ ?

হ্যাঁ, তাই তো বলে।

মারতি নেই।

ভিটের লোক মারেনি।

বুড়ি বলে, গাঁ-টা আগে দিলে এডা হত না।

গাঁ দেবে, মাঠ তো দেবে না। বলতে বলতে এগিয়ে যায় খয়রা। পথের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকে। বউ কাজে বেরলে তার এই অবস্থা হয়। যতক্ষণ না ফেরে, ততক্ষণ তার বসার উপায় নেই। অথচ তার সময় হলে তো আসবে। কলকাতা, পার্কসার্কাস কম দূর না।

আতঙ্ক দাস যাচ্ছিল পাকা রাস্তার দিকে, পিছন থেকে তাকে ধরল, দাঁড়ায়ে কেন ?

এমনি !

আতঙ্ক তার বিড়াল চোখে হাসল, এমনি, না বউ ফিরেনি ?

তোর কী রে শোরের বাচ্চা ! আচমকা উগ্র চণ্ডাল হয়ে উঠল খয়রা।

আশ্চর্য ! আতঙ্ক দাস রাগল না। সে যেন জানত এই প্রতিক্রিয়ার কথা, তাই সামলে নিয়ে বলল, মুণ্ডুটা নেশ্চয় মাটি চাপা পড়েচে।

দেখিচিস ?

না দেখি নাই, তবে তাই তো হবে।

এইটা হবে, উটি সন্ন্যিসী সাপ, মুণ্ডু থাকলেই হয়।

তার মানে ! আতঙ্কর চোখে ভয়ের ভাব জেগে ওঠে।

মানে ওইডা, সাপের মুণ্ডুই তো আসল, ওখেনে বিষ দাঁত।

আতঙ্ক বলে, ঠাকমা বুড়ির কথা তো ?

না আমার কথা, এখন মুণ্ডু খোঁজ, না হলি কোনোদিন যে কেডা যাবে !

আমার কী ? আতঙ্ক বিড়বিড় করে, বটবিরিক্ষ কাটতি বারণ করলাম ঠিকেদার কুম্পানির লোককে, শোনলেই না।

অত পাতা কেডা নেল ?

আতঙ্ক বলে, ছাগলে খাচ্ছে, কিন্তু মুণ্ডুর কথা কি সত্যি ?

সত্যি কিনা মনসা পুজোয় বুঝা যাবে। এ ভিটিতে দুধ খেতি আসে ওদিন।

দূর কেলা, সে তো অনেক দেরি, সাক্ষীই বা কেডা ?

বউটা আসছে। হাসতে হাসতে আসছে। এত বেলাতেও হাসি থাকে। আতঙ্ককে ঠেলা দেয় খয়রা, আমার বউ, তুই নিজিরডা দ্যাখগে।

বউ ! শালা তুমি যা শুনালে, কুম্পানির সঙ্গে কথা বলতি হবে, মুণ্ডু নে আসল সাপ পলায়েছে, কিন্তু তারা কি বিশ্বেস করবে ?

খয়রার বউ ঢুকতে ঢুকতে ডাকে, আঁসবা এদিকি।

দুই

মেয়েমানুষ বটে। উঠোনে পা দিতে না দিতেই সাড়া পড়ে গেল। পশ্চিমধারে ভিটের গায়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে যে কুকুরটা ঘুমিয়েছিল এতটা সময়, আচমকা উঠে বসে লেজ নাড়তে লাগল ময়নার সামনে দাঁড়িয়ে। কাতলা জেগে উঠল যেন তা দেখেই। উঠে বসে মা, মা করতে লাগল। নিমগাছের ডালে যে কাকটা গম্ভীর হয়ে বসেছিল অনেকক্ষণ, হঠাৎ ডানা মেলে এক চক্কর মারল উঠোনের আকাশে। ময়নার হাতের থলেটা বেশ ভারী। চাল কিনে এনেছে. ময়না মাটিতে উবু হয়ে বসে থলের ভিতর থেকে কী যেন বের করতে থাকে। খয়রা কৌতূহলী চোখে তাকিয়েছিল ময়নার দিকে। কী আনল বউ, যার জন্য পথ থেকে ডেকে আনল তাকে। ময়নার মুখখানি ঘামে ভেজা। ব্লাউজের পিঠ ভিজে গেছে হাইরোড থেকে এতটা হেঁটে আসায়। মাথায় রুক্ষ চুলের বোঁয়াগুলি থিরথির বাতাসে কাঁপছে। রোগাটে শরীর, খাটতে পারে খুব। দিন কয় তকো বামনঘাটা থেকে চুনোমাছ কিনে কসবা বাজারে বসছিল। কিন্তু তাতে নানারকম ফ্যাকড়া। লাভের মুখ দেখাই যায় না। পয়সা এদিক ওদিক দিতে দিতেই শেষ। আই বাপ! কী বের করে ময়না। না, মোটরগাড়ি, দাম দেওয়া, আলো জ্বলা। চেপে ঠেলে দিলেই বোঁ ওঁ ওঁ আওয়াজ হবে।

ময়না বলল, পড়েই থাকে, ছাবালডার অ্যাত্তো খেলনা।

লিয়ে এলি, না হাতে করে দেছে?

হাতে করে কেউ কিছু দেয়, পড়েই থাকে সব, খোঁজই হবে না। বলতে বলতে ময়না মোটরগাড়িটা উঠোনে বসিয়ে দিয়ে কাতলাকে ডাকে, আয় সোনা।

কাতলা নামছিল রোগা রোগা পায়ে। দাওয়া থেকে দৌড়ে এসে সে গাড়ির পাশে বসে পড়ল, যেন বড় দৌড় জিতল। ন্যাংটো কাতলা ধুলোমাটিতে বসে লাল রঙের গাড়িটার গায়ে হাত বুলোতে থাকে, যেমন ময়না ফিরে এসে কাতলার গায়ে রাখে, সেইরকমই। ময়না দেখতে দেখতে একটু আগে বলা কথার সূত্রই ধরল বাবুর ছেলের কী নেই, মোটর, রেলগাড়ি, উড়োজাহাজ, কথাবলা পুতুল, পাঁচরকম বাজনা, বন্দুক, তুলোর কুকুর, বাঁদর, দেখলি চোখ টেরে যাবে, ক'দিন ধরে ঝুঁকতিলাম গাড়িডা নেব বলে।

চেয়ে নিলিনে কেন?

আহারে ধম্মোপুত্তুর, চেয়ে খ্যাটনের ভাত পাচ্ছ তাই ওর'ম মনে হয়, দেবে?

দিতেই পারে।

দেয় না, আর চেয়ে নিতি গেলি সন্দেহ করবে, চেয়ে কেউ লেয়, এই যে মাঠ পুকুর, জমিন, ভেড়ি, ভিটে পর্যন্ত লিয়ে লেচ্ছে, চেয়ে নেচ্ছে?

চেয়ে তো লেছেই, লুটিশ দেচ্ছে না? বলে খয়রা বুঝল কথাটা জুতসই হল না।

লুটিশ মানে হুকুম, আমরা যদি বলি দেব না চাষ জমিন, ভেড়ি, নেবে না কুম্পানি ?

খয়রা চুপ করে থাকে। মেঘের ছায়া এতসময় ব্যাপ্ত হয়েছিল এই গ্রামভূমিতে, তার আড়াল থেকে পড়ন্তবেলার লালচে রোদ আচমকা ছড়িয়ে পড়ে মাঠের উপর। ভিটে এই উঠানের পশ্চিমে, ফলে রোদটা উঠোনের উপর গড়াল না। কিন্তু একটি ফালি দক্ষিণ প্রান্তে লম্বালম্বিভাবে পড়ল উঠোনের প্রান্তে, সেই রোদের ভিতরে পেয়ারাপাতার ছায়া ঝিলমিল, নানা নকশা। খয়রা ওই ছায়া আলোর দিকে তাকিয়ে থাকল। ঠিক সেইসময় কাতলা কেঁদে উঠল। চমকে ঘুরে তাকিয়ে দেখে ধুলো মাটির উঠোনে গাড়িটা ঠেলে নিয়ে যেতে পারছে না খোকা। সে তাহলে এখন ওই মোটরগাড়িতে ব্যস্ত হোক। খয়রা মোটরগাড়ির সামনে উঁচু হয়ে বসে চালাতে চেষ্টা করল, এই যে মনি, এরকম চলে, আলো বেরোবে দ্যাখপা, বোঁ বোঁ আওয়াজ হবে, দ্যাখপা ?

আলো ফিস করে জ্বলে আর জ্বলে না। গাড়ি আটকে যাচ্ছে উঠোনের ধুলোয় তাই আওয়াজ নেই। চাপ দিয়ে মাটিতে ঠেলতে গিয়ে ধুলো জড়িয়ে যায় চাকায়, স্প্রিং-এ। ময়না তার থলে নিয়ে রান্নাশালে গিয়ে বসেছে। মাটির হাঁড়িতে চাল ঢালতে ঢালতে বলে, ঠাকমার সেই সাপ দু'ভাগ হয়ে গেছে বুলডজায়। পলাচ্ছিল তিনি।

মুখ তুলল খয়রা, আমারে ডাকলি কেন পথ থেকে ?

ড্যাকরাটা কী বলতিল ?

ওই সাপের কথা, কিন্তু মুণ্ডুটা কোথায় গেল ?

মুণ্ডু ! ময়না অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল।

খয়রা আবার গাড়ি চালানোয় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কিন্তু বাপ ও ছেলের ঠেলাঠেলিতে কলের মোটর তার দক্ষতা দেখাতে মোটেই উৎসাহী নয়। শেষে খয়রা হাল ছেড়ে দিয়ে ছেলের কাছে গাড়িকে রেখে উঠে দাঁড়ায়, ভালো না মটোরটা।

খারাপ কিসে, কালই ও বাড়ির খোকা চালাচ্ছিল।

তবে যে বললি পড়ে থাকে।

থাকেই তো, খোকার কত গাড়ি, যেটা ইচ্ছে চালায়, যেটা ইচ্ছে ভাঙে। চালের কলসি দু'হাতে ধরে ময়না নেমে আসে ভাঙা রান্নাশাল থেকে, দাওয়ায় উঠে শোওয়ার কামরায় ঢুকতে ঢুকতে বলে, ধড়টারে পুড়ায়নি, নোতনমাটি চাপা পড়েচে।

খয়রা চালের বাতা থেকে বিড়ির কৌটো, খ্যাঁচাকল লাইটার নিয়ে বিড়ি ধরিয়ে বুড়িকে ডাকে, ও ঠাম্মা, ঘুমালে নাকি ?

বুড়ি চমকে ওঠে, না ঘুমাব কেন, সাধুরে পুড়ায়নি ?

না, পুড়াবেই বা কী করে মুণ্ডু পায়নি, মুখে আগুন দেবে কী করে ?

বুড়ি বলে, গাঁ যখন দিবে, এভাবে আঘাত করে কেন, কতকালের কথা, পঞ্চাশের

সেই ভাত ভাত করে কান্না, সব চলে গেল গাঁ ছেড়ে, সাধু ছেল, আর তোর বাপরে নে আমি, ভিটে ছাড়িনি বাপ।

খয়রা বলে, আমি এট্টু ঘুরে আসি।

ময়না বেরিয়ে আসে ঘর থেকে, যাবা কুথায় ?

হাইরোড।

না যেতি হবে না, দুবলা মানুষ ঘরে বসে থাক। বলতে বলতে ময়না নেমে কাতলার পাশে বসে, গাড়িটা ঠেলতে চেষ্টা করে। না পেরে বলল, এখেনে চলবে না।

চলবে না কেন ?

শানের মেঝে ছাড়া চলে না।

শানের মেঝে এখেনে কুথায় ?

এখেনে চলার গাড়ি ওডা লয়, যাকগে ও খেলুক ওই নিয়ে। ময়না কপালে হাত দেয়, বিড বিড় করে, অত বড় বট বিরিক্ষ, কেটে দিল।

ও খয়রা, ওরা আমাদের বট বিরিক্ষ দেবে ? বুড়ি ডাকে।

খয়রা জবাব দেয় না। ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে মুখোমুখি বসে, খ্যা খ্যা করে আচমকা হেসে ওঠে, বেচে দে আসব বামনঘাটায় ?

কেডা কেনবে ?

খয়রা চুপ করে থাকে। ময়না দু'হাতের নখে উকুন ভর্তি মাথা চুলকোতে থাকে। দু'আঙুলে উকুন বের করতে করতে বলে, এর চেয়ে খোকার জামা প্যান আনলি ঠিক হত।

উঠোনের প্রান্তের রোদের ফালিটি নিঃশেষ হয়ে গেছে। পথের ওপাশের মাটি ফেলা মাঠের রোদও শেষ প্রায়। সমস্ত দিন যে আকাশ আলো দিয়েছিল, সেখান থেকে নামছে গুঁড়ো গুঁড়ো অন্ধকার। মিহি ধুলোর মতো তা ছড়িয়ে যাচ্ছে দিগন্তে। ওই আসছে পুঁটি, তপসে। খয়রা দেখল কোন ফাঁকে বুড়ি ঠাকমা তার ভাঙা মাজা নিয়ে উঠোনে এসে বসেছে। তিনজনে যেন গোপন সভায় বসল। তাতে এসে যোগ দিল পুঁটি। তপসে গিয়ে মায়ের গলা জড়াল, খিদে পেইছে।

মুড়ি আছে লিয়ে খা।

তপসে ছুটে গেল দাওয়ায়। দাওয়া থেকে ঘরে। ময়না চিৎকার করে ওঠে, হাত পা ধুয়ে আয়, ও পুঁটি ভাই সব ফেলে দেবে।

এসব নিত্যদিনের চিত্র। খয়রা বিড়বিড় করে, যদি শানের মেঝে দেয় কুম্পানি—।

কী হবে ?

গাড়ি চলবে তখন।

হ্যাহ্! ময়না ঝট করে উঠে পড়ে কাঠকুটোর স্তূপ থেকে পাঁজা নিয়ে খোলা রান্নাশালের সামনে নিয়ে রাখে, শানের মেঝে দেবে, বয়ে গছে, শেষে না পথে

গে উঠতি হয়, এ ভিটের মালিক কেডা?

বাবুদের জমিন।

তবে তো বাবুদের ঘর দেবে। ময়না বলে উঠতেই গা ঠাণ্ডা হয়ে গেল খয়রার, বলে, আমাদের নাম লিখে নে গেছে কুম্পানিব লোক।

বুড়ি ফিসফিস করে, কী অভাবেব দিন, ভাত মেলে না, ফ্যান মেলে না, তোর বাপরে লিয়ে এ ভিটেতে আমি আছি, আর ছেল ওই সাধু, বটগাছের কোটরে, মানুষের ভাত নেই, সাপের খাদ্য নেই, ইঁদুর ব্যাঙ মেরে মানুষই খায়, কী রোগা হয়ে গেছেন তিনি, পথেঘাটে দেখা হত তো, মাটি ঘষে ঘষে যাচ্ছেন, পথ ছেড়ে দিই, আপনাআপনি চলে যান।

আহ্, থামো তো। খয়রা ঝাঁজিয়ে ওঠে, যাওনি কেন, গেলি আজ এ অবস্থা হত না।

গেলি তো বাঁচতাম না।

না বাঁচতি, না বাঁচতি, বেশি বেঁচে লাভ কী?

আতঙ্ক দাস ঢুকল উঠোনে, এ খয়বা,খয়রা. বিধানডা কী বলে দিতে বল ঠাকমারে।

ময়না ওধার থেকে বলে, কিসের বিধান?

বটের চন্দ্রবোড়া মরেচে।

বাপের ছেরাদ্দ যেমন হয়, কব গে। খ্যানখ্যান করে ওঠে ময়না, সাপ, ব্যাঙ, ইঁদুর, কচ্ছপ, মাছ কত মরল, ধান মরল চেরকালের জন্যি, উনি বিধান লিতে এয়েচেন।

কথাগুলো গায়ে মাখে না আতঙ্ক দাস। উঁচু হয়ে বসে বুড়ির মুখোমুখি। বুড়ি দু'হাতে জোড় করে অদৃশ্য দেবতাকে স্মরণ করে আকাশে মুখ তোলে, বিড়বিড় করে, উনার মিত্যু নাই, মুণ্ডুটা নাই যখন উনি আছেন এখেনেই, কিসের কী বিধান?

আতঙ্ক ভঞ্জনের ভ্রূ দুটি কুঁচকে ওঠে, ওসব বললিও থাকতি পারা যাবে না এখেনে।

কথাটা কানে গেছে ময়নার, বলে ওঠে, তুমি কেডা গো, তুমি এসব বল কেন, থাকপ না যাব সে উনিত বোঝপেন, সাধু।

সাধু! অস্ফুট শব্দ করে ওঠে আতঙ্কভঞ্জন।

হ্যাঁ, সাধু। বিড়বিড় করে বুড়ি, কত লোক মরল, কত মানুষ গেল আর ফেরল না, ভাত নাই, বাবুদের কাছারি বন্ধ, ধান চাল সব কলকেতায় পাঠায়ে খালাস, কলকেতার ধান চাল আবার কোন কুম্পানি কিনে লিয়ে গাপ করে ফেলছে, বেধবা মেয়েমানুষ, খয়রার বাপরে বুকে লিয়ে গাঁ ছাড়ব তো পথের উপরে তিনি শুয়ে, কী হলুদ বরণ, ফণাখানি অ্যাত্তো বড়, তার উপরে কেষ্ট ঠাকুরের খড়মচিহ্ন, তিনি থাকলেন আমরাও থাকলাম মায়ে-পোয়ে, তিনি বটের কোটরে থাকেন, মাঝেমধ্যি

আসেন এই ভিটেতে, জোছনারাতে একদিন ঘুম ভাঙল, বোশেখ মাস, দেখি সাধু বসে আছেন মনসাথানের সামনে, আসলে উনি মা মনসাবে তুষ্ট করতে আসতেন।

তাহলে কী হবে? আতঙ্ক জিজ্ঞেস করে বুঝল তার প্রশ্নের কোনো মানে নেই।

হবে আবার কী, সাধুর মরণ নাই।

দু'খণ্ড হলে বাঁচে?

অত অভাবে বেঁচেছে যখন! বুড়ি ফিসফিস করে, যেটুকুন গেছে অঙ্গ থেকে সেটুকুন আবার পূরণ হয়ে যাবে ঠিক, সাধুরে ঠিক দেখতি পাবা।

অন্ধকার হয়ে আসছিল। চুলো জ্বলে উঠেছে। চুলের উপরে ভাতের হাঁড়ি চেপেছে। আতঙ্ক দাস আড়চোখে খয়রার বউকে দেখছিল। অগ্নিশিখায় মুখখানি টসটস করছে। তার এই সময়ে নজরে পড়ল মোটরগাড়িটাকে, বাহ্, কে দিল?

কী দরকার? উঠে দাঁড়াল ময়না।

দামি গাড়ি।

চুরি করে লিয়ে আসছি! ময়না বলে ওঠে, তুমি যাও দেখি, বুড়োর সাপের অঙ্গ কাটা গেছে, ওর মুণ্ডু ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আতঙ্ক বলে, কুম্পানি এডা ঠিক করেনি।

কী?

বটগাছডারে কাটা।

যাও তো। ময়না হিসহিস করে ওঠে, মাঠ গেল, জমিন গেল, ভেড়ি গেল, মাছ গেল, তো বটগাছ, থাকপে কেন?

তবু তো রাখা যেত।

ময়না বলে, যাও না, কুম্পানির কাছে বল গে, এখেনে কেন?

পকেট থেকে টর্চ বের করে আতঙ্ক। নতুন ব্যাটারি, শন শন করে ছড়িয়ে যায়, আতঙ্ক সেই আলো দেখিয়ে ময়নার দৃষ্টি আকর্ষণ করে, বলে, নতুন গাঁ হলে, বটগাছ লাগানো হবে ফের, তা গাড়িটা কাজের বাড়ি থেকে দেছে?

ময়না জবাব দেয় না। খয়রা বলে, আতঙ্ক তুই যা, সাধুর গায়ে ঘা লেগেছে।

এবার আতঙ্ক যায়। অন্ধকারে উঠানে বুড়ি ঠাকমার সামনে বসে থাকে খয়রা। ময়নার ভাতে ফুট আরম্ভ হয়েছে। ময়না বলল, ঠাকমা তুমি সাধুরে ছেড় না।

তার মানে? খয়রা জিজ্ঞেস করল।

ময়না চুলোর কাঠ টেনে আগুন কমিয়ে উঠানে এসে বসে। অন্ধকারে তাকে ছুঁয়ে আছে পুঁটি, তপসে, কাতলা। খয়রা আবার বিড়ি ধরায়, ময়না বলে, এখন যদি একটা কাটত লতায়।

কী বলিস?

ওই আতঙ্করে যদি কাটত!

কী বলছিস তুই?

তাহলে বিশ্বাস হত সাধুর কথা।

বুড়ি বলে, লোকের অনিষ্ট কামনা করতি নেই মা।

ময়না চাপা গলায় হিসহিস করে, এমন কথা তো শুনা যেত লতায় কেটে মরেচে দুষ্ট মানুষ।

হয় না এসব, মোর বাপ কি দুষ্ট ছিল?

সাধু যদি কাটত একটা কুম্পানির লোক।

কী বলিস তুই! চাপা গর্জন করতে চায় খয়রা, ততটা পারে না, বিড়বিড় করে, তোর স্বভাবডা দিন দিন মন্দ হয়ে যাচ্ছে, ওরা তো ভিটে দেবে বলেচে।

এ তো বাবুদের জমিন।

এত বছর আছি।

আছ আছ! ময়না বলে, বাসে শুনতিলাম যাদের জমিন তারাই সব পাবে, যারা আমাদের মতন, তাদের কিছুই নাই।

অন্ধবুড়ি, তার নাতি, নাতির ছেলেপুলে সব চুপচাপ। ময়না কপালে হাত দেয়, তারপর আচমকা বুড়িকে জিজ্ঞেস করে, তুমি যা বল সব সত্যি?

বুড়ি আকাশে তাকায়। বুড়ির চোখে সব অন্ধকার। আকাশের কোনো তারাই চোখে পড়ে না, বিড়বিড় করে, সত্যি না হলে এত বছর কী নিয়ে আছি?

সাধুরে তুমি কখনো দেখেছ?

বুড়ি বলে, হ্যাঁ

মিথ্যে বল কেন?

তুই থাম দেখি। গরগর করে ওঠে খয়রা, না দেখলি সাধুর কথা জানল কী করে সব মানুষ?

ময়না উঠে দাঁড়ায়, সব মিথ্যে, মিথ্যে, সাধু আজ মরেচে, সাধুর মরণই হয়।

অন্ধবুড়ি থমথমে হয়ে বসে আছে। ময়না ভাত নামায় চুলো থেকে।

তিন

সেদিন কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠল অনেক রাত্রে। ছেলেমেয়েরা সব ঘুমিয়ে আছে। উঠোনে বসে আছে ময়না, খয়রা আর অন্ধবুড়ি। পুব আকাশে চাঁদখানি পোড়া হলুদ রঙের। অন্ধবুড়ি বলছিল, সাধুকে দেখার বৃত্তান্ত। সেই হলুদবর্ণের বিষধর কতবার পথে দেখা দিয়েছে তাকে সকালে, দুপুরে, সন্ধ্যায়। সেই দুর্ভিক্ষের দিনে একলা এই এত বড় গাঁয়ে বাসের সময় ওই সাপের ভরসায় না ছিল এখানে। সাপও ছিল তার ভরসায়। তখন না খেতে পেয়েও বেঁচেছে, আর এখন কিনা ধান আছে, ভাত আছে, পান সুপারি আছে, গায়ের বস্ত্র আছে, ঠাণ্ডা বাতাস আছে, মেঘ আছে, রোদ আছে, তবু প্রাণে ঘা লাগছে।

কোলে মোটরগাড়িটা নাচায় ময়না, বলে, তুমার সাধুর ক্ষমতা নাই।

অন্ধবুড়ি চুপ করে আছে। পাতলা অন্ধকারে তার প্রায় দৃষ্টিহীন চোখে জলবিন্দু। ময়না বিড়বিড় করে, বাবুর বাড়িতে সব আছে, যা এখেনে ছিল, দেখলি এত লোভ হয়।

আনলি তো মটর।

কথাটা কানেই নেয় না ময়না, বিড়বিড় করে, কাচের বাক্সয় লাল নীল মাছ, বাঘ, বাঁদর, হাঁস, সাপ, বেজি, টিয়াপাখি, দেওয়ালে কত বড় ছবি, ঠিক যেন এই গাঁ।

মটর ফিরোয় দিয়ে আয়।

ময়না শোনে না, বলে, এত লোভ যায়, যা দেখি লোভ হয়।

লোভ ভালো না। বুড়ি বলে।

থামো তো। গরগর করে ওঠে ময়না।

অন্ধকার পাতলা হয়ে আসছিল। চাঁদের আলো ফুটছিল। পাতলা চোখের জলের মতো আলোয় মানুষ তিনটি পরস্পরের মুখ দেখছিল। ময়না ভাবছিল বাবুদের ঘরের কথা, ঠিক আর কোনটা নেওয়া যায় ফাঁক পেলে। আর একটা মোটরগাড়ি? উড়োজাহাজ, রেলগাড়ি? কথাবলা পুতুল? খয়রা ভাবছিল রোগা পায়ে কী কাজ জুটোনো যায় কোম্পানিতে! আতঙ্ক দাসকে ধরে চলে যাবে কোম্পানির পায়ে। আর বুড়ি তার অন্ধ চোখে দেখতে পাচ্ছিল হলুদবর্ণের সাপটিকে। ফণা তুলছে তার সামনে। বুড়ি ডাকে, আয়, বিষ ঢাল, আর আমার বাচার সাধ নেই সাধু। অম্বুবাচির আগে কাট, এ জগতে আর মাটি ফসল ধরবে না।

সেই জোছনার ভিতরেই বৃষ্টির তিনটি ফোঁটা পড়ল তিনজনের গায়ে। অচেনা নক্ষত্রের জল। ময়নার হাই ওঠে। সে ধীরে ধীরে ঘরের দিকে যায়। খয়রা অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকে, তারপর উঠে যায়। থাকে অন্ধবুড়ি একা। সেও উঠে যায় আর একটু বাদে। উঠোনটা একা পড়ে থাকে। উঠোনে চাঁদের আলো থাকে নিঃশব্দ, মৃতের মতো শয়ানে, সাদা কাপড়ে মোড়া থাকে মৃতটির দেহ। আর ছিল মোটরগাড়িটি। ময়নার ঘুমের ভিতরে আলো জ্বলে ওঠে গাড়িটিতে। চলতে শুরু করে উঠোনময়। তার নিচে চাপা পড়ে যায় চন্দ্রবোড়ার মুখখানি। চাকায় গুঁড়ো গুঁড়ো হতে তা কতক্ষণ? নিজের অজান্তে, স্বপ্নের ঘোরেই না চিনে নিজের মরণকে ডাকে মানুষ, হ্যাঁ, মানুষই।

সোলেমানের ডিঙা

শচীন দাশ

এক

ফাল্গুন মাস। ফুরফুর করে হাওয়া দিচ্ছে।

একটু বেলায় তিন পয়সার ঘাটে এসে দাঁড়াতেই গুণেনের চোখে পড়ে দু'দুটো নৌকা। দাঁড়ে টানা নয়, ভেতরে মেশিন লাগানো। মেশিন বলতে আট- ঘোড়ার পাম্প। তেল ভরে চালু করলেই ভটভট করে শব্দ ওঠে। শব্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পেছনের পাখাটাও ঘুরতে থাকে, নৌকাও তখন ছোটে জোরে— এক ঘণ্টার পথ মাত্র আধঘণ্টার ভেতরেই ফুরিয়ে যায়। এদেশে কাজকর্মে সুবিধের জন্য ব্যাপারিদের নৌকায় এই মেশিনের চল লেগেছে -- ওই ভটভটি শব্দ থেকেই দাঁড়িয়েছে ভটভাট।

কিন্তু ওটা কী, কার নৌকা ওখানে? এদিকে ওদিকে তাকিয়ে আস্তেধীরে জলের কাছাকাছি এগিয়ে যায় গুণেন মণ্ডল। অবাক হয়ে দেখে, নৌকা দুটোর সামনে হাত কয়েক তফাতে আরও একটা নৌকা। তবে ও-দুটোর মতো এত বড় নয়, মাঝারি আকারের, কিন্তু দেখতে ভারি সুন্দর। নিচে নৌকার গায়ে, কালোর ওপরে সাদার বর্ডার, ওপরে ছই-এর গায়েও লাল-সাদা রঙের কারুকাজ। ভেতরে নৌকার পাটাতনের ওপরে ভারী একটা কম্বল। কম্বলটা ভাঁজ করে বিছিয়ে রাখা।

গুণেন অবাক হয়। এ নৌকাটা আবার কার! তবে কি অঘোর হালদার এটাও সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে— ছেলে আর ছেলে-বউকে নিয়ে যাবে বলে? কিন্তু এ নৌকায় তো মেশিন নেই। মেশিন না থাকলে দশ মাইলের রাস্তা একবেলায় পাড়ি দেবে কি করে! তাও আবার সঙ্গে এত জিনিসপত্র। বাসনকোসন থেকে সোনাদানা কী না আছে। আজকাল এতসব নিয়ে নদী-নালায় যাওয়া বড় বিপজ্জনক। চেনা লোকও মানে না। ভয় দেখিয়ে মেরে ধরে সব নিয়ে চলে যায়। তবু ভটভটি

থাকলে রক্ষা, তাড়াতাড়ি দিনে দিনেই পৌঁছানো যায়। কিন্তু দাঁড়ের নৌকায় আর যাবে কতক্ষণে!

ভাবতে ভাবতে গুণেন চিন্তায় পড়ে। আবার ভাবে, কী জানি হয়তো এটা আদৌ অঘোরের নৌকা নয়; সে মিছিমিছিই ভাবছে। হয়ত আজ সকালে কেউ এসেছে এটা নিয়ে, কাজের চাপে গুণেন আর টের পায়নি। কিন্তু কেই-বা আসবে? একে এত দূর, তার ওপর এমন এক গণ্ডদ্বীপ— কেউ তো আসেই না, যদিও বা এল তো একটা ঘটনা ঘটল; সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঘরে খবর পৌঁছে যাবে। অথচ এ দু'দিনে তো তেমন কিছু কানে আসেননি গুণেনের। তাছাড়া ধানকাটার পর, দেড়-দুমাসের ভেতরে এবার এ-দ্বীপের বড় উৎসব গুণেনের মেয়ের বিয়ে। গত বছর তবু এ সময়টায় ক্লাবের ছেলেরা মিলে যাত্রা করেছিল। আশপাশ থেকে দু'চারটে নৌকাও এসেছিল ঘাটে। কিন্তু এবার তো সেসব নয়, কিছুই হয়নি এখনো। তবে ও নৌকাটা কার! তাহলে কি অঘোরই নিয়ে এল সঙ্গে করে?

মাথা চুলকোতে চুলকোতে গুণেন পেছনে ফেরে। জলের ধার থেকে আস্তে আস্তে বাঁধের ওপরে উঠে যায়! মাঝি-মাল্লাদের কেউ থাকলে তবু জিজ্ঞেস করা যেত; কিন্তু কেউ নেই; অঘোরের মাঝিরা এখন গুণেনের বাড়িতে। অবশ্য এরা না থাকলেও ঘাটে একটা এক-মাল্লাই রয়েছে। মাঝিটি বোধ হয় রান্নায় ব্যস্ত। কী জানি, জিজ্ঞেস করলে হয়তো কিছু জানা যেতে পারে। পেছনে ফিরেও গুণেন আবার এগিয়ে যায়।

হেই মাঝি— অই রঙদার নৌকাটা কার হে?

ভোরের দিকে পীরখালির ওপার থেকে কিছু রূপবতী মাছ ধরা পড়েছিল জালে, তারই কিছু নিয়ে পেঁয়াজ রসুন দিয়ে ছালুন তৈরিতে ব্যস্ত ছিল মাঝিটি। গুণেনের কথায় রান্না থেকে মুখ তুলল।

আজ্ঞি, অই তো আপনার বড় কুটুমের গো! অঘোর হালদার নিয়ি আসিছে—

যা ভেবেছিল। অঘোর ছাড়া আর এ-কাণ্ড কার! পাগল আর কাকে বলে! ভটভটির সঙ্গে আবার দাঁড়ে-টানা নৌকা নিয়ে এসেছে। কিন্তু কারণটা কি! কিছুই বুঝতে না পেরে গুণেন যখন আবার এগোচ্ছে ঠিক সে সময়েই চোখে পড়ল মেয়ে-জামাইকে সঙ্গে নিয়ে ঘাটের দিকেই এগিয়ে আসছে গুণেনের বাড়ির লোকজন। পেছনে পেছনে অঘোর হালদার ও অন্যান্যরা। সামনে বরণকুলো হাতে গুণেনের বউ। দুই শালি আর ভায়রা। ছোট ছেলেটা পাশে পাশেই আছে। দিদির সঙ্গে যাবে। কিন্তু বড়টাকে এর ভেতরে কোথাও দেখল না গুণেন। পিঠোপিঠি ভাই-বোন; মেয়েটার বিয়ে হয়ে যাওয়ায় খুব ভেঙে পড়েছে।

ভাঙারই কথা। মেয়েটা ঘরসংসার মাত করে রাখত। সকাল থেকেই শুধু পারু আর পারু। পারু এটা কর, পারু ওটা কর। ও পারু— গেলিনি ওখানি! তা পারু যেত। হাসিমুখেই সব কাজ নিপুণ হাতে করে দিত। কিন্তু কাজ করতে করতেই

সেই না একটু ফাঁক পাওয়া, অমনি পারু হাওয়া। নিমেষে ছুটে বেরিয়ে যেত। সঙ্গে সঙ্গে আবার পেছন থেকে চিৎকার উঠত, পারু— অ পারু কোটি যাচ্ছু! শুন...শুনি যা—

কিন্তু কে কার কথা শেনে! দোষের মধ্যে তো ওই একটাই— সুযোগ পেলেই শুধু ফুরুৎ-ফারুৎ ওড়ে। টই-টই করে ঘুরবে সারাদিন। গাছে ছড়া, পুকুরে ঝাঁপাঝাঁপি করা ও ছাগল নিয়ে মাঠে চরানো থেকে সারাদিনই সময় সুযোগ মতো নদীর ধারে ধারে ঘুরছে। ঘুরছে কি— দেখবে, কোথায় নদীর চরের কোনখানে কাঁকড়ার গর্ত আছে, জোয়ারের জল সরে গেলে কোন গাছের গোড়ায় মাছ আটকে পড়েছে। একদিন তো ভয়ংকর একটা কাণ্ড করেছিল। একটা শালিখের বাচ্চাকে ছিনিয়ে এনেছিল চন্দ্রবোড়ার গ্রাস থেকে। সাহস বটে মেয়েটার। সবাই শুনে প্রশংসা করলেও, কথাটা শোনামাত্রই ভীষণ খেপে গিয়েছিল গুণেন। ঘরে ফিরতেই আচ্ছা করে হেঁতালের ডাল দিয়ে পিটিয়েছিল মেয়েটাকে। মেয়েও তেমনি। এত পিটুনি খেয়ে একটু সময় শুধু চুপ করে বসেছিল, তারপর সে বেরিয়ে গেলে পড়ন্তবেলায় মেয়েটাও আবার ছুটেছিল নদীর দিকে।

গুণেন চিন্তায় পড়েছিল। মেয়ের ভাবভঙ্গী তার ভালো লাগেনি। বয়সের মেয়ে। ষোল পার হয়ে এই মাঘেই এবার সতেরোয় পড়েছে। শরীরটাও এরই মধ্যে বেশ বাড়ন্ত, অথচ মেয়েলি স্বভাবগুলোয় এখনো যেন রপ্ত হয়ে উঠতে পারেনি ও। ঘরের কাজকর্ম করে বটে, তবে মন থাকে অনেক দূরে। আপনমনেই চোখেমুখে কেমন অদ্ভুত হাসে সে। নিজের সঙ্গেই ফিসফিস করে কী কথা বলে। ব্যাপারটা গুণেনের চোখে ভালো ঠেকেনি। অনেক ভেবেচিন্তে শেষকালে মেয়েকে নিয়ে এক মুশকিল-আসানের কাছে গিয়েছিল। ভেবেছিল, ঝাড় ফুঁকে যদি কিছু হয়। কিন্তু ফকির দেখেই অবাক। পারুলের মাথায় চামরের হাওয়া দিয়ে বলেছিল, এ মেইয়ির কিছু হয়নি বাপ। পারিস তো দেখিশুনি একটা বিয়ে দিয়ি দে—

ব্যস, সেই থেকেই বিয়ের কথাটা ঢুকে পড়েছিল গুণেনের মাথায়। কিন্তু ঢুকলেই তো হয় না, পরিবেশ অনুকূলে থাকতে হয়। কাজেই বিয়ের কথা ভাবলে কী হবে, মেয়ে শুনে জেদ ধরে, বিয়ের পিঁড়িতে বসবে না সে। জোর করে দিলে সে মাজরা পোকার ওষুধ খাবে। তা মেয়ের কথাবার্তায় ভয় পেয়েছিল গুণেন। জোর করে বিয়ে দিলে যে মেয়ে বিষ খাবে তাতে সন্দেহ নেই; এ মেয়ের সে ক্ষমতা আছে। অগত্যা কী আর করা— মেয়ের জেদের ফাঁদেই ধরা দিয়ে বিয়ের চিন্তাটা মাথা থেকে সরিয়ে দিয়েছিল গুণেন।

দিয়েছিল, অথচ যোগাযোগটা তবুও হল। ধানকাটার পর এই মরসুমেই এসেছিল নবদ্বীপ। গুণেনের ছোট ভায়রা। সেই-ই এসে জানিয়েছিল বড়গঞ্জের অঘোর হালদার তার ছেলের বিয়ে দেবে। সুন্দরী পাল্টি ঘরের মেয়ে খুঁজছে। সে বলে এসেছে পারুর কথা। অঘোর বলেছে, পছন্দ হলে এই ফাল্গুনেই শুভ কাজে নামবে। এখন

গুণেন যদি রাজি হয় তবে অঘোরকে মেয়ে দেখতে আসতে বলা যায়।

গুণেন তো শুনেই অবাক। একে অঘোর হালদারের ঘর, তার ওপর বড়গঞ্জের মতো জায়গা। বিয়েটা হলে মেয়ে সুখী হবে। কিন্তু মেয়েকে রাজি করার সাধ্য কার! সব শুনে শেষে ভায়বাকে বলতেই ভায়রা রাজি করাবার দায়িত্ব নিয়েছিল। পারুকে ডেকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে শেষে বলেছিল, তুই না বলিস না পারু—। বড়গঞ্জ বড় জায়গা। কত্ত পাকা বাড়ি সেঠি। সারাদিন শুধু পায়ের ওপরি পা তুলি থাকবি। তা বাদে অঘোরির ছেলি বিজয়ির তুলনা হয় না। তোরি ভালবাসবে। সেন্ট দিবে পাউডার দিবে। তোরি নিয়ি ঘুরেও বেড়াবে। তুই রাজি হয়ি যা পারু— মেইয়ি মানুষির স্বামী-সংসারই আসল ধর্ম।

ভায়রার কথায় কী যাদু ছিল কে জানে। কথার জালে পারুলের ধরা পড়তে আর দেরী হয়নি। আস্তে ধীরে এরপর সে রাজি হয়েছিল। শুধু মুখে জানিয়েছিল, বিয়ে করছে ঠিকই তবে মাঝে মধ্যে তাকে এখানে আসতে দিতে হবে।

তা অঘোর আপত্তি করেনি। করবেই বা কেন। বিয়ে হলেও মেয়েদের বাপের বাড়ির দিকে একটু টান থাকে। না যেতে দিলে চলবে কেন! তেমন হলে অঘোব নিজেই এসে দিয়ে যাবে পারুলকে।

অঘোরের কথায় মুগ্ধ হয়েছিল গুণেন। আরও মুগ্ধ করেছিল, কোনো দাবি নেই শুনে। নেই মানে অঘোর কিছু চাইবে না। মেয়ে গুণেনের এবং একমাত্র। কাজেই কী দেবে না দেবে তা গুণেনের নিজস্ব ব্যাপার। মেয়ে পছন্দ হয়েছে এতেই তারা খুশি। তবু মেয়ের বাপ হয়ে গুণেন কি মেয়েকে যেমন তেমন পাঠাতে পারে। তাছাড়া অভাব কোথায় গুণেনের? মা-লক্ষ্মী তো ক্ষেত-খামার আলো করে বসে আছেন। ঘরে-বাইরে সর্বত্র তাই প্রাচুর্যের চিহ্ন। গুণের অতএব সাজিয়েই পাঠাল মেয়েকে। বাসনকোসন, সোনাদানা আর শাড়ি ব্লাউজ থেকে দেয়নি এমন জিনিস নেই। এমন কী বড়গঞ্জে অর্ডার দিয়ে আলমারি ও পালঙ্ক দিতেও ভুল করেনি। সে দুটো অবশ্য নদী পার করে আর এদিকে আনেনি গুণেন। বড়গঞ্জের দোকান থেকে সরাসরি অঘোরের বাড়িতেই পাঠিয়ে দিয়েছে। গুণেন হিসেবী লোক। ভবিষ্যতে যাতে কথা শুনতে না হয় সেজন্যই সাজিয়ে গুছিয়ে মেয়েকে তুলে দিয়েছে বিজয়ের হাতে।

তা সেই মেয়েই এখন সামনে। জড়সড় হয়ে কান্নাভাঙা মুখে হাঁটছে। পাশে বিজয়। টোপরটা মাথা খুলে নিয়ে গুণেনের ছোট ভায়রার সঙ্গে কথা বলতে বলতে আসছে। ছেলেটা শুনেছে ভালো। গঞ্জের শুঁড়িখানায় ঢোকে না। নদীর ধারের মেয়েছেলেদের খুপরিতেও যায় না। এখন পারুর কপাল।

গুণেন এগিয়ে যায়। ভেতরে ভেতরে একটা দলাপাকানো কান্না উঠে আসছে। মেয়ে চলে যাচ্ছে চিরদিনের মতো। একটু আগে, আশীর্বাদের পর মেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লে তাই দাঁড়াতে পারেনি আর। নিজেকে সমালাবার জন্য চটপট উঠে

পড়েছিল। নতুন বেযাই অঘোর হালদারকে জানিয়ে এর পর বেরিয়ে পড়েছিল ঘাটের দিকে।

গুণেন তাকাল। ঘাটের আশেপাশে এখন ভিড় জমে উঠেছে। তারই ভেতরে রাস্তা করে নদীর ধারে ব্যস্তসমস্ত হয়ে নেমে যাচ্ছে এখন অঘোব হালদার। সঙ্গে গুণেনের দুই ভায়রা। পেছনে পেছনে মাঝিমাল্লারাও আছে। জিনিসপত্র ধরাধরি করে নৌকায় তুলে দিচ্ছে। কিন্তু ও কি! ওই রঙচঙে নৌকাটাকে যে সামনে টেনে আনা হচ্ছে! তবে কি ওটায় মেয়ে-জামাই উঠবে নাকি! কিন্তু ও নৌকায় তো মেশিন নেই!

একটু এগিয়ে গুণেন জিজ্ঞেস করে, হালদার মশায়, ওই নৌকায় কি মেয়ে-জামাই উঠবে লাকি?

হ্যাঁ।

অঘোর জবাব দেয়, ওটা ওদির জন্যি নিয়ি আসিছি—

কিন্তু মেশিন নেই—

মেশিন না থাক, সোলেমান আছে। লৌকা গাঙশালিখের মতো উড়ি যাবে।

গুণেন অবাক হয়। সোলেমান আবার কে? নিশ্চয়ই কোনো মাঝি। তা সে যতবড় মাঝিই হোক, মেশিনের সঙ্গে পাববে কেন! তাছাড়া নদী নালাব ব্যাপার। বিপদ ঘটতে কতক্ষণ! অঘোর হালদাব যতই ভালো হোক, অন্তত এ কাজটা ভালো করছে না। একবার কিছু হলে শেষে আর ভেবেও পার পাওয়া যাবে না। তার চেয়ে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ভটভটিতে তুলে দেওয়াই ভালো।

হালদার মশয়—

চিন্তিত মুখে গুণেন এগিয়ে যায়। একবারে কাছে গিয়ে অঘোর হালদারের হাতদুটো ধরে।

আমি বলি কি তার চেয়ি মেয়ে-জামাইরি ভটভটিতে তুলি দেন। কী থার্কাত কী হয়! বলা তো যায় না—

অঘোর হাসে। আপনি দেখতিছি খুবই কাতর হয়ি পড়িছেন বেহান। না না এ নিয়ে একদম ভাববেন না। মেয়ে আপনার ঠিক মতোই যাবে। তাছাড়া আমি তো ভটভটিতে নিতি চেয়েছিলাম, কিন্তু অই সোলেমান ছাড়লনি—

সোলেমান!

হ্যাঁ— ওই ডিঙে নৌকার মাঝি। বলতি বলতি এল, দাবাবু আর বউদিরি সে নিজির ডিঙিতে তুলবে। কী করবো, ছেলিবেলা থেক্‌তি বিজয়রি কোলেপিঠি মানুষ করিছে, ওর আবদারডা না রাখি পারলাম না।

একটু থেমে নিশ্বাস নিয়ে অঘোর আবার জানায়, তবি চিন্তার আপনার কারণ নাই মণ্ডল মশয়। ও ডিঙি ভটভটির সঙ্গে পাল্লা দিয়ি চলবে। সোলিমানরি তো জানি আমি—

অঘোর জানলেও গুণেনের মন তবু মানে না। চিন্তায় তার কপালের মাঝখানে রেখা জাগে।

অঘোর বলে, নাহলি এক কাজ করতি পারেন বেহান—

গুণেন তাকালে অঘোর প্রস্তাব দেয়, আমাদির সঙ্গে চলেন। এক বেলার তো মামলা।

প্রস্তাবটা গুণেনের মনে ধরে। ডিঙি নৌকায় মেয়ের যাওয়ার কথাটা শোনার পর থেকেই ভেতরে ভেতবে একটা অস্বস্তি কাজ করছিল। এমনকি মেয়েব নিরাপদে পৌঁছোবার খবরটা না পাওয়া পর্যন্ত সে যে কোনো কাজেই মন বসাতে পারবে না, এ ব্যাপারেও সে নিশ্চিত। তাই কী করবে ঠিক বুঝতে পারছিল না. এখন অঘোরের প্রস্তাবে যেন অনেকটা হালকা হল সে। মনে মনে ভাবল, ঠিক আছে তাই করবে সে। মেয়েকে বড় গঞ্জে পৌঁছে দিয়েই সে ফিরে আসবে। ফিরে আসতে আসতে রাত হবে ঠিকই, তবু তো নিশ্চিন্তে ফিরতে পারবে।

পায়ে পায়ে গুণেন এগিয়ে যায়। সোলেমানকে একবার দেখা দরকার। কেমন মাঝি যে ভটভটির সঙ্গে পাল্লা দেয়! যতই হোক আট ঘোড়ার পাম্প-মেশিন বলে কথা! তার ওপর এই নদী!

দুই

নদী তো নয় যেন সাক্ষাৎ শঙ্খচূড়।

ফাল্গুনেব হাওয়ায় তার শীতের ঘুম ভাঙে। চৈত্রের মাঝামাঝি কুণ্ডলী ছেড়ে ওঠে। আর বৈশাখ থেকে সে হয় মত্ত সাপিনী। নিজের দেহের ওপরেই ভর দিয়ে পাঁচ ছ'হাত উঁচুতে উঠে দাঁড়িয়ে বিষাক্ত নিশ্বাস ছাড়ে। কখনো বা সে-নিশ্বাসের সঙ্গে মাথা নামিয়ে মারে ছোবল। সে-ছোবলে কোথাও বাঁধ ভাঙে, কোথাও বা বাঁধের গায়ে তৈরি হয় নানা ঘোঘ। নৌকা তো দূরের কথা, তখন এ নদীতে লঞ্চ চালাতেও সাহস পায় না সারেঙরা। ব্যতিক্রম বোধ হয় ওই এক সোলেমান।

লোকে বলে, মাঝি নয়, ও জলের পোকা। সারা জীবনই শুধু ভেসে ভেসে বেড়ালো। না করল সংসার, না হল সংসারে থিতু। আপনার বলতে সাধের ওই ডিঙিটি। তা সে ডিঙি নিয়ে শীত-গ্রীষ্ম বারো মাস এখানে ওখানে ঘুরছে।

শুধু কী ঘোরা, সোলেমান জানে কোন্ মেঘে বৃষ্টি হয়, কোন্ মেঘে জল দেয় না। আকাশের দিকে তাকিয়ে আগাম জানতে পারে সামনের বছরটা খরায় জ্বলবে না প্লাবনে ভাসাবে। তাছাড়া চাষ বল, গাছ বল, নদী বল, আর পাখি বল— সব কিছুই যেন সোলেমানের চোখমুখে ঘুরছে। বড় গঞ্জের প্রবাদ, শুভকাজ করবে তো সোলেমানকে ধরবে।

কিন্তু সোলেমান যেন ধরা-ছোঁয়ারও বাইরে।

সেই কবে এসেছিল। অঘোর হালদারেরই তখন পনের কী ষোল চলছে। স্বরূপগঞ্জ

থেকে ধান-বেচে ফেরার সময় বাপ বিপিন হালদার নিয়ে এসেছিল সঙ্গে করে। খালি গা, খালি পা। একমাথা ঝাঁকড়া চুল, আর থুতনিতে সামান্য দাড়ি। কথা যত না বলে সে তুলনায় গম্ভীর বেশি।

বিপিন বলেছিল, এই হল গে আমার ঘর-বাড়ি বুঝলে।

সোলেমান চোখ তুলে তাকিয়ে মাথা নাড়লে ঘর থেকে অঘোরকে ডেকে এনে দেখিয়েছিল, আর এই হল ছেলি অঘোর। দুই মেইয়ির বিয়ে দিয়িছি। ঘবিতি আছে আরও দুটো। আর আছে পরিবার। এদির মধ্যেই থাকতি হবে তোমাবি। চাষবাস আর ক্ষেত-খামার দেখতি হবে। তা বাদে একটা ডিঙি দুব; ওটা লিয়ি আমার কথামতো এখানি ওখানি যাতি হবে।...কী পারবে না থাকতি ?

সোলেমান আবারও তাকিয়ে ঘাড় কাত করলে বাপ বিপিন হালদার টেমি জ্বালিয়ে ওকে নিয়ে গিয়েছিল চাষঘরের দিকে।

এখানিই এখন তুমি থাকো ক'দিন বুঝলে। পরে না হয় উত্তরদিকি একটা ঘর তুলি দেব।

পরদিন।

সকালের দিকে মাঠে গিয়েই বিপিন হালদার ঘুরে ঘুরে দেখিয়েছিল তার জমিজমা।

এই দেখ এ জমিতি এবারি জয়া দুব ভাবতিছি। আর ওই জমিতি---

না না অমন কাণ্ডটি ভুলেও কোর না বাবু --

বাধা দিয়ে চোখ টান টান করে বলেছিল সোলেমান; তার পরেই জমি থেকে একটুকরো মাটির ঢেলা তুলে নিয়ে হাতের তালুতে গুঁড়ো করে দেখিয়েছিল, এ জমিতি জয়া হবেনি ভালো। বিঘে প্রতি বড় জোর পাঁচ-ছ মণ পাবে। তার চেয়ি এখানি কর্পূরতুল লাগাও—

কর্পূরতুল !

হ্যাঁ। বিঘেয় আটাশ থেকে তিরিশ মণ উঠে আসবেনে।

বিপিন শুনে মনে মনে বিরক্ত হলেও মুখে আর কিছু বলেনি। কী ভেবে সোলেমানের কথাটাই মেনে নিয়েছিল। শেষে অগ্রহায়ণেব মাঝামাঝি ধান তুলতে গিয়েই চমকে উঠেছে। একদম কাঁটায় কাঁটায় হিসেব। বিঘে হিসেবে তিবিশ মণই উঠে আসছে জমি থেকে। বিপিন ছুটে গিয়েছিল চাষঘরের দিকে।

কিন্তু ঢুকবে কি, দরজায় দাঁড়াতেই অবাক।

ঘরের এক কোণায় বসে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছে সোলেমান। হাসির সঙ্গে মাঝে মধ্যে বিড়বিড় করে কী বলছে। বিপিন বেশ ধন্দে পড়েছিল।

যে লোক হাসে না, অন্তত এ-ক'মাসে হাসতে দেখেনি একবারও সে মানুষটা এমন তাকিয়ে তাকিয়ে হাসে কেন! তাছাড়া বলছেই-বা কি বিড়বিড় করে!

একটু তাকিয়ে এর পর গলাখাঁকারি দিতেই সোলেমান তাকিয়েছিল। কিন্তু মুখের সে হাসি মিলোয়নি। বিপিন ভয় পেয়েছিল। পাগল হয়ে যায়নি তো! পাগল হলে

তো মা ুষ এমনি করেই হাসে শুনেছে। বিপিন আর দাঁড়ায়নি। ওর সঙ্গে কথা না বলেই বেরিয়ে এসেছিল। কিন্তু পরেরদিন সকালেই অবাক! এক মুনিসের মুখেই খবরটা পেয়েছিল, সোলেমান পালিয়েছে— সঙ্গে নতুন ডিঙিটি।

বিপিন থম মেরে গিয়েছিল ; মাত্র ক'দিন আগেই খরচখরচা করে বানানো হয়েছিল ডিঙিটা, অথচ যাওয়ার সময় সেটাই নিয়ে গেল সোলেম ·। কি জানি, হয়তো এই সুযোগই খুঁজছিল সে। নৌকা না পেলে হয়তো বা অন্য কিছু নিয়ে পালাতো। নাহ্,— দিনকাল যা পড়েছে, লোককে আব বিশ্বাস করার উপায় নেই। ভাবতে ভাবতে রাগে শরীরটা জ্বলে উঠেছিল বিপিন হালদারের। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে প্রায় সমস্ত জায়গায়ই চষে ফেলেছিল এরপর। কিন্তু বৃথাই চেষ্টা ; ডিঙি তো দূরের কথা সোলেমানই নেই। কেউ কোথাও দেখেনি। এমনকি মাসখানেক নানা জায়গায় খুঁজেও কেউ হদিস দিতে পারল না ওর। অবশেষে ডিঙির ক্ষতটা যখন আস্তে আস্তে মনের মধ্যে মিলোতে শুরু করেছে বিপিনের, সেই সময়েই খবর এল সোলেমানকে পাওয়া গেছে।

পাওয়া নয়, সোলেমান নিজেই এল। সোজা ঘাটে ডিঙি ভিড়িয়ে বিপিন হালদারের কাছে গিয়ে কাছে গিয়ে বলল, দাও বাবু— দেখি কি কাঝ আছে তোমাব ?

বিপিন তো দেখেই প্রথমে জ্বলে উঠেছিল। ভেতরে ভেতরে অবস্থাটা এই মাবে কি সেই মারে। কিন্তু মারতে গিয়েও কী জানি কেন হাত উঠল না। এমন কি মুখেও কিছু বলতে পারল না ; তাই যেমন সে এসেছিল তেমনিই আবার থেকে গেল। আবার আগের মতোই ফাইফবমাশ খাটতে লাগল। কিন্তু তখন আর তাব মুখে হাসি নেই। আগের মতোই মুখ চোখে আবাব সেরকম গাম্ভীর্য। কাজেব প্রতি সেরকম নিষ্ঠা আর ভালোবাসা।

বিপিন দেখছিল আর অবাক হচ্ছিল ; কিন্তু অসুখটা তখনো ধরতে পারেনি। এমন কি সন্দেহও করেনি। কেবল মাসছয়েক পরে একদিন। ঠিক তেমনি আর এক সকালে। বীজতলা থেকে ফিরতে গিয়েই বিপিনের ততক্ষণে চোখে পড়েছে— আলের ওপরে বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে আপন মনে হাসছে সোলেমান। ঠিক তেমনি হাসিটি।

বিপিন কিছু আর বলেনি ; তবে সেদিনই আবিষ্কার করেছিল— সোলেমান ঠিক স্বাভাবিক নয়। মাঝেমধ্যে এমনি একটা শূন্যতা ঢুকে যায় তার মাথার মধ্যে ; আর তখনই সে এমন হাসে। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। তখন তাকে ধরে রাখে সাধ্য কার।

সুতরাং বিপিনও পারল না। পরের দিনই ডিঙি নিয়ে আবার সোলেমান হাওয়া। তবে এবার আর খুঁজল না বিপিন। মনের মধ্যে রাগও হল না। কেননা ততদিনে জানা হয়ে গেছে তার, লো টা এক ভবঘুরে পাগল পাগলামিটা মাথায় ঢুকলেই সে হাসিখুশি, এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াবে। আর পাগলামি চলে গেলেই সে আবার অন্য মানুষ।

অঘোর তাকায়

পরপর দুটো ভটভটি। একটায অঘোরের লোকজন ও কিছু জিনিসপত্র। অন্যটায় পাটি, কলসি ও বিছানাপত্তবের সঙ্গে গুণেনকে নিয়ে নিজে অঘোর। একটু দূরে পাশাপাশি সোলেমানের ডিঙা। পাল্লা দিয়ে ভটভটির সঙ্গে ছুটছে; দাঁড়ে সোলেমান নিজে, পেছনে হালে বসেছে বছর পনেরোর এক কিশোর আর মাঝে-ছইয়ের ভেতরে বিজয়; বিজয়ের পাশে পারুল আর পারুলের ছোট পান্ত।

কিন্তু কারও মুখে কোনো কথা নেই; এতদূব থেকে তাকিয়েও বুঝল অঘোর, পারুলের চোখদুটো জলে টসটস কবছে। একটু আগে তিন পয়সাব ঘাট থেকে নৌকায ওঠাব সময় সেই যে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল, এতটা এসেও মুখের সে ভাব কাটেনি।

হবেই তো। এটাই তো মেয়েদের জন্মান্তরের সময়। শৈশব থেকে একদিকে যেমন থাকে বেড়ে ওঠাব জগৎ, বিয়েব পব অন্য জীবনে গিয়ে তেমনি তার জন্ম হয নতুন কবে। এক জন্ম থেকে অন্য জন্মে যাবার মুখে তাই নিজেকে নিঙড়ে নিয়ে বুঝতে চায সে। তবু হয়তো দু'চাবটে কথা বললে মেয়েটা একটু শান্ত হত। কিন্তু কে বলবে! বলাব মধ্যে আছে বিজয়। কিন্তু নতুন বলে হয়তো লজ্জা পাচ্ছে।

অঘোর চোখ ফেরালো। গুণেনের মুখ চোখ বেশ ভারী। মেয়ে চলে যাচ্ছে চিরদিনের মতো। তাই মনের ওপবে যেন একটা পাথর চেপে বসেছে। এ পাথরটা সরালে, কী জানি, হয়তো হাউ হাউ কবে কান্নায় ভেঙে পডবে। আসলে, এ ক'দিনে যা বুঝেছে মানুষটি অতি সবল; ভেতরে কোনো প্যাঁচ-ঘোচ নেই। নেই বলেই মেয়েকে সাজিয়ে গুজিয়ে অঘোরের ঘবে পাঠিয়েছে। দেয়নি এ হেন জিনিসও নেই। অঘোর তাই তৃপ্ত।

অবশ্য এ তৃপ্তির মূলমন্ত্রটা পেয়েছে বাপ বিপিন হালদারের কাছ থেকে। বিপিন বলত, দ্যাখ যার আছে অনেক তার কাছে চাইবি না; গুণবান লোকের দোষ-ত্রুটি ধরবি না।

কথাগুলো মনেপ্রাণে মেনে এসেছে অঘোব। মানে বলেই গুণেনের কাছে কিছু দাবি করেনি। আর সোলেমানের দোষত্রুটি জেনেও তাকে নিজের কাছে আঁকড়ে রেখেছে। অথচ বাপের কথা সে মেনে নিলেও ছেলে বিজয়কে এসব বোঝাতে পারেনি। ছেলেও তাই বেঁকে বসেছে। এ বিয়ে নিয়েই কি কম ঝামেলা হল! অঘোর তো কিছুই চায়নি; জানত যা দেওয়ার সবই দেবে গুণেন। তবু ছেলের কাছে বলতেই ছেলে বেঁকে বসল। স্পষ্ট জানিয়ে দিল, কি কি দিচ্ছে আর লিস্টি না দিলি এ বিয়িতি রাজি হবেনি সে। অঘোরের তো লজ্জায় মাথা কাটা যায় তখন। মেয়ে পছন্দ হওয়ার পর কথা দিয়েছে, এখন যদি ছেলে এমন করে! ছেলেটার এই এক দোষ— এত আছে তবু লোভটা বড় প্রবল। যাই হোক, তবু শেষ রক্ষা— অঘোরকে আর জিজ্ঞেস করতে হয়নি, গুণেনের ছোট ভায়রা নবদ্বীপই এসে

জানিয়েছিল তারা কি কি দেবে। বাস, তাতেই শান্ত ছেলেটা। এর পরে, আর কিছু বলেনি ; তড়িঘড়ি পার্বতীপুরে গিয়ে মেয়ে দেখে এসেছিল।

জামার সাইড-পকেট থেকে বিড়ির কৌটোটা বের করে অঘোর। কৌটো খুলে একটা বিড়ি নিয়ে গুণেনের দিকেও একটা বাড়িয়ে ধরে। তারপর পেট্রল-ম্যাচটা এগিয়ে দিতে গিয়ে বড় অবাক হয়। ডিঙি নৌকাটা এখন আগে আগে ছুটছে। আব ছইয়ের ভেতর থেকে মুখ বাড়িয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে পারুল।

দৃষ্টিটা বড় উদাস। কী যেন খুঁজছে। অঘোর শুনেছে, মেয়েটা ভারি চঞ্চল। সারাদিনই টইটই করে বেড়াত বনজঙ্গলে ঘুরত। আর এজন্য চেষ্টা করেও মেয়েটার বিয়ে দিতে পারেনি গুণেন। কিন্তু এবার মেয়েটা রাজি হয়ে গেল মেসো নবদ্বীপের কথায়। তবে অঘোরের দৃঢ় বিশ্বাস, বিয়ে হয়েছে এবারে চঞ্চলা হবে স্থির ; ঘর-সংসাবে আস্তে আস্তে মন বসাবে।

বিড়িটা ঠোঁটে তুলেও আবার ঠোঁট থেকে নামিয়ে নেয় অঘোর। তারপর অন্যমনস্ক হয়েই আঙুলের ফাঁকে ঘরঘব কবে ঘোরাতে থাকে।

তিন

থেকে থেকে চোখদুটো ঝাপসা হয়ে উঠছে। বুক থেকে হু হু কান্না উঠে আসছে। তারপর সেটা, সেই কান্নাটা দু'ভাগে ভাগ হয়ে এক ভাগ দলা পাকিয়ে এসে গলার ভেতরে কুণ্ডলী পাকিয়ে যাচ্ছে, আর অন্য ভাগ যেন আর একটু ওপরে উঠে শীতের নয়ানজুলির মতো, চোখ থেকে বেরিয়ে, দু'গাল বেয়ে তিরতিব করে বইছে। দৃষ্টি তাই ঝাপসা ; শীতের কুয়াশা জড়ানো নদীর মতো।

পারুল ঘাড় ফেরাল।

দু'ধারে এখন হেঁতাল আর পশুর জঙ্গল। মাঝে মাঝে তারই ভেতরে গেঁওয়া আর গরাণ। দূরে বাঁধের গায়ে আকাশমণি, সুবাবুল ও বাবলার সারি। দু-একটা বাচকা জলের ধারে ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাথার ওপরে ডিঙিটার পেছনে পেছনে উড়ে আসছে একটা গাঙশালিখ।

মুখ তুলে পাখিটাকে দেখতে গিয়েই পারুলের চোখদুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। নদীর ধারে, জলের কাছাকাছি উবু হয়ে বসে আছে একটি মানুষ ; হাতে একটা সরু লোহার তার। বেঁকানো। সেটা উঁচু করে ধরে একমনে নিচের দিকে তাকিয়ে কী দেখছে।

নির্ঘাৎ কাঁকড়া। পারুলের মনটা হু হু করে উঠল। বেশ ছিল, ভালোই ছিল। কেন যে ছাই বিয়ে করতে এল। আর করলই যদি, তো গাঁয়ের কাউকে করলেই পারত। কত ছেলে তো প্রেম দিয়েছে তাকে। গিরিদের ছেলেটাই তো বেঁকে বসেছিল সেদিন। বলেছিল, ওকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না ; কিন্তু সে-ই তো ফিরিয়ে দিয়েছে। অথচ আজ! আজ নিজেই সে বিয়ে করে চলল বড়গঞ্জে—স্বামীঘর করবে বলে।

কি জানি মানুষটা কেমন! শ্বশুর লোকটারই বা মতিগতি কি! একটু আড়চোখে একবার পাশের মানুষটার দিকে সামান্য তাকায় পারুল। আর তাকাতেই চমকে ওঠে। মানুষটা যেন দু'চোখ দিয়ে গিলে খাচ্ছে ওকে। কালও বার কয়েক এমনি দেখেছে লুকিয়ে চুরিয়ে। শুনেছে, মানুষটা নাকি আকারে ইঙ্গিতে জানিয়েছিল— ভালো দেখতে না হলে বিয়ে করবে না সে। অগত্যা গাঁ-গঞ্জ ঢুঁড়েই পারুলকে বাছা। দাবি-দাওয়া না শুনেই পাত্রী পছন্দের খবর পৌঁছে দেওয়া। তবে শ্বশুর তার বুদ্ধিমান; জানে মেয়ের বাপের আছে অনেক, দেবেও সাজিয়ে-গুছিয়ে; এ নিয়ে আর বলার কী আছে। তা বাপ তাই দিয়েছে ঢেলে। শ্বশুরবাড়ি গিয়ে যাতে মেয়ের কোনোরকম কথা শুনতে না হয়, তারই ব্যবস্থা করেছে।

তা তো করেছে; কথা না হয় শুনতে হল না, কিন্তু যদি গৃহবন্দী হয়ে যায় তবে তো আর কোথায়ও বেরোতে পারবে না। প্রথম প্রথম দু'চারদিন বউ-বউ হয়ে থাকবে, তারপরেই যে কে সেই— ঘর নিকানো, ঢেঁকিতে পাড় দেওয়া, গোয়াল ঝাঁটানো, সবই করতে হবে একে-একে।

পারুল তাকাল। নদীর ধারের সেই মানুষটির হাতে এখন একটা কাঁকড়া উঠে এসেছে। কাঁকড়াটা এবার বড় একটা মাটির কলসিতে রাখল সে। তারপর আবার সরু লোহার তারটা আর একটা গর্তে ঢুকিয়ে দিতেই পারুলের বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠল। হু হু করে কান্নাটা আবারও চোখ ছাপিয়ে আসছে।

পারুল চোখ নামাল। হাতের মুঠোর ভেতরের সিঁদুরে মাখা দলা পাকানো রুমালটা তুলেই আস্তে করে চোখের ওপরে চেপে ধরল। আর ধরতেই কে ওকে ডেকে ওঠে।

কী বউদিমণি, ওখানি কি দেখলেন! কি কাঁকড়া ধরতিছে বলেন তো—

পারুল অবাক হয়।

অই বুড়ো মাঝিটি। একগাল সাদা দাড়ি, এক মাথা সাদা চুল, কুচকুচে কালো দেহটায় এখনো যৌবনের প্রতিচ্ছবি। নাম বুঝি সোলেমান। ঘাট থেকে নৌকায় ওঠার সময় একে নিয়েই বাপ-বেটায় মতান্তর হয়েছিল। ছেলে কিছুতেই উঠবে না, বাপ বোঝাচ্ছে ওঠার জন্য। শেষে অনেক বোঝাবার পর ছেলে অবশ্য রাজি হয়েছে, কিন্তু মতান্তরের কারণটা আর আবিষ্কার করতে পারেনি পারুল।

এখনও পারল না; উত্তর দেবে কি দেবে না ভাবতে ভাবতেই আবার জঙ্গলের দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

সাপের হাঁচ বেদেয় চেনে।

না চিনলে আর সোলেমান এভাবে তাকাবে কেন। দেখেছিল প্রথম—কাল বিয়ের আসরে। কিন্তু তখনো ঠিক বোঝেনি, বুঝল তিন পয়সার ঘাট থেকে তার ডিঙিতে তোলার সময়।

মেয়েটি বড় ছেলেমানুষ। বিয়ের ফুল ফুটলেও মনে-প্রাণে যেন এখনো বিয়ের উপযুক্ত হয়ে ওঠেনি। তা বাদে সংসারে রওনা হলেও ঠিক যেন সংসারী হয়ে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবে না। এ মেয়েকে মানায় ভালো জঙ্গলে। ওড়া, কেটকি আর ক্যাওড়ার ঝোপের ভেতরে যেন ফুটে থাকা সোনালি ফুল। কিন্তু তুলে নিয়ে গৃহস্থের আঙিনায় লাগালেই তা নিষ্প্রভ।

দাঁড় বাইতে বাইতে পারুলের দিকে চোখ রাখে সোলেমান।

চোখ-দুটো বেশ ভারী। কান্নাভাঙা মুখখানা বর্ষার আকাশের মতো থমথমে। তবে মা-বাবা ও ভাইবোনের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য যত না, তার চেয়েও বেশি বোধ হয় পার্বতীপুব থেকে চিরজীবনের মতো চলে আসার জন্য। ঠিক এমনটি হয়েছিল সোলেমানের নিজের বেলায়ও, সেই মামুদপুর থেকে চলে আসার সময়।

সে কবেকার কথা। বাপ যাচ্ছে ওর জম্বুদ্বীপে। মাছের আড়তে কাজ করবে বলে। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়াল সোলেমান। মা-মরা বছর সাতেকের ছেলে। ওকে নিয়ে যাওয়া তো তখন অসম্ভব সব জেলেব পক্ষে। তাছাড়া জম্বুদ্বীপে থাকবেই বা কোথায়! চারদিকে সমুদ্দুর, তারই মাঝে একখানা দ্বীপ; জঙ্গল আব সাপখোপে ভর্তি। এরই ভেতরে চবার দিকে পরপব খুঁটি। মাছ শুকোনো হচ্ছে লাইন দিয়ে; তার যেমন গ্যাস তেমনি শ্বাস-প্রশ্বাসের অসুবিধে।

বাপ তাই রেখে গেল ওকে মামুদপুরে এক চাচাতো ভাইয়ের কাছে। এখানেই নাকে দড়ি লাগিয়ে ঘুরতে ঘুরতে একদিন বড় হল সোলেমান: বাগাল দিতে দিতে হয়ে দাঁড়াল কর্মঠ মুনিস। মামুদপুর ততদিনে তার প্রিয় জায়গা। একদিকে খাঁড়ি আর অন্যদিকে সমুদ্রের মোহানা। দিনে এক রকম আর রাতের দিকে একেবারে আলাদা; নদী তখন সহস্র চোখ মেলে সমুদ্রে যাবার তাড়নায় অস্থির।

বয়ঃসন্ধির সঙ্গে সঙ্গে সোলেমানের মাথায় ঢুকল সে সমুদ্রে যাবে; বাপ আছে এক দ্বীপে, মাছের খুঁটিতে; দূরে কয়েক ক্রোশ তফাতে উঠেছে আর একটা দ্বীপ। স্থানীয় ভাষায় চরা। শুনে সোলেমানেরও বক্তে নেশা লাগল, সে যাবে ওই চরা দেখতে। কিন্তু যাবে বললেই তো যাওয়া যায় না; এক সকালে যখন এক মাছের ট্রলার ধরে যাওয়ার আয়োজন করছে সে সময়েই খবর এল, বাপ তার মরেছে জম্বুদ্বীপে। তথ্য যা পেল তাতেই জানা গেল, বাপেব হাড়ে লেগেছিল পোকা; সেই পোকাই আস্তে আস্তে কুরে খেল তার দেহটাকে। অবশেষ একদিন কাশতে কাশতে মুখে রক্ত তুলেই মারা গেল।

বাপ মরে যেতে সোলেমানের কষ্ট হয়েছিল, তবে ভেঙে পড়েনি। ভাঙল মামুদপুর থেকে চলে আসার সময়। কেননা মামুদপুরে থাকা মানেই কোনো না কোনো সময় তবু সে চরায় যেতে পারত; এমনকি জম্বুদ্বীপে নেমে বাপের গোরস্থানও দেখে আসতে পারত। কিন্তু তা আর হল না। বাপের চাচাতো ভাই আর ঠাঁই দিল না তাকে। ব্যস—ওই তারপর থেকেই ভেসে পড়া।

তা ভাসল তো এতকাল। কত গ্রাম কত গঞ্জ ঘুরল। কিন্তু সে চরায় আর যাওয়া হল না কোনোদিন। মাঝখানে তবু জম্বুদ্বীপে গিয়ে বাপের গোরস্থান দেখে এসেছে, কিন্তু চরায় যাওয়া হয়ে ওঠেনি।

বুক থেকে দীর্ঘশ্বাসের মতো একটা নিশ্বাস বেরিয়ে এল সোলেমানের। আর সেই সময়েই ওর চোখ পড়ল আবার পারুলের দিকে। নদীর পাড়ে জঙ্গলের দিকে আবার চোখ ঘুরিয়ে নিয়েছে এখন পারুল। মুখটা এখনো সেরকম কান্নাভেজা।

সোলেমান হাসল।

কি বউদিমণি, কি কাঁকড়া বললেন না তো?

পারুল তাকাল। কিন্তু মুখে কোনো কথা নেই।

সোলেমান বলল, তবে আমি বলি। ওটি বিষ কাঁকড়া। মাথায় হলদে রঙের ছোটি ফুল আছে। ওরা ধরি ধরি গাঙের হাটে নিয়ে বেচে দেয়। পাইকের তা কিনে কমীর প্রকল্পে চালান দিবে।

তা দিক, এবার পারুলের এখন অবাক হওয়ার পালা। মানুষটা বলে কি! কাঁকড়া — তার মাথায় হলদে ফুল! কই এমন কাঁকড়া তো আর চোখে পড়েনি এতদিন।

কি দিদি, অবাক হলেন তো! অবাক হওয়ার মতো এমনি আরও কত যে জিনিস আছে এখানে।

পারুল এখন চুপ। ভেতরে ভেতরে রক্তের ধমনীতে তার জোয়ার আসে। কান্না ভেজা মুখখানায় আবার খুশির ঝলক। কিন্তু বউমানুষ হয়েছে, বাড়ির লোকেরা বলেছে বেশি ছটফট না করতে। করলে নাকি পাপ হয়। ঘরের লক্ষ্মী হয় চঞ্চলা। পারুল তাই স্থির, চোখ তুলে শুধু তাকায় একবার।

হাঁ দিদি— সোলেমান জানায়, রঙিন পাখি তেমনি মাছ। জলের ধারের নানা জায়গায় আবার কচ্ছপের ডিমও পাওয়া যাবে। সেই সঙ্গে ভীমরাজের গান —

ভীমরাজ! এবারে আর বিস্ময় চাপতে পারে না পারুল। মুখ থেকে শব্দটা বেরোতেই সোলেমান জানায়, হাঁ দিদি এক রকমের পাখি। ভীমরাজ, দুধরাজ, বকরাজ। গভীর জঙ্গলে লুকিয়ে টের পাবেন অবিকল মানুষের ভাষায় কথা বলতেছে।

কথাও বলে— স্থান কাল ভুলে পারুল এবার জিজ্ঞেস না করে পারে না, কি বলে?

সোলেমান জবাব দেয়, সে কত কথা। না শুনলি বোঝানো যায় না।

আমারে একবার শোনাতি পারো? উচ্ছ্বাসে ভেঙে পড়ে পারুল। একটু যেন এগিয়েও যায়। আর সেই সময়েই পাশ থেকে কে চেঁচিয়ে ওঠে।

পারুল ভয়ে চুপসে যায়। না তাকিয়েও বুঝতে পারে পাশের মানুষটা চুপচাপই ছিল, হঠাৎ কী কারণে বিরক্ত হয়ে উঠেছে।

ভয়ে ভয়ে আড়চোখে একবার মানুষটার দিকে তাকায় পারুল।

চার

চিৎকার নয় একটু জোরেই যেন ডেকে উঠেছিল বিজয়; আর তাতেই, শব্দটা তার কানে যেতেই চমক ভাঙে সোলেমানের।

সে তাকাতেই বিজয় বলে, এ কী — এ তুমি কি করছ চাচা?

কেন! কী হয়েছি কি — সোলেমান থেমে থেমে বলে, ভুল তো করিনি —

বিজয় জানায়, করিছো কিনা চেইয়ে দ্যাখো। ডিঙডি দুটো কতত পিছিয়ে পড়িছে

মানুষটার কথায় সোলেমান ঘাড় উঁচু করে। সঙ্গে সঙ্গে ছইয়ের ভেতর দিয়ে পারুলও দৃষ্টি চালিয়ে দেয়। পারুলের দেখাদেখি তার ছোট ভাই পাঁচুও। সত্যিই নৌকা দুটো অনেক পেছনে। বোধ হয় [illegible] বেশ ঘুমিয়ে পড়েছে। [illegible] কথা। তবে চিন্তাটা [illegible] ততটা না হলেও [illegible] বেশী। সে [illegible] তো এই নৌকায় উঠতে ওদের আপত্তি জানিয়েছিল।

আপত্তি বিজয়েরও ছিল। তবে সে আপত্তির কারণ আর [illegible] দুশ্চিন্তার কারণ এক নয়। তাছাড়া ওকে কোলে নিয়ে মানুষ করেছে বলেই যে এমন চাচাকে সাড়া দিতে হবে, তারই বা কি মানে আছে? তবে হ্যাঁ, বিজয় জানে মানুষটার গুণ আছে এবং এমন চালাক চতুর মানুষ সংসারে [illegible] সে পুষে রেখেছে এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তাই বলে তাকে মাথায় তুলবে এমন ব্যাপারও ঠিক নয়। তাছাড়া [illegible] বিয়ের [illegible], এদিকে নাচাচ্ছে দেখ? একেই উড়নচণ্ডী, শুনেছে দিনরাত টইটই করে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত। ঘর সংসারের দিকে একটুও নজর ছিল না; এখন [illegible] বিয়ে করে যখন যাচ্ছে সংসারে তখন তাকে আবার সংসারের বাইরে টানা কেন? মেয়েটার মন তাহলে আর সংসারে থাকবে না। কথাটা যে আগে একবারও ভাবেনি বিজয় তা নয়; ভেবেছে। আর পারুলকে না দেখা পর্যন্ত তাই ভেতরে ভেতরে ছটফট করছিল। বাপ তো কথা দিয়েছে। কিন্তু বাপের চোখের সুন্দরের সঙ্গে তার সুন্দরের যে মিল খাবে তার কি মানে আছে। তা বাদে মেয়েটি তো প্রজাপতির মতো; শুনেছে বনজঙ্গলে উড়ে উড়ে বেড়ায়; কোথাও দণ্ড যে স্থির হয়ে বসবে তাও তার ভেতরে নেই। এমন মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হওয়া মানেই তো ঘরের লক্ষ্মীকে গাঙের জলে ভাসিয়ে দেওয়া। তবে এও শুনেছে, এ মেয়ে পাবার জন্যই নাকি ওদিকের গাঁয়ে-গঞ্জে কাড়াকাড়ি। কেন — কী এমন মেয়ে? বিজয় ভেবে ভেবেও তল পায় না।

অনেক ভেবেচিন্তে এর পর সে তাই বন্ধুদের নিয়ে গিয়েছিল পার্বতীপুর। খবর আগেই পাঠিয়েছিল সে যাচ্ছে মেয়ে দেখতে। সঙ্গে জনাতিনেক বন্ধু, এক ভগ্নীপতি।

কিন্তু তিন পয়সার ঘাটে নামতে না নামতেই আচমকা দেখা হয়ে গেল। ঝাউয়ের সারির নিচে একটা ছাগলছানা নিয়ে সে বসেছিল। পরিচয় পেতেই বিজয় অবাক। অনেকক্ষণ পর্যন্ত যেন চোখের পলক পড়েনি। মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল তার রূপ দেখে। যেমন রঙ তেমনি চোখমুখ। আর বাড়ন্ত যৌবন দেখ! বুক থেকে কোমর পর্যন্ত যেন থরে থরে সাজানো; তবে এ যৌবন পোড়ায় না; পোড়ালেও না; এ যৌবনের ছোঁয়ায় মরা গাঙেও আসে জোয়ার। বিজয় তাই মুহূর্তেই উজ্জীবিত হয়ে উঠল। এমন মেয়ে এমনি রূপ— একে যেভাবেই হোক নিজের করে পেতে হবে। বিজয় আর এগোল না। এমনকি গুণেনের বাড়িতেও গেল না। যেমন এসেছিল, ভগ্নীপতি ও বন্ধুদের নিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই নৌকায় উঠে আবার রওনা হয়েছিল।

বন্ধুরা তো অবাক। ভগ্নীপতিও শঙ্কিত। কী হল কী! এত উৎসাহ নিয়ে গেল, ফিরে এল মেয়ের বাড়িতে না গিয়েই, মেয়ের সঙ্গে কথা না বলেই। তবে কি পছন্দ হল না! দাদা পছন্দের লিস্টি না দেখে তো বিয়েয় বসবে না বলেছিল, তা সেসব হওয়া মিলন হওয়া আর আগাম কোথায়! তবে কি এ মেয়েও তার পছন্দ হয়নি!

না, তা নয়; তেমন কিছুই হয়নি। বরং ফিরেই সে জানিয়েছিল, মেয়ে তার খুবই পছন্দ হয়েছে, এই মেয়েকেই সে বিয়ে করে আনবে।

তা সে বিয়ে করেই এখন ফিরছে বিজয়। সঙ্গে একই নৌকায় নতুন বউ আর ছোট শালিকা। সঙ্গের নৌকায় সোনামানিরা। কেউ সোনামানিক যেন শোলে উঠেছে। পাড় তো নয়, যেন মৃত্যু গহ্বর। নদীর উত্তাল বুকে অনবরত ঢেউয়ের ভেঙে পড়ছে।

কী ভয়ঙ্কর এক তুফানের মধ্যে পড়েছে! আবহাওয়া খারাপ। আশ্বিন মাসের শেষ। এমনিতেই বিকেলের দিকে ঝড় ঝঞ্ঝা লেগে থাকে। তারপর দাঁড় থেকে পাড়ি পৌঁছাতে আর কতক্ষণ! কিন্তু ঢেউয়ের ছুটছে— বিজয়ের ভয় হল, কী জানি কী মাঝিদের সোনামানের একবার পারের দিকে তাকিয়েও আবার সোনামানের দিকে দৃষ্টি ফেরায়, আর সেই সঙ্গেও সে ভয়ংকর দিকে চায়। সোনামানের নৌকা আরও দ্রুত বেগে ঢেউয়ের উপর দিয়ে ভেসে চলেছে। তাই তাই ছুটছে সাঁই সাঁই করে। কি বলে বলা যায় ভাবতে ভাবতেই বিজয়ের কানে আসে চিৎকার। যেন পেছনের ডিঙিটি থেকে কেউ কিছু বলছে।

ছইয়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেই বিজয় পেছনে তাকায়। হাত তুলে ইশারায় কিছু বলার চেষ্টা করে।

পাঁচ

শুধু গুণেনেরই নয়, ব্যাপারটা ততক্ষণে অঘোরেরও নজরে পড়েছে। অঘোর তবু প্রথমটায় আমল দেয়নি, একটু পরে ভালো করে দেখতেই কেমন খটকা লাগল। যে ডিঙিতে সোলেমান আছে, জানে সেটা দ্রুতবেগে ছুটবে। কিন্তু তাই বলে এত জোরে! দেখতে দেখতে নৌকা তো অনেক দূরে চলে গেল। ডিঙির মানুষগুলোকে এখন খুবই ছোট ছোট লাগছে। কী জানি মুনিসটার আবার কী হল! এতকাল দেখছে, এমন ব্যাপার তো এই প্রথম। যদিও একটু পরেই এই গতি কমে যাবে সোলেমানের, ডিঙিটাকে আবার ধরে ফেলবে ওদের নৌকাটা, তবুও ব্যাপারটাকে ভালো চোখে নিল না অঘোর। তখন বাজি না হলেই ভালো ছিল; সোলেমানকে বললেই পারত বউকে নিয়ে বিজয় ভটভটিতেই উঠবে। কিন্তু তা পারল কই! শুধু কি আবদার, অঘোর জানে সোলেমান বললে আর কোনো ব্যাপারেই ওকে না বলতে পারে না। মুনিসটা কাছে এলেই সব কেমন ওর গোলমাল হয়ে যায়। আজও হয়েছিল। তাই সোলেমান বলামাত্রই সে রাজি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখন—

একটু ইতস্তত করে, মেশিন-নৌকার পাম্প এর কাছে বসে, যে পাম্প-এর দিকে নজর রেখেছিল তাকেই বলল, কি হল বল তো হৃষীকেশ! মেশিনের গাত কি বাড়ায়ি দিবি?

যাকে বলল সে ততক্ষণে দূরের দিকে তাকিয়ে। চোখের ওপর হাত তুলে রোদ আড়াল করে ডিঙটার গতি আন্দাজ করছিল। চোখ নামিয়ে এখন বলল, না গাত বাড়ানো ঠিক হবেনি। এখনো অনেক জল ভাঙতে হবে; মেশিন গরম হয়ি যাত পারে।

তাহলে?

উত্তরটা দেবার কথা হৃষীকেশেরই। কিন্তু দিল গুণেন মণ্ডল। তাহলি আর কি! যেভাবি হোক ওরি ফেরান হালদার মশয়। আমি তখনই বলিছিলাম—

না না ভয় আপনি পাবেন না বেহান। ও ডিঙিরি ঠিক ধরি নুব আমরা—

ধরবেন আর কি করি! যেভাবে ও ছুটতেছে—

আহা ছুটলিই বা! মানুষ তো, কতক্ষণ আর এভাবি দৌড়ুবে।

বলতে বলতে অঘোর একবার কি ভাবে। তারপর হৃষীকেশকে বলে, তুই তাহলি চেঁচায়ি ডাক হৃষীকেশ। সোলেমানরি থামতি বল। বলি দে আস্তে যাও... আমরা আসতিছি—

হৃষীকেশ ঘুরে বসে ও চেঁচায়। সঙ্গে আরও ভটভটির দু'তিনজন। সুর করে করে সোলেমানকে ডাকে।

এ সোলিমান চাচা— আ— আ... ডিঙি আস্তি কর— ও গো— অ—অ...

কিন্তু সোলেমানের কানে বোধ হয় সে ডাক পৌঁছোয় না। নদীর ওপর দিয়ে

ঘুরতে ঘুরতে শব্দগুলো যেন আচমকা দু'ধারে আছড়ে পড়ছে। কি ভেবে অঘোর বলে, ঠিক আছে তোরা থাম। আমি ডাকতেছি—

বলেই হাতদুটো মুখের কাছে নিয়ে যায় অঘোর। তারপর হাতের চেটো দুটো গোল করে ডাকতে থাকে। প্রথমে একটু থেমে থেমে, সামান্য টেনে টেনে তারপর বেশ জোরে; আওয়াজটা তখন বাতাসের বেগে নদীর ওপর দিয়ে ছুটছে। এ ডাক না-শোনার নয়। হলও তাই। এতদূর থেকে তাকিয়েও অঘোরের মনে হল, নৌকার গতি যেন আস্তে আস্তে কমে আসছে। বুঝল, ডাকটা ঠিকই কানে গেছে আর ডাক শুনেই দাঁড় তুলে নিশ্চয় এদিকে তাকিয়ে অর্থটা বোঝার চেষ্টা করছে সোলেমান।

সোলেমান নয়, আওয়াজটা প্রথম কানে গিয়েছিল বিজয়ের। বিজয় তাকাতে সোলেমানও শুনল। কিন্তু শুনেও যেন কিছু বুঝল না। একবার দাঁড় থামিয়ে তাকাল মাত্র, তারপরেই আবার আগের মতো ডিঙি ছুটিয়ে চলল সামনের দিকে। তবে এবারে যেন গতি অনেকটা কম ; নৌকা যেন আগের তুলনায় অনেক আস্তে চলছে।

হবেই তো। দাঁড়ে টানা নৌকা ; বাহুর জোর আর কতক্ষণ থাকবে। সোলেমান বলেই তবু এতটা এগিয়ে এসেছিল।

বিজয় তাকাল। ভেতরে ভেতরে এতক্ষণে আবার স্বস্তিটা ফিরে পেয়েছে। মনটা আবার চনমনে হয়ে উঠেছে। সঙ্গে রাজকন্যা আর অর্ধেক ধনরত্ন—মনটা বেশ টগবগিয়েই ছুটছিল। হঠাৎ সোলেমানের বাহুর গতিতে তা বাধা পেল। এখন আবার তা বন্ধনহীন হয়ে আগের মতোই ছুটছে।

এই সময়ে আকাশ সাদা করে উড়ে আসছিল এক ঝাঁক পাখি, পারুলের হঠাৎ চোখ পড়াতে সোলেমানও তাকাল।

অই যি অই দেখুন বউদিমণি—কত্ত বালিহাঁস! সাগরির দিকি যাতিছে—সাগরির দিকি!

নতুন চরায় বোধায়—

ঠিক— ঠিকই ধরিছেন বউদিমণি—

সোলেমান লাফিয়ে ওঠে। কেমন অদ্ভুতভাবে একবার তাকিয়ে পরে জিজ্ঞেস করে, বউদিমণি কি দেখিছেন নাকি?

না— কোথায় আর দেখলাম। তুমি...তুমি তো দেখিছো—

নাহ্ বউদিমণি— সোলেমান বিষণ্ণ হয়, বয়স এল বয়স গেল চরডা তবু দেখি আসতি পারলাম না। এখন তো সিখানি জঙ্গল। পশু-পাখির জায়গা। হরিণ আছে, বরা আছে, মাছি আছ; আছে কেউটে, কালনাগিনী, উদয়রাজ আর শঙ্খচূড়ের দল।

উফ্! কী সুন্দর—

তবি— তবি যি গাঁয়ের কথা ভাবতি ভাবতি চোখ ভারী কইর‍্যো তুলিছিলেন। আরি বাবা, জীবনডা কী একস্থানি থাকার জনি্য। কত্ত জিনিস দেখার আছে এই আল্লার সংসারি—

আমারি... একবার দেখাতি পারো?

পারুলের উচ্ছ্বাস এবার দ্বিগুণতর: উচ্ছ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে বুকেও কাঁপন ধরে। ঘোমটা খুলে যায়। খোঁপা ভেঙে পড়ে। কানের লতিতে দুলছিল চিকিচিকে যে নতুন দুলজোড়া, পারুলের মুখেও যেন সেরকম দোলা লাগে।

সোলেমান দাড়িতে হাত বোলায়। তারপর আবার ছপছপ করে দাঁড় টানতে থাকে।

হ্যাঁ দিদি পারি, নিশ্চয়ই পারি....কোথায় যাবেন আপনি?

কেন সি নতুন চরায়—

নতুন চরা।

বলতে বলতে সোলেমানের দু'বাহু আবার দ্রুতগতি পায়: ডিঙি আবারও জোরে ছুটতে থাকে।

বিজয় চমকে ওঠে।

এতক্ষণ তবু আনন্দেই ছিল। নৌকার গতি কমার সঙ্গে সঙ্গেই হাঁপ ফেলে বাঁচে। একসঙ্গে সুন্দরী বউ আর অর্ধেক রাজত্ব পাওয়ার আনন্দে ভেতরে ভেতরে খুশিতে ফেটে পড়ছিল: হঠাৎ ডিঙিটা আবার দ্রুতগতি পাওয়ায় বিজয়ের চমক লাগে। সঙ্গে সঙ্গে ছইয়ের ভেতর থেকে সামান্য বেরিয়েও আসে সে।

যাহোক, পাখি দেখাতে গিয়ে তবু দাঁড় তুলে নৌকার গতি থামিয়েছিল; কিন্তু হঠাৎ কী হল! ডিঙি যে আবার জোরে ছুটছে।

বিজয় চেঁচিয়ে ওঠে। আর ডাকতে গিয়েই সে অবাক। সোলেমানের মুখে হাসি ফুটে উঠেছে। দৃষ্টি উদাস; বিজয় ভয় পায়। যেমন এগিয়ে এসেছিল তেমনি পিছিয়ে আবার ছইয়ের ভেতরে ঢুকতে গিয়েই দেখে পারুলের মুখেও হাসি। হাসতে হাসতেই আপনমনে আকাশের দিকে তাকিয়ে কী দেখছে পারুল!

পারুল— অ্যাই পারু—

ফিসফিস করে ডাকতে গিয়েও বিজয় পারে না। গলা বুজে আসে। বুকের ভেতরে কাঁপন ধরে। আর এই অবস্থাতেই সে অনুভব করে, ভেতরটা আস্তে আস্তে যেন ঠাণ্ডা মেরে আসছে ওর।

বিজয় ভয়ে চোখ বোজে।

বুকের কথা

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

মেয়ের কাছে চলেছে হিরণ্ময়। শিলিগুড়ি। এ-জীবনে কাউকে মনের কথা বলা হল না হিরণ্ময়ের। মেয়েকে বলতে হবে সব। মনে তো কত কথাই জমে মানুষের। হাজারও কথা। লাখো কথা। অর্বুদ কথা। সেইসব কথা ঠিক ঠিক বলে ফেলতে পারলে হিরণ্ময়ের পৃথিবীটা হয়তো আমূল বদলে যেত। অনেক মনোরম, অনেক ভরভরন্ত হয়ে উঠত জীবনটা। কেন যে তাকে নিয়ে এই নিষ্ঠুর খেলা খেলল বিধাতা!

খেলা, নাকি বৈরিতা? মানুষ যা বলতে চায় তার বদলে যদি অন্য কথা বেরিয়ে আসে মুখ দিয়ে, তবে তাকে কি বলে? এই ব্যাপারটাই ঘটে আসছে হিরণ্ময়ের জীবনে। চিরটাকাল। হৃদয়ের সঙ্গে স্বরযন্ত্রের এ এক অদ্ভুত দ্বন্দ্ব। মন যা বলতে চায় কণ্ঠ তাকে ধাক্কা মেরে হটিয়ে দেয়। স্বরযন্ত্র টপকে যদিও বা মুখে এল কথাটা, জিভ ঠোঁট ওমনি বিদ্রোহ করে বসল। মনের কথা মনেই রয়ে গেল হিরণ্ময়ের।

হিরণ্ময়ের শৈশব কেটেছিল দুটো মানুষকে ঘিরে। মা আর দিদি। হিরণ্ময়ের যখন সবে ছয়, তখন তার বাবা মারা যায়। হঠাৎ। দিব্যি সুস্থ মানুষ খেয়েদেয়ে অফিস গেল, ফিরে এল মৃতদেহ হয়ে। অফিসে নাকি ফাইল দেখতে দেখতে আর্তনাদ করে উঠেছিল একবার, পাশের টেবিলের লোক ছুটে আসার আগেই সব শেষ।

বাবার মৃত্যুর পর অথৈ জলে পড়েছিল মা। আত্মীয়স্বজন জ্ঞাতিগুষ্টি সবাই দূর থেকেই আহা-উহু করে, এগিয়ে এসে দায় নেওয়ার বেলায় একজনও নেই। অর্থ নেই, সম্বল নেই, দু-দুটো ছেলেমেয়ে নিয়ে মা যে তখন কী করে! শেষে বাবার বন্ধুদের করুণায় মাটিতে পা রাখার একটা জায়গা জুটল। বাবার অফিসে চাকরি পেল মা।

চাকরি পাওয়ার পরও বহুকাল বাবার ছবির সামনে বসে কাঁদত মা। সারা দিন অফিস, সংসারের খাটাখাটুনি, দিদি ছোট থেকেই একটু রোগাভোগা তাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা— মা বোধহয় ফিরে ফিরে বাবার কাছেই আশ্রয় খুঁজত।

মার কান্না দেখে বুক ভার হয়ে যেত হিরণ্ময়ের। সন্ধেবেলাই রাত নামত চোখে। মনে মনে বলত, দুঃখ কোরো না মা। আমাকে একটু বড় হতে দাও, তোমার সব কান্না আমি মুছে দেব।

ছোট্ট হিরণ্ময় জানত না এ পৃথিবীতে কেউ কারুর কান্না মোছাতে পারে না। কান্না জিনিসটা জোলো বাতাসের মতো। রুক্ষ পৃথিবীকে কান্নাই খানিকটা সহনীয় করে তোলে।

তা হোক, তবু কথাগুলো শুনলে হয়তো একটু ভাল লাগত মার। শিশুর মুখের কথা হলেও সান্ত্বনা তো বটে।

কিন্তু ওই যে, মনের কথা মুখে আসে না হিরণ্ময়ের। এসে এসেও ফিরে যায়

হিরণ্ময় জোরে জোরে ঠেলত মাকে,— আর কাঁদতে হবে না। ওঠো আমাকে খেতে দেবে চলো।

মা সজল চোখে বলত, —তোর কি বাবার জন্য একটুও মন কেমন করে না হীরু?

করে। করে। ভীষণ করে। যে মানুষটা এই সেদিনও ছিল, হাসিখুশিতে ভরিয়ে রাখত সংসার, তাকে শ্মশানে পুড়িয়ে এলে বুক হু-হু করবে না? বাবা কত ভালবাসত হিরণ্ময়কে। ছুটির দিন হলেই তাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ত রাস্তায়। চিড়িয়াখানা, জাদুঘর ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, পরেশনাথের মন্দির কোথায় না যেত। আইসক্রিম ঝালমুড়ি খাওয়াত, বুড়ির মাথার পাকা চুল কিনে দিত, রেস্টুরেন্টেও খাইয়েছে কত দিন। হাঁটতে হাঁটতে হিরণ্ময়ের পা ধরে গেলে তাকে কাঁধে নিয়ে ছুটত ববা। বাঘের খাঁচার সামনে হিরণ্ময়কে পাঁজাকোলা করে তুলে ছুঁড়ে দেওয়ার ভান করত, আর হাসত গমগম।

লকলকে চিতার হৃদয়ে সাপটে রেখে হিরণ্ময়ের ঠোঁট বলে উঠত,—যে মরে গেছে তার কথা ভেবে কি লাভ?

ছোট মুখে বড় কথা শুনে অবাক চোখে তাকাত মা। বুঝিবা বুঝতে চাইত কথাটা কতটা শেখা বুলি, কতটা বা অন্তরের। ভিজে স্বরে ধমকাত, —ওকথা বলতে নেই হীরু। তোমার বাবা এখানেই আছে। এই আমাদের চারপাশে।

—দূর বাবা তো কবেই মরে ভূত। সত্যি সত্যি ভূত এলে আমার একটুও ভাল লাগবে না।

একদিন ঠাস করে চড় কষিয়ে দিয়েছিল মা। ফিনফিন কান্না ঝেড়ে ডুকরে উঠেছিল,

—তোর মনে কি একটুও মায়া নেই? এই বয়সেই এত নিষ্ঠুর?

আশ্চর্য! সেই মাও বাবাকে ভুলে গেল। মাঝখান থেকে হিরণ্ময়ের কপালে একটা স্ট্যাম্প পড়ে গেল— নিষ্ঠুর!

এক সময়ের যোগিনী বেশ ধীরে ধীরে ঝেড়ে ফেলল মা। চুলে মুখে চোখে রুখুসুখু, ভাবপ, কপালে দিবারাত্র বিষণ্ণতার ভাঁজ দিব্যি উবে গেল। চড়া রঙিন শাড়ি পরে অফিস যেতে মা আর অস্বস্তি বোধ করে না, ছোট্ট টিপ পরে, পাউডার বুলোয়, পারফিউম মাখে, হাল্কা কাজলও দেয় চোখে। অফিস থেকে ফিরে যে মা হা-ক্লান্ত বসে থাকত, মাত্র চারটে বছর ঘুরতে না ঘুরতেই তার মধ্যে কী পরিবর্তন! বাবার অফিসের বন্ধু অরুণকাকুর প্রায়ই আসাযাওয়া বাড়িতে। কাকুকে দেখলেই মার চোখ খুশিতে ঝলমল।

মার ওই সুখী মুখটাই তো আজীবন দেখতে চেয়েছে হিরণ্ময়। অরুণকাকুকেও তার মন্দ লাগত না। শান্ত, কিন্তু কী দিলদরিয়া। কাকু কত খেলান কিনে দিত হিরণ্ময়কে। দিদিকেও। যখনই আসত হাতে চকোলেট, লজেন্স, কেক, পেসট্রি। হিরণ্ময়দের হারিয়ে যাওয়া খুশিটাকে আবার যেন ফিরিয়ে আনছিল কাকু।

এক রবিবার বিকেলে, সেদিন বুঝি অরুণকাকু রাত্রে হিরণ্ময়দের বাড়িতে খাবে। সকাল থেকে দিদিকে সঙ্গে নিয়ে কত পদ রাঁধল মা। তারপর বিকেল হতে আয়নার সামনে সাজতে বসল। দেখতে দখেতে কী অপরূপ হয়ে উঠছিল মার পানপাতার মুখ। পাতা কেটে চুল আঁচড়েছে, ঘাড়ের কাছে গোল খোঁপা, কপালের খয়েরি টিপও সেদিন যেন একটু বড়। মিষ্টি সৌরভে ভরে যাচ্ছিল ঘরের বাতাস।

হিরণ্ময় মনে মনে বলল, তুমি চিরকাল এমনই সুন্দর থেকো মা।

সাদার ওপর নীল ফুটফুট শিফনের আঁচল কাঁধে ছুঁড়ে মা হঠাৎ কথা বলে উঠল,—আমাকে দেখতে কেমন লাগছে রে হীরু?

স্বরযন্ত্র খরখর করে উঠল হিরণ্ময়ের,—তোমার মুখটা কেমন বুড়ি বুড়ি হয়ে গেছে মা। সাজলে তোমাকে সঙের মতো দেখায়।

মার মুখ পলকে মলিন। সমস্ত রঙ মুছে গিয়ে যেন দাঁড়িয়ে আছে এক তেত্রিশ বছরের কঙ্কাল। এক প্রাগৈতিহাসিক মমি।

অবসন্ন মা কপাল থেকে টিপ মুছে ফেলল। চুপটি করে মোড়ায় বসে রইল কিছুক্ষণ। ড্রেসিংটেবিলের আয়নার কি যেন খুঁজল। তারপর অরুণকাকুর কিনে দেওয়া ঝুরো কুমকুমের কৌটো ফেলে দিল জানলা দিয়ে নিঃশব্দে।

মা আর কখনও টিপ পরেনি।

অরুণকাকুর সঙ্গে সম্পর্কটাও স্থবির হয়ে গেল।

মা একটা শক্ত লোহার বর্ম এঁটে নিল শরীরে। মনেও।

হিরণ্ময়দের সংসারে আলো জ্বলেও নিবে গেল।

সংসারে সুখঅসুখ থাকেই। ঝড় ঝাপটা বিপদআপদও আসে। আবার কখনও কখনও দখিনা বাতাসও বয়। কিন্তু নিবে যাওয়া সংসারে শুধু মেঘ আর মেঘ। সেই মেঘের আড়াল থেকে এক অদৃশ্য তীরন্দাজ বিষের তীর হেনে চলে অবিরাম।

বোগা দিদির ভারি ন্যাওটা ছিল হিরণ্ময়। বাইরের জগৎ তেমন টানত না হিরণ্ময়কে, চার বছরের বড় দিদিই ছিল তার কৈশোরের পৃথিবী। দিদির সঙ্গে খাওয়া। দিদির সঙ্গে খেলা। দিদির সঙ্গে ঘুম। সেই দিদি পড়ে গেল এক কঠিন অসুখে। বাবাকে অসম্ভব ভালবাসত দিদি, বাবার মৃত্যুর পর গুমরে গুমরে কাঁদত। দিদির সেই গোপন অশ্রুই বুঝি প্লুরিসি হয়ে বাসা বাঁধল বুকে।

হিরণ্ময়ের জগৎ যেন চুরমার হয়ে গেল।

চোদ্দো বছরের দিদি সারা দিন মিশে আছে বিছানায়। বিষণ্ণ। ফ্যাকাসে। শীতের নিষ্পত্র কৃষ্ণচূড়া গাছটির মতো। দিদিকে দেখে ভীষণ মায়া হত হিরণ্ময়ের। জ্বরে আচ্ছন্ন দিদির মাথার পাশে বসে হিরণ্ময় মনে মনে বলত দিদি, তুই ভাল হয়ে ওঠ্। দিদি, তুই একদম সেরে যা।

একদিন হিরণ্ময়ের প্রার্থনার সময়ে চোখ খুলল দিদি। শীর্ণ হেসে বলল, — কি বিড়বিড় করছিস রে হীরু?

হিরণ্ময় ভীষণ চমকে উঠল, —কই, কিছু না তো।

—নিশ্চয়ই কিছু বলছিস। কি বলছিলি বল্ না।

হিরণ্ময়ের জিভ ঠোঁট বেমালুম বলে দিল,— তুই আর ভাল হবি না রে দিদি।

—এ কথা কেন বলছিস? দিদি প্রায় ককিয়ে উঠল।

—তোর অসুখটা খুব খারাপ। আমি জানি। এ রোগ সেরেও সারে না।

নিমেষে দিদির মুখ পাংশু। রক্তহীন মুখমণ্ডলে প্রাণের আভাটুকুও যেন আর রইল না। অসাড়ে জল গড়িয়ে গেল গাল বেয়ে।

হিরণ্ময়ের দিকে পিছন ফিরে শুল দিদি।

মাস দুই পর দিদি মোটামুটি সুস্থ হল। তবে দিদির বুকের দোষটা পুরোপুরি গেল না কোনওদিন। সামান্য অনিয়মেই অসুখে পড়ে, ঘুষঘুষে জ্বর লেগেই আছে, একটু হাঁটাচলা করলেই হাঁপায় কুকুরের মতো।

লেখাপড়াটাও হল না দিদির। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দিদি বড় খিটখিটেও হয়ে গেল। বিনা কারণে মার সঙ্গে গলা ফাটিয়ে ঝগড়া করে, তুচ্ছ অজুহাতে দিনরাত শাপশাপান্ত করে ভাইকে। বারবার পাত্রপক্ষের সামনে বসা আর বাতিল হওয়াই যেন হয়ে উঠছিল তার জীবনের পরিণতি।

হিরণ্ময় তখন একটা ওষুধের কোম্পানিতে কাজে ঢুকেছে। ক্যানভাসার। সেও

তখন বুঝে গেছে দিদির রূপ নেই গুণ নেই, যদি দিদির বিয়ে হয়ও, তার জন্য লাগবে প্রচুর টাকা। দিনরাত খেটে টাকা জমিয়ে চলেছে সে। তার মনের কোণে এক সূক্ষ্ম অপরাধের কণা নোংরা ঝুল হয়ে জমে আছে। যদি একদিন মুখ ফুটে দিদিকে মনের কথা বলে ফেলতে পারত, তা হলে কি আর একটু সতেজ হয়ে ফুটে উঠত না দিদি!

এ বড় কঠিন ধন্দ। এই ধন্দের কূলকিনারা পায় না হিরণ্ময়। পায় না বলেই সে আরও অসুরের মতো খাটে, আরও টাকা জমায়।

শেষ পর্যন্ত দিদির একটা সম্বন্ধ পাকা হল। পাত্র কার্ডবোর্ডের ব্যবসা করে। খাট, আলমারি, ড্রেসিংটেবিল, নমস্কারী শাড়ি ছাড়া তাদের আর বিশেষ দাবিদাওয়া নেই। গয়না শাড়ি মেয়েকে যে যেমন দেয় তা তো হিরণ্ময়রা দেবেই।

হিরণ্ময় দিদির বিয়ের তোড়জোড় শুরু করল। কোমার বেঁধে। বহুদিন পরে সংসারে একটা উৎসব আসছে।

বিয়ের মাত্র সাত দিন আগে আবার এক বিষতীর ছুঁড়ল অদৃশ্য তীরন্দাজ। পাত্রপক্ষ একটা ছোট্ট লিস্ট পাঠিয়েছে। অতি বিনয়ের সঙ্গে। ব্যবসার কাজে তাদের হঠাৎ লাখ টাকা আটকে গেছে, ছেলের বউভাতের খরচখরচাব জন্য দশ হাজার টাকা দরকার। আগে বলা হয়নি, ছেলেকে কাজের ধান্দায় নানান জায়গায় ছুটে বেড়াতে হয়, একটা মোটব সাইকেল বা স্কুটার না হলে ভয়ানক অসুবিধে হয় ছেলের।

হিরণ্ময়ের মা সিঁটিয়ে গেল —এখন কী হবে হীরু?

হিরণ্ময়েরও চোখ ফেটে জল আসছিল। এখন উপায়? কি হবে দিদির?

মা বলল,— আরও পঁচিশ তিরিশ হাজারের ধাক্কা। অত টাকা আমি পাব কোথায়?

হিরণ্ময় দ্রুত হিসেব করে নিচ্ছিল। ব্যাঙ্ক থেকে কুড়িয়ে কাছিয়ে আরও হাজার নায়েক তোলা যেতে পারে, বাকিটা কি কোনওভাবে জোগাড় করা যায় না? দরকার হলে কোম্পানির মালিকের কাছে আত্মাটাও বাঁধা রাখবে সে।

মাকে অভয়বাণী শোনাতে চাইল হিরণ্ময়, কিন্তু স্বরযন্ত্র বেইমানি করল,

—এ বিয়ে ভেঙে দাও মা।

দিদি হাউমাউ তেড়ে এল,—কেন বিয়ে ভাঙবে? আমার জন্য তুই টাকা খরচ করতে চাস না? তোর জমানো টাকা নেই?

হিরণ্ময় বলতে চাইল, সত্যি অত নেই রে। বলে ফেলল, —থাকলেও দেব না। ওখানে বিয়ে হওয়ার থেকে তোর আইবুড়ো বসে থাকা ভাল।

শুকনো প্যাকাটির মতো দিদি দেওয়ালে মাথা ঠুকতে লাগল,—আমি মরে যাব। আমি বিষ খাব।

ভেতরের হিরণ্ময় বলে উঠল, আমি তোকে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালবাসি রে

দিদি। তুই শাস্ত হ: আমি ব্যবস্থা কিছু করবই।

মা দিদি শুনতে পেল উল্টো কথা, —পাগলামি করিস্ না দিদি। এ বিয়ে আমি কিছুতেই হতে দেব না।

আচমকা মা ছুটে গিয়ে জাপটে ধরল দিদিকে। অনেক কাল আগে এঁটে নেওয়া খোলস ভেঙে হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রুগীব মতো চেঁচিয়ে উঠেছে হঠাৎ,—ও আমাদের কারুর ভাল চায় না রে খুকু। টাকা আমি জোগাড় করব। দেখি তোর বিয়ে ও কি করে আটকায়।

চেয়েচিন্তে, প্রায় এর ওর কাছ থেকে ভিক্ষে করে, টাকাটা জোগাড় করে ফেলল মা। পরদিন নতমুখে যথাসর্বস্ব সঞ্চয় তুলে এনেছিল হিরণ্ময়, মা ছুঁয়ে দেখল না। কল্পিত শুভ লগ্নে বিয়ে হয়ে গেল দিদির।

মাস চারেক পর জামাইবাবুর সঙ্গে মুসৌরি বেড়াতে গেল দিদি। বিলম্বিত মধুচন্দ্রিমা। সেখানেই পাহাড় থেকে পিছলে পড়ে দিদি মাবা গেল।

মা জামাইকে দুষল না। হিরণ্ময়ের দিকে আঙুল তুলল,—তুই কি কখনও কারুর সুখ চাইবি না হীরু ? তোর মনে এত কু ?

হিরণ্ময় কলকাতা ছাড়ল। কপালে এক দগদগে দাগ নিয়ে । নিষ্ঠুর ! নিষ্ঠুব !

দুই

মেয়ের কাছে চলেছে হিরণ্ময়। শিলিগুড়ি। সেখানে মার সঙ্গে থাকে মেয়ে। তাদের দ্বীপ থেকে বহুকাল নির্বাসিত হয়েছে হিরণ্ময়।

মনের কথা হিরণ্ময় মেয়ের মাকে বলতে পারেনি। মেয়েকে বলতে হবে সব।

হিরণ্ময়ের বুকের মধ্যে অনন্ত কথার মিছিল ঝংকার তোলে অবিরাম। শিলাবৃষ্টি হয়ে আছড়ে পড়তে থাকে হৃদয়ের খাঁচায়। মাথা খোঁড়ে। ভাষা চায়।

একটি বারও যদি মনের কথাকে বার করে দিতে পারত হিরণ্ময় !

আবতি বলত, —তুমি একটা কসাই। তোমার মন বলে কিছু নেই।

আরতি হিরণ্ময়ের বউ। আরতি ঝুমুরের মা। কলকাতা ছেড়ে অন্য ওষুধ কোম্পানিতে কাজ নিয়ে শিলিগুড়ি চলে গিয়েছিল হিরণ্ময়। সেখানেই আরতির সঙ্গে তার বিয়েটা ঘটে। আরতির বাবা রেলের কণ্ট্রাক্টর। সিভিল। দাপুটে মানুষ। কোমরে টোটা ভরা রিভলবার। দু-আড়াই শো কুলির প্রভু। অপার সুখ, অঢেল বিত্ত, অসীম প্রতিপত্তি লুটোপুটি খায় তার পায়ে। পোষা বেড়ালের মতো। এমন একটা লোকের মেয়ের সঙ্গে হিরণ্ময়ের বিয়ে হওয়ার কথা নয়, তবু কেমন করে যেন হয়ে গেল।

হিরণ্ময় তখন ভূতের মতো খাটে। সকালবেলা বেরিয়ে পড়ে বাক্স নিয়ে, হিমালয়

থেকে তরাই চক্কর মারে দিনভর। তখন তার পরিশ্রম নিজেকে শুধু চেতনার শেষ সীমায় নিয়ে যাওয়ার জন্য। যাতে দিনশেষে বুকে কোনও কথা জমার অবকাশটুকু না থাকে।

আরতি বাবা কর্মবীর। বোধহয় হিরণ্ময়ের এই পরিশ্রমী চেহারাটাই পছন্দ হয়েছিল তাব।

হিরণ্ময়ের মধ্যেও তখন এক তীব্র বাসনা। সংসার করতে হবে। আরতির বাবার প্রস্তাবে সেও বেশ প্রলুব্ধ হয়েছিল। একটাই শর্ত ছিল আরতির বাবার। মেয়ে তার চোখের মণি, হিরণ্ময় কখনও শিলিগুড়ি ছাড়তে পারবে না।

হিরণ্ময়ই বা তখন আর কোথায় যাবে? মেনেই নিল। বিয়ের খবর জানিয়ে চিঠি দিল মাকে। মা এল না।

ফুলশয্যার রাতে আরতিকে দেখে চোখে জল এসে গিয়েছিল হিরণ্ময়ের। ফুলচন্দনে সাজা, বেনারসিতে মোড়া ওই পুতুলের মতো মানবী তার! তবে কি জীবন আবার...! প্রিয়জন হারিয়ে আবার কি প্রিয়জন পেল হিরণ্ময়!

ফাল্গুন মাস। মহানন্দার দিক থেকে একটা বাতাস আসছিল ঘরে। ঠাণ্ডাও নয়, আবার ঠিক উষ্ণও নয়, কেমন এক শান্তিব প্রলেপের মতো। দোলপূর্ণিমার চাঁদ উঁকি দিচ্ছিল জানলায়।

আরতি বিছানায় বসে একটা একটা করে কাঁটা খুলছিল খোঁপা থেকে। মৃদু মৃদু পা দুলিয়ে ছুন ছুন নিক্কণ তুলছিল নুপরে। তেমন একটা লজ্জাশীলা কনেবধুটি ছিল না আরতি, বরং সে যেন একটু বেশিই চপল।

গ্রীবা হেলিয়ে আরতি প্রথম কথা বলল,— আমাকে একটু জল দাও তো। টেবিলে জলের গ্লাস। দৌড়ে নিয়ে এল হিরণ্ময়। জলটুকু নিঃশেষ করে শূণ্য গ্লাস হিরণ্ময়কে ফিরিয়ে দিল আরতি। সুগন্ধি রুমালে মুখ মুছল। হঠাৎ বুঝি তার খেয়াল হল গ্লাস হাতে দাঁড়িয়েই আছে হিরণ্ময়।

আরতি কটাক্ষ হানল,—কি দেখছ?

হিরণ্ময়ের বুকে মাদল বাজছিল দ্রিম দ্রিম। তুমি সুন্দর। তুমি সুন্দর। তুমি সুন্দর।

স্বরযন্ত্র রুখে দিল কথাটাকে। জিভ আর ঠোঁট বিদ্রোহী হল। কাঁপা কাঁপা গলায় হিরণ্ময় বলল, —তোমার কপালটা বড্ড ছোট।

—তো?

—ছোট কপালের মেয়েরা সুখী হয় না। তোমার কপালে অনেক দুঃখ আছে।

ঠিকাদারের ধনী মেয়ে থমকাল মুহূর্তের জন্য। ক্ষণ পরেই হেসে উঠেছে খিলখিল, —সে তো আছেই। বাবা এমন দড়ি-কলসি বেঁধে জলে ফেলে দিল!

হিরণ্ময় কুঁকড়ে গেল, —আমাকে বুঝি তোমার পছন্দ নয়?

ঠিকাদারের মেয়ে পা দোলাচ্ছে আবার, —ভেবে দেখতে হবে।

—কি ?

—এই, এরকম চালচুলোহীন লোককে পছন্দ করা যায় কিনা।

হিরণ্ময় নিঃশব্দে বলল,— আমি বড় দুঃখী আরতি। আমাকে দয়া কোরো। আমাকে দয়া কোরো।

হিরণ্ময়ের হাত থেকে গ্লাস নিয়ে নিজেই ড্রেসিংটেবিলে রেখে এল আরতি। নতুন বরের গা ঘেঁষে দাঁড়াল সামনে। নরম আঙুল দিয়ে নেড়ে দিল হিরণ্ময়ের নাক,— উঁউঁহু, অমনি বাবুর ঠোঁট ফুলল ! না রে বাবা, তোমার মতো লোকই আমার পছন্দ। বোকা বোকা। ভ্যাবলা ভ্যাবলা।

খুশি হবে, না আহত হবে ভেবে পাচ্ছিল না হিরণ্ময়। শুনতে পেল রক্তে যেন কল্লোল উঠছে। তীব্র সুবাসে আচ্ছন্ন হয়ে এল ঘ্রাণশক্তি।

আরতি হঠাৎ বলল, —তখন কপালের কথা বললে কেন ? তুমি জ্যোতিষচর্চা করো নাকি ?

নিশ্বাস ঘন হয়ে এল হিরণ্ময়ের। সামান্য হেসে হালকা হতে চাইল।

ধনী মেয়ের হাত ভরা গয়না নেচে উঠল ঝমঝম। তুলতুলে দুটো হাত এগিয়ে এল হিরণ্ময়ের দিকে, —দ্যাখো তো, আমার হাতে কি আছে ?

কোমল হাতের স্পর্শে হিরণ্ময়ের দেহ শিরশির। এ এক অচেনা স্বাদ রোমহর্ষক।

আরতি বলল, আমার আয়ুরেখাটা কেমন গো ? কদ্দিন বাঁচব বলে মনে হয় ?

হিরণ্ময় মনে মনে বলল, কি হবে জেনে ? যতদিন সুখ ততদিনই তো বেঁচে থাকা। বাকি জীবন তো নীরস সালতারিখের হিসেব।

আরতি অধীর হল, —আমার স্বাস্থ্য কেমন যাবে ? অসুখ কিন্তু আমার একটুও ভাল লাগে না।

হিরণ্ময় মনে মনে বলল, —অসুখের চিন্তাই অসুখ আরতি। আমি চিরকাল তোমার মন ভাল রাখব, অসুখ তোমার হবেই না।

আরতি ঝামরে উঠল, —কই কিছু বলো। হাত ধরে সঙ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলে কেন ?

তড়বড়িয়ে সরব হল হিরণ্ময়। এবং ভুল কথা বলল, —তোমার হাতে বড় কাটাকুটি। এত দাগ থাকা ভাল নয়। জীবন জটিল হয়।

—আমার জীবন জটিল হবে কি মরতে ? আমার বাবা আছে না ? সব জটিলতা বাবা সিধে করে দেবে। বাবার কাছে আমার সুখ সব থেকে আগে।

হিরণ্ময়ের হাত থেকে করতল দুটো খসে পড়ে গেল।

—ভয় খেয়ে গেলে ? হেসে লুটিয়ে পড়েছে আরতি,— তুমি একটা ভোঁদা

কার্তিক। তুমি একটা হাঁদাগঙ্গারাম। ফুলশয্যার রাতে মেয়েরা কেন বরেদের হাত ধরতে বলে বোঝ ?

হিরণ্ময়ের সত্যি ভয় করছিল। বড়লোকের মেয়েকে বিয়ে করে কি ভুল করল সে!

পরদিন থেকে আরও পরিশ্রমী হয়ে গেল হিরণ্ময়। বড়লোকের মেয়েকে স্বাচ্ছন্দ্যের নকশিকাঁথায় মুড়ে রাখতে হবে। কখনও যেন বাবার ধনের কথা না তুলতে পারে আরতি। কখনও যেন এতটুকু অভাবের কষ্ট না পায়।

এত খেটেই বা কি লাভ হল হিরণ্ময়ের! যার জন্য উদয়াস্ত পরিশ্রম, তার মুখ ভার দিনে দিনে। আরতি দর্পী মেয়ে বটে, কিন্তু তার চাওয়া খুব বেশি নয়। হিরণ্ময় বাড়ি ফিরলেই সে ছোট ছোট অনুযোগের ঝাঁপি খুলে বসে। তুমি আমাকে নিয়ে বেড়াতে যাও না! শান্তিনিকেতন থেকে অত ভাল নৃত্যনাট্যের দল এসে চলে গেল, তুমি একদিনও সময় করতে পারলে না! সারাটা দিন কিভাবে কাটে আমার, সে খবর রাখো!

হিরণ্ময় নিবিড় চোখে তাকাত। তোমাকে ছেড়ে এই খেটে মরা, এ তো তোমারই জন্য আরতি।

বলত অন্য কথা, —ঘরে বসে থাকার দরকার কি ? ঘোরো না নিজের মতো।

—কার সঙ্গে ঘুরব ?

—যার সঙ্গে খুশি। এ শহর তো তোমার চেনা।

আরতির মুখ থমথমে হয়ে যেত। সরে যেত পাশ থেকে, —জানি। চাইলেই বাবা এক্ষুণি গাড়ি পাঠিয়ে দেয়। একবার তুড়ি দিলে একশোটা সঙ্গী জোটে আমার।

—সত্যি ?

—তুমি দেখতে চাও ?

হিরণ্ময়ের মুখের বলাটাকে ধ্রুব ধরে নিয়ে সঙ্গী জুটিয়ে নিল আরতি। পাড়ার দেওর, পুরনো বন্ধু, অনেকেরই আনাগোনা শুরু হল বাড়িতে। আজ এর সঙ্গে মার্কেটিং, কাল ওর সঙ্গে সিনেমা। কখনও বা দলবল নিয়ে পাহাড়, কখনও পিকনিক করতে জঙ্গলে। কত দিন রাতে বাড়ি ফিরে বউকে দেখতে পায়নি হিরণ্ময়।

তবু সম্পর্কটা ছিল। অম্ল মধুরে। কাঁটায় ফুলে।

এক রাতে হিরণ্ময়ের গলা জড়িয়ে শুয়ে আরতি রাতপাখির মতো রিনরিন করে উঠল।—এই তুমি তমালকে চেনো ?

—কে তমাল ?

—চেনো না ? আমার বাপের বাড়ির পাশেই যে বিশাল বাড়ি…। দারুণ হ্যাণ্ডসাম। রোজ নতুন নতুন রঙের টিশার্ট পরে। প্রচণ্ড স্পিডে মোটরবাইক চালায়।

হিরণ্ময় চিনতে পারল না। তবু বলল, —হ্যাঁ হ্যাঁ চিনি। কেন?

—তমালটা ভারি অসভ্য হয়ে গেছে।

হিরণ্ময়ের বুক টিপটিপ করে উঠল।

—তমাল কি বলে জানো?

—বোলো না আরতি। বোলো না।

—তমাল বলে আমার জন্যই নাকি ও বিয়ে করে উঠতে পারছে না। যে মেয়েকেই দ্যাখে তাকে আমার তুলনায় বাঁদরী মনে হয়।

হিরণ্ময় নিরুচ্চারে বলল, এসব তো আমার বলার কথা। এ কথা তমাল বলে কেন?

মুখ বলল, —অকারণ স্তুতি বাক্য মানুষের ক্ষতি করে আরতি।

আরতি শুনেও শুনল না। ঝটপট বলে উঠল,—তোমার হিংসে হচ্ছে?

বুকের চিন চিন ভাব বুকেই রয়ে গেল হিরণ্ময়ের। স্বর বলল, —হিংসে? কেন?

—কারণ তুমি তমালের মতো হ্যাণ্ডসাম নও। কারণ তুমি তমালের মতো সুন্দর কথা বলতে জানো না। কারণ তুমি তমালের তুলনায় অতি সাধারণ। কথাটা বলেও যেন তৃপ্ত হল না আরতির। ব্যঙ্গের সুরে বলল,—আরও কি বলে শুনবে?

—কি?

—সেই কথাটা। যে কথাটা আমাকে তুমি আজও বলোনি।

হিরণ্ময় মনে মনে বলল, সে কথা কি তুমি এখনও শুনতে পাওনি আরতি? কণ্ঠ বলল,— তুমি কি সে কথা আর আমার কাছে শুনতে চাও?

—না, চাই না। আরতি ছিটকে সরে গেল, —ও কথা তমালের মুখেই মানায় ভাল।

ক্রোধের বদলে এক বিষাদ ঢেকে ফেলছিল হিরণ্ময়কে। পথেঘাটে বনে প্রান্তরে পাহাড়ে আকাশে নদীতে সর্বত্র আরতিকে দেখতে পায় হিরণ্ময়। এই দুনিয়ায় কোন পুরুষ কোনও নারীকে হিরণ্ময়ের থেকে বেশি ভালবাসতে পারে না।

বুক উজাড় করতে গিয়ে বাধা পেল হিরণ্ময়। উৎকট হাই উঠে কথার পথ রোধ করল। মুখ বলল,—রাত বড় অশালীন ভাবনা ভাবায়। তুমি ঘুমোও আরতি।

আরতি অন্ধকারে হিসহিস করে উঠল,— তুমি কসাই। তুমি মানুষ নও। মন বলে তোমার কিচ্ছু নেই।

কথাটা আরও বহুবার বলেছে আরতি। বহু সময়ে। প্রতিবার একটু একটু করে ছিঁড়েছে সম্পর্কের সুতো। শেষবার বলেছিল বড় কঠিনভাবে। তখন তাদের মাঝে ঝুমুর এসে গেছে।

দেড় বছরের মেয়েকে নিয়ে সেবার প্রথম আরতির সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিল হিরণ্ময়। পাহাড়ে। তখন হিরণ্ময় কোম্পানির এরিয়া-ম্যানেজার, সবে একটা গাড়ি কিনেছে। শ্বাশুরের সাহায্য ছাড়াই ছোট্ট বাড়িও তুলেছে শিলিগুড়িতে। হিরণ্ময় খুশি। খুবই খুশি।

আরতিও সেদিন বেশ উচ্ছল। শেষ বিকেলে পাহাড় কিনারে দাঁড়িয়ে অনেক নিচের জঙ্গল দেখছিল সে। দেখছিল দুপাশে পাইনের হাতছানি। দেখছিল অপরূপ ক্যাকটাস চতুর্দিকে। পাশে ঝুমুর। পাহাড় চুঁইয়ে আসা আলোয় দুজনেই কী অপরূপ! খানিক দূর থেকে অপলক চোখে দুজনকে দেখছিল হিরণ্ময়।

আরতি এক সময়ে ডেকে উঠল, —এই, শুনছ, শুনছ?

— উঁ?

—আমি যদি এক্ষুণি পাহাড় থেকে ঝাঁপ দিই, কেমন হয়?

এ কি কথা বলে আরতি!

—আশঙ্কা চেপে হাসল হিরণ্ময়, —ওখানে বড় ঝোপজঙ্গল। একটু নীচে গিয়ে আটকে যাবে।

আরতি ভুরু কুঁচকে তাকাল,— যদি আরও খাদের দিকে গিয়ে ঝাঁপ দিই? ধরো ওই দিকটায় গিয়ে?

কেন আরতি! এখন তোমার কিসের অভাব!

হিরণ্ময়ের কণ্ঠস্বর বলল, —তুমি মরতে পারবে না আরতি। তোমার এত পিছুটান।

—কিসের পিছুটান?

—আমি। আমি। আমি।

আরতির কাছে পৌঁছেও হিরণ্ময়ের স্বর বিশ্বাসঘাতকতা করে বসল,—তোমার বাবা। যিনি তোমার সমস্ত জটিলতার সমাধান করতে পারেন। তোমার তমাল। যে তোমাকে ভালবাসার কথা শোনাতে পারে।

আরতি গুম। খানিক পরে ফ্যাসফেসে গলায় বলল, —আর কোনও পিছুটান নেই আমার?

ম্রিয়মান আরতিকে দেখে বুক টন টন করছিল হিরণ্ময়ের। আরতি কি শুনতে চায় সে তো স্পষ্ট। তবু কেন ঠোঁট খোলে না হিরণ্ময়ের!

দিব্যি কায়দা করে আরতিও ঘুরিয়ে নিল কথাটা, —আমাদের মেয়ে নেই?

ভুল বলতে হিরণ্ময়ের জিভ সঙ্গে সঙ্গে রাজি, —আমাদের যে একটা মেয়ে আছে, আমার মনেই থাকে না।

—মানে?

— এ মেয়ে যে সত্যিই আমার, বিশ্বাসই হতে চায় না।

— মানে ?

কথার পিঠে কথা পড়ে গেছে। মাথা খুঁড়লেও কথা আর ফেরাতে পারবে না হিরণ্ময়।

আরতি বিকারগ্রস্তের মতো চেঁচাচ্ছিল, --তুমি কসাই। তুমি ইতর। তুমি ছোটলোক...

বিকেল বড় দ্রুত রাত হয়ে গেল। কালো অন্ধকার রাত।

শিলিগুড়ি ফিরেই মেয়ে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে গেল আরতি। হিরণ্ময় আনতে গিয়েছিল তাদের, আরতির বাবা ফটক দেখিয়ে দিল।

বাড়ি গাড়ি বেচে শিলিগুড়ি ছাড়ল হিরণ্ময়। কপালে দগদগে দাগ নিয়ে। কসাই! কসাই!

তিন

মেয়ের কাছে চলেছে হিরণ্ময়। শিলিগুড়ি। সেখানে আরতির সঙ্গে থাকে ঝুমুর। মা মেয়ের দ্বীপ থেকে বহুকাল নির্বাসিত হয়েছে হিরণ্ময়। বিশ বছর পর হিরণ্ময়কে চিঠি লিখেছে মেয়ে। বিয়ে। মেয়ে বিয়ের আগে একবার বাবাকে দেখতে চায়।

কথার ভার আর বইতে পারে না হিরণ্ময়। দেহ ন্যুব্জ হয়ে আসে তার, কান মাথা ভোঁ ভোঁ করে সর্বক্ষণ। মাত্র সাতান্ন বছর বয়সেই এক পালতকেশ বৃদ্ধ হয়ে নিজেকে খুঁজে চলে হিরণ্ময়। তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে এক বিকেল, যে বিকেলে ঝুরো কুমকুমে সাজছিল মা। মা আর নেই। মনে পড়ে এক পাতাঝরা কৃষ্ণচূড়ার রুক্ষতপ্ত কপাল। গাছটা মরে গেছে। মনে পড়ে মহানন্দার হাওয়া মাখা দোলপূর্ণিমার রাত। মনে পড়ে পাহাড়ি বিকেলে দ্রুত ফুরিয়ে যাওয়া আলো। আরতিও হারিয়ে গেছে কবেই।

ঝুমুর আছে। ঝুমুর ডেকেছে হিরণ্ময়কে।

শ্রাবণের সকালে নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছল হিরণ্ময়। ট্রেনে। মেঘলা আকাশ, নোংরা চাদরের মতো আলো ছড়িয়ে আছে স্টেশনে। হিরণ্ময় বেরিয়ে একটা রিকশা ধরল। বহুকাল না এলেও এ জায়গা তার হাতের তালুর মতো চেনা, দেখতে দেখতে পৌঁছে গেল শ্বশুরবাড়ি।

বাড়িটা বদলে গেছে। আমূল। বেদিটা ভাঙা। ফটকের ধারে দারোয়ান থাকত, সেখানে নেড়ি কুকুর ঘুমোচ্ছে। বাগানে জঙ্গল। কড়িবরগা খিলান দরজাজানাল সবেতেই কেমন দুঃখী দুঃখী ভাব। দেখেই বোঝা যায় টোটা ভরা বিভলবার আর নেই।

হিরণ্ময়কে চিনতে দু-এক সেকেণ্ড সময় লাগল আরতির। চমকটুকু কাটার পর হঠাৎই মুখ উদ্ভাসিত। ক্ষণ পরেই একটা ছায়া এসে ম্লান করে দিল আলোটুকু।

শুকনো স্ববে আরতি বলল, --তুমি ?

হিরণ্ময় হাঁ হয়ে আরতিকে দেখছিল। সময়ের অজস্র দাগে ভরে গেছে আরতি। ছোট্ট কপাল চওড়া হয়ে গেছে। বয়স ঘাঁটি গেড়েছে দেহের আনাচে-কানাচে।

থতমত মুখে হিরন্ময় বলল, —এলাম।

আরতি বলল, —এসো!

বৈঠকখানা ঘরে বসেছে হিরণ্ময়। ঘরটাতেও প্রচুর ঝুল জমে আছে। পুরনো সোফায় ধুলোর পরত।

সময়েব বড়ই ওলটপালট করা স্বভাব! হিরণ্ময়ের অস্বস্তি হচ্ছিল।

চারঠেঙে ঢাউস পাখাটা চালিয়ে দিয়ে আরতি বলল, —কেমন আছ?

--ভাল। ভালই তো।

আরতিও কি ভুল কথা বলা শিখে গেছে!

- -হিবণ্ময় প্রাণপণ চেষ্টা করে বলে ফেলল, —তুমি আর মুখ দেখাতে বারণ করেছিলে, তাই আসিনি।

—ও। আরতি আবার ভুল কথা বলল, —তা এতদিন পর শিলিগুড়িকে মনে পড়ল যে?

—শিলিগুড়ি আমার অস্তিত্বে মিশে আছে আরতি।

—বলতে গিয়েও হিরণ্ময় বলে উঠল, —মেয়ে চিঠি দিয়ে ডাকল...

—সেই চিঠি দিল! পলকে কঠিন হয়ে গেছে আরতির মুখ,—বেইমান। বেইমান। এত কাল ধবে যে একা এল, মানুষ করল...

হিবণ্ময় গুটিযে গেল। আরতি কি সত্যি চায়নি হিবণ্ময় আসুক!

বেশ খানিকক্ষণ পর কথা বলল আরতি, —একেই বলে রক্তেব দোষ। মেয়ে বলে যে বাপ স্বীকাবই কবল না, তাব ওপব এত কিসেব টান থাকে মেয়ের!

হিরণ্ময়ের বুক ধুকপুক করে উঠল। প্রিয়জন তবে হারায় না! ফিরে ফিরে আসে। ভিন্ন রূপে!

আরতি বলল, —মেযে বিয়ের কথাও জানিয়েছে নিশ্চযই?

—হুঁ।

--ভালই হল। বাপের কর্তব্যটাও সেরে যাও তবে।

--পাত্র ভাল?

—ইঞ্জিনিয়ার। মেয়ে নিজেই পছন্দ করেছে।

—ও।

--বোসো। মেয়েকে ডেকে দিচ্ছি। তার মুখ থেকেই শোন সব। উদাস মুখে আরতি চলে যাচ্ছিল, হিরণ্ময় পিছু ডাকল, —শোন।

—কি ?

—আমার আসাটা কি তোমার পছন্দ নয় ?

ঠিকাদারের মেয়ে সত্যিই কথা ধরে রাখা শিখে গেছে। দরজার কাছে থমকে দাঁড়াল কয়েক মুহূর্ত। নাকি অনন্তকাল ? তারপর তার ঠোঁট বলল, —আমার পছন্দ-অপছন্দে কি আসে যায় !

ভেতরবাড়িতে ঢুকে চিৎকার করে মেয়েকে ডাকছে আরতি। হিরণ্ময় শুনতে পাচ্ছিল।

হঠাৎ ভীষণ ভয় করে উঠল হিরণ্ময়ের। মেয়ে আসছে। মেয়েকেও যদি ভুল কথা বলে ফেলে হিরণ্ময় ! যদি বলে ! যদি বলে !

থাক। কথা নয় রয়েই যাক বুকে।

কত কথাই তো জমে মনে। ক'টা কথাই বা বলতে পারে মানুষ !

হিরণ্ময় পালাল। পালিয়ে বাঁচল।

বিদ্যাসাগর! বিদ্যাসাগর!

স্বপ্নময় চক্রবর্তী

—আপনার বয়স ?

—উনিশশো চল্লিশে জন্মেছি।

—চাকরিতে কবে ঢুকেছিলেন ?

—যে বছর চীনের সঙ্গে যুদ্ধ হল।

—কী পোস্টে কাজ করছেন ?

—ইউ.ডি.সি.। আমাকে বড়বাবু বলে।

—দেশ কোথায় ?

—খন্ডঘোষের কাছে, কেওটাগ্রাম।

—তা আপনি ঐ খোঁড়া মেয়েটাকে নিয়ে অন্ধকারে নদীর পাড়ে গেলেন কেন ?

থানার বড়বাবুর চোখ টর্চলাইটের ফোকাস মেরে আছে। মেজবাবু, জমাদার, পিওন, সবাই ঘিরে আছে। বড়বাবু টেবিলের উপর রাখা পেপারওয়েটে হাত বুলোচ্ছেন, সেই হাতের দু-আঙুলে চাপা সিগারেট ছোট হয়ে এসেছে। দেয়ালে জেলার ম্যাপ। ম্যাপ-এ নীল রং-এ দামোদর নদী।

(আমি চাষীর ছেলে। জাতে মাহিষ্য। বংশে আমিই প্রথম ম্যাট্রিক পাশ করি। তাইতো আমার বাবা হরিসংকীর্তন বসিয়ে ছিলেন। বঙ্গীয় মাহিষ্য সম্প্রদায়ের সেক্রেটারী বর্ধমান সদর থেকে এসেছিলেন ঐ হরি-সংকীর্তনে। যাবার সময় আমার পিঠে হাত রাখলেন, মাথায় হাত রাখলেন, তারপর একটা চিঠি লিখে আমার হাতে দিলেন। সেই চিঠি নিয়ে মেমারির এম.এল.এ-র কাছে যাই। তখনকার দিনে এম.এল.এ-রা আজকালকার মত ছিল না। অত ঘোরায়নি। চাকরিটা হয়ে গেল।)

—কী করেন ? কোন্ ইউনিয়ন ? ফেডারেশন না কো-অর্ডিনেশন ?

—এ্যাঁ?

—কোন্ ইউনিয়ন করেন?

—ঐতো, মাধব যশ মাসে দুটাকা করে চাঁদা নেয়, ইউনিয়নের চাঁদা।

—কোন্ ইউনিয়ন সেটা, ফেডারেশন না কো-অর্ডিনেশন?

—সেটা তো ঠিক....মানে খোঁজ করিনি স্যার...।

(আমি সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। অফিসে কোন পার্টি মিষ্টি খাবার টাকা দিতে চাইলে আমি নিজে কখনো নিই না, পিওন জগবন্ধুকে দেখিয়ে দিই। জগবন্ধু প্রতি হপ্তায় আমাকে যা দেয়, আমি তাতেই খুশি। আমার অত লোভ নেই। পালাবাবু, জানাবাবুদের মত পিওনদের সঙ্গে খিটিমিটি করি না। কাজের ব্যাপারে আমার কোন ইগো নেই। সাহেব যা করতে বলে করে দিই। তর্ক্কো করি না।)

—আপনার অফিস থেকে দামোদরের পাড় কত দূর?

—দু-তিন কিলোমিটার হবে।

—কিসে গেলেন?

—রিকশায়।

—বে-থা করেছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—বাচ্চাকাচ্চা?

—চারটি।

—পরিবার কোথায়?

—দেশে।

—চারটে বাচ্চা? বাচ্চাগুলো আপনার তো? হেঁ-হেঁ। তা আপনি খোঁড়া মেয়েটাকে নিয়ে কী ধান্ধায় ঐ অন্ধকারে দামোদরের ধারে গেলেন?

ক'দিন হল জয়েন করেছে মেয়েটা?

—তা বছরটাক হবে।

সাইকেল রিকশাটা অফিসের সামনে গাছতলায় দাঁড়ালো। একটা রোগা মত মেয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল- এটাই কি বি.ডি.ও অফিস? আমি বললুম—হ্যাঁ।

তারপরই মেয়েটা গাছটার দিকে তাকিয়ে বলল— এটা বুঝি কৃষ্ণচূড়া গাছ?

আমি বললুম তেঁতুল। তারপর একটা ছেলে মেয়েটাকে ধরে রিকশা থেকে নামালো। তখনই আমি দেখলুম মেয়েটা খোঁড়া। ছেলেটা ব্যাগ থেকে অশোকস্তম্ভের ছাপমারা একটা খাকি খাম বের করল। বলল জয়েন করতে এসেছে।

—কে? —এই যে আমি এর দাদা।)

—মেয়েটার নাম বলুন।

—পূরবী। পূরবী দত্ত।

—বয়স ?

—সার্ভিসবুক না দেখে...।

—আন্দাজে বলতে পারেন না একটা যুবতী মেয়েছেলের বয়স ?

—না-না-না, যুবতী নয় স্যার, মানে বয়স অনুযায়ী যুবতী বলতে পারেন, ঠিক যুবতী নয় স্যার। মানে রোগা, খোঁড়া.....।

—আপনি যে মহা ঘোড়েল লোক মশাই, যুবতী কিন্তু, যুবতী নয়.... এবার বলুন মেয়েটাকে কিভাবে রেপ্ করা হয়েছিল, বেশ ভালভাবে ডিটেল্স-এ বলবেন।

—ঠিক বলতে পারব না স্যার। আমাকে আগে ওরা মাথায় মারে। জ্ঞান হবার পর দেখি আমি দামোদরের বালির চড়ায় শুয়ে আছি। আমি ওনার নাম ধরে ডাকলাম। কেউ নেই স্যার, শুধু ক্রাচ্টা পড়ে আছে।

—এবার বলুন আপনি কী ধান্ধায় ঐ সন্ধ্যেবেলা অফিসের মেয়েটাকে নিয়ে দামোদরের পাড়ে গিয়েছিলেন।

—মেয়েটা দামোদর দেখতে চাইছিল স্যার, সেই জয়েন করার পর থেকেই। আমাদের অফিসে স্যার একটা ম্যাপ, আপনাদের মতই, আমাদের দেয়ালে ঝোলান থাকে। ওখানে স্যার নীল রং-এ দামোদর নদী আছে। মেয়েটা স্যার ম্যাপে দামোদরের নাম দেখেই কেমন যেন— বিশ্বাস করুন— কি বলব, বর্ষার খল্‌সে মাছের মত, কি বলে উচ্ছ্বসিত হয়ে গিয়েছিল। বলেছিল— বিদ্যাসাগর, বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর তো দামোদর পার হয়ে....।

—পুরনো কথা ছাড়ুন। আজকের কথা বলুন।

—সেই কথাই তো বলছি স্যার, মেয়েটাতো কেবল দামোদর যাব দামোদর যাব প্যাঁচাল পাড়তো। আমি বলতাম কী হবে ওখানে গিয়ে ? ও বলতো— না যাবোই, একদিন নিয়ে চলুন না। তা আজ আমি স্যার, ছুটিতে ছিলাম। কারণ আজ সকালে বর্ধমান যেতে হয়েছিল। আমার জমিতে স্যার, বর্গা রেকর্ডিং হয়ে গেছে। বর্ধমানে সেট্‌লমেন্টের এক সাহেবের বাড়ি দুটো মুরগি আর মিহিদানা নিয়ে যেতে হয়েছিল স্যার, আমার সম্বন্ধী নিয়ে গিয়েছিল। ফিরলাম বিকেলে। চায়ের দোকানে বসে জল-দুধ খাচ্ছিলাম, চা খাই না। তখন ক্রাচে ভর দিয়ে মেয়েটা যাচ্ছিল স্যার, আমাকে দেখে ফেললে। বলল— এইযে আপনি, আজ চলুন, নিষেধ শুনব না। আমি বুঝলাম— দামোদর যাবার বায়নাক্কা। মেয়েটা বলল— কতদিন বাদে রোদ উঠেছে। আমি বললুম— রোদ উঠেছে ভাল কথা। ধানে কীটপোকা লাগবে না।

উনি বললেন— সেদিন আসবার সময় ট্রেনে দেখেছি দামোদর পাড়ে কত কাশফুল, আর সেই ছোটবেলায় পথের পাঁচালীতে দেখেছিলাম। চলুন না দাদা, রিক্শা করে দামোদর পাড়ে যাই। আমি বললুম— কাশ একগোছা নিয়ে আসবখনে। কাশফুলের ডাঁটি দিয়ে বেশ ভাল ঝ্যাঁটা হয়।

উনি বললেন,— আপনার দাদা খালি গেরস্থালীর চিন্তা। চলুন না রোদ্দুরটা কমলা রং-এর হয়ে যাচ্ছে, কাশফুলগুলোর রংটাও আস্তে আস্তে পাল্টে যাবে না ? দেখব। আমার যদি পা ভাল থাকতো, আপনাকে বলতাম না। একাই চলে যেতাম— ছুটে চলে যেতমা। তাই রিক্‌শা করলাম।

তখন বিকেল ক'টা ?

—সাড়ে চার-পাঁচ হবে।

—তারপর রাত্তির পর্যন্ত কাশফুল দেখলেন ! একটা দেশলাই কাঠি দিয়ে কান খোচাচ্ছেন বড়বাবু। দেয়ালে জেলার ম্যাপ। পাশে একটা মাকালীর ক্যালেণ্ডারও আছে। তাতে জবাফুলের মালা পরানো। থানার মধ্যে মাকালী ? মাকালী সর্বত্র। টেপে হিন্দি গান বাজছে। পুলিশ শুনছে। এটাও সর্বত্র। —সর্বত্র রেপ্ হচ্ছে বুঝলেন, সর্বত্র। আপনার ওখানে ঐ মহিলাকে নিয়ে যাওয়াই উচিত হয়নি, বুঝলেন।

(ঠাকুমার নাকি বিয়ে হয়েছিল দশ বছর বয়সে। এখন যিনি আমাদের গুরুদেব, তাঁর বাবা শ্রীশ্রীযতাননন্দ গোস্বামী গুরুপ্রসাদী করেছিলেন ঠাকুমাকে। সেটা কি রেপ্ ছিল ? সবাইতো তাতে সায় দিয়েছিল। ঢাকঢোল বেজেছিল।) বর্ধমান স্টেশনে এক ভিখারিনী, ডি.এ-বৃদ্ধির আলাপে ব্যস্ত দুজন ভদ্রলোককে ভিক্ষার জন্য বিরক্ত করছিল। একজন ভদ্রলোক বলল— ভিক্ষে তো করছ, ছানাপোনা হওয়া কমাতে পারো না ?

ভিখারির মা বলেছিল -- ছানাপোনা কি এমনিতে হয় বাবু ? পুলিশের লোকেরা কিছু না পেলে পেলাটফরমে থাকতে দিবে কেনে ? লোক দুটো হাসলো। আমি হাসলাম। মানে কী ন্যায্য কথা ভাবলাম, হক্ কথা ভাবলাম।

এখানকার বাসন্তী সিনেমাহল-এ একটা সিনেমা চলছে। ডেসপ্যাচে যে ছেলেটা বসে সে নাকি তিনবার দেখেছে। সেখানে নাকি পাঁচবার রেপ আছে। ছেলেটা অফিসের চৌকিদারকে ঐ পাঁচটা রেপের বর্ণনা দিচ্ছিল। সেই গল্প শুনে মন্ডলবাবু দাঁত ক্যালালো। মিত্রবাবুও। আমিও। রেপ্ কি দাঁত ক্যালোনোর মত ব্যাপার ?— তবুও....

—তা ওই মেয়েটা খামাকো চাকরি করতে কলকাতা ছেড়ে এখানে মরতে এল কেন ?

—ওর বাবা গ্যাস্ট্রিকে মারা যান। কম্পেনসেটরি গ্রাউন্ডে চাকরি। সরকার এখানেই পোস্টিং দিয়ে দিল। ধরা-করার কেউই ছিল না।

—ওনার সঙ্গে কে থাকতেন ?

—ওনার মা থাকতেন। তবে বোধ হয় মাসখানেক ধরে উনি একাই আছেন।

—দাদাটি ?

—পিসতুতো। শিবপুরে থাকে।

—তাহলে মাসখানেক ধরে একা ?

—হ্যাঁ স্যার।

—তবেতো ও জিনিস হয়েই গ্যাছে।

কয়েকজন হেসে উঠল। জেলার ম্যাপ, গান্ধীজীর ছবি, বিড়ির গন্ধ, ফ্যাকাশে আলো....।

—তারপর ?

—মানে ?

—শুরু করুন। কাশফুল থেকে শুরু করুন।

—উনিতো রিক্সা থেকে নেমে ক্র্যাচে ভর দিয়ে নদীর দিকে এগুতে লাগলেন। বালিতে ঐ ক্র্যাচ-লাঠির গোড়া সেঁধিয়ে যাচ্ছিল। উনি আঙুলটা পশ্চিমের দিকে রেখে বললেন— দেখুন, ওদিকে কী হচ্ছে। আমি বললুম— ওদিকে তো খড়গপুর যাবার রাস্তা তৈরি হচ্ছে। উনি বললেন— আঃ! সূর্যটাকে দেখুন না, কীরকম রং দেখুন, জলের মধ্যে চিকিচিকি, কাশফুল সোনালি হয়ে গেছে। আমি বললুম— এমনকী আর, এরকম তো রোজই হচ্ছে। তিনি আমাকে বসতে বললেন। আমি একটু বসলাম। উনি দামোদরের দিকে তাকিয়ে বললেন— বিদ্যাসাগর। আমি তাঁর চোখের দিকে তাকাতেই তিনি বললেন— ছোটোবেলায় বইতে বিদ্যাসাগরের ছবি দেখেছি, সাঁতরে পার হচ্ছেন তিনি দামোদর, সেই থেকেই, বুঝলেন, দামোদরের কথা শুনলেই বিদ্যাসাগর মনে পড়ে। দামোদরের এপার-ওপার জুড়ে বিদ্যাসাগর, তাই না ? আমি বললুম —বিদ্যাসাগরের দামোদর কি আর আছে ? সব চড়া পড়ে গেছে।

এমন সময় স্যার, ঝোড়া বাতাস আসে। কোত্থেকে শুকনো অশ্বত্থ পাতা হাওয়ায় উড়ে এসে ওনার শাড়িতে লাগে। উনি ঐ পাতাটা গালে ঘষছিলেন আর আপন মনে কেমনধারা যেন বকবক করছিলেন। বলছিলেন— সেই কবে ছোট বয়সে উনি শিবপুরে পিসিমার বাড়ি গিয়েছিলেন, ওনাকে রিক্‌শায় চাপিয়ে পিসতুতো ভায়েরা গঙ্গার ধারে বেড়াতে গেল, একটু পরেই ঘন আর কালো মেঘ। আকাশ ফালা-কালা— তারপর হাওয়া, বৃষ্টি। রিক্‌শাওয়ালা তো জোর রিক্‌শা ছুটিয়ে চলল বাড়ির দিকে। উনি কেবলই বলেন— আস্তে চলো— আস্তে চলো— আস্তে চলো....আমি তখন বলি— এবার উঠুন মিস দত্ত.... মিস দত্ত বললেন— পূরবী বলতে পারেন না, পূরবী। উনি সেই অশ্বত্থ পাতাটা হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে হাতের ইশারায় আমাকে কাছে ডাকলেন। বললেন— শুনুন না, একটা জরুরি কথা আছে। আমি বললাম— বলুন না, শুনতে পাচ্ছি। উনি বললেন— আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আপনি আমায় কত কাজ শিখিয়েছেন অফিসে। কত গাছ চিনিয়েছেন রাস্তায়, আজ কী সুন্দর জায়গাটা দেখালেন....।

আমি উড়ে আসা আর একটা অশ্বত্থ পাতা খপ্ করে ধরে ওনাকে দিতে গেলাম— 'নিন', উনি হাসলেন। হাওয়ায় ঐ হাসি উড়ে গিয়ে কাশফুলে মিশে গেল। বললেন— কী হবে? আমি বললুম— ঐ যে এতক্ষণ পাতাটা নিয়ে খেলা করলেন, তাই আর একটা দিলুম। উনি বললেন— শুনুন, আপনার জন্য একটা সোয়েটার বুনছি। শীতের আগেই দিয়ে দেব। আমি বললুম— ঐ সোয়েটারটা, যেটা আপনি অফিসে মাঝে মাঝে বোনেন, সবুজ আর সাদা?

—তারপর? চুপ করে গেলেন কেন মশাই, বলুন, কিছু বাদ দেবেন না।

—অন্ধকার হয়ে আসছিল, আমি বললুম— এবার উঠুন মিস দত্ত, উনি তবু বললেন,— আর পাঁচ মিনিট।

এমন সময় স্যার, একটা প্রাইভেট গাড়ি এসে থামল। তিনজন লোক এগিয়ে এল। আমাকে ঠাস্ করে একটা চড় মারল। বলল— শালা, মেয়েছেলে নিয়ে ফুর্তি? তারপর ওনাকে বলল— এতক্ষণ তো একে আনন্দ দিলেন, এবার আমাদের একটু দিন। আমি বুঝলুম সামনে বিপদ। গুরুনাম জপ করতে লাগলাম।

আমি ওনাকে আঁকড়ে ধরতে গেলাম, কিন্তু লজ্জায় পারলাম না। ওরা পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে গাড়িতে তুলল। আমি মধুসূদনকে ডাকতে লাগলাম। গাড়ি ছেড়ে দিল। আমার পকেটে টর্চলাইট ছিল স্যার, গাড়ির নম্বরটা দেখলাম। তিন হাজার দুই।

—তিন হাজার দুই?

সবাই কেমন যেন নড়েচড়ে বসল। এ-ওর মুখের দিকে তাকালো।

—নম্বরটা ঠিক দেখেছেন তো?

—হ্যাঁ স্যার, তিন হাজার দুই। স্পষ্ট দেখেছি।

নম্বরটা জপ করতে করতে আসছি।

বড়বাবু কলম ঠুকলেন টেবিলে। বললেন— আপনি আগে বলেছিলেন যে আপনি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন! ওরা আপনাকে মেরেছিল.....

—স্যার, ওটা ঠিক নয় স্যার, মিথ্যে বলেছিলাম। একজন সজ্ঞান ব্যাটাছেলের কাছ থেকে একটা মেয়েকে ছিনিয়ে নেয়া স্বীকার করতে খুব লজ্জা করছিল স্যার, তাই প্রথমে মিথ্যে বলে দিয়েছিলাম।

—ধুর মশাই, আপনি একজন নায়াব।

—না স্যার, মাকালীর পা ছুঁয়ে বলছি কিচ্ছু মিথ্যে নেই, সব সত্যি বলছি স্যার, শুধু প্রথমটায়....

আপনি অন্ধকারে কি করে গাড়ির নম্বরটা পড়লেন?

—আমার পকেটে টর্চ থাকে স্যার। নতুন ব্যাটারি, পরশুর কেনা, যশোদা ভাণ্ডার থেকে কিনেছিলাম।

বড়বাবু সিগারেট ধরালেন। একটু চুপ করে বললেন— দেখুন মশাই চাকরি

করতে এসেছেন ঝুটঝামেলায় কেন জড়িয়ে পড়ছেন, এসব ডায়রি ফায়রি কেন করতে যাচ্ছেন, চেপে যান। আমি বললুম— ওদের ধরবেন না ? মেয়েটাকে বাঁচাবেন না ? গাড়িটার নম্বর তো....

—তাহলে তো প্রথম আপনাকেই অ্যারেস্ট করে দেবো। যদি বলি আপনিই চক্রান্ত করে...

থানা থেকে বেরিয়ে আসি। ঘরে যাই। রান্নাবান্না করতে ইচ্ছে করল না, শুয়ে পড়লাম। একটু পরেই উঠে পড়লাম। বাইরে একফালি চাঁদ আলো বমি করছে। পূরবীদেবী যে বাড়িতে থাকেন ঐ বাড়ির সামনে গেলাম। দেখি ঘরে আলো জ্বলছে। পূরবীদেবীর নড়াচড়াও দেখতে পাই। আঃ। ডাকলাম না। যদি কেউ কিছু ভাবে ? কিংবা আমার নিজেরই মুখ দেখার লজ্জা। সারারাত নিজের ঘরে একা একা বসে থেকে পরদিন সকালে ওর ঘরে গেলাম।

আমাকে দেখেই ওর চোখ থেকে জল বেরিয়ে গাল বেয়ে পড়ে। আমি কিছু বলি না, বলতে পারি না। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকি।

উনি বললেন— আমাকে ওরা ছেড়ে দিয়েছিল। গাড়ির একজন বলছিল— একটা খোঁড়া মেয়েকেই শেষ পর্যন্ত... অন্য একজন বলেছিল— দেখি মালটাকে। গাড়িতে আলো জ্বালতেই একজন বলল— কাকে ধরে এনেছ ? এঁকে চেনো না ? এতো বি.ডি.ও অফিস কাজ করে। অন্য একজন বলল— ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও; এখনো ইটভাটার দিকে গেলে সাঁওতাল টাওতাল পাওয়া যাবে।

আমাকে মোড়ের মাথায় নামিয়ে দিয়ে গাড়ি ঘুরে গেল। আমি বি. ডি. ও অফিসের কেরানী বলে বেঁচে গেলাম। অন্য একজন হয়তো বা মরল, যার চোখে চশমা নেই, গুছিয়ে কথাও বলতে পারে না।

আমি বললাম— খুব বাঁচা বেঁচে গেছেন ম্যাডাম। তিনি বললেন— ছিঃ ! 'ছিঃ' শব্দটা বলার সময় মুখ দিয়ে থুথু ছিটালো। ক্ষোভ আর ঘৃণার পুঁটুলি ছুঁড়ে দিল যেন। থুথু-মাখানো 'ছিঃ' শব্দটা চামচিকের মত ঘুরতে লাগল। এই 'ছিঃ' কি আমি ? না আমার চারপাশ ?

অফিসে আর আমার সঙ্গে কথা বলতেন না পূরবীদেবী। আমি কোনোদিন আগে এসে পূরবীদেবীর ড্রয়ারের ফাঁকে গলিয়ে দিতাম শির বের হওয়া অশ্বত্থ পাতা বা মাছরাঙা পাখির নীল পালক। তবু উনি কথা বলতেন না আমার সঙ্গে। মাঝে মাঝেই মনে হ'ত থুথু ছিটানো 'ছিঃ' শব্দটা চামচিকের মত আমার পাশে পাশে ঘুরছে।

একদিন চিমনি কারখানার কনট্রাক্টর এসে আমায় বলে— জলের ব্যবস্থাটা শিগ্‌গির করে দেন দাদা, বহুদিন তো হল। সন্দেশের বাক্সোটা টেবিলে রাখলেন। আমি বললুম, বাকসোটা হঠান শিগ্‌গির। তারপর বললুম— সিরিয়ালি হবে। আপনার টাইম হলেই পেয়ে যাবেন। বিরক্ত করবেন না। বলেই পূরবীদেবীর দিকে তাকালাম।

দেখি উনি আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। বি.ডি.ও সাহেব নিজে এসে বললেন—

এবার চিমনি ফ্যাক্টরির জলের ফাইলটা ছেড়ে দিন। আমি বললুম, ওটার প্রায়োরিটি নেই। হাসপাতালের জলটা আগে হবে।

চিমনি ফ্যাক্টরির কনট্রাক্টার সাহেব গাড়ি করে এসেছিল। তার নম্বর তিন হাজার দুই।

কিছুদিন পরে গাড়িটাকে আবার দেখলাম অফিসের সামনে। গাড়ির নম্বর তিন হাজার দুই। গাড়িতে বি.ডি.ও সাহেবের পরিবাব। গাডি যাচ্ছে বর্ধমান-টাউন। আমি রুলটানা স্কেলটা নিয়ে ছুটলাম। বেপরোয়া বাড়ি মারতে লাগলাম গাড়িটার গায়ে। মুখ থেকে থুথুমিশ্রিত 'ছিঃ' শব্দ ঠিক্‌রে বের হতে থাকে। গাড়িতে ঝম্‌ঝম্‌। বি.ডি.ও-র পরিবার চিৎকার করতে থাকে। সবাই আমাকে ধরাধরি করে সরিয়ে দেয়। টেনে অফিসের মধ্যে নিয়ে যায়। আমি একটি মুখ দেখবার জন্য ব্যাকুল— চারপাশে তাকাই।

আমার ট্রান্সফার হয়। মুর্শিদাবাদের খুব ভিতরের দিকে। পানিশ্‌মেন্ট। আমাব জিনিসপত্র গোছগাছ করছিলাম। পূরবীদেবী ক্র্যাচে ভর দিয়ে আমার ঘরে আসেন। তখন রাত্রি। ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে। ব্যাঙ ডাকছে। পূরবীদেবীর হাতে সাদায় সবুজে মেশানো সোয়েটার। বললেন— দাদা, এটা পরবেন।

আর কী আশ্চর্য! যেন কানায় কানায় ভর্তি হয়ে গেল দামোদব, বিশাল; বিদ্যাসাগর !! বিদ্যাসাগব !!

উনি বললেন— ভালো থাকবেন। চিঠি লিখবেন। জানাবেন কেমন থাকেন, আর —

আর কিছু দরকার নেই! বাজনা বাজছে ঝিঁঝিঁর শব্দে, বাজনা বাজছে ব্যাঙের ডাকে। হারমনিয়ামেব মতো বেজে উঠল মুর্শিদাবাদের রাস্তা।

মায়াযান !

কিন্নর রায়

এ ট্রেন এবার রাউরকেল্লা চলে যাবে। কি জোরে যায় এখন। জানলার ধারে বসলে চোখে কয়লার গুঁড়ো বেঁধে না। হাতে এসে লাগে না গরম কয়লার ধুলো। ট্রেনের সেই গিস গিস ঘ্যাস ঘ্যাস— কু-উ-উ শব্দটাই নেই। কত কি বদলে গেল। কয়লার ইঞ্জিন জংশন স্টেশনে আর দাঁড়ায় না জল নিতে।

বছর কুড়ি আগেও টাটানগর অব্দি যেত এ গাড়ি। নিজের মনে এসব ভাবতে ভাবতে তিনি প্ল্যাটফর্মে পা রাখলেন। ধুতি একটু তুলে পরা। দু পায়ের পুরুষ্টু ডিম চোখে পড়ে। ভালো করে বললে যা কিনা কাপ্ মাসল— অনেকটা ফুটবল খেলোয়াড়দের যেমন হয়, তেমনই স্বাস্থ্যবান। পায়ে কাপড়ের লাল কেডস্। গায়ে সুতির হাফ হাতা শার্ট।

শার্টটায় ইস্তিরি নেই। ধুতিও লালচে মতো, মাড় ছাড়া। কোঁচকানো শার্ট, লালচে ধুতি দেখলে বাবলু রাগ করবে। কত বড় হয়ে গেছে। হঠাৎ দেখলে মনে হবে আমার ছায়া। চুলের ঢেউ, চোখ। মুখের ভাঁজ। ঠোঁট। কাঁধ। দাঁড়ান। পায়ের কেডসের দিকে একবার ভয়ে ভয়ে তিনি তাকালেন। লাল ক্যাম্বিসের গা ফুটো করে ডান পায়ের কড়ে আঙুল ঠিক বাইরে। এইরে! দেখলেই বাবলু রাগ করবে। মিত্রাও। হয়ত বকুনি খাব। গৌরী, গজেনরা দেখলেও রাগ করত।

প্ল্যাটফর্মের ঘড়িতে প্রায় এগারোটা। গাড়ি একটু লেট ছিল। ১৩০৩-এর চৈত্র শেষ হয়ে এল প্রায়। আজ ন'দিন পরই বাংলা নববর্ষ। দূরে কোথায় একটা পাখি ডাকছে। মনে পড়ছে ১৯৪৬-এর ২২ আগস্টের দিনলিপি।

অনেক দিন পর এলুম এখানে, নতুন দেশের নতুন হাওয়া গায়ে লাগল। সকালে উঠেই দেখলুম সুবর্ণরেখার ওপারের মেঘাবৃত পর্বতমালা। নতুনের মধ্যে মন এসে

মুক্তি পেলে। আবার শালবনে বেড়াতে গেলুম, আবার বাঁধে স্নান করলুম। বিকেলে ভট্‌চাজ সাহেবের বাড়ি বেড়াতে গিয়ে গল্প গুজব করি। পথে যাবার সময় হঠাৎ মিসেস কন্‌ওয়ারের সঙ্গে দেখা। সে বল্লে আমরা ছুটিতে চলে যাচ্ছি, একদিন এসো। অন্ধকারে রাত্রে ফিরে এলুম। নুটু এল অনেক রাতে লরিতে। তার সঙ্গে গল্প করি দেশের ধানের জমির।

পাখির ডাক আবারও শুনতে পেলেন তিনি। ট্রেন চলে গেছে। এবার আমি হাঁটব। হাঁটতে হাঁটতে দহিগোড়া হয়ে—

স্টেশন থেকে বেরিয়ে সামনেই অনেক সাইকেল রিকশা। তার পাশে সার বাঁধা অটো। সবাই ডাকছে— দহিগোড়া। দহিগোড়া। মৌ ভাণ্ডার।

রিকশায় আট টাকা নেবে। কেউ কেউ দশও চাইছে। তার থেকে হাঁটা যাক। বাজারের ভেতর দিয়ে একটা পথ আছে। আর একটা রাস্তা সোজা। ডান দিকে নিচু রেল লাইন। বাঁ দিকে টাটা যাওয়ার মিনি বাস স্ট্যান্ড। এসব বাস গালুডি হয়ে আরও কোথায় কোথায় যায়। মনে পড়ছে ১৯৪৩ এর ২২ সেপ্টেম্বর ট্রেনে টাটানগর পৌঁছেছিলাম সকাল সাড়ে দশটায়। বাদাম পাহাড়ের গাড়ি দাঁড়িয়েছিল প্ল্যাটফর্মে। সকালবেলা ছাড়বে। বাদাম পাহাড়ের গাড়িতে ইন্টার ক্লাসে শুয়ে ঘুমোই। ভোরে মুখ ধুয়ে মেলে ঘাটশিলা। সে দিন বুধবার ছিল। পরদিন সকাল থেকে মেঘ আর বাদলা। এই সময় এমন বাদলা হবে কে জানত! দ্বিজবাবুর বাড়ি সন্ধে থেকে রাত সাড়ে দশটা অব্দি ছিলাম। সেখানে লুচি খেলাম আমি আর কেষ্ট সরকার। আগের দিনই, মানে বুধবার দ্বিজবাবুর বাড়ি ফুল আনতে গেছিলাম। বিকেলে বিঁধা পরব দেখতে যাব হই ভূপালবাবু ও স্টেশনমাস্টারের সঙ্গে। মুকুলের বাড়ি চা খাই। বুধা তামাক সেজে এনেছিল।

ঘাটশিলায় এখন সব সময়ই ভিড় লেগে থাকে। পুজোর সময়, শীতে তো কথাই নেই। আর কি হয়েছে জিনিসের দাম। ১৯৪৩-এর ২৫ আগস্ট ছিল বুধবার। সকালে লিখে বিকেলে বাজারে গিয়ে এক সঙ্গে চৌত্রিশ টাকা তিন আনার জিনিস কিনি মুদির দোকান থেকে। চাল বাদ দিয়ে আর সব। এখন আলু চার টাকা, পাঁচ টাকা কিলো। পেঁয়াজ কুড়ি। সর্ষে শাক দেড় টাকায় দু'আঁটি। রূপনারায়ণের ইলিশ ষাট। মাথা সমেত গোটা রুই ছত্রিশ। যুদ্ধের বাজারে বনগাঁর দিকে হাটে, গাঁ ঘরে পটলের সের ছিল দু'আনা, দশ পয়সা। সেই পটল বারো চোদ্দ টাকা কিলোয় গিয়ে ঠেকেছিল। এখন আবার ছয়ে নেমেছে। হয়ত অনেক মানুষের মাস মাইনেও বেড়েছে— তবে সবার নয়— এটুকু ভেবে নিয়ে তিনি একটা বিড়ি ধরালেন।

রোদ অনেকটা ছড়িয়েছে চারপাশে। বেশ গরম। তবে হাওয়া আছে। ডান দিকে নিচু রেল লাইন। বাঁ দিকে বাড়ি, বাজার, দোকান। হোটেল। গেস্ট হাউস। ফাঁকা

মাঠ আর থাকবে না। কোথাও থাকবে না। চারদিকে এত মানুষ। এত মানুষ। বাবারে বাবা! গাছ নেই। আকাশ দেখা যায় না।

১৯৩০ থেকেই ঘাটশিলায় আসা যাওয়া! তারপর ১৯৩৪ সালে....

অ বিভূতিবাবু, শুনছেন!

তিনি চমকে পেছু ফিরলেন। দেখলেন আর একজন ধুতি-পাঞ্জাবি। পায়ে চামড়ার পা-ঢাকা জুতো। আমার নাম ধরে ডেকে বলতে তাঁর কথা আটকে গেল কি! খুব বড় বড় এক জোড়া চোখ। হয়ত অনেক দূর দেখতে পান। উনি আমায় ডাকেছেন।

আরে আপনি! জীবনানন্দ!

আপনার বাড়ি সরকার উদ্ধার করবে। কলকাতা থেকে খবরের কাগজের লোকজন, ফটোগ্রাফার, সাহিত্যিকেরা এসেছেন। আমার তো বাড়ি ছিল না। ভালো ঘরও ছিল না কখনও লেখার। তাই দেখতে এলাম।

বেশ করেছেন। একটা বিড়ি খান।

না বিভূতিবাবু।

আচ্ছা তারাশঙ্কর আর আপনি সমান বয়সি। তারাশঙ্করের সঙ্গে তো কত দেখা হয়েছে। সাহিত্য সভায়। গজেন সুমথদের মিত্র ও ঘোষের আড্ডায়। গৌরীর মিত্রালয়ে। আরও কোথায় কোথায়। কিন্তু আপনার সঙ্গে মনে হচ্ছে হয়নি।

এই তো হলো। খুব আস্তে কথাটি বলে জীবনানন্দ হাঁটছিলেন বিভূতিভূষণের পাশাপাশি।

আপনার বাড়িটা বুঝলেন, বে-আইনি দখলদার হটিয়ে নিজেদের দখলে আনার খুব দরকার ছিল।

নিজেদের! হ্যাঁ তা নিজেদেরই তো। বাবলু, মিত্রা— ওদের ছেলেরা— আমার ছাত্র আবিরলালও আছে। সে এখন খুব নাম করা কানের ডাক্তার। কলকাতার শেরিফ হয়েছিল। বিধানসভার ভোটে দাঁড়িয়েছিল। যদিও জিততে পারেনি। কিন্তু খুব কৃতী ছাত্র। মাস্টারমশাই হিসেবে আমার বুক ভরে ওঠে ওদের কথা ভাবলে। খুব গর্ব হয়। বাবলু-মিত্রাদের সঙ্গে আবিরও এসেছে।

জীবনানন্দের পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বিভূতিভূষণের মনে পড়ল ১৯৩৪-এ আমি ঘাটশিলার এই বাড়ি কিনি। তারপর ১৯৪২-এর পর থেকে এই বাড়িতেই। এখানে বসেই লেখা 'দেবযান', 'ইছামতী', 'কেদার রাজা', 'কুশল পাহাড়ি'।

আপনার ঐ ছবিটা দেখে খুব মন খারাপ হয়ে যায়।

কোন ছবিটা!

ঐ যে ১৯৫০-এর দোসরা নভেম্বর তোলা। আপনি শুয়ে আছেন 'গৌরীকুঞ্জ'-এর সামনে। খাটের ওপর। দু'চোখ বোজা। মুখে কি এক আশ্চর্য প্রশান্তি। মাথা ভর্তি

কালো চুল পাট পাট করে আঁচড়ানো। পায়ের কাছে রমা দেবী। পাশে সম্ভবত নুটুবাবুর স্ত্রী যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর শিশু তারাদাস। তাবাদাসের গায়ে পাঞ্জাবি।

হ্যাঁ, বাবলু, বাবলুসুর গায়ে পাঞ্জাবি ছিল। মাথা ভর্তি ঝাঁকড়া চুল। সিঁড়ি দেখা যাচ্ছে ঘাটশিলার বাড়ির। ঐ বাড়ি কিনে তার নাম দিয়েছিলাম 'গৌরীকুঞ্জ'। আমার প্রথমা স্ত্রীর নামে। কল্যাণী তার লেখা কবিতা পাথরেব ফলকে লিখিয়ে সিমেন্টে বাঁধিয়ে রেখেছিল ঐ বাড়ির সামনে। শুনবেন কবিতাটা?

জীবনানন্দ চুপ করে হাঁটছিলেন।

বিভূতিভূষণ বলতে শুরু করলেন—

'পথেব পাঁচালীতে গাহি অমর সঙ্গীত
পথ ক্লান্ত অতিশ্রান্ত হে মোর দয়িত
অরণ্যের কোলে তুমি লভিছ বিশ্রাম
'আরণ্যক' রচয়িতা লহ হে প্রণাম
'দেবযান' সৃজয়িতা হে মহা তাপস
চবণ পঙ্কজে তব এ মোব-মানস
'দৃষ্টি প্রদীপে'তে মম দৃষ্টি দাও খুলে
'বাবলুসু'কে রেখ তুমি সদাই কুশলে
মমার্জিত পুণ্য যদি একমাত্র থাকে
সকল অর্পিণু আমি হে প্রিয় তোমাকে

জীবনানন্দ শুনতে পাচ্ছিলেন উদাত্ত গলায় বিভূতিভূষণ বলে যাচ্ছেন—

উভয়ের পুণ্য সহ পশ স্বর্গ পুরে
হউক সুগম যাত্রা যোগিনীর বরে
'অপবাজিত' কীর্তি রাখি মহীতলে
সুখে এ দাসীরে থেক নাক ভুলে।'

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বিভূতিভূষণ দেখতে পাচ্ছিলেন গৌরীকুঞ্জের সামনে মাটিতে লাল সিমেন্টের চৌকো বেদীর গায়ে শাদা পাথরের কালো কালো অক্ষর। রমা দেবীর কবিতার মাথায় লেখা— 'জন্ম ২৮শে ভাদ্র ১৩০১, মৃত্যু ১৫ কার্তিক ১৩৫৭। আর কবিতার লাইন যেখানে থেমে গেছে, সেখানে আছে— 'রথযাত্রা ১৩৫৮। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে অর্পিত।'

উঠোনে জবা গাছে আছে। পেয়ারা। নোনা গাছ। বেশ ঝাপড়ালো আমগাছ। ঐ আমগাছটি আমার হাতে লাগানো। সেই বাড়ির দেয়ালে পুরু টিনের নীল প্লেটে শাদায় লেখা— 'নো অ্যাডমিশন।'

ঘরের মাথায় লাল টালি। বাড়ির পেছন দিকে বাঁশের মাথায় টি.ভি.-র ছবি

ধরার আঁকশি। সব জানলা খোলাও নেই। টিন দিয়ে কাঠের বাটাম মেরে মেরে বেশ কয়েকটি জানলা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

১৯৫০-এর ২ নভেম্বর তোলা আরও দুটো ছবির কথা ঠিক তখনই মনে পড়ে গেল বিভূতিভূষণের।

তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন। ঐ তো শুয়ে আছি খাটের ওপর। চোখ বোজা। মাথার কাছে আমার ছোটভাই নুটুবিহারী। চোখে চশমা। গোল, ভারী মুখ। আর একটিতে শ্মশানে অনেক লোক। সঙ্গে আমি। খাটে শোয়া। বুকে ফুল। মালা।

বিড়ির শেষ অব্দি যত্ন করে টেনে দূরে ছুঁড়ে দিলেন বিভূতিভূষণ। তাঁর মনে পড়ল নিজের হাতে লাগান আমগাছে এখন অনেক অনেক কাঁচা আম। যে রাস্তাটির নাম হয়েছে অপুর পথ, সেখানে ফাঁকা মাঠে সার্কাসের তাঁবু পড়ে বর্ষায়। মাস খানেক থাকে প্রায় সার্কাস পার্টি। এই মাঠে দাঁড়িয়ে হিন্দুস্থান কপারের চিমনি, ধোঁয়া নজরে পড়ে। আর রাতে আকাশ পরিষ্কার থাকলে কত তারা। নীহারিকা মণ্ডল। কালপুরুষ। শুক্রগ্রহ। কল্যাণী বাবলুকে ছাদে শুয়ে শুয়ে তারা চেনাত। আমিও তো একদিন কল্যাণীকে মাঝ-রাতে ঘুম থেকে তুলে শুক্রগ্রহের জ্যোৎস্না দেখাতে ঘরের বাইরে ডেকে নিয়ে এসেছিলাম। সে সব কতদিন আগে।

বাড়িটা দেখলে বহু স্মৃতি মনে আসে। কত থেকেছি এখানে। লিখেছি। গল্প করেছি। কলকাতা থেকে গজেন, সুমথ, অন্য বন্ধুরা কত বার এসেছে। কত আড্ডা, রান্নাবান্না, খাওয়া দাওয়া। বেড়াতে যাওয়া। সুবর্ণরেখা, ধারাগিরি, বরাজুড়ি। মনে পড়ছে ১৯৪৩-এর ২৪ আগস্ট, বাংলার ৭ ভাদ্র ১৩৫০— দিনটা ছিল মঙ্গলবার। রাতে কল্যাণীকে বলেছিলুম মশারি টাঙানো নিয়ে। ওর চোখ দিয়ে অল্পেই জল বেরিয়ে আসে। দেখে কষ্ট হলো। অনেকক্ষণ পর আবার গায়ে হাত দিয়ে আলাপ করলে। বল্লে— শিগ্‌গির মরে যাবো— তোমার না হয় খুকু ছিল, সুপ্রভা ছিল, উমা ছিল— আমার সাধ মেটেনি। তুমি ছাড়া কে আছে বলো? একটা গল্প বলো নকু। ছেলেমানুষের মতো রোজ ওকে গল্প শোনাতে হবে।

এই তো এমন এক চৈত্রেই— তবে শেষে নয়, প্রথম দিকে গিয়েছিলাম সুবর্ণরেখার ওপারে পিকনিক করতে। আমার ভাই নুটু, তার বন্ধু সুবেশ, আরও দু তিনজন। চৈত্রের প্রথম। মহুয়া গাছে ফুল ফুটে টুপ টুপ গাছের তলায় পড়ছে। লতা-পলাশের ফুল ফুটছে। গাছের ডালে ডালে জড়িয়ে উঠেছে পলাশের লতা। গোলগোলি গাছে হলদে ফুল। দুই পাহাড়ের মধ্য দিয়ে আমরা কতদূর চলে গেলাম। এই সময়ে কেঁদফল পাকে, সিংভূমের বনের বড় মিষ্টি ফল। আমরা উঠিয়ে দিলাম একটা লোককে গাছে। সে গাছ ঝাড়া দিয়ে অনেক কেঁদফল পাড়ল। স্থানীয় হাটে পাঁকা কেঁদফল শালপাতার ঠোঙায় বিক্রি হয়। আট-দশটা ফল এক পয়সায়।

পাহাড়ের মধ্যে ঢুকে আমরা একটা অনাবৃত উপত্যকা বেয়ে চলেছি কত দূর। চৈত্রের রোদ চড়ছে যতই, ততই টুপটাপ করে মহুয়া ফুল ঝরে পড়ছে গাছতলায়। ঝাঁটি ফুলের মৃদু দুর্গন্ধ বাতাসে, এক স্থানে একটি ক্ষুদ্র ঝর্না উপত্যকার মাঝখান দিয়ে চলেছে। ঝর্নার দুপাশে বুনো জাম গাছের সারি। ছায়া পড়েছে জলে।

আমরা এই জায়গাটা পিকনিকের জন্যে ঠিক করে ফেললাম। গরুর গাড়ি থেকে জিনিসপত্র নামান হলো। সবাই বললে, এখানে ছায়া আছে। এখানেই রান্নাবান্না হোক। সবাই মিলে লেগে গেল কাজে।

আমি একটু পরে সামনের ক্ষীণ পথরেখা বেয়ে সামনের দিকে চললাম।

আপনাদের গৌরীকুঞ্জ ফেলু চাটার্জি দখল করে ছিলেন না?

হ্যাঁ, প্রথমে ফেলুবাবু তারপর তাঁর ছেলে টুলুবাবু। এখন তো ফেলুবাবু নেই। তাঁর বিধবা স্ত্রী আছেন। খুব খ্যাটখেটি বুড়ি। বাড়ির ত্রিসীমানায় কাউকে অ্যালাউ করে না। বাবলুদের তো করেই না। অন্য কোনো টুরিস্টকেও না। টুলুবাবুর দুটি সন্তান। স্ত্রী। হিন্দুস্থান কপারে চাকরি করেন টুলুবাবু। সেখানে তার কোয়ার্টার্স আছে। তবু আপনার বাড়ি দখল করে—

স্বভাব মশাই, স্বভাব! যাবে কোথায়। পরের পেয়ে গেলে তখন তো— সে যাক গে। স্নান করুক গে যাক।

তবু তো আপনার বাড়ি আছে ঘাটশিলায়। গোপালনগরে। গোপালনগরের বাড়ি তো বেশ ভালোভাবেই রাখা আছে। কিন্তু আমার? কোথায় বাড়ি? কোথায় ঘর। বসে লেখার জায়গা অব্দি নেই ঠিক মতো। রাণী রায়ের ঘর দেখে মনে হত, লিখবার অবকাশ বা নির্জনতা পাই না। উপন্যাস লিখব ভাবছি। কত কী লিখবার আছে। আহা, এই ঘরখানা যদি পেতাম। বাসাবাড়ির পাশের ঘরে সেই মহিলা, তাঁর ঘরে দিনরাত হুল্লোড়। উপভাড়াটিয়া মহিলার ঘরে 'জটিল জনসমাগম' আর 'হৃদয়হীন চিৎকার'। সে যন্ত্রণা আপনাকে বোঝাতে পারব না। তাকে তোলার জন্য প্রেমেন্দ্র মিত্র, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, হুমায়ুন কবির, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়— সকলের সাহায্য চেয়েছি। গোপালচন্দ্র রায় নিয়ে গেছেন উকিলের কাছে।

শুনতে শুনতে বিভূতিভূষণ আবারও একটা বিড়ি ধরালেন। ধরাতে ধরাতে কেন জানি না তাঁর কলার বড়া, চাল ছোলা ভাজা খাওয়ার কথা হঠাৎ মনে পড়ল।

আর বিড়ির গন্ধে জীবনানন্দের চুরুটের কথা মনে পড়ছিল।

বাবলুকে তো মাঝে মাঝেই দেখি, ইচ্ছে হলেই দেখতে পাই। এই সেই ছেলে যে আমায় কালকাসুন্দের পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে দিত আর বলত, বাবা, আউভাজা খা, আউভাজা খা—নে—মুখের ভেতর থেকে লালঝোল মাখা মিছরির টুকরো বার

করে নিয়ে আমাকে চুষতে বলত। সেই খোকা— বাবলু এখন কত বড় হয়ে গেছে। তার হাতে আমার গৌরীকুঞ্জের চাবি তুলে দেবে বিহার সরকারের লোকেরা। এসব ভাবনার সঙ্গেই চলতে চলতে কেন জানি না কুলচুর নয়ত কুলের আচার খাওয়ার ইচ্ছে চুলবুল করে উঠল বিভূতিভূষণের জিভে।

চোখ ক্রমশ খারাপ হচ্ছিল। বাড়ছিল ব্লাডপ্রেসার। ১৯৫১-য় ব্যবসার পারমিট যোগাড় করতে গিয়ে রাইটার্সে অজ্ঞান হয়ে যাই। ১৯৫৩-য় সুরজিৎ দাশগুপ্তকে লিখি— জীবনানন্দের মনে পড়ছিল— 'শরীর বড় অসুস্থ। কোনো কাজই করতে পারছি না।' ১৯৫৪-র ৪ সেপ্টেম্বর সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে লিখেছিলাম— 'অনেক দিন থেকে আমার শরীর বিশেষ অসুস্থ'। সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে সেই আমার শেষ চিঠি।

রোদ বাড়ছিল মাথার ওপর। আস্তে হাঁটলে তেমন ঘাম হয় না। হাঁটতে হাঁটতে জীবনানন্দের মনে পড়ল ১০ অক্টোবর কলকাতা রেডিও স্টেশনের কবিসভায় গেছিলাম প্রেমেন্দ্র মিত্রর সঙ্গে দেখা করার জন্যে! সেই সভায় প্রেমেন্দ্র আসেনি। বারবার সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে জিজ্ঞেস করছিলাম, প্রেমেন্দ্র এল না কেন? প্রেমেন্দ্র এল না কেন?

বিভূতিবাবু তো তাঁর ঘাটশিলার বাড়ি ফেরত গেলেন। তাঁর সন্তান বেঁচে। পুত্রবধূ, নাতিরা। আমরা তো কেউ নেই। বাড়ি নেই। ঘর নেই। দক্ষিণ কলকাতার যে বাড়িতে থাকতাম, সেখানে অন্য ভাড়াটে। তারা কেউ আমাকে জানে না। জানতে চায় না। মেয়ে মঞ্জুশ্রী মারা গেছে এই তো বছর দুই তিন। মেয়েও তো কবিতা লিখত। কেউ কেউ বলেন, তার হাসিতে নাকি আমার হাসির ভাবখানি বসান ছিল। কি জানি, হবে হয়ত!

কল্যাণী, আজ আমি চলেছি গৌরীকুঞ্জের রাস্তায়। পাশে জীবনানন্দ দাশ। আমাদের বাড়ির চাবি কাল বাবলুর হাতে তুলে দেবে সরকার। আবিরলাল থাকবে— যাকে তুমি বড় ছেলে বলতে। সেই তুমিও তো আর এখন বাবলুর বারাকপুরের বাড়িতে নেই। কোন তারার আলো গায়ে মেখে ঘুরে বেড়াও। কোন দূর নক্ষত্রে। তোমাকে এখনও ঠিক মতো পাশে বসিয়ে কথা বলতে পারি না। সেই আমার 'দেবযান'-এর ক্ষেমদাসের মতো— সাধু ক্ষেমদাস, যতীন ও পুষ্পকে বলেছিল না— 'এই দুঃখ সনাতন আত্মা নিরন্তর সাধনা করছে নিজেকে জানবার। আমার নিজের জীবনেও এমনি হয়েছিল। আমি তাই এখানে বসে বসে ভাবছিলাম আবার পৃথিবীতে পূর্ণিমা জ্যোৎস্না উঠেছে। যেমন উঠতে পাঁচশো বছর আগে— আমি পৃথিবীতে একটি মেয়েকে কত ভালোবাসতাম, আমাদের গ্রামের সদানন্দী মঠের ফুলবাগানে কত বেড়াতাম দুজনে এমনি জ্যোৎস্নারাত্রে লুকিয়ে লুকিয়ে,— এখন সে কোতায়?'

রমা দেবী কি সবসময় আপনার কাছে থাকেন না।

একটু যেন অন্যমনস্ক ছিলেন বিভূতিভূষণ। চুপ করে রইলেন। তারপর তাঁর অনেক অনেক দূর দেখতে পাওয়া দু চোখ তুলে গভীর ভাবে জীবনানন্দকে দেখলেন। জীবনানন্দও তাঁর ভবিষ্যৎ দেখা দু চোখ দিয়ে দেখছিলেন বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

হাসলেন বিভূতিভূষণ। ঘাড় নাড়লেন। বললেন, দ্যাখা হয়। কিন্তু ঐ যে বললাম, সব সময় হয় না।

জীবনানন্দের মনে পড়ল এখন আর আমার দেখতে কোনো অসুবিধে হয় না। ব্লাড প্রেসারে মাথা ঘূর্ণি নেই। কিন্তু ১৪ অক্টোবর সন্ধের একটু পর দেশপ্রিয় পার্কের কাছে বালিগঞ্জ যেতে চাওয়া এক ট্রামের ধাক্কায়...। আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম হাসপাতালে। তারপর টানা আট দিন— ঐ সে আসে। ঐ আসে না। ঐ আসে....। বালতি বালতি জল তুলতে হতো দু হাতে বড় বালতি বোঝাই জল। ঐ বছরই মে মাসে শ্রেষ্ঠ কবিতার ভূমিকায় লিখেছিলাম--

'আমার কবিতাকে বা এ কাব্যের কবিকে নির্জন বা নির্জনতম আখ্যা দেওয়া হয়েছে, কেউ বলেছেন, এ কবিতা প্রধানত প্রকৃতির বা প্রধানত ইতিহাস এ সমাজ চেতনার অন্য মতে নিশ্চেতনার, কারও মীমাংসায় এ কবি একান্তই প্রতীকী, সম্পূর্ণ অবচেতনার, সুররিয়ালিস্ট। প্রায় সবই আংশিকভাবে সত্য - কোনো কোনো কবিতা বা কাব্যের কোনো কোনো অধ্যায় সম্বন্ধে খাটে, সমগ্র কাব্যের ব্যাখ্যা হিসেবে নয়।'

আমার বেলাতেও একই ব্যাপার। সবাই মিলে আমায় গাছ পালার লেখক, প্রকৃতিপ্রেমী বলতে শুরু করলে। আর সমালোচক অধ্যাপকরা যা যা বলেন সাধারণভাবে বাড়তে থেকেছে। তারপর 'দেবযান' লেখার পর হয়ে গেলাম আত্মা আর ভূত-প্রেতের লেখক। সে আর আপনাকে কি বলব। সে যাক গে যাক। চ্যান করুক গে যাক! বলতে বলতে আবারও একটা বিড়ি ধরালেন বিভূতিভূষণ। তাঁর মনে পড়ল আজ ৫ এপ্রিল ১৯৯৭। এই পৃথিবীর হিসেবে ৫ এপ্রিল ১৯৯৭ শনিবার। বাংলা হিসেবে ২২ চৈত্র ১৪০৩। এখান যেখানে থাকি, সেখানে মাস বছর ঘণ্টা মিনিট সেকেন্ড— কিছুই ঘড়ি ধরে পৃথিবীর নিয়মে আসে না। এখানে তো প্রতিটা মুহূর্ত মুখ থুবড়ে ডুবে যায় অনন্ত কালচক্রের বুকে। মহাকালের বিশাল ঘূর্ণীতে সে এক বুদবুদ মাত্র। ক্ষণ বুদবুদ। ভাবতে ভাবতে নিজের মাথার চুলে হাত ছোঁয়ালেন বিভূতিভূষণ। রাস্তার পাশে দোকানে বড় বড় আলুর চপ। বেগুনি সঙ্গে মুড়ি আছে। শালপাতা ভাঁজ করে তার ওপর মটর সেদ্ধ করা ঘুগনি দিচ্ছে। তার ওপর সামান্য কাঁচা লঙ্কা আর পেঁয়াজের কুচি ছড়ান। কি সুন্দর গন্ধ আসছে মটর-ঘুগনির। কাচের বাক্সে তেলে ভাজা সাজান। বিভূতিভূষণ সব দেখতে পাচ্ছিলেন।

সেই উপভাড়াটিয়া মহিলার অশালীন হুল্লোড়ে অতিষ্ঠ হয়ে শেষ পর্যন্ত বাড়ি পাল্টালাম। এক ভাড়া বাসা থেকে অন্য ভাড়া বাসায়। সেখানেও স্বস্তি নেই।

আমি তো ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না। মানুষের নীতিবোধ বিশ্বাস করি। বলতে গিয়ে জীবনানন্দের জিভ এতটুকুন জড়াল না। যেমন অনেক সময় অনেক কথা বলতে গিয়ে আটকে যায়। তার মাথার ভেতরে ফুটে ওঠা নিজের কবিতার লাইন বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছিল।

অগণন, অ্যান্টিএয়ার ক্রাফ্‌ট গান সার্চলাইট ঘুরায়ে ঘুরায়ে দেখা যায়।
বুদ্ধ, খৃষ্ট, এঞ্জেলোর মোম
মহৎ বস্তুর মতো, নিজে তবু ব্যাপ্ত হয়ে আছে— সব জেনে, আধো জেনে
চুংকিং, কলকাতা, দিল্লি, মস্কৌ, রোম
অধিক প্রাণের দিকে চলে যায়— নিপট, কপট, শঠ, কর্মী, মর্মগ্রাহী
মানব নিঃশেষ হবে জেনে তবু ভাবনা
মানবিক কলরবে অন্নপূর্ণা মরীচিকা খোঁজ করে চলেছে— চলেছে—

তা না করুন। ভগবানে বিশ্বাস করতে হবে— এ মথার দিব্যি কে দিয়েছে! মানলে ভালো। না মানলেও ভালো। ও নিয়ে তক্কো হয় না। অনন্ত শয্যায় অনন্ত নিদ্রায় মগ্ন উনি। এক এক নিঃশ্বাসে যুগ যুগান্ত কেটে যায়।... ওঁর উপাসনা হয় না। কে করতে পারে ওঁর উপাসনা? উনি কাউকে দেখেন না। কারও উপাসনা গ্রহণ করেন না। বিশ্বজগৎ ওঁর স্বপ্ন— উনি ঘুম ভেঙে উঠলে জগৎ স্বপ্ন লয় হয়ে যাবে যে! সৃষ্টি অন্তর্হিত হবে। কিন্তু তা হয় না— সৃষ্টিও অনন্ত। ওঁর সুপ্তিও অনন্ত। উনিই বিশ্বের আদি কারণ— সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। ক্ষিরোদশয়নশায়ী মহাদেবতা ব্রহ্মাণ্ডের। আপনি, আমি, স্বর্গ-নরক, জন্ম-মরণ, দেব-দেবী, ঈশ্বর, পাপ-পুণ্য, দেশ ও কাল— সবই ওঁর স্বপ্ন। সব তিনি। তিনি ছাড়া আর কিছুই নেই— কে কার উপাসনা করবে! ওঁর স্বপ্ন ছাড়া আর উনি ছাড়া আর কি আছে?

তবু তো আপনার এটুকু আছে বিভূতিবাবু।

আপনারও আছে।

কি আছে?

প্রকৃতি, ইতিহাস চেতনা, মৃত্যুবোধ। পৃথিবীতে সব জিনিসের মতোই প্রকৃতিও ক্ষয় হয়। কিন্তু তুলনায় তা ধীরে। সেই প্রকৃতির বিশাল ক্যানভ্যাসে ইতিহাস চেতনা, মৃত্যুবোধ— মৃত্যু— গরিয়সী মৃত্যু-মাতা, তাকে অস্বীকার করি কী ভাবে! এই যে আপনার ১৯৩৩-এ লেখা গল্পে পাচ্ছি—

'বাবা জিজ্ঞেস করেন, বনলতা? মনে হয় তার কথা তোমার?

সেই বনলতা আমাদের পাশের বাড়িতে থাকত সে। কুড়ি-বাইশ বছর আগের সে এক পৃথিবীতে...

কুড়ি বছর পর ফিরে আজ দেখছেন, কত শীতের ভোরের কুয়াশা ও রোদের

সঙ্গে জড়িত সেই খড়ের ঘরখানাও সেই তাদের আজ। বছর পনের আগে দেখেছি মানুষজন নেই, থমথমে দৃশ্য, লেবু ফুল ফোটে, ঝরে যায়, দোতলার বেড়াগুলো উইয়ে খেয়ে ফেলেছে। চালের উপর হেমন্তের বিকেলে শালিক আর দাঁড়কাক এসে উদ্দেশ্যহীন কলরব করে...।'

সরুন সরুন মশাই, চাপা পড়বেন যে — বলতে বলতে বিভূতিভূষণ জীবনানন্দকে টেনে নিলেন একপাশে। শব্দ করে ধোঁয়া উড়িয়ে, ধুলো ছুঁড়ে যে মোটর সাইকেল দুটি চলে গেল, তার শব্দ তখনও দক্ষিণাপাড়ার যাওয়ার রাস্তার বাতাস ছিঁড়ে দিচ্ছিল।

আপনার সেই অন্যমনস্ক ভাব এখনও গেল না— বলতে বলতে বিভূতিভূষণ জীবনানন্দের বাঁ বাহু ধরলেন। ধাক্কা দিলেই হয়েছিল আর কি! সেই ১৯৫৪ এর ১৪ অক্টোবর যেমন— বলতে বলতে ট্রামের টং টং টং ঘন্টি--- ঢন ঢনাত করে লাইন পেরনোর শব্দ পেলেন বিভূতিভূষণ। রাসবিহারীর দিক থেকে আসা বালিগঞ্জের ট্রাম ততক্ষণে দেশপ্রিয় পার্ক পেরিয়ে যাচ্ছে। তার নিচে থ্যাঁতলান ইঁদুর হয়ে- - বিভূতিভূষণ আর দেখতে চাইছিলেন না।

শুধু এখানে নয়। ওখানেও এই ঝামেলা ঝঞ্ঝাটের শেষ নেই মশাই। গাদা গাদা উপগ্রহ। স্পেস স্টেশন। নতুন নতুন স্যাটেলাইট। স্টার ওয়ার-এর যুগ নাকি শেষ হয়েছে। কিন্তু উপগ্রহ খবরদারি তো শেষ হয়নি। যেতে আসতে--- এক লোক থেকে অন্য লোকে যাওয়া-আসা করতে খুব অসুবিধে হয় আমাদের। কি হয় না!

জীবনানন্দ কোনো উত্তর দিলেন না।

দক্ষিণাপাড়ার রাস্তা অপূর্ব পথের দিকে বাঁ হাতে বেঁকে গেলে পর পর অনেকগুলো হোটেল, লজ — সাম্মরি, আনন্দিতা। বাচ্চাদের ইংলিশ মিডিয়াম নার্সারি স্কুল একটা। এ সবই গত কয়েক বছরে মাটি ফুঁড়ে উঠেছে।

মাঠের ওপর গণেশ চন্দ্রর কালাকন্দ-এর দোকান থেকে শুধু দেশি ঘিয়ের গন্ধ উড়ে আসছিল। আহা, কি মন কেমন করা গন্ধ!

হ্যাঁ বাবা, তোমার কালাকাঁদ কত করে? একটু এগিয়ে গিয়ে বিভূতিভূষণ জানতে চাইলেন।

আশশি রুপাইয়া কিলো বাবুজি।

ও বাবা, কি দাম হয়েছে দ্যাখো--- এটুকু নিজের ভেতর গিলে ফেলে দোকানদার মানুষটিকে দেখছিলেন বিভূতিভূষণ। তেমন লম্বা নয়। তবে কাঁধ বেশ চওড়া। কাঁধের সঙ্গে লাগানো হাত দুটিও বেশ মাসলঅলা। কাঁচা-পাকা কোঁকড়া চুল উল্টে আঁচড়ানোর তামাটে চওড়া কপাল নজরে পড়ে। গায়ে সাদা স্যান্ডো গেঞ্জি। সেই শাদাটুকু ধুলো ময়লায়, জলে, ক্ষারে-সাবানে অনেকটাই লালচে মতন। পরনের লুঙ্গিটি সবুজ

আর নীলে কাটাকুটি— নাভির নিচে বাঁধা। একটু যেন ভুঁড়ি আছে। তবে তা চেহারার সঙ্গে মানিয়ে যায়।

টালির চাল। ইটের দেয়াল। দেয়ালের গায়ে চুনকাম। তার ওপর কালো রঙে বাংলায় লেখা 'গণেশচন্দ্রর কালাকন্দ।'

দোকানের ভেতর পায়ে পায়ে ঢুকে এলেন বিভূতিভূষণ। গোটা তিনেক কাঠের বেঞ্চ পাতা। মাটির উনোনে নিভে যাওয়া কয়লার আঁচ। একটু দূরে বড়সড় লোহার কড়াই। বাতাসে পোড়া-কয়লা, গাওয়া ঘি, ন্যাতা দিয়ে ল্যাপা মাটির উনোনের গন্ধ এক সঙ্গে ঠ্যালাঠেলি করে উঠে আসতে চাইছে।

কোথায় বাড়ি ছিল বাবা?

গোরখপুর।

দোকানের দেয়ালে কাচ বাঁধানো কৃষ্ণ কোলে যশোদা। একটা দেয়াল আলমারিও আছে। বিভূতিবাবু সব দেখছিলেন।

বিকেলেব দিকে কি টাট্‌কা মাল পাওয়া যাবে?

মিলেগা।

আহা, তাহলে বিকেলেই আসব। বাবলুসুব জন্যে নিয়ে যাব মিষ্টি। কতবার বিয়ে বাড়ি থেকে পকেটে করে সন্দেশ নিয়ে এসেছি ওর জন্যে— তা তোমরা কি একটা, দুটো বিক্রিব কব?

হাঁ পিস দো রুপাইযা।

অ। আচ্ছা। বলে বিভূতিভূষণ দোকানের বাইরে এলেন। জীবনানন্দ দেখতে পাচ্ছিলেন দোকানে ঢোকাব দবজাব ফ্রেমে লাগান চৌকো স্টিকারে গেরুয়া পাগড়ি পরা স্বামী বিবেকানন্দ 'হে ভাবত ভুলিও না' স্টাইলে দাঁড়িয়ে।

বিভূতিবাবু বেরিযে যেতে গণেশচন্দ্রের মনে পড়ল এই তো আমার পরই আর তেমন ভাবে চলবে না কলাকাঁদের দোকান। বাবা করতেন। তারপর আমি। আমার দুই ছেলে মাইক লাগিয়ে পয়সা কামায়। একজন সন্ধের পর 'লহর' নামের ভাঙ কা গোলা খেয়ে মস্ত থাকে। কাজবাজ করে না। পয়সা কামাইয়ের ধান্দা-উন্দাও নেই। যো হোগা সো দেখা যায়গা। কৃষ্ণ ভগবান কা কিরপা সে— ভাবতে ভাবতে 'তিরঙ্গা'-র প্যাকেট দাঁত দিয়ে ছিঁড়ল গণেশচন্দ্র। নেশার রেডিমেড মশলা বড় দ্রুত জিভ থেকে রক্তে ছড়ায়।

রাতটা কোথায় থাকবেন বিভূতিবাবু?

কেন বলুন তো?

না, আপনি বললেন কাল আপনার ঘরের চাবি পাবেন আপনার ছেলে।

থাকব সুবর্ণরেখার পাড়ে। ওখানে আমি দিনের পর দিন বসে থেকেছি, লিখেছি।

কুমির-পাথর বলে একটা পাথর আছে, জানেন তো! প্রায় পাঁচশো ফিট লম্বা। দেখলে মনে হবে নদীর চরায় উপুর হয়ে রোদ পোয়াচ্ছে কুমির। ঐ পাথরে কতদিন বসেছি। সূর্যাস্ত দেখেছি। সে যে কি মনোরম। নয়ত চলে যাব ফুলডুংরি, কোর্টের পাশ দিয়ে সোজা রাস্তা। ফুলডুংরির মাথায় উঠলে সুন্দর বসার জায়গা। ঘাটশিলায় কি জায়গার অভাব!

হাঁটতে হাঁটতে কুমির-পাথরে আর যাওয়া হলো না। তার আগেই নদীর সামনে এসে দাঁড়ালেন বিভূতিভূষণ, জীবনানন্দ। রোদের গরমের রোগা নদী নিজের মতো করে আয়না হয়ে আছে জায়গায় জায়গায়। কালো কালো পাথর টপকে জলে যেতে গেলে সবুজ শ্যাওলার ভাসাভাসি চোখে পড়ে। জলে তেমন স্রোত নেই।

আসুন না আমরা একটা পাথরে গিয়ে শুয়ে থাকি।

শোবেন! বড্ড রোদ্দুর। 'রোদ্দুর' ওটুকু বলতে গিয়ে বার দুই হোঁচট খেলেন জীবনানন্দ।

তাতে কি! এখনই মেঘ করবে। বলতে বলতে বিভূতিভূষণ পাথরে পা দিলেন। তারপর বাঁ হাত বাড়িয়ে ডাকলেন জীবনানন্দকে — আসুন, আসুন না।

ঠিক তখনই আকাশের এক কোণ থেকে হঠাৎ ডানা ছড়িয়ে দিতে চাইছিল মেঘেরা। জীবনানন্দ দেখতে পেলেন বিভূতিভূষণের ডান হাতে একটি কঞ্চি। তার ভরে তিনি নদীর বুকের পাথর টপকাচ্ছেন।

তারপর একসময় সন্ধে নেমে গেল। গরমের আকাশে অনেক ফোটা, না ফোটা তারা। নক্ষত্রমণ্ডলী। দূর থেকে ফুলের চাপা গন্ধ ভেসে আসছিল।

এভাবেই এক সময় পৃথিবীর নিজের নিয়মে আকাশে রাত এসে যায়।

বিভূতিভূষণ দেখতে পেলেন আকাশের গায়ে ফুটে ওঠা অক্ষরমালা -

'একদিন জলসিঁড়ি নদীটির পারে এই বাংলার মাঠে
বিকীর্ণ বটের নিচে শুয়ে রব--- পশমের মতো লাল ফল
ঝরিবে বিজন ঘাসে— বাঁকা চাঁদ জেগে রবে- — নদীটির জল
বাঙালি মেয়ের মতো বিশালাক্ষী মন্দিরের ধূসর কপাটে
আঘাত করিয়া যাবে ভয়ে ভয়ে--- তারপর সেই ভাঙা ঘাটে
রূপসীরা আজ আর আসে নাকো, পাট শুধু পচে অবিরল,
সেইখানে কলমীর দামে বেঁধে প্রেতিনীর মতন কেবল
কাঁদিবে সে সারা রাত -- দেখিবে কখন কারা এসে আমকাঠে

দেখতে পাচ্ছেন, দেখতে পাচ্ছেন জীবনানন্দবাবু! বিভূতিভূষণ একটু জোরেই বলে উঠলেন।

অন্ধকারে ঘাড় নাড়লেন জীবনানন্দ। সারা আকাশ জুড়ে আলোর নাচ। আলোয়

আলোয় বোনা কবিতার লাইনে তখন—

'সাজায়ে রেখেছে চিতা : বাংলার বিস্মিত আকাশ
চেয়ে রবে ; ভিজে পেঁচা শান্ত স্নিগ্ধ চোখ মেলে কদমের বনে
শেনাবে লক্ষ্মীর গল্প— ভাসানের গান নদী শোনাবে নির্জনে ;
চারি দিকে বাংলার ধানী শাড়ি— শাদা শাঁখা— বাংলার ঘাস
আকন্দ বাসকলতা ঘেরা এক নীল মঠ— আপনার মনে
ভাঙিতেছে ধীরে ধীরে— চারি দিকে এই সব আশ্চর্য উচ্ছ্বাস।'

আলোয় আলোয় লিখে যাওয়া ঘাটশিলার সেই আকশে নামের বিশাল শ্লেটে জীবনানন্দ তখন দেখতে পাচ্ছিলেন

'অথচ কত লোকের চিতার ছাই ইছামতীর জল ধুয়ে নিয়ে গেল সাগরের দিকে, জোয়ারে যায় আবার ভাঁটায় উজিয়ে আসে. এমনি বার বার করতে করতে মিশে গেল দূর সাগরের নীল জলের বুকে। যে কত আশা করে কলাবাগান করেছিল উত্তরেব মাঠে, দোয়াড়ি পেতেছিল বাঁশের কঞ্চি চিরে বুনে ঘোলডুবির বাঁকে. আজ হয়ত তার দেহের অস্থি রোদবৃষ্টিতে সাদা হয়ে পড়ে রইল ইছামতীর ডাঙায়। কত সুন্দরী বধূর পায়ের চিহ্ন পড়ে নদীর দু'ধারে ঘাটের পথে, আবার প্রৌঢ়া বৃদ্ধার পায়ের দাগ মিলিয়ে যায়— গ্রামে গ্রামে মঙ্গলশঙ্খের আনন্দধ্বনি বেজে ওঠে বিয়েতে, অন্নপ্রাশনে. উপনয়নে. দুর্গাপুজোয়, লক্ষ্মীপুজোয়....সে সব বধূদের পায়ের আলতা ধুয়ে যায় কালে কালে, ধূপের ধোঁয়া ক্ষীণ হয়ে আসে...মৃত্যুকে কে চিনতে পাবে. গরিয়সী মৃত্যু-মাতাকে ? পথপ্রদর্শক মায়ামৃগের মত জীবনের পথে পথে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে সে. অপূর্ব রহস্য-ভরা তার অবগুণ্ঠন কখনো খোলে শিশুর কাছে, কখনো বৃদ্ধের কাছে...তেলাকুচো ফুলের দুলুনিতে অন্তরের সে সুর কানে আসে....কানে আসে বনৌষধির কটুতিক্ত সুঘ্রাণে, প্রথম হেমন্তে বা শেষ শরতে।'

জীবনানন্দ সব পরিষ্কার পড়তে পারছিলেন। এখন আর আমার দৃষ্টি ক্ষীণ নয়। সমস্ত সাফ-সুতরো দেখতে পাই। আকাশের শ্লেটে জেগে থাকা অক্ষরমালারা জীবনানন্দর মাথার ভেতর বলে যাচ্ছিল।

'বর্ষার দিনে এই ইছামতীর কূলে কূলে ভরা ঢল-ঢল রূপে সেই আজানা মহাসমুদ্রের তীরহীন অসীমতার স্বপ্ন দেখতে পায় কেউ কেউ....কত যাওয়া-আসার অতীত ইতিহাস-মাখানো ঐ সব মাঠ, ঐ সব নির্জন ভিটের ঢিপি— কত লুপ্ত হয়ে যাওয়া মায়ের হাসি ওতে অদৃশ্য রেখায় আঁকা। আকাশের প্রথম তারাটি তার খবর রাখে হয়ত।'

আমরা দু' জনে তো শলা-পরামর্শ করে লিখতে আসিনি। অথচ আমি কি বিভূতিবাবুর গলায় কথা বলেছি— কিংবা উনি আমার গলায়! ভাবতে ভাবতে

জীবনানন্দ আবারও আকাশের দিকে তাকালেন। শব্দ, লাইন মুছে গিয়ে এখন সেখানে শুধুই নক্ষত্রদের জেগে থাকা।

সুবর্ণরেখার বুক থেকে জল বয়ে যাওয়ার হালকা হালকা শব্দ উঠে আসছিল।

পরিষ্কার আকাশে তখনই কি একটা আলোর মশাল দৌড়ে গেল। তার চেহারা হঠাৎ করে দেখলে মনে হবে ওল্টানো ঝাঁটা।

কি গেল বলুন তো ?

জীবনানন্দ ঘাড় নাড়লেন। জানি। তবে আপনি বলুন।

এতো হেল বপ্ গেল। নতুন আবিষ্কার হওয়া ধূমকেতু।

অন্ধকারে আকাশ দেখলেন জীবনানন্দ। তারপর নদী, পাথর। আরও দূরে আবছা পাহাড়ের রেখা এখন আকাশে মুছে গেছে। হিন্দুস্থান কপারের আলো ফুটে উঠেছিল দূরে।

১৯৯৫ সালে অ্যালান হেল আর টমাস বপ্ নামের দু'জন বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেন এই ধূমকেতু। তাই এর নাম হেল-বপ্।

শুনতে শুনতে অন্ধকারে মাথা নাড়ছিলেন জীবনানন্দ।

জানেন তো আজ থেকে প্রায় ১৫২১ বছর আগে জ্যোতির্বেত্তা আচার্য বরাহমিহির একটি ধূমকেতু প্রথম আবিষ্কার করেন। আচার্যের প্রামাণ্য গ্রন্থ 'কেতুচর' অধ্যায়ের একটি শ্লোকে এই ধূমকেতুকেই কাশ্যপ-শ্বেতকেতু বলা হয়েছে।

শুনতে শুনতে জীবনানন্দ আবারও তারা বসান অন্ধকার আকাশ দেখলেন।

ধূমকেতু, উল্কা, তারাখসা যাই দেখিনা কেন সাতজন বামুনের নাম পর পর বলে যেতে হয়— জানেন তো— এক নিঃশ্বাসে সাত বামুনের নাম— এটুকু বলে বিভূতিভূষণ শব্দ না করে হাসলেন।

তারপর বললেন, বাপ ঠাকুর্দা থেকে শুরু করে সাতপুরুষের নাম মনে রইল তো রইল, নইলে আমাদের তারামণ্ডলের পরিচিত সপ্তর্ষিরা আছেন— পুলস্ত্য. পুলহ, ক্রতু, অত্রি. অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ, মরীচি— কি, হলো কি না সাত জন— অবশ্য সাতজনই যে বামুন ছিলেন সে আর গাঁই, গোত্তর, মেল, প্রবর মিলিয়ে কে দেখতে যাচ্ছে!

আপনি কি যেন বলছিলেন, হেল-বপ—বরাহমিহির...

ও হ্যাঁ, আচার্য বরাহমিহির শ্লোক লিখে ধূমকেতুটির গতি-প্রকৃতিরও বর্ণনা করেছেন। ঘড়ির কাঁটা যেমন ঘোরে, সেই নিয়মে এই কাশ্যপ-শ্বেতকেতু সপ্তর্ষিমণ্ডলের ধার ঘেঁষে ক্রমশ দক্ষিণ দিকে চলে যাবে। আর দেড় হাজার বছর পর মাঝ রাতের প্রথম প্রহরে পৃথিবীর মানুষ তাকে দেখতে পাবে। আমরা যে হেল-বপ্ দেখলাম, তা কি আসলে কাশ্যপ-শ্বেতকেতু ? বলতে বলতে কালো পাথরে

শোয়ানো কঞ্চিটি ডান হাতে তুলে নিলেন বিভূতিভূষণ।

সকাল ন' টাতেই অনুষ্ঠান শুরু হলো। গৌরীকুঞ্জের সামনে অনেক চেয়ার। মাইক। কলকাতা থেকে কত লোকজন এসেছে। লাল কালো নীল চাঁদোয়ায় ঢাকা বাড়ির সামনেটুকু। শেষ চৈত্রের রোদ পড়েছে আম গাছের ডালে। পাতায়। মাইক ধরা বক্তারা হিন্দি, বাংলায় বলছিলেন। বিভূতিবাবু চন্দন দিয়ে সাজানো রজনীগন্ধার মালা গলায় তাঁর নিজের ছবিটি দেখতে পাচ্ছিলেন। চেয়ারে বসানো ছবির কাচেও সকালের রোদ। পাশেই অন্য চেয়ারে কল্যাণী। রঙিন। তাঁর গলাতেও ফুলের মালা।

বক্তারা অনেকেই 'বিভূতিবাবু বিভূতিবাবু' বলে বলছিলেন মাইকের সামনে। এদিকের মানুষরা যেমন বলেন। শুনতে শুনতে লজ্জা পাচ্ছিলেন বিভূতিভূষণ। বার বার মাথা নিচু করছিলেন।

এস ডি এম হরিনারায়ণ রাম বাড়ির চাবি তুলে দিলেন বাবলুর হাতে। হাততালি। ক্যামেরার ক্লিক। বাবলুর গলা বুজে আসছিল কথা বলতে গিয়ে। চোখে জল। সব ঠিকঠাক মিটে গেল। এমন কি চা-মিষ্টিও। একটা শাদা অ্যামবাসাডার, দুটো জিপ, গোটা দুই মোটর সাইকেল সব সময় ছুটছে।

ঠিক তখনই একটা নীলকণ্ঠ পাখি এসে বসল গৌরীকুঞ্জের টালির চালে। দুপুরের দিকে অনেকটা এগিয়ে যাওয়া রোদ পাখির ডানায়, গলায়। আহা, কল্যাণী আজ যদি তুমি দেখতে— আমাদের 'গৌরীকুঞ্জ'— এখন বাবলুসুর। মিত্রার। ভাবতে ভাবতে হাওয়ায় ভেসে ওঠা ফুলের গন্ধ টের পেলেন বিভূতিভূষণ।

দুপুর এগিয়ে আসছিল নিজের নিয়মে। আমার খাটটা এখানে নেই। সেই খাট, যেখানে আমি শুয়েছিলাম ১৯৫০-এর পয়লা আর দোসরা নভেম্বর। রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজ এলেন। ফাঁকা ঘরের দরজার সামনে বাবলু আর মিত্রা বসে। ওমা, তোমরা বসে কেন? দুপুর হয়ে এল প্রায়। খিদে পায় না! যাও সবাই চানটান করে ভাতে বোস।

হাওয়ায় খিচুড়ি আর পটল ভাজা, বেগুন ভাজার খিদে পাওয়ার গন্ধ উড়ছিল। কি যে ভালো খেতে গরম গরম খিচুড়ি আর পটল ভাজা। কল্যাণী কতদিন করে দিয়েছে আমায়। আহা, এর সঙ্গে যদি একখানা দু'খানা করে মুচমুচে পোস্তর বড়া থাকত আর বড়ি দিয়ে বেগুনের টক। কি ভালো যে হতো তাহলে! তা পোস্ত এখন দুশো টাকার ওপর কিলো বাপু। করবে কোত্থেকে! আর বেগুন দশ টাকা। আমি তো দেখতে পাচ্ছি সামনের বছর— মানে ১৯৯৮ সালে দুশো তিরিশ টাকা হবে পোস্তর সের। বেগুন চল্লিশ টাকা। দূর বাপু, কি সের সের করে মরচি! সের কি আর আছে নাকি এখন!' এখন তো সব কিলো কিলো। কিন্তু বাজারে

গেলে কেউ কিলোর হিসেব মেলে না। বলে একশো গ্রাম অ্যাতো। আড়াইশো গ্রাম ততো। যে লোকেই থাকি না কেন, পুরনো অভ্যেস যাবে কোথায়! সুযোগ পেলেই বাজার দরের খোঁজ নি। টাকা আনা পাই নেই। গণ্ডা, পোণের হিসাবও উঠে গেছে প্রায়। তবু গাঁ-ঘরে এখনও পাকা কলা কাঁচা কলা বিক্রি হয় পোণের হিসেবে। চোখকিয়া, পোণকিয়া, কাঠাকিয়া, গণ্ডাকিয়া, বুড়িকিয়া, শতকিয়া— কত কত হিসেব! নিজের ভেতরে এত সব বলতে বলতে বিভূতিভূষণ আবারও নীলকণ্ঠের দিকে তাকালেন। গৌরীকুঞ্জের টালির চালে নীলকণ্ঠ। আহা, ভগবানের কি অপার মহিমা। কি তার রূপ। বিভূতিভূষণ চালে বসা নীলকণ্ঠর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বাড়ির ভেতর খিচুড়ি খাওয়ার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে শালপাতার পাতায়। বালতি নাড়ানাড়ি, হাত ঠোকার শব্দ। আমায় দিন— ওকে দিন, এদিকে জল দাও ভাই— এই সব শব্দ এক সময় মিলিয়ে এল।

মাথার ওপর টাঙানো সামিয়ানা খোলা হচ্ছে। দড়িদড়া চেয়ার বাঁশ গুছিয়ে রাখা হলো এক কোণে। গাছে উঠে কারা যেন আম পেড়ে নিচ্ছে। আহা, পাড়ুক পাড়ুক। বাবলুরা দিয়ে যাবে। আমাদেরই তো জমির ফল। দেখিস বাবা, গাছ থেকে ফল পাড় ঠিক আছে। কিন্তু পাতা ছিঁড়ো না। ডাল ভেঙো না। আর পড়ে গিয়ে নিজেরা খোঁড়া হয়ো না বাবারা।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল নেমে এল। যাওয়ার আগে নিজের সন্তানকে ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে হলো বিভূতিভূষণের। এই তো বাবলু দাঁড়িয়ে গাড়ির সামনে। বড় শাদা গাড়ি। ওর এক বন্ধু টিভি প্রোডিউসার, সে এনেছে। আমার গল্প নিয়েও কি কি সব করবে টি ভি-তে। বাবলু গোছগাছ করছে। শরীর তো তেমন ভালো না। এই বয়েসেই সুগার— প্রেশার। হয়ত আমারও ছিল। তখন তো অ্যাতো মেসিন বেরোয়নি। দেখানও হয়নি। ভাবতে ভাবতে বিভূতিভূষণ তাঁর একমাত্র পুত্র সন্তানের দিকে তাকালেন। টালির চালে নীলকণ্ঠ পাখিটি তখনও বসে। ঘেটুর গন্ধ ফুটে উঠছিল ঘাটশিলার বাতাসে। সব মিলিয়ে চোখে জল এল বিভূতিভূষণের। একেই কি মায়া বলেছেন ঋষিরা! এই কি টান-ভালোবাসা!

একটু দূরে দাঁড়িয়েছিলেন জীবনানন্দ। ধীরে ধীরে গরমের একটি দুপুর বিকেল হয়ে যাচ্ছিল। বাতাসে রোদে পোড়া ধুলোর গন্ধ। খই ভাজার আঁচ। ঠিক তখনই সামিয়ানা সরে যাওয়া উঠোনে নীলকণ্ঠের একটি পালক কুড়িয়ে পেলেন বিভূতিভূষণ। ঝাঁট দিয়ে শুকনো পাতা তুলে নেয়া উঠোনে রোদ মাখা নীলকণ্ঠ পাখির পালক— ঠিক যেন শরৎ আকাশের এক টুকরো।

বিভূতিভূষণের ইচ্ছে হলো একটু সুবর্ণরেখার পাশে বসবেন, কুমির-পাথরে। বসে বসে একটা দিনের আর একটা দিনের ভেতর ঢুকে পড়া দেখবেন। এভাবেই

তো দিন যায়। সময় যায়। সময় যায়। নাকি কিছুই যায় না। হারায় না। সব থেকে যায়। সব। যেমন আমি আছি। জীবনানন্দ আছে।

জীবনানন্দ আগে থেকে হাঁটছিলেন। একটা বড় বট গাছের মাথায় রোদ পড়েছে। বেলা কাত হয়ে গেলে যেমন হয়। একটু পরেই গরম কমে যাবে। ঠাণ্ডা বাতাস দেবে।

অভ্রমাখা পাথর পড়েছিল পথের ওপর। পাশাপাশি অভ্রের কুচি। তাতে বেলা শেষের রোদ পড়ে হাজার হিরে। খানিকটা সবুজ, কালো পাথর আর শাদা বালি পেরনোর পর পাথর ছুঁয়ে ছুঁয়ে নাচা সুবর্ণরেখা। বিভূতিভূষণের লালচে কাপড়ের কেডসে শেষ চৈত্রের অভ্রমাখা ধুলো জড়িয়ে যাচ্ছিল। নীলকণ্ঠের পালকটাকে খুব যত্নে বুক পকেটে রেখেছেন বিভূতিভূষণ। ডান হাতে কঞ্চি।

আমরা কোথায় যাচ্ছি বিভূতিবাবু?

একটু কুমির-পাথরে গিয়ে বসব। আপনার কি খুব অসুবিধে হবে?

না, তেমন আর কি!

তাহলে চলুন যাই।

জীবনানন্দ কথা না বলে বিভূতিভূষণের পাশে পাশে হাঁটছিলেন।

কুমির পাথরের কাছাকাছি পৌঁছে মন খারাপ হয়ে গেল বিভূতিভূষণের। সামনেই পাকা গাঁথনির শেতলা মন্দির। কুমিরের ল্যাজের দিক প্রায় দেখাই যায় না। এদিকের খানিকটা ঘিরে রাখা পাঁচিলে। সে পাঁচিলও ইঁট-সিমেন্টের।

ওমা, সব বদলে গেল— দেখতে দেখতে বিভূতিভূষণ ভাবছিলেন। পাথরের ওপর ঘুঁটে শুকোচ্ছে। বাতাসে শুকনো গোবর আর গুয়ের গন্ধ। এখানেই বসে থাকতাম। দিনের পর দিন বসে বসে কত সময় কেটে গেছে। লিখেছি। ভেবেছি। দেখেছি কত মনোরম সূর্যাস্ত। রঙের খেলা। ভগবান দু'হাত ভরে কত কি দিয়েছেন আমায়।

আপনার তো ঘাটশিলার বাড়ির সমস্যা মিটল বিভূতিবাবু।

তা তো মিটল।

কিন্তু আমার তো কোনো ঘরই নেই। ঠিক মতো বসে লেখার টেবিলও না।

তাতে কি, আসুন না আমরা এই কুমির-পাথরে বসে খানিকটা সময় কাটাই। ঈশ্বরের কথা ভাবি। এখানে বসে তো আপনি লিখতেও পারেন। ইচ্ছে হল লিখুন। না হলে আসুন আমরা কুমির-পাথরে বসে ভগবানের কথা ভাবি। ঐ দেখুন, সন্ধে হয়ে এল। ইটারনিটির ছায়া নামবে এবার।

বলতে বলতে বিভূতিভূষণ কঞ্চি নামিয়ে রাখলেন পাথর-কুমিরের পিঠে। বুক পকেট থেকে নীলকণ্ঠ পাখির পালকটি বের করে আনতেই তাঁর গৌরী, রমা, খুকু,

সুপ্রভাকে মনে পড়ল। পালকটি ডান হাতের দু আঙুলে— তর্জনী আর বুড়ো আঙুল দিয়ে ঘোরাচ্ছিলেন বিভূতিভূষণ। বাতাসে ভাসা দুর্গন্ধ সরে যাচ্ছিল। জীবনানন্দ দেখতে পেলেন কুমির-পাথরের চার পাশে একটি দুটি একটি দুটি করে পদ্ম ফুটে উঠছে। শাদা পদ্ম। হাওয়ায় ফিকে কমল-ঘ্রাণ।

বিভূতিভূষণ টের পাচ্ছিলেন তাঁদের দুজনকে ঘিরে, পাথরের কুমির ঘিরে অনেক, অনেক পদ্ম ফুটে উঠেছে। সেই সব শাদা ফুলের মাথা দোলাচ্ছে বাতাসে। ঠিক তখনই কুমির-পাথরে বসা জীবনানন্দ, বিভূতিভূষণের মাথার ওপর চক্কর কেটে কেটে কি যেন বলতে চাইছিল নীলকণ্ঠ পাখিটি। তার গলায় কান্না ছিল কি ?

একটি দিন ডুবে যাচ্ছিল সন্ধ্যার আড়ালে। আকাশে একটি দুটি, একটি দুটি তারার চুপি চুপি ফুটে ওঠা! মেঘের গায়ে গায়ে সূর্যাস্তের খুন-খারাবি। নীলকণ্ঠ ওঁদের দুজনের মাথার ওপর পাক খেতে হিসেব করছিল ঘাটশিলা থেকে বনসিমতলার ঘাটে উড়ে যেতে ঠিক কতটা সময় লাগবে।

ফেরা

বীরেন সাহা

এত ভোরে নিউ জলপাইগুড়ি জংশনে ডিসেম্বরের হাড় কাঁপানো শীতের অভিজ্ঞতা তুষার দীর্ঘ কয়েক বছর পরে ফিরে পেল যেন। সেই কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অসম্ভব ভালো লাগা দিনগুলিতে ছুটিতে বাড়ি ফেরা এখন সুদূর অতীতের নষ্টালজিয়া। কিন্তু সেই নষ্টালজিয়া আর তাকে আজ ছুঁতে পারছে না। পারার কথাও নয়। কেননা প্রায় দেড় যুগ আগেকার পৃথিবীটা আজ বদলে গেছে অনেকটাই। তবু উত্তরবঙ্গের সেই হারানো শীতের ভোর অনেকদিন পরে ফিরে পেয়ে অসম্ভব সুখী লাগছিল নিজেকে। ট্রেন থেকে প্লাটফর্মে নেমে কুলির মাথায় মালপত্র চাপিয়ে ওভারব্রিজের দিকে যেতে যেতে সে সুখটুকুই পুরো তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছিল তুষার। হয়তো সে কারণেই আনমনা কানে প্রথমবারের ডাকটা পৌঁছুলো না। আরেকবার ডাক শুনে এবার চমকে ফিরে তাকালো সে। হ্যাঁ, তাকেই তো ডাকছেন একজন ফরসা মাঝবয়সী ভদ্রলোক। চোখে নিকেলের চশমা। মাথায় বেশ বড় টাক। চুলের দু'একটি গুচ্ছ মাথার শেষ প্রান্তে। পরনে টেরিজিনের ট্রাউজার্স আর বড় চেকের বুশশার্ট। হাতে একটি বড় ভি. আই. পি. স্যুটকেশ। একটু অবাকই হল তুষার। স্মৃতির সরু গলির একেবারে শেষ প্রান্তে পৌঁছেও তুষার এই লোকটির চেহারা খুঁজে পেলো না কোথাও। তবু থেমে দাঁড়াতে হল, কাছে এগিয়ে এসে ভদ্রলোক একটু হাসলেন। বললেন, তুষার না?

হ্যাঁ। একটু অপ্রস্তুতের মতই হেসে উত্তর দিল তুষার। একটু সংক্ষেপেই। এছাড়া কীই বা উত্তর দেবে সে? এই ভদ্রলোকটির সঙ্গে জীবনে তার কোনদিন পরিচয় ছিল বলে কিছুতেই সে মনে করতে পারছে না।

'তুষার, তুমি আমায় চিনতে পারছো না? আমি সমীরদা।'— শরীরের সমস্ত

রক্ত এবার পলকে হঠাৎ দপ করে মাথায় চলে এলো তুষারের। বিস্মৃতির অন্তরাল থেকে প্রিয়তম একটি মানুষকে আবিষ্কারের এত আনন্দ ও কি করে ধরে রাখবে? অসম্ভব জোরে চেঁচিয়ে উঠলো তুষার-'সমীরদা আপনি!' হাতের ব্রিফকেসটা নামিয়ে রেখে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তুষার সমীরের হাত চেপে ধরলো। সমীরদা তাঁর চিরকালের চেনা গলায় বললেন. দেশে কবে ফিরলি?

দিন দশেক হল। আপনি? উঃ, কতদিন পরে আপনাকে দেখছি! আনন্দে তুষারের ভেতর থেকে একসঙ্গে অনেকগুলো কথা বেরিয়ে গেল।

তোর সব খবরই আমি রাখি। পাঁচ বছর আগে একবার দেশে ফিরেছিলি তাও শুনেছি। তা, বাড়ি ফিরছিস তো?

হ্যাঁ, কিন্তু আপনি কোথায় আছেন সমীরদা? শুনেছিলাম কলকাতায় ফিরে এসেছেন আমেদাবাদ থেকে।

সমীরদার খবর তুষার অনেকদিন রাখে না। মনে রাখার উপায় নেই। বারো বছর তিনি দেশছাড়া। এরমধ্যে চারবার তিনি দেশে ফিরেছিলেন। কিন্তু কলকাতা ও জলপাইগুড়ি করতে করতেই দু-মাসের অবকাশ কী অসম্ভব তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যেত।

কলকাতায় মাসিমা থাকেন। সেখানে থেকেই তুষারের পড়াশুনো। জলপাইগুড়ির বাড়িতে মা থাকেন। এখন একা। আগে দিদি ছিল। পাঁচ বছর আগে তারও বিয়ে হয়ে এখন দুর্গাপুরে। এই দু-তিন জায়গায় দৌড়াদৌড়ি করতেই তুষারের ছুটি কখন ফুরিয়ে আসে। তবু এরই মাঝখানে মনের মধ্যে ভিড় করে কয়েকটি চেনামুখ। সমীরদা, সোনাদি, শুভ্র। সমীরদার খোঁজ এই বারো বছরে একবারই সে পেয়েছিল শুভ্রর কাছ থেকে। দমদম এয়ারপোর্টে ফ্লাইটে কলকাতায় নেমে লাউঞ্জে শুভ্রর সঙ্গে দেখা। শুভ্রই বলেছিল, সমীরদা কলকাতায় এক নামী কোম্পানির পার্সোনেল ম্যানেজার। সংসারীও হয়েছেন। এই সমীরদা একদিন তুষারের শুভ্রর হিরো ছিলেন। বারো বছর আগে যখন দেশ ছেড়েছিলেন তখন সমীরদা তুষারের জীবনের ধ্রুবতারা। অবশ্য তখন সেই আগের সমীরদা অনেকটাই পাল্টে গিয়েছিলেন। ভেতর থেকে নয়, বাইরে থেকে। নকশালবাড়িতে তাদের দলের শেষ দুজন নেতা ধরা পড়ে গেছে। সমীরদার কলেজের চাকরিটিও গেছে চরমপন্থী হওয়ার অপরাধে। তুষার তখন একটি স্কুলে কাজ করত বেহালায়। কিন্তু ছোট ভাই শিশির বছর খানেক হল ঘাটশিলার জঙ্গলে লড়াইয়ে মারা গেছে। চেনাজানা দলের অনেকেই হয় দলছুট নয় জেলে। তুষার অবশ্য সক্রিয়ভাবে দেশের কাজ করত না। কিন্তু তত্ত্বগত দিক থেকে সে সমীরদার গ্রুপের সঙ্গে একটানা অনেকদিন ছিল। সমীরদার দলে ভাঙন ধরেছিল অনেক আগেই। এখন তা তুঙ্গে। এই কয়েকটি ঘটনায় তুষার ভীষণভাবে ভেঙে পড়েছিল। সমীরদাকে অবশ্য ঘাবড়াতে জীবনে খুব কমই দেখেছিল তুষার। এবার সেই সমীরদাও কেমন যেন অন্যরকম হয়ে গেলেন। অবশ্য বাইরের এই

রাজনৈতিক কারণ ছাড়া সমীরদার এই পরিবর্তনের কারণ ছিল। দিল্লির্ যেই কলেজে সোনাদি চাকরি নিয়ে চলে গিয়েছিলেন তিন বছর আগে সম্প্রতি শোনা গেছে সেই কলেজেরই একজন অধ্যাপককে সোনাদি বিয়ে করেছেন। এসব খবরে বেশী মুষড়ে পড়েছিল সমীরদার চেয়ে তুষারই বেশি করে। তুষার ভাবতে পারে না, সে সময় আমেরিকায় যাবার ব্যবস্থাটা পিসেমশাই না করলে তুষার কী করে বেঁচে থাকত এসব আঘাত সহ্য করে।

কিন্তু সে সব তো অনেক পুরানো কথা। তারপর অনেক ঘটনাই ঘটে গেছে। কলেজের চাকরি না থাকা সত্ত্বেও সমীরদা বিয়ে করেছেন। অনেকটা যেন সোনাদির সঙ্গে জেদ করেই। ঐ একই বছরে। ছেলে মেয়ে হয়েছে দুটি। তারপর তো পাঁচ বছর আগে শুভ্রই খবর দিল, সমীরদা এখন অনেক পাল্টে গেছেন। তাঁর চালচলন পোশাক কথাবার্তায় নামী কোম্পানির বড় অফিসারের কেতাদুরস্ত চাকচিক্য। কে বলবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এককালের এই রত্ন সমীরদা প্রথম সারির নকশাল নেতা হিসেবে উত্তরবঙ্গের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলের তরুণদের মনে ঝড় তুলেছিলেন। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে অনেকগুলো তাজা যুবক দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল পড়াশুনোর পাট চুকিয়ে দিতে। বারো বছর পরে সেই সমীরদাকে অবশ্য তুষার আর খুঁজতে চায় না। কিন্তু বড় বুড়িয়ে গেছেন সমীরদা এই ক'বছরে। একটু খুঁটিয়ে দেখলেই বোঝা যায়, সমীরদার সেই অসম্ভব ফর্সা লম্বা দোহারা-চেহারাটায় চাকচিক্যের শত প্রলেপেও বয়সের ছাপ লেগেছে। তার এককালের সবচেয়ে পছন্দের মানুষ সমীরদার ওপর সেই টানটা আজও কিন্তু তুষারের একটুও কমেনি। তাই মনের ভেতর প্রশ্নটা বার বার উঁকি দিচ্ছে তুষারের। সমীরদা কি সুখী? সমীরদা কি এখনো দেশের কথা ভাবেন? কিংবা সোনাদির কথা? তুষারের মনের ভেতর অনেকগুলো প্রশ্ন তোলপাড় করছে এখন।— সমীরদা, আপনি তো কলকাতায় থাকেন শুনেছি। কী ব্যাপার, এখানে যে? অফিসের কাজে এসেছেন?— তুষার বললো। সমীরদা এসব প্রশ্নের উত্তরই দিলেন না। বললেন, তোর কী খবর তুষার। আমেরিকাতেই থাকবি, না দেশে ফিরবি এখন?

দেশে ফেরার তো ইচ্ছে খুব। কিন্তু পারছি কোথায়? এখানে চাকরি আর পেলাম কই?

চাকরির চেষ্টা করেছিলি?

কথা বলতে বলতে খেয়াল ছিল না। দেখা গেল সমীরদা নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে ডাইনিং-রুমের দিকে এগোচ্ছেন। বললেন, কুলিকে বল মালপত্র ডাইনিং-রুমে নিয়ে আসতে। চল একটু বসি। অনেকদিন পরে দেখা।

ডাইনিং-হলে মুখোমুখি চেয়ারে বসলো তুষার। উল্টোদিকের চেয়ারে বসতেই দেখা গেলো, সমীরদা তুষারের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছেন।

বিয়ে করেছিস?

না, সময় আর পেলাম কই আগে। আর এখন তো অনেক বয়স হল, তুষার বললো।

সে কীরে তুষার। তুই আমার থেকে অন্তত দশ বছরের ছোট। আমারই বয়স হয়েছে মনে হয় না। আর তুই একথা বলছিস।

তাহলে আপনি এমন বুড়িয়ে গেছেন কেন সমীরদা!— এ প্রশ্নটা তুষারের মনে এলো সঙ্গে সঙ্গেই। কিন্তু কথাটা এড়িয়ে গিয়ে বলল, জলপাইগুড়ি যাচ্ছেন তো?

ঠিকটা ধরেছিস। জলপাইগুড়িতেই যাচ্ছি। চল, চা-টা খেয়ে নিই। বাস না পেলে ট্যাক্সিতে করে জলপাইগুড়ি যাওয়া যাবে একসঙ্গে। — সমীরদা বললেন।

জলপাইগুড়ির সঙ্গে সমীরদার নতুন কী সম্পর্ক তুষার জানে না। তুষার কি জিজ্ঞেস করবে সে কথা? না, তার চেয়ে অপেক্ষা করা যাক। সমীরদাই হয়ত বলবেন। একথা জিজ্ঞেস করে সমীরদার মনে অজান্তে কোন আঘাত দিতে চায় না তুষার। কেননা জলপাইগুড়ির সঙ্গে একদিন যে সম্পর্কটা ছিল সমীরদার, আজ থেকে অনেক দিন আগে তার সূত্র ছিন্ন হয়ে গেছে। বিশেষ করে সোনাদি দিল্লি চলে যাবার পর। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করে সমীরদা একদিন বেড়াতে এসে ছিলেন জলপাইগুড়িতে। বাবা ছিলেন এখানকার ডাক্তার সদর হাসপাতালের। অনার্স ক্লাসে ভর্তি হওয়ার আগে পুরো দু'টো মাস থেকে গেলেন জলপাইগুড়িতে। সোনাদিরা থাকতেন একই পাড়ায়। বাবুপাড়া। সোনাদি তখনো স্কুলের পড়া শেষ করেননি। কিন্তু জলপাইগুড়ির সাংস্কৃতিক জগতে তখনই সোনাদির অসম্ভব নামডাক।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের সবচেয়ে বড় শিল্পী তখন জলপাইগুড়িতে সোনাদিই। এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে একদিন সোনাদির গান শুনে সমীরদা মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। অনুষ্ঠানের শেষে নিজে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। অসম্ভব সাহসী ছিলেন সমীরদা। যাকে ভালো লাগতো সামাজিক গণ্ডী ভেঙে তার সঙ্গে কথা বলতে তাঁর বিন্দুমাত্র অসুবিধা হত না।

তুষারই সমীরদাকে সোনাদি সম্পর্কে আরো খবর দিয়েছিল। সোনাদি রূপসী, ভালো গল্প লেখেন, ডিবেটি করেন। এরপর সমীরদা একদিন তুষারকে বললেন সোনাদির বাড়িতে নিয়ে যেতে। তুষারেরই পড়শি ওরা। সেই পরিচয় কখন যে দুজনের মধ্যে নিবিড় ভালোবাসায় রূপান্তরিত হয়েছিল সে খবর সে সময় তুষারের রাখার কথা নয়, বয়সই নয়। একদিন সমীরদা একটি মোটা বাঁধানো খাতায় একটি উপন্যাস দিয়ে এলেন সোনাদিকে। সেই উপন্যাসের নাম তুষারের এখনো মনে আছে— শিল্পী তোমায়। সমীরদার লেখা এটা দ্বিতীয় উপন্যাস। তুষারদের কাছে সমীর বসুর তখন অন্য চেহারা। রাজনীতির নিত্য আখড়ায় সমীরদা তখন একচ্ছত্র অধিপতি, অসম্ভব সুন্দর তাঁর বক্তৃতা। তুষাররা দারুণ মনোযোগী শ্রোতা। অবহেলিত

মানুষের প্রতি অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে জাগাতে হবে—এই ব্রতে তখন তুষাররা সমর্পিতপ্রাণ। এছাড়া নাটক করা, রবীন্দ্র শতবার্ষিক অনুষ্ঠানে গ্রামে গ্রামে ঘোরা এ সবকিছুরই নেতা তখন সমীরদা। প্রথম বারের দু'মাসের পর সমীরদার জলপাইগুড়িতে থাকা এরপর বছরে একাধিকবার ঘটতে লাগলো। সোনাদি জলপাইগুড়ি কলেজের গণ্ডী ছাড়িয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলেন। নকশালবাড়িতে শুরু হল সশস্ত্র বিপ্লবের সংগ্রাম। সমীরদার সঙ্গে সঙ্গে তুষাররাও ঝাঁপিয়ে পড়লো। কর্মক্ষেত্র এবার কলকাতা। একদিন ইউনিভার্সিটির ছুটির পর কলেজ স্ট্রিটের কফি হাউসে তুষার সমীরদার নির্দেশমত হাজির হয়ে দেখল একটি টেবিলের দু'পাশে সমীরদা সোনাদি বসে। দুজনের মুখই কিছুটা গম্ভীর। তুষারের মনে হল, অনেকক্ষণ কেউ কোনো কথা বলছে না। সমীরদা সেদিনই ঝাবসুগুদা থেকে ফিরেছে। সমীরদা আপাতত সেখানেই আত্মগোপন করে আছে। গালে মুখে অনেকদিনের সঞ্চিত দাড়ি। বিধ্বস্ত চেহারা। সোনাদিই তুষারকে দেখে একটু হেসে কথা বললেন।

তুষার, তোমার সমীরদাকে একটু এবার সামলে চলতে বলোতো। সমীরদা এতক্ষণ ধৈর্য্য ধরেছিলেন। এবার আর হতাশা আর ক্রোধ চেপে রাখতে পারলেন না। একেবারে ফেটে পড়লেন— না, না, তোমার দিল্লী যাওয়া হবে না এখন। এখানেই কিছুদিন অপেক্ষা কর। নিশ্চয় একটা কলেজে কাজ পেয়ে যাবে। রেজাল্ট যখন তোমার ভালোই।

কী করে অপেক্ষা করব বলো? মেয়ে হয়ে আমার পক্ষে এভাবে থাকাটা যে কী কষ্টকর তা তুমি যে কেন এখনো বুঝতে পারছ না আমি ভেবে পাইনা। ---অসহিষ্ণু গলায় বলে উঠলেন সোনাদি। তখন তিনি ওয়ার্কিং গার্লস হস্টেলে থাকেন। বাবা রিটায়ার করেছেন। জলপাইগুড়ি থেকে টাকা পাঠানো বন্ধ। দুটি টিউশনি করে এখন সোনাদির চলছে। দিল্লির কলেজের এই চাকরিটি হাত-ছাড়া করা তার পক্ষে কোনোমতেই সম্ভব নয়। সোনাদির অবস্থাটা তুষারেরও খুব অসহায়জনক মনে হল। কিন্তু সমীরদা কিছুতেই তা বুঝতে রাজি নয়। সোনাদিকে দূরে ঠেলে দিতে তার মন চায় না। কিন্তু সমীরদারও তখন কোন থাকার ঠিকঠিকানা নেই, ভবিষ্যৎ তো নেইই।

সেদিন অনেক কথাবার্তার পর কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল এতদিন পরে আজ আর তা মনে পড়ছে না তুষারের। তবে এর পরের কয়েকটি ঘটনার খবর তুষার পেয়েছে আমেরিকা থেকে। সোনাদির সঙ্গে সমীরদার সম্পর্কে চিড় ধরেছে। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে আমেদাবাদে যাবার পরে সমীরদা চাকরি পেয়েছিলেন। তখন বিয়ে করতে রাজিও ছিলেন সোনাদিকে। কিন্তু ততদিনে সোনাদির জীবনে আর এক পুরুষের আবির্ভাব হয়েছে। সোনাদিরই সহকর্মী একজন পঞ্চনদবাসীর সঙ্গে। সমীরদার সেসময়কার মানসিক অবস্থার খবর তুষার পেয়েছে শুভ্রর চিঠিতে। এরই কয়েকমাস পরে সমীরদা বিয়ে করলেন।

চা আর টোস্টের অর্ডার দিয়েছিলেন। টোস্টে কামড় দিয়ে সমীরদা বললেন, ক'দিন থাকবি এখানে ?

: বেশি দিন নয়, মাত্র পনের দিন ছুটি আছে হাতে।

: তা, আপনি জলপাইগুড়িতে কোথায় থাকছেন ? বৌদি আসেননিতো দেখছি। ওরা কি এখন কলকাতায় ?

: ওরা কলকাতাতেই আছে। আমি এসেছি একটি জরুরি চিঠি পেয়ে। সোনা খুব অসুস্থ।

এবার তুষারের চমকাবার পালা। সোনাদিতো দিল্লিতেই সেটল করেছিলেন পাঞ্জাবি স্বামীর সঙ্গে। এখানে কবে এলেন ? সমীরদার সঙ্গে সম্পর্কটা কি এখনো আছে ? আস্তে আস্তে সব খবর দিলেন সমীরদাই। পাঁচ বছর আগে স্বামীর সঙ্গে সোনাদির ডিভোর্স হয়ে যাবার পর এখন জলপাইগুড়ির একটি স্কুলে চাকরি নিয়ে এসেছেন। বাড়িতে একমাত্র বুড়ো মা আছেন। তাকেই দেখতে হয়। এরপর আবার সোনাদিও অসুস্থ। সোনাদি কি এখনো গান করেন ? এ প্রশ্নটা তুষারের করার কথাই নয় এঅবস্থায় ? কিন্তু সমীরদাই জানালেন, সোনাদি একটি গ্রুপ থিয়েটারের দল করেছেন। সমীরদার লেখা একটি অভিনয়ের প্রস্তুতি চলেছিল। সমীরদার সেই দ্বিতীয় উপন্যাসের নাট্যরূপ যা তিনি সোনাদিকে দিয়েছিলেন। সেই 'শিল্পী তোমায়'। মাস দুয়েক আগে অনেক বছর পর সোনাদির চিঠি পেয়েছিলেন সমীরদা। ছোট্ট চিঠি : 'তোমার দেয়া উপন্যাসটিকে নাট্যরূপ দিয়েছি আমরা। প্রথম অভিনয়ের দিন তোমার উপস্থিতিকে স্বাগত জানাবো।' সেই চিঠি পেয়ে সমীরদা উত্তর দেননি। মঞ্জরী বৌদি নিজে বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও। কিন্তু ক'দিন আগে হঠাৎ সোনাদি নয়, সোনাদির বৃদ্ধা মা-র চিঠি এল, সোনা অসুস্থ। তোমাকে একবার দেখতে চায়।

সমীরদা সেই আহ্বানে সাড়া দিয়েই এবার জলপাইগুড়ি যাচ্ছেন। তুষার বলল, সমীরদা, একটা কথা বলবো।

: বল।

: সোনাদি এখনো আপনাকে খুব ভালোবাসে।

: হয়ত। কিন্তু বড্ড যে দেরি হয়ে গেল। ও ফিরতে পেরেছে। আমি ফিরব কী করে ?

সত্যি। তুষার ভাবলো এই অবেলায় সমীরদার ফেরা খুব মুশকিল। কিন্তু তবু কোথায় যেন মনের ভেতর থেকে একটা ছবি ভেসে উঠলো তুষারের। তুষার আমেরিকা থেকে সোজা শান্তিনিকেতনে ফিরেছে। সমীরদা ও সোনাবৌদির একান্ত অনুরোধ এবারের ছুটিটা সেখানেই কাটাতে হবে। বোলপুর স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াতেই হৈ হৈ করে ছুটে এলেন সোনাদি আর সমীরদা। সঙ্গে তাঁদের পাঁচ বছরের টুকটুকে ছেলে শান্ত।

ওপার বাংলা

ঘরগেরস্থি

হাসান আজিজুল হক

লঞ্চ থেকে নেমে গুটি পায়ে রামশরণ সপরিবারে বাঁধের উপর উঠে আসে। এর মধ্যে তিনবার সে পা ফস্কে পড়ে গেছে। হাঁড়িকুড়ি, হুঁকোকল্কে, কুল্লে সের সাতেক চাল, বিছানাপত্র সব জলে ভিজে জবজবে হয়ে গেল। বইতে সুবিধে হবে বলে রামশরণ একটা বাঁক জোগাড় করেছিল শহরে— ফলের বাজারে গিয়ে চেয়েচিন্তে পেয়ে গিয়েছিল দুটো ভাঙা ঝুড়ি। এই ঝুড়ি দুটিতেই তার সংসার মোটামুটি ধরে গেল। অবশ্য বউ, বাবো বছরের ছেলে, দশ বছরের মেয়ে আর তিন বছরের কনিষ্ঠ কন্যাটিকে বাঁকে জায়গা দিতে পারা যায়নি। ববং বাঁকে যা ধরেনি তাই ওদের কোলে পিঠে হাতে কাঁধে ধরিয়ে দিয়েছিল রামশরণ। ছেলেটি নিয়েছিল আধ কাঁদি কাচা কলা— মেয়েটার হাতেও কি যেন দিয়েছিল সে। কিন্তু বউয়ের ভারটাই বেশি হয়ে গেল। ছোটো মেয়েটা বা কাঁকালে, ডানদিকে সংসারেব টুকিটাকি জিনিস।

বাঁধে উঠে হাঁফ ছাড়ল রামশরণ। ভানুমতি ডান কাঁধটা ফাঁকা কবে একটু জিরিয়ে নেবার জন্যে দাঁড়াল। জিনিসপত্রগুলো মাটিতে নামিয়ে ফেলেছিল সে। কোলের মেয়েটাকে নামাতে যেতেই সে দুহাতে আঁকড়ে ধরল মাকে।

ভানুমতী বলে, তুই কি আমারে চিব্যায়ে খাবি—হ্যাঁ লা? জবাবে মেয়ে খিমচি দিয়ে ভানুমতীর শুকনো স্তনের বোঁটা ধরে এমন করে চুষতে শুরু করে যে, যন্ত্রণায় তার চোখে জল এসে যায়। ধাঁই ধাঁই করে মেয়েটির পিঠে চড় বসিয়ে বলে, ছাড় ছাড়, ছাড়ে দে রাক্ষুসী— বলে সে স্বামী পুত্র কন্যার সামনেই বুক উদোম করে ফেলে। রামশরণ নিস্পৃহ চোখে সেদিকে পিট পিট করে চেয়ে বলে, মারিস না— কি আছে মাইয়্যাটার দেহে, অমন করে মারলি বাঁচপে?

ভানুমতী বলে, মলে ত আপদ যায়। ও মাইয়্যা তোমার মরবে ভাবিছ? ভানুমতিকে দোষ দেওয়া মুস্কিল। গত ন মাস ধরে এই মেয়ে তার কোলে চড়ে আছে। ভানুমতি

বিনা সংকোচে কোমরের কসি একটানে খুলে ফেলে রামশরণকে দেখায়, দেহো দিহি কেমন ঘা করে দেছে কোমরে।

সত্যিই কাঁকালটায় ঘা হয়ে গেছে। এমনিতে কিন্তু আজকাল আর ভানুমতীর কোলে মেয়েটাকে আলাদা করে চেনা যায় না। কদাকার কুৎসিৎ একটা টিউমারের মত ভানুমতীর বাঁ দিকের পাঁজরে সে লেগে আছে। উলঙ্গ মেয়েটার দুদিকের কুঁচকির চামড়া ঢিলে হয়ে ঝুলে পড়েছে— মাথায় একটি চুল নেই— সমস্ত শরীরে শুকনো দাদের মত ঘা। রামশরণ জানে মেয়েটা মরছে, ভানুমতীও জানে— শুধু অভ্যাস আর নেহাৎ ওরা মানুষ বলে বয়ে বেড়াচ্ছে।

রোদটা চড়চড় করে উঠে গেলে তালগাছের মাথার ছায়া একটা কুঁজো জানোয়ারের মতো সুট করে গুঁড়ির কাছে চলে গেল। হাল্কা, গরম স্বস্তিহীন ছায়া সামান্য একটু জায়গা জুড়ে। রামশরণ সেই ছায়াটুকুর মধ্যেই পুরো পরিবারের জায়গা কুলিয়ে ফেলল। বড় ছেলেটাকে টেনে নিল কোলের মধ্যে, ভানুমতী শাড়ি। .কালের উপর জড়ো করে রামশরণকে আলিঙ্গনের ভঙ্গিতে বসল আর বড় মেয়েটা সেঁটে রইল মায়ের গায়ে! এইটুকু জায়গার মধ্যে একটা পরিবার এঁটে যেতে পারে এ এক তাজ্জব ব্যাপার। রামশরণ হুঁকো কল্কে বের করে তামাক সাজতে বসল।

গরম বাতাস আসছিল থেকে থেকে। দম আটকে আসছিল তখন, রামশরণ ঘাড় ঘুরিয়ে এদিক ওদিক দেখছিল, বলল, কি যে দ্যাখব বাড়ি গিয়ে! ভানুমতী বলে, দ্যাখবে আবার কি? দ্যাখব কিছুই নেই।

আহারে কত যেন ছেলো আমাদের?

ভানুমতী অতিষ্ঠ হয়ে দুহাতে মেয়েটার মাথা ধরে জোর করে একটা স্তন থেকে তার মুখটা সরিয়ে দিতেই মেয়েটা তার মা বাবা দাদা দিদির ভ্রুক্ষেপ মাত্র না করে ঠিক স্থিতিস্থাপক রবারের মতো অন্য স্তনটায় মুখ লাগিয়ে চোঁ চোঁ টানতে থাকে।

ইকি জন্মের খাওয়া খাচ্ছে গো? কথাগুলো ভানুমতী কাউকেই বলে না— কিন্তু মেয়ের তেলো মাথায় হাত বুলিয়ে বুলিয়ে উকুন খোঁজার চেষ্টা করে। ইতিমধ্যে রামশরণ হুঁকা ধরিয়ে ফেলেছে। চোখ বুঁজে আরাম করে সে টানতে থাকে। শূন্য মাঠ আর ফাঁকা আধশুকনো খাল, অজন্মা ও অনাবাদী বছরের পাটকিলে রং-এর বদমেজাজী ঘাসের জংগল, নোনা জলে ডোবা ঝাঁঝালো অফলা বিল— এইসব তীব্র রোদে মিশে গিয়ে নেশার মদের মতো রামশরণের ভিতরে ঢোকে তামাকের ধোঁয়ার সঙ্গে। সে চোখ বন্ধ করে বলে, কতদিন সংসার করতেছিরে ভানু? ভানুমতী চমকে উঠে তাড়াতাড়ি কোলে জড়োকরা শাড়ি তুলে নিয়ে গা ঢেকে ফেলে। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে রামশরণের দিকে তাকায় সে। তখন রামশরণ মজার কাণ্ড করছিল। হুঁকো টানা বন্ধ করে ছেলেটাকে বুকের খুব কাছে টেনে নিয়ে আকাবাঁকা গাঁট ওঠা আঙ্গুলে তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে সে পরিবারের সন্তানদের বয়েসের হিসাব আরম্ভ করে দিয়েছে।

জগ্যের বয়েস হয়েছে তের বছর— না রে? তার আগে দুটো গেছে। মনো মরিছে পাঁচ বছর বয়েসে— সেই যেবার গাঁশুদ্ধ লোকে শামুক গুগলি আর শাপলা খাইছিল সারাবছর। মনোর ছোটো পুন্নিমে মরিছে তিন বছর বয়েসে বিয়ের বছরই তো পেটে আইছিলো মনো, তাহলি আমাদের বিয়ে হইছে আঠারো বছর।

গত বছর এই সময় রামশরণ ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হয়েছিল। ব্যাপার যা ঘটেছিল, রামশরণ বাপের জন্মে কোনদিন শোনেওনি, দেখাতো দূরের কথা। দূরের বাড়ির ছেলে রশিদ এসে গোয়ালের গোজ থেকে দুধেল গাইটির দড়ি ধরে নিয়ে গেল যেন চরাতে নিয়ে যাচ্ছে মাঠে। রামশরণ বলে, অ বাবা রশিদ করিতেছিস কি বাবা, গাইটোকে নিয়ে যাচ্ছিস কনে। রশিদ কিছু বলেছিল কিনা মনে নেই— বেচারি বোধ হয় লজ্জায় কিছু বলতে পারেনি, একবার শুধু ঘাড় ঘুরিয়ে চেয়েছিল বুঝি। কিন্তু দুপুরে যখন খেতে বসে রামশরণ, সেই সময় পশ্চিম বাড়ির রিদয়চরণ নিজেরই বাড়িতে খড়ের গাদায় পুড়ে পোড়াকযলার মতো হয়ে গেল : ঘটনাটা ঠিকমত বুঝে ওঠার আগেই চার পাঁচটা ছেলে এসে বলে, কাকা আর কত খাবা? তাতে রামশরণ বলে, ক্যানো বাবারা, কোথায় যেতে হবে? এতে অন্য ছেলেগুলো চুপ করে থাকলেও বসন্তের দাগঅলা অল্প চেনা ছেলেটা বলে বসল, কাঁসার থালাটা— যেটা খাচ্ছো, ওঠা আমাদের লাগবে। দেরি করতি পারিতিছি না— অন্য বাড়িতে যাতি হবে। তাই কচ্ছি তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে থালাটা দাও।

বড়ো বড়ো ফোঁটায় রামশরণের চোখ থেকে জল পড়ে তার ভাতই লোনা হয়ে গেল। মোটামুটি আধ ঘণ্টার মধ্যেই উৎখাত হয়ে গেল সে। ঐ যে দুপুরে লোনা লেগেছিল মুখে, কোনো জল কি অন্য কিছুই পাওয়া গেল না স্বাদ ফেরানোর — পথে পথে ঘুরে, নদীতে নদীতে আঁকুপাঁকু করে, সীমান্তে চেঁচিয়ে সীমান্ত ছাড়িয়ে মখে পাথরের মুখ এঁকে মানুষের সারিতে নরক পর্যন্ত অপেক্ষা করে— দাঁড়িয়ে বসে চলে হেঁটে কোনোভাবেই যে মানুষ পারেনি নুনের ঝাঁঝ থেকে মুক্তি পেতে— এক বছর পরে বাড়ির কাছে এসে কেমন দিব্যি হুঁকো ধরিয়ে সেই মানুষ সন্তানদের বয়েসের হিসেব নিতে শুরু করেছে।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ছেলেমেয়েদের খোঁজ-খবর করায় ভানুমতীর ভিতরে সেই রহস্যময় দরজা হাট হয়ে খুলে যায়— যেখানে সচরাচর দৃষ্টিহীন অন্ধকারই থাকে। বুক টন টন করে ওঠে ভানুমতীর। হঠাৎ মনে পড়ে যায় মোট ছটি ছেলেমেয়ে ছিল তার। গরম ভাপঅলা রোদের দিকে চেয়ে মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠলেও ভানুমতী অবাক হয় যখন দেখে, প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের মুখই তার মনে পড়ছে। বড়ো ছেলেটির থুতনির উপর একটা তিল ছিল, মেয়ের কপালে ছিল একটা বিশ্রী আঁচিল আর ছোটো ছেলেটার ডান পায়ের একটা আঙুল অন্য আঙুলগুলোর চেয়ে উপরে ছিল— এসবও স্পষ্ট মনে পড়ল তার। ভানুমতী বলে, ভগোমান ঠিক আধাআধি ভাগ করে দেছে। ছটার তিনটে আছে। রামশরণ কিছু বলল না— ছোটো মেয়েটার দিকে

চাইল একটু অন্যমনস্কভাবে। মেয়েটাকে এখন ঢেকে নিয়েছে ভানুমতী বউমানুষের মতো।

রামশরণ একটু ভেবে নিলো। একটু চিন্তাভাবনা করে শেষে বলল, গাছ থাকলে আবার ফল ধরে । গাছটা তো আছে।

দেখে মনে হয় ভানুমতী এই কথায় লজ্জা পেয়ে গেছে। সে আড়চোখে চাইছে রামশরণের দিকে! রামশরণের পরনে আছে রং জ্বলে যাওয়া ময়লা একটা গামছা। তার বেঢপ লম্বা হাত দুটোর পেশী দড়ির মতো পাকানো, ছোট ছোট চুল বিবর্ণ প্রায়, সবগুলো দাঁতই পড়ে গেছে তার। বাড়িটা কি আছে? কি যে দ্যাখবো গিয়ে। থাকতিও পারে।

শুনিছি পরে পোড়ায়ে দিছিলো মিলিটারী গিয়া। তাহলিও ভিটেটা আছে কি বলিস?

থাকতিও পারে— ভানুমতী আবার বলে।

থাকতিও পারে বলতিছিস ক্যানো? থাকবে না তো যাবে কনে? একটু ক্ষেপে উঠে রাগী গলায় বলে রামশরণ।

তাহলি আছে— ভানুমতী এবার বলল।

এতেও রাগ বেড়ে গেল রামশরণের। কিন্তু সে কথা কাটাকাটি করতে চাইল না। বলল, কি কষ্টই না পাইছি এই নটামাস। এ্যাহন এই এ্যাতো কষ্টের পর কি দ্যাশে যাইয়ে বসতে পারবো না কস?

ভানুমতী এইবারে ঝেঁজে উঠল, কি সুখটা জেবনে পাইছো আমারে এট্টু কও তো? প্যাট ভরে খাতি পাইছো কোনোদিন— পরের বাড়ির খেটে খেয়ে জেবন গেল। পোলাপানদেব কোনদিন দুটো ভালো জিনিস দিতি পারিছ— এট্টু ভালো জামাকাপড় দিতি পারছ কও?

রামশরণও সমান তেজে জবাব দিল, আরি বাপ ভিটেটা তো নিজের ছেলো, সারাদিন পরে নিজের ঘরে শুয়ে তো থাকতি পারতাম—

ভানুমতী একটানা কিন্তু বকে গেল, বলো কেমন করে তোমার মনো মরিছে? পেরথম ছাওয়ালটা কেমন বিনি ওষুধে বিনি পথ্যে মরিছে, কও পুন্নিমে মরিছে কেমন করে? সঙ্গে সঙ্গে রামশরণ বলে, তাহলি বল দয়াল মরিছে কেমন করে? কই থামলি ক্যানো— বল তোর ছোটো ছাওয়ালটা কেমন করে মরিছে? বেশি দিন তো না, এই তো সেদিন মলো পোলাটা। বল কেমন করে মরিছে?

ভানুমতী একেবারে থেমে গেল— কোনো কথা বলতে পারল না সে।

তবে? রামশরণ বলে, বাড়িতে মরলি অমন শ্যাল কুকুরের ছানার মতো ফেলে তো দিতি হয় না।

ভানুমতী চোখে আঁচল চাপা দিলো।

কেঁদে কোন লাভ নেই বুঝলি। তিনডে এ্যাহনো বেঁচে আছে। ফিরে তো আইছি

আবার। ইণ্ডে গেলাম— কবে মরে ভুত হবার কথা— ফিরে আলাম, দ্যাশে ফিরে কোথা ইষ্টিশান, কোথা জাহাজ ঘাট, রিলিফের লাইন আর লোকের কাছে দাও দাও করা— তার চাইতি নিজের ভিটেতে— একটু উত্তেজনা হয়েছিল রামশরণের হুঁকোটা নিভে গিয়েছিল। ফের ধরিয়ে নিল সে। ঐ দুপুরে রোদ ছিল অসহ্য— স্যাতস্যাতে দেশ, সব কিছু ঠিক পুড়ে যায় না, কিন্তু ভেজা মাটি থেকে বিশ্রী ভাপ উঠতে থাকে, আধশুকনো খানাখন্দ থেকে গরম জলীয়বাষ্প ধোঁয়ার মত ভাসতে থাকে; বাঁদিকে গাঙ রোদে জ্বলছে বলে সেদিকে চাইলেই চোখে আচমকা ধাক্কা লাগে— এই সব কারণে রামশরণের চোখে যন্ত্রণা হচ্ছে, মাথায় ঝিমধরা বেদনা, সে খানিকটা অভিভূত হয়ে হুঁকো টানতে টানতে ভানুমতীর সামনে একটি চমৎকার জগৎ খুলে দিতে থাকে। রামশরণের ভঙ্গি রূপকথা বর্ণনার— সামনের ময়লা নোংরা জগৎটা একটু একটু করে মুছে যাচ্ছে, সেখানে তার বদলে জাগছে শক্ত মজবুত বাড়ি ঘর-দুয়োর যা ঝড়ে বন্যায় টিকে থাকবে, খাদ্য এবং বস্ত্রের কোনো অভাব থাকবে না। অবশ্য জগৎটা খুবই খাটো— রামশরণের কল্পনা আর আকাঙ্খার মাপ মতো।

ভানুমতী মেয়েটাকে আর ঠেকাচ্ছে না— কাপড়চোপড় ঠিকঠাক করে নিয়ে কপালের উপর পর্যন্ত ঘোমটা টেনে চুপচাপ শুনছে। তার মুখের কঠিন রেখাগুলো নরম হয়ে এলো— অনিদ্রা, দুশ্চিন্তা আর অনশনের জন্যে গজিয়ে ওঠা চোখের কোণের গভীর কালো রেখা মুছে গিয়ে চোখ দুটো কেমন টানা মনে হতে থাকে।

রামশরণ তার বাপের গল্প বলল, তার বাল্যের কেচ্ছা শোনাল, সন্তানদের কথা বলল— ফেনিয়ে ফেনিয়ে। শুনতে শুনতে ভানুমতীর চোখে বারে বারে জল চলে এলো, সে মোছবার চেষ্টাও করল না।

ভাবনা কি? ঠিক আবার গুছিয়ে বসবানে— ক. রামশরণ। এত সব কথার পর ভানুমতী ও সাধ মিটিয়ে স্বপ্ন দেখে নিল। উত্তর পূব আর পশ্চিম পোতার তিনটে ঘর পরিষ্কার ঝকঝকে উঠোন ঘিরে। ছেলে বউ নিয়ে আছে একটায়, একটায় তারা নিজের আছে, উত্তরেরটা ফাঁকা, জামাই মেয়ে এলে ব্যবহার করা যাবে। বাংলাদেশের বউ ভানুমতী কতো দিন ধরে সংসার করছে —কি বিচিত্র ঘননিবদ্ধ অভিজ্ঞতা তার। সে কি জানে না, কেমন করে হয় সুখের সংসার? জানো না কি, কেমন করে পাততে হয় চমৎকার পরিবার? গোয়াল, গাই-গরু, হাল-বলদ, জমি-জমা, পুকুর ভর্তি মাছ আর গোলাভরা ধান দূরস্থিত স্বপ্নের মতো ভানুমতীকে প্রচণ্ড আকর্ষণে টানে; ভানুমতীর চোখ বিশাল গভীর দীপ্ত; প্রায় মেঘভরা জলভরা শ্রাবণের আকাশের মতো। রামশরণ উঠে দাঁড়াতে গিয়ে উঃ উঃ শব্দে বসে পড়ে। কিন্তু সে বসেও থাকতে পারে না— তাকে খুব তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে হয়। কিছুদিন থেকে তার কোমরে একটা খিচ ব্যথা হয়েছে— বেশিক্ষণ বসে থাকার পর উঠে দাঁড়াতে গেলেই এই ব্যাপার। ভানুমতী বলে, কি হইছে, দুঃখ পাইছ?

রামশরণ বিকৃত মুখে শুয়ে শুয়েই কোমর টান টান করার চেষ্টা করে, উঠে বসে ঘাড় নিচু করে থাকে কিছুক্ষণ, শেষে দুহাতে কোমড় ধরে উঠে দাঁড়ায়।

উঃ শালার বেথাটা অস্ফুটে মন্তব্য করল সে। রামশরণ তার মাথাটা কিছুতেই বুকের উপর ঝুঁকে পড়তে দেবে না— এমনি রোখ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে— তার সেই চেষ্টায় ঘাড়ের পিছনে দুগোছা দড়ির মতো শিরা থর থর করে কাঁপতে শুরু করে, হাড় সেঁকা রোদে পুড়তে পুড়তে তার খালি গায়ের চামড়াও সেই কষ্টে জিল জিল করে নড়ে চড়ে ওঠে। তবু সে বাঁক কাঁধে নিয়ে প্রতিটি জিনিস বৌ ছেলেমেয়ের হাতে আগের মতো ধরিয়ে দিয়ে বাঁধ ধরে টুক টুক করে এগিয়ে গেল।

খুব কাছেই রামশরণদের গাঁ— উঁচু বাঁধটা চোখের উপর বেঁকে গেছে বলেই গাঁ ঘর দেখতে পাওয়া যায় না। রামশরণের চেষ্টা হলো, বাঁকটা তাড়াতাড়ি পেরিয়ে যাবার। এমন তেজে সে হাঁটতে থাকে যে, মনে হয় দরকার হলে বাড়িতে গিয়েই সে তার জীবনের সর্বশেষ নিঃশ্বাসটি ফেলবে। তার বুকের ভিতর গুড়-গুড়ুনি শুরু হয়— কাটা মুরগীর মতো ধড়ফড় করতে থাকে তার হৃৎপিণ্ড, সাপোর মতো কিলবিলিয়ে ওঠে নাড়িভুড়ি। বাঁকটা পার হয়েই দাঁড়িয়ে পড়ল রামশরণ, চোখ পিটপিটিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখল ; রোদের জন্যে কিছু দেখতে পাচ্ছিল না সে।

ফিরে তাকাল সে ভানুমতীর দিকে— গাঁ কইরে? ভানুমতী বলে— আসে গিছি নাকি?

রামশরণ ধমক দেয়— চোহে দেহিস না? গাঁটা গেল কনে?

বাঁধ থেকে নেমে পড়ল সে সপরিবারে। গাঁয়ের চিহ্নমাত্র ছিল না— এই কথাটা সে ঠিক বলছিল না। আসলে দূর থেকে দেখতে পায়নি রামশরণ। এখন সে ঘর বাড়ির অবশেষ কিছু কিছু দেখতে পাচ্ছিল। কালো মাটির ভাঙা চোরা ভিটে, আধপোড়া খুঁটি, তোবড়ানো এনামেলের বাটি, ভাঙ্গা ঝুড়ি, ঝাঁটা, উনুনের পোড়ামাটি আর ছাই— এসব তবে কিসের চিহ্ন? রামশরণ ঠিকই চিনতে পেরেছিল— কিন্তু সে বোবা হয়ে গিয়েছিল এত কাছে এসেও নিজের ভিটেটাকে চিনতে না পেরে। অবাক হয়ে ভাবছিল— এত ছোট ছিল নাকি তাদের গাঁ, মাত্র এই ক'টি ঘর? বাড়িগুলোর ভিতর দিয়ে যে অসংখ্য গলি ছিল— যেখানে সেখানে কুমড়ো আর লাউয়ের মাচা— খোলা খামারে গরু বাঁধা, এতগুলো ডোবা— এ সব গেল কোথায়? সব উবে গিয়ে এই গুটিকতক ন্যাংটো ভিটে? রামশরণ বাঁক কাঁধে দুলতে দুলতে বলে এইডা না?

ভানুমতী এদিক ওদিক চেয়ে হৃদয়চরণের বাড়ির দিকে গলিটা খুঁজতে থাকলে রামশরণই আবার বলে দুরো, তুলসীদার ভিটে এটা। রামশরণ একবার এ ভিটের কাছে গিয়ে বলল, রিদয়খুড়োর বাড়ি, একবার সে ভিটের কাছে গিয়ে এইডা পেল্লাদের মনে হয়— এইরকম চলতে চলতে শেষ পর্যন্ত সে আধপাগলের মতো চেঁচাতে শুরু করে, কাঁধের বাঁক তার হাত ফাটিয়ে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছে, ভিটেটা

গেল কনে? আঁ? অ ভানু দ্যাখ না এট্টু খুঁজে। বেচারার জল এসে গেল চোখে।

সান্ত্বনা দেবার মত ভানুমতী বলে, ক্যানো মিছে খুঁজে মরতিছ? বাড়ি ঘরদোর কি আছে যে ঘরে গিয়ে বিছানা পেতে শুয়ে পড়বানে? সব ভিটেই তো সমান— শরিকে কি ঝগড়া করতি আসতিছে? কথাটা ভাল করে ভেবে বিচার করে দেখল রামশরণ। কোন বাড়িই যখন আস্ত নেই, ভাগাভাগির জন্যে দ্বিতীয় প্রাণীও যখন নেই হাজির, তখন নিজের ভিটের জন্যে এত খোঁজ-খবরের দরকারটা কি? কিন্তু যেন দুর্দান্ত কৌতূহলেই রামশরণ আতিপাতি খুঁজে দেখছিল, কোথায় যেতে পারে তার সাধের বাড়িটার পোড়ো ভিটে, পা গজিয়ে পালিয়ে তো যেতে পারে না। নিশ্চয়ই ঘাপটি মেরে আছে এখানে— পোড়া খুঁটি, ভাঙা বাঁশ, টিনের বাসন-কোসন, মাটির শানকি— এই সবের মধ্যে। বোশেখ মাসের প্রচণ্ড রোদ হু হু হাওয়া আর বিরাট নিস্ফল অঞ্চল এমন করেই কি তার ভিটেটাকে লুকিয়ে ফেলতে পারে যে খুঁজে মিলবে না? বাড়ি তো জঙ্গম নয়!

রাত দশটার দিকে খানিকটা হাল্কা হয়ে গেল রামশরণের পরিবার! ভানুমতী প্রচণ্ড তেজের সঙ্গে শুরু করলেও বেশিক্ষণ চালিয়ে যেতে পারল না, নেতিয়ে পড়ল সে। তাছাড়া এই খোলা মাঠে চিৎকার করে একা একা কান্না কোথাও যেন ঠিক পৌঁছায় না। ভানুমতী কিছুক্ষণ চেঁচিয়ে ককিয়ে কেঁদেই বোধহয় বুঝল, নালিশ ঈশ্বরেব কানে পৌঁছে দেওয়া তার কর্ম নয়। খানিক করেই রামশরণ আর তার তীক্ষ্ণ বুকফাটা চিৎকার শোনে না। ভানুমতী কাঁটা ফেঁসে যাওয়া গলায় বার বার ডাকছিল, অরু অরুরে, কোথায় গেলি মা। সঙ্গে সঙ্গে বিকৃত হয়ে উঠছিল তার মুখ। গলার ঘাড়ের আর মুখের মাংসপেশী টানটান হয়ে যাচ্ছিল যেন তার বুকের ভিতর রয়েছে কঠিন কোনো ভার যা ভানুমতী চাইছে উগরে ফেলতে। খুব প্রিয়জন মরে গেলে হয়তো প্রথম কয়েকঘণ্টা শোক এইরকম পাথরের মতোই বুকের ভিতর বেড়ে ওঠে।

ছোট মেয়েটার নাম ছিল অরুন্ধুতী। এমন সুন্দর নাম নিয়ে সে মরে গেল কোন সাড়াশব্দ না করে। ভানুমতী একটা পড়ো ভিটের উপর ইট পেতে রান্না চড়িয়েছিল সন্ধের পরে। শহর থেকে আসার সময়ে রিলিফের চাল সে জোগাড় করেছিল তাই ফুটিয়ে নিয়েছিল। মেয়েটা পেট পুরে খেয়েছিল। সেই ভাত। খেয়ে নিশ্চিন্দ হয়ে ঘুমিয়েছে, বড়ো ছেলেমেয়ে দুটোও অসাড় হয়ে পড়ে আছে, ভানুমতী রামশরণকেও খেতে দিতে যাবে— তখন দেখা গেলো মেয়েটা মরে গেছে, ঘুমের মধ্যেই চলে গেছে সে। ভানুমতী ত্রস্ত হাতে মেয়েটার বুকে হাতের পাতা রেখে দেখল, নাকে হাতের উল্টো পিঠ রাখল, ঝুঁকে পড়ে মেয়ের মুখের উপর নিজের মুখ নিয়ে গেল। ওই সময়ের মধ্যে টু শব্দ করল না ভানুমতী। পর্যবেক্ষণ শেষ করে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয়ে কেমন বুনো চোখে একবার রামশরণের দিকে তাকাল তারপর বুকফাটা কান্নায় ভেঙে পড়ল।

ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই ভানুমতীর প্রায় সমস্ত শোকটাই বেরিয়ে গিয়ে সে হাল্কা বোধ করে— কিন্তু সেই আক্রোশ ভরা ভয়াবহ শোক যায় কোথায়? কোথায় যে মিলিয়ে যায়। রামশরণ এখন আর কোনো চিৎকার শোনে না। একটা চটের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে আকাশের ঝকঝকে তারা দেখতে দেখতে সে ভানুমতীর মৃদু একঘেয়ে গোঙানি শুনতে থাকে। নদীর দিক থেকে খোলা মাঠের উপর দিয়ে হু হু করে হাওয়া ছুটে আসে। প্রায় নেভা ইটের উনুনের ছাইয়ের তলায় লাল গনগনে আগুন অন্ধকারে জ্বলজ্বল করে উঠে। তখন ভিটেটা চাপা আলোয় আবছা দেখা যায়— রামশরণ চেয়ে চেয়ে দেখে, বড় ছেলেটা হাত পা ছড়িয়ে ঘুমোচ্ছে, বড়ো মেয়েটা কোলের ভিতর গুটিয়ে নিয়েছে নিজেকে আর তাদের পাশে, প্রায় গায়ে গায়েই মরা মেয়েটা পড়ে আছে। মাথায় একটাও চুল নেই, কাঠির মত সরু হাত-পা, শরীরের ভাঁজে ভাঁজে চামড়া ঝুলে পড়েছে— পেটে এখানো রিলিফের ভাত ভরা আছে। ওহোহো জাতীয় একটা অতর্কিত চিৎকার করে রামশরণ কেঁদে উঠতে চাইল। খুব বেখাপ্পা শোনায় সেটা। রামশরণ চুপ করতেই উঁচু বাঁধ বাধা পেয়ে বাতাস যে হুড়মুড় করে ফিরে গেল সেই শব্দ শোনা যায়। আশেপাশে কোন বড় গাছপালা নেই— বাতাসের সোঁ সোঁ আওয়াজ নেই সেজন্যে— কি রকম হাহাকারের মতো বাতাস ছুটোছুটি করে বেড়ায় শুধু। ভানুমতীর গোঙানি একটানা চলছে— এখন সেটা আরো মৃদু। অসম্ভব খিদে বোধ করল রামশরণ।

উঠে বসে সে কথাবার্তা চালানোর চেষ্টা করে। মরে হাড় জুড়োল মেয়েটার, কাঁদিসনে, আমাদের ভাগ্যে তো নেই! নাড়ী জ্বলে যাচ্ছিল তার। সব ভাত কি এখন ফেলে দেবে ভানুমতী? তাহলে তো মরা মেয়ের পাশে তাকেও জায়গা নিতে হচ্ছে আজ।

ভানুমতী এরকম কেঁদে চলল ইনিয়ে বিনিয়ে। অস্থির হয়ে আবার শুয়ে পড়ল রামশরণ। যখন ঘরে থাকে, বাড়ি থাকে, শিশুর কান্না থাকে,— গৃহপোষ্য পশু, ক্ষেত আর কিছু কিছু ফসল থাকে, আকাশ তখন ছোটো, নিচু ছাদের মতো— আর এখন শস্যহীন, বসতিহীন ভূখণ্ডের বহু উপরে— কুচকুচে কালো বিশাল আকাশ। রামশরণ সেই আকাশের দিকে চেয়ে ভেবে চলল, ভানুমতী তৈরি ভাত তাকে খেতে দেবে কিনা।

কিন্তু উঠে বসল ভানুমতী— শানকি টেনে নিয়ে ভাত বাড়ালো দুজনের জন্যে। ভাত বেড়ে সে চুপচাপ বসে থাকল উদাসভাবে। রামশরণ দেরি করল না, নিজের কাছে একটা শানকি টেনে নিয়ে আর একটা এগিয়ে দিল ভানুমতীর দিকে। কোনো কথা না বলে ঠাণ্ডা কড়কড়ে ভাঁটার মতো বড়োবড়ো শক্ত বিস্বাদ রিলিফের চালের ভাত নুন মাখিয়ে খেতে শুরু করে সে। কচ করে কাঁচা মরিচ দাঁতে কেটে নেয় রামশরণ, হু হু করে মুখে জল চলে আসে— কন্যাশোক ভুলে গিয়ে খুব মন দিয়ে ভাত খেয়ে যায় সে। আঁচল দিয়ে মুখ মুছে শুকনো করে তুলল ভানুমতী— কিন্তু ভাতের প্রথম গ্রাসটা মুখে তুলতেই চোখ আবার ভর্তি হয়ে গেল জলে। সুবিধে

হবে না বুঝে আর মুছলো না ভানুমতী— ভাতে আলাদা করে আর নুন মাখানোর প্রয়োজন হোল না তাব। ভানুমতীর পাশেই শুয়ে পড়ল রামশরণ। বিশ্রী আঁশটে গন্ধ বেরুচ্ছে তার গা থেকে। শুকনো ছাইয়ের গন্ধও পাচ্ছে রামশরণ। সে বলে কি করব এ্যাহন ?

ভানুমতী কিছু বলে না। গলগল কবে অন্ধকার নামছে আকাশ থেকে। বাঁধে আটকে বাতাস ফিরে ফিরে যাচ্ছে। আর কোনো আবাদ হবে না, চাষ হবে না, কেউ আসবে না এখানে বাস করতে— বিশাল এই ভাগাড়ে রামশরণ হঠাৎ এতো ভয় পেয়ে গেল যে, সে ভানুমতীব কাছে ঘেঁষে এগিয়ে গেল।

কি করবানে এ্যাহন ওডাকে নিয়ে ? ভানুমতী নতুন করে কেঁদে বলে, ওরে এট্টু আগুন দেবা না ? মেয়েডা এট্টু আগুন পাবে না, হায় রে।

রামশরণ চেয়ে দেখল ছাইয়ের নিচে আগুন খুব তাড়াতাড়ি নিভে আসছে। সে বলল, পুড়িয়ে আব কি সদগতি হবে নে ? ভগোবন ফগোবান নাই বুঝলি। কাল সকালে এট্টু গর্ত করে পুঁতে দেবানে শিয়েল, টিয়েল যাতে না খাতি পারে। যাবে পঞ্চভূতে মিশে।

মৃত মেয়েটা ভিতরে ভিতরে খুব শক্ত হয়ে যায়। মেয়েডা আমার পরান ছিল গো— ওরে পোভাও তুমি— ভানুমতী ভীষণ কাঁদতে কাঁদতে বলে, কেমন করে আমাব দুলাল মরিছে তোমার মনে নাই ? ছেলেডা ইণ্ডেয় শুকিয়ে মলো— জংগোলে ঠেলে ফেলে দেলাম।

স্বাধীন হইছি আমরা — ঘৃণায় আর রাগে রামশরণের গলায় আওয়াজ চিড় খেয়ে গেল, স্বাধীন হইছি অতে আমার বাপের কি ? আমি তো এই দেহি, গত বছর পবানের ভয়ে পালালাম ইণ্ডেয়—ন'টা মাস শ্যাল কুকুরের মতো কাটিয়ে ফিরে আলাম স্বাধীন দ্যাশে। আবাব সেই শ্যাল কুকুরের ব্যাপার। ছাওয়াল মিয়ের হাত ধরে আজ ইস্টিশান, কাল জাহাজ ঘাট— রামশরণের কথা থেকে ছড়াৎ ছড়াৎ শব্দে ধার ছিটকোতে থাকে, স্বাধীনটা কি, আঁ ? আমি খাতি পালাম না— ছাওয়াল মিয়ে শুকিয়ে মরে, স্বাধীনটা কৌয়ানে, রিলিফের লাইনে দাঁড়াও ফহিরের মতো— ভিক্ষে করো লোকের বাড়ি বাড়ি।

ভানুমতী বলে, কেমন করে এহানে বাস করব— কি খাবা এহনে— অরুন্ধতীরে—

রামশরণ বলে ভাবনা কি তরো ? সবকার জমি দেচ্ছে, গাড়ি গাড়ি চাল দেচ্ছে, বাঁশ বেড়া টিন দিয়ে ভিটে বাড়ি তুলে দিচ্ছে— তারপর আকাশ থেকে পড়বেনে একজোড়া জুয়ান বলদ।

ভানুমতী ককিয়ে কাঁদে, অ মা অরুন্ধতী, কোথা গেলিরে তুই ? দু'তিনবার চিৎকার করে আবার গলা নামায় ভানুমতী, সাপের মন্ত্র পড়ার মতো একঘেয়ে ঝিম-মারা সুরে গুণ গুণ করতে থাকে। শুনতে শুনতে অসহ্য হয়ে ওঠে রামশরণ। সে বলে, ভানুমতী, আমি বলতিছি কি—স্বাধীন হইছি না কি হইছি আমি বোঝাবো কেমন

করে? আগে এট্টা ভিটে ছিল— এখন তাও নেই। আমি স্বাধীনটা কিসি?

কান্না থামিয়ে ভানুমতী খুব উদাস ম্রিয়মান গলায় বলে, ক্যানো সরকার থে পাবে না কোনো কিছু?

এই যে পাইছি সাত সের চাল আর ইগুে থেকে দু'টা কম্বল। এই পাইছি। ঘর দোর বানাতে কিছু দেবে না আমাদের?

তোর কি মনে হয়? রামশরণ পাল্টা জিজ্ঞেস করে। এহেনে তোরে কি দেবেনে ক।

তবে যে কয়, গেরামে গেরামে ঘর বানিয়ে দেবে।

আচ্ছা আচ্ছা দেচ্ছে, রামশরণ বলে, তিনদিনের চাল আছে তোর— চালটা ফুরিয়ে গেলে কি করবি? চাল ফুরোলি ভিক্ষে করবি কনে? কেউ আছে ইদিগে? তিনদিন পর চাল নে আসছে কি সরকারের লোক? বাঁশ বেড়া আনতিছে? ভাবসাব যা দ্যাখলাম সরকারের লোক যদিও আসেও, ততদিনে তোর আমার হাড়ে মাস গজিয়ে যাবেনে।

ভানুমতীর গা থেকে উৎকট গন্ধ আসছে। তার পাশে শুয়ে রামশরণের গলা পর্যন্ত শোক ফেনিয়ে ওঠে। রান্না করার জন্যে ভানুমতী জোগাড় করেছিল কটা বড়ো বড়ো শুকনো ডাল। একটা মোটা ডাল আধপোড়া পড়ে আছে। মরা মেয়েটা শুয়েছে আছে ঐ ডালটারই পাশে ছেঁড়া চটের উপর। আলাদা করে তাকে চেনা যায় না। আব একটা ডালের মতোই মনে হয়। রামশরণের চোখ জ্বালা করে ওঠে— শোকের ভাব বুকে যেন পাষাণ হয়ে চাপে, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে তার— ভিটের নিচে জোড়া শিয়াল ঘুরে বেড়ায়। ভানুমতীর গা থেকে মাটি আর ছাইয়ের গন্ধের সঙ্গে মেশা আঁশটা খুব জোরাল হয়ে উঠলে রামশরণ ধীরে ধীরে মোহে পড়ে— কি একটা ঘোরে ভানুমতীর দিকে সে এগিয়ে গেলে ভানুমতীর চোখ অন্ধকারের মধ্যে জ্বলে, তারার আলোতে রামশরণ সেই চোখে মারাত্মক আক্রোশ এবং অসহনীয় দুঃখ দেখেও জোর করতে থাকে। তখন লাথি ছোঁড়ে ভানুমতী— সে রামশরণকেও ফেলে দেয় ছিটকে, মুখে শুধু বলে, লজ্জা করে না তোমার?

মরা মেয়েটার ব্যবস্থা শিয়াল দুটোই করে ফেলেছে। সবাই— ঈশ্বরের জীব— এই কথা বলল রামশরণ। ভানুমতী মোটামুটি সান্ত্বনা পেয়ে গেলে ধোঁয়ার দাগ লাগা ইটগুলো ছিটিয়ে দিয়ে উনুনটা ভেঙে দিল রামশরণ, জিনিসপত্র ঝুড়িতে তুলে বাঁক কাঁধে নিল। এবারে ভানুমতী নির্ঝঞ্ঝাট— ফাঁকা—হাত পা। বড়ো ছেলেমেয়ে দুটোর হাতেও কিছু নেই। বাঁধের উপর উঠে এলো রামশরণ। তার পরিবারটিকে নিয়ে গুট গুট করে বাঁধ ধরে এগিয়ে গেল সে, পিঁপড়ের সারির মত। যখন বাঁকটা তারা পার হচ্ছিল, তখন এই বেলা ন'টার দিকে, গুড় গুড় শব্দে, লঞ্চটা ঘাট ছেড়ে চলে গেল।

কিন্তু লঞ্চে যাবে না রামশরণ। লঞ্চ ধরে কোথাও যাবার নেই তার। তবে কোথাও সে নিশ্চয়ই যাবে।

জলিল সাহেবের পিটিশন

হুমায়ুন আহমেদ

তিনি হাসি মুখে বললেন, 'আমি দু'জন শহিদ মুক্তিযোদ্ধার বাবা। সেভেন্টি ওয়ানে আমার দু'টি ছেলে মারা গেছে।' আমি অবাক হয়ে তাকালাম। ভদ্রলোকের চেহারা বিশেষত্বহীন। বয়স প্রায় ষাটের কোঠায়। সে তুলনায় বেশ সমর্থ। বসেছেন মেরুদণ্ড সোজা করে। চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। চশমা-টশমা নেই। তার মানে চোখে ভালই দেখতে পান। আমি বললাম, 'আমার কাছে কি ব্যাপার ?'

ভদ্রলোক যেভাবে বসেছিলেন সেভাবেই বসে রইলেন। সহজ সুরে বললেন, একজনের ডেডবডি পেয়েছিলাম। মালিবাগে ‹ বর দিয়েছি। আমার ছোট মেয়েব বাড়ি আছে মালিবাগে।

তাই নাকি ?

জ্বি। মালিবাগ চৌধুরী পাড়া।

আমার কাছে কেন এসেছেন ?

গল্পগুজব করতে আসলাম। নতুন এসেছেন এ পাড়ায়। খোঁজ-খবর করা দরকার। আপনি আমার প্রতিবেশী।

ভদ্রলোক হাসি মুখে বসে রইলেন। আমার সন্দেহ হলো, তিনি হয়তো সত্যি সত্যি হাসছেন না। তার মুখের ফটোটাই হাসি হাসি। ভদ্রলোক শান্ত স্বরে বললেন. 'আমি আপনার পাশের গলিতেই থাকি।'

তাই নাকি ?

জ্বি। ১৩/২, বাসার সামনে একটা নারিকেল গাছ আছে দেখেছেন তো ?

আমি দেখিনি। তবু মাথা নাড়ালাম। ভদ্রলোকের চরিত্র স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। সম্ভবত অবসর জীবন যাপন করছেন। কিছুই করবার নেই। সময় কাটানোটাই বোধ হয় তার এখন একমাত্র সমস্যা। যার জন্যে ছুটির দিনে প্রতিবেশী খুঁজতে হয়।

আমার নাম আবদুল জলিল।

আমি নিজের নাম বলতে গেলাম ভদ্রলোক বলতে দিলেন না। উঁচু গলায় বললেন, 'চিনি, আপনাকে চিনি।'

চা খাবেন ? চায়ের কথা বলি ?

জ্বি না। আমি চা খাই না। চা সিগারেট কিছুই খাই না। নেশার মধ্যে পান খাই।

পান তো দিতে পারব না, এখানে কেউ পান খায় না।

পান আমার সঙ্গেই থাকে। ভদ্রলোক কাঁধের ঝোলাতে হাত ঢুকিয়ে পানের কৌটা বার করলেন। বেশ বাহারী কৌটা। টিফিন কেরিয়ারের মত তিন চারটা আলাদা বাটি আছে। আমি একটি দীর্ঘ নিশ্বাস গোপন করলাম। ভদ্রলোক লম্বা পরিকল্পনা নিয়ে এসেছেন। সারা সকালটাই হয়তো এখানে কাটাবেন। নিজের ছেলে দু'টির কথা ইনিয়ে বিনিয়ে বলবেন। দুঃখ কষ্টের গল্প অন্যকে শোনাতে সবাই খুব পছন্দ করে। ভদ্রলোক একটু ঝুঁকে এসে বললেন, প্রফেসার সাহেব আপনি একটা পান খাবেন ?

জ্বি না।

পান কিন্তু শরীরের জন্য ভাল। পিত্ত ঠাণ্ডা রাখে! যারা পান খায় তাদের পিত্তের দোষ হয় না।

তাই নাকি ?

জ্বি। পানের রস আর মধু হল গিয়ে বাতের খুব বড় ওষুধ।

আমি ঘড়ি দেখলাম। সাড়ে দশটা। আজ ইউনিভার্সিটি নেই। থাকলে সুবিধা হতো: বলা যেত কিছু মনে করবেন না। এগারোটার সময় একটা ক্লাস আছে আপনি অন্য আরেক দিন সময় হাতে নিয়ে আসুন। ছুটির দিনে এরকম কিছু বলা যায় না।

ভদ্রলোক তার পানের কৌটা খুলে নানান রকম মশলা বের করলেন। প্রতিটি শুঁকে শুঁকে দেখলেন। পান বানালেন অত্যন্ত যত্নে। যিনি পান বানানোর মত তুচ্ছ ব্যাপারে এতটা সময় নষ্ট করেন তিনি যে আজ দুপুরের আগে নড়বেন না তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু আশ্চর্য ভদ্রলোক পান মুখে দিয়েই উঠে দাঁড়ালেন। হাসি মুখে বললেন, 'যাই, আমি অনেকটা সময় নষ্ট করলাম।' বিস্ময় সামলে আমি আন্তরিকভাবেই বললাম, 'বসুন, এত তাড়া কিসের ? তিনি বসলেন না। আমি তাকে বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম। ফেরার পথে দেখি বাড়িওয়ালা বারান্দায় ভ্রূ কুঁচকে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, 'প্রফেসার সাহেবকে ধরেছে বুঝি ? সিগনেচার ?'

কি সিগনেচার ?

জলিল সাহেবের পিটিশনে সিগনেচার করেননি ?

পিটিশনটা কিসেব?

আমাকে বলতে হবে না। নিজেই টেব পাবেন। হাড ভাজা কবে দিবে। কোন প্রশ্রয় দিবেন না।

অস্পষ্ট একটা অস্বস্তি নিয়ে ঘবে ফিবলাম। নতুন পাডায় আসাব অনেক বিবক্তিকব ব্যাপাব আছে। নতুন নতুন মানুষদেব সঙ্গে পবিচয় অনেক সময়ই সুখকব হয় না। তবে জলিল সাহেব প্রসঙ্গে ভযটা বোধহয় অমূলক। একবাব দেখা গ্রিন ফার্মেসীব সামনে। তিনি হাসি মুখে এগিয়ে এলেন, প্রফেসাব সাহেব না? ভাল আছেন?

জি ভাল। আপনি ভাল আছেন? কই আব তো আসলেন না।

সময় পাই না। খুব ব্যস্ত। পিটিশনটাব ব্যাপাবে।

আমি আব কথা বাডালাম না। ক্লাসেব দোহাই দিয়ে বিকশায় উঠে পডলাম। দ্বিতীয়বাব দেখা হলো নিউ মার্কেটেব একটা নিউজ স্ট্যান্ডেব সামনে। দেখি তিনি উবু হয়ে বসে একটিব পব একটি পত্রিকা দ্রুত পডে শেষ কবছেন। হকাব ছেলেটি ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকে দেখছে।

কি জলিল সাহেব, কি পডছেন এত মন দিয়ে?

জলিল সাহেব আমাব দিকে তাকালেন। মনে হয় ঠিক চিনতে পাবলেন না।

তাব চোখে চশমা।

চশমা নিয়েছেন নাকি?

জি! সন্ধ্যা হলে দেখি না; হাসি পাওযাব! ভাল আছেন সাহেব?

জি ভাল।

যাব একদিন আপনাব বাসায়। পিটিশনটা দেখাব আপনাকে। চৌদ্দ হাজাব তিন'শ সিগনেচাব জোগাড হয়েছে।

কিসেব পিটিশন?

দেখলেই বলবেন। আপনাবা জ্ঞানী গুণী মানুষ, আপনাদেব বুঝতে কষ্ট হবে না।

আমাব ধাবণা ছিল সবকাবেব কাছে কোন সাহায্য টাহায্য চেয়ে পিটিশন কবা হয়েছে। সেখানে চৌদ্দ হাজাব সিগনেচাবেব ব্যাপাবটা বুঝা গেল না। আমি নিজে থেকেও কোন আগ্রহ দেখালাম না। জগতে অসুস্থ মানুষেব সংখ্যা কম নয়। সিগনেচাব সংগ্রহ কাবো যদি নেশা হয় তাতে আমাব উদ্বিগ্ন হবাব কাবণ নেই।

কিন্তু উদ্বিগ্ন হতে হলো। জলিল সাহেব এক সন্ধ্যায তাঁব চৌদ্দ হাজাব তিন'শ সিগনেচাবেব ফাইল পত্র নিযে আমাব বাসায উপস্থিত হলেন। হাসি হাসি মুখে বললেন, 'ভাল কবে পডেন প্রফেসাব সাহেব'। আমি পডলাম। পিটিশনেব বিষযবস্তু হচ্ছে— দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে দশ লাখ ইহুদী মাবা গিযেছিল। সেই অপবাধে অপবাধীদেব প্রত্যেকেব বিচাব কবা হযেছে এবং এখনো হচ্ছে। কিন্তু এ দেশেব ত্রিশ লক্ষ মানুষ মেবে অপবাধীবা কি কবে পাব পেযে গেলো? কেন এ নিয়ে আজ কেউ কথা

বলছে না। জলিল সাহেব তার দীর্ঘ পিটিশনে সরকারের কাছে আবেদন করেছেন যেন এদের বিচার করা হয়।

আমি ভদ্রলোকের দিকে তাকালাম, তিনি শান্ত স্বরে বললেন, আমার দুটি ছেলে মারা গেছে, সেই জন্যেই যে আমি এটা করছি, তা ঠিক না। আমার ছেলে মারা গেছে যুদ্ধে। ওদের মৃত্যুর জন্য আমি কোন বিচার চাই না। আমি বিচার চাই তাদের জন্য যাদের ওরা ঘর থেকে ধরে নিয়ে মেরে ফেলেছে। আমার কথা বুঝতে পারছেন ?

পারছি।

জানি পারবেন। আপনি জ্ঞানী-গুণী মানুষ। অনেকেই পারে না। বুঝলেন ভাই অনেকে মানবতার দোহাই দেয়। বলে বাদ দেন। ক্ষমা করে দেন। ক্ষমা এত সস্তা ? অ্যাঁ, বলেন, সস্তা ?

আমি কিছু বললাম না। জলিল সাহেব পানের কৌটা বের করে পান সাজাতে বসলেন। শান্ত স্বরে বললেন, আপনি কি মনে করেছেন আমি ছেড়ে দিব ? ছাড়ব না। আমার দুই ছেলে ফাইট দিয়েছে। আমিও দিব। মৃত্যু পর্যন্ত ফাইট দিব। দরকার হলে বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের সিগনেচার জোগাড় করব। ত্রিশ লক্ষ লোক মরে গেল আর কেউ কোন শব্দ করল না ? আমরা মানুষ না অন্য কিছু বলেন দেখি ?

আমি সিগনেচার ফাইল উল্টে দেখতে লাগলাম। খুব গোছানো কাজকর্ম। সিগনেচারের পাশে বর্তমান ঠিকানা ও স্থায়ী ঠিকানা। স্বাধীনতা যুদ্ধে নিহত আত্মীয় স্বজনের নাম ঠিকানা।

অনেকেই মনে করে আমার মাথার ঠিক নাই। এক পত্রিকা অফিসে গিয়েছিলাম। সম্পাদক সাহেব দেখাই করলেন না। ছোকরা মত একটা ছেলে বলল, 'কেন পুরানো কাঁসুন্দি ঘাটছেন ? বাদ দেন ভাই।' আমি তার দাদার বয়সী লোক, আমাকে বলে ভাই।

আপনি কি বললেন ?

আমি বললাম, 'তুমি চাও না এদের বিচার হোক ? ছেলেটি কিছু বলে না। সরাসরি না বলার সাহস নাই। অথচ এই সব ছেলেরা কত সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। করে নাই ?

জ্বি করেছে।

বাড়িওয়ালার কথাই ধরেন। তাঁর এক শালাকে ঘর থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলেছে। অথচ এই লোক সিগনেচার করেনি। ত্রিশ লক্ষ লোক মরে গেলো বিচার হলো না। মনে হলেই বুকের মধ্যে চিন চিন ব্যথা হয়।

আমি অত্যন্ত অস্বস্তি নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। ভদ্রলোক দ্বিতীয় একটি পান মুখে পুরে বললেন, সরকারি লোকজনদের সঙ্গে দেখা করেছি। তারা আমি কি বলতে চাই সেটাই ভাল করে শুনতে চায় না। একজন আমাকে বলল, 'আপনি

একটা পরিত্যক্ত বাড়ির জন্য দরখাস্ত করেন। আপনার দু'টি ছেলে মারা গেছে বাড়ি পাওয়ার হক আছে আপনার।'

আপনি কি বললেন ?'

আমি আবার বলব কি ? বাড়ির জন্যে আমি পিটিশন করছি নাকি ? বাড়ি দিয়ে আমি করবটা কি ? আমার দুই ছেলের জীবন কি এত সস্তা ? একটা বাড়ি দিয়ে দাম দিতে চায় ? কতবড় স্পর্ধা চিন্তা করেন। আমি চাই একটা বিচার হবে। একটা বিচার চাই। আর কিছুই না। সভ্য সমাজের নিয়ম মত বিচার হবে। বুঝলেন ?

জ্বি বুঝলাম।

আপনার জ্ঞানী-গুণী মানুষ, আপনাদের বুঝতে কষ্ট হয় না। অন্যরা কেউ বুঝতে চায় না। একেকটা সিগনেচারের জন্যে তিনবার করে যেতে হয়। তাতে অসুবিধা নাই। আমি ছাড়বার লোক না ?

আমার সিগনেচার নিয়ে ভদ্রলোক চলে গেলেন। তারপর অনেকদিন তার সঙ্গে দেখা হলো না। একটা কৌতূহল জেগে রইল। রাস্তাঘাটে দেখা হলে জিজ্ঞেস করেছি কি ভাই কতদূর করলেন ?

চালিয়ে যাচ্ছি প্রফেসর সাহেব। দোয়া রাখবেন।

লোকজন দস্তখত দিচ্ছে তো ?

সবাই দেয় না। ভয় পায়।

কিসের ভয় ?

ভয়ের কি কোন মা বাপ আছে ? ভয় পাওয়া যাদের স্বভাব তারা ভয় পাবেই। বুঝলেন না ? আমি আছি লে:গ। আদালতে হাজির করে ছাড়ব। কি বলেন প্রফেসার সাহেব ?

তা তো ঠিকই।

ডিস্ট্রিক্টে ভাগ করে ফেলেছি। এখন সব ডিস্ট্রিক্টে যাব। কষ্ট হবে উপায় তো নাই। আপনি কি বলেন ?

ভালই তো।

তাছাড়া শুধু দস্তখত জোগাড় করলেও হবে না। কেইস চালানোর মত এভিডেন্স থাকতে হবে। বিনা কারণে নিরপরাধ লোকজন ধরে ধরে মেরেছে এটা প্রমাণ করতে হবে না। ওরা ঘাগু ঘাগু সব 'লইয়ার' দিবে। দিবে না ? তা তো দিবেই।

আপনার জানামত ভাল লইয়ার আছে ?

আমি খোঁজ করব। তা তো করবেনই। আপনি তো অন্ধ না। অন্যায়টা বুঝতে পারছেন। বেশির ভাগ লোকই পারে না। মূর্খের দেশ।

অনেকদিন আর জলিল সাহেবের দেখা পাই নাই। হয়তো সত্যি সত্যি জেলায় জেলায় ঘুরে বেড়াতে শুরু করেছেন। বগলে ভারী ভারী ফাইল। দস্তখতের সংখ্যা হয়তো বাড়ছে। বার হাজার থেকে পনেরো হাজার। পনেরো থেকে বিশ। এমনকি

সত্যি সত্যি হতে পারে যে, চল্লিশ পঞ্চাশ লাখ দস্তখত জোগাড় করে ফেলবেন তিনি। পঞ্চাশ লাখ লোকের দাবি অত্যন্ত জোরালো দাবি।

বর্ষার শুরুতে খবর পেলাম জলিল সাহেব অসুখে পড়েছেন। হাঁপানি সেই সঙ্গে রিউমেটিক ফিভার। বাড়িওয়ালা বললেন, পাগল মানুষ। শরীরের যত্ন তো কোনদিন করে নাই। এ যাত্রা টিকবে না।

বলেন কি ?

হাঁ। গ্রিন ফার্মেসীর ডাক্তার সাহেব বললেন। আমি নিজেও গিয়েছিলাম দেখতে।

অবস্থা কি বেশি খারাপ ?

বর্ষাটা টিকে কিনা....

বলেন কি ?

খুবই খারাপ অবস্থা।

বর্ষাটা অব্যি টিকে গেলেন। ফাইলপত্র বগলে নিয়ে ঘুরতে বেরুলেন। আমাব সঙ্গে দেখা হলো এক দুপুরে। আমি চিনতেই পারি না এমন অবস্থা। তিনি এগিয়ে এলেন, 'প্রফেসর সাহেব না ?'

আরে কি ব্যাপার ভাই ? এ কি অবস্থা আপনার।

বাঁচব না বেশি দিন।

না বাঁচলে চলবে ? এত বড় একটা প্রজেক্ট হাতে নিয়েছেন।

ঐটার জন্যেই টিকে আছি।

সিগনেচার কতদূর জোগাড় হয়েছে ?

পনেরো হাজার। মাসে তিন চারশর বেশি পারি না। বয়স হয়েছে তো। তবে ছাড়বার লোক না আমি।

না ছাড়বেন কেন ?

কাঠগড়ায় দাঁড় করাবো শালাদের। ইহুদীরা পেরেছে আমরা পারব না কেন ? কি বলেন ?

তা তো ঠিকই।

ত্রিশ লাখ লোক মেরেছে বুঝলেন, একটা দুটা না। বাংলাদেশের মানুষ সস্তা না ? মজা টের পাইয়ে দেব।

আজিমপুরের ঐ পাড়ায় আমি দু'বছর কাটালাম। এই দু'বছরে জলিল সাহেবেব সঙ্গে মোটামুটি ঘনিষ্ঠতা হলো। মাঝে মাঝে যেতাম তার বাসায়। ভদ্রলোকের নিজের বাড়ি। দোতলাটা ভাড়া দিয়েছেন। ভাড়ার টাকায় সংসার চলে। স্ত্রী নেই। বড় ছেলের বউ তাঁর সঙ্গে থাকে। ফুটফুটে দু'টি মেয়ে আছে সেই বউটির। যমজ মেয়ে বোধ করি। খুব হাসি-খুশি। ভালই লাগে ও বাড়িতে গেলে। বউটি খুবই যত্ন করে।

পিটিশন সম্পর্কে বাচ্চা দু'টির ধারণাও দেখলাম খুব স্পষ্ট। একটি মেয়ে গম্ভীর হয়ে আমাকে বলল, 'দাদুর খাতা লেখা শেষ হলে যারা আমার বাবাকে মেরেছে

তাদের বিচার হবে।' এইটুকু মেয়ে এত সব বোঝার কথা নয়। জলিল সাহেব নিশ্চয়ই ব্যাপারটা ওদের বুঝিয়ে বলেছেন।

ঐ পাড়া ছেড়ে চলে আসার পরও মাঝে মাঝে যেতাম। তারপর ধীরে ধীরে যোগাযোগ কমে গেলো। এক সময় দীর্ঘ দিনের জন্যে দেশের বাইরে চলে গেলাম।

যাবার আগে দেখা করতে গিয়েছি। শুনলাম তিনি ফরিদপুর গিয়েছেন সিগনেচার যোগাড করতে। কবে ফেরৎ আসবেন কেউ বলতে পারে না। তাঁর ছেলের বউ অনেক দুঃখ কবল। দুঃখ কবার সঙ্গত কারণ আছে। একমাত্র পুরুষ যদি ঘর-সংসার ছেড়ে দেয়, তাহলে জীবন দুঃসহ হযে ওঠে।

বাইরে থাকলে দেশের জন্যে অন্য রকম একটা মমতা হয়। সেই কারণেই বোধহয় জলিল সাহেবেব কথা মনে পড়তে লাগলো। মনে হতো, ঠিকই তো তিরিশ লক্ষ লোক হত্যা করে পার পেয়ে যাওয়া উচিত নয়। জলিল সাহেব যা করছেন এটা মধ্য যুগ না। এ যুগে এত বড় অন্যায় সহ্য হয় না।

উইক এণ্ড-গুলিতে বাঙালিরা এসে জড়ো হতো আমার বাসায়। কিন্তু আন্ডার গ্র্যাজুয়েট ছেলে, মুরহেড টেস্ট ইউনিভারসিটির অংকের প্রফেসার আফসার উদ্দিন সাহেব। সবাই একমত জলিল সাহেবের প্রজেক্টে সব রকম সাহায্য করতে হবে। বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে প্রয়োজন হলে আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা দায়েব করতে হবে। বিদেশি পত্রিকার জনমতেব জন্যে লেখালেখি করা হবে। আমেরিকার কার্গো শহরে আমরা এক সন্ধ্যাবেলার 'আবদুল জলিল সংগ্রাম কমিটি' গঠন করে ফেললাম। আমি তার আহ্বায়ক, আফসার উদ্দিন সাহেব সভাপতি। বিদেশে বসে দেশের কথা ভাবতে বড ভাল লাগে।

সব সময় ইচ্ছে করে একটা কিছু করি।

দেশে ফিরলাম ছ'বছর পর।

ঢাকা শহর অনেকখানি বদলে গেলেও জলিল সাহেবেব বাড়ির চেহারা বদলায়নি। সেই ভাঙা পলেস্তারা ওঠা বাডি। সেই নারিকেল গাছ। কড়া নাড়তেই চৌদ্দ পনেরো বছরের ভারি মিষ্টি একটি মেয়ে দরজা খুলে দিল। অবাক হয়ে তাকাল আমার দিকে।

তুমি কি জলিল সাহেবের নাতনি ?

জ্বি।

তিনি বাড়ি আছেন।

না। দাদু তো মারা গেছেন দু'বছর আগে।

ও, আমি তোমার দাদুর একজন বন্ধু।

আসুন, ভিতরে এসে বসুন।

আমি বসলাম কিছুক্ষণ। মেয়েটির মা'র সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে ছিল। ভদ্রমহিলা

বাসায় ছিলেন না। কখন ফিরবেন, তারো ঠিক নেই। উঠে আসবার সময় জিজ্ঞেস করলাম, তোমার দাদু যে মানুষের সিগনেচার যোগাড় করতেন, সেই সব আছে?

জ্বি আছে। কেন?

তোমার দাদু যে কাজটা শুরু করেছিলেন সেটা শেষ করা উচিত। তাই না?

মেয়েটি খুব অবাক হলো। আমি হাসি মুখে বললাম,

আমি আবার আসবো কেমন?

জ্বি আচ্ছা।

মেয়েটি গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসে নরম গলায় বলে, 'দাদু বলেছিলেন, একদিন কেউ, না কেউ এই ফাইল নিতে আসবে।'

আর যাওয়া হল না।

উৎসাহ মরে গেলো। দেশের এখন নানান রকম সমস্যা। যেখানে সেখানে বোমা ফাটে। মুখ বন্ধ করে থাকতে হয়। এর মধ্যে পুরানো একটি সমস্যা টেনে আনতে ইচ্ছা করে না।

আমি জলিল সাহেব নই। আমাকে ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হয়। মীরপুরে একটা পরিত্যক্ত বাড়ি কেনার জন্যে নানান ধরনের লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে হয়। জলিল সাহেবের বত্রিশ হাজার দরখাস্তের ফাইল নিয়ে রাস্তায় বেরুনোর আমার সময় কোথায়।

জলিল সাহেবের নাতনিটি হয়তো অপেক্ষা করে আমার জন্যে। দাদুর পিটিশনের ফাইলটি ধুলো ঝেড়ে ঠিক ঠাক করে রাখে। এই বয়েসী মেয়েরা মানুষের কথা খুব বিশ্বাস করে।

যোদ্ধা

ওয়াসি আহমেদ

পায়ের ভারে নৌকার গলুই দুলে ওঠে। এতটা সময় অধৈর্য কেটেছে যাত্রীদের, কেউ উসখুস করলে মাঝি একটা কথাই বলেছে, আর অ্যাগজন পাইলি অয় বাপ— অ্যামন সোঁত ঠেলি যাতি জান শ্যাষ, আর খেপ দিতি পারব না নে!

সেই একজন কখন যে গলুইয়ে পা রেখেছে, এদের কেউ তেমন খেয়াল করেনি! নতুন লোকটি বেপরোয়া, গলুই থেকে নৌকার পাটাতনে পা ফেলল, তাও লাফিয়ে। তার পায়ে কালো চামড়ার জুতা, বগলে চিতল মাছের পেটির মতো আঁটসাট ব্যাগ, জামার হাতটা খোলা থাকায় লাফ দেয়ার তালে সেটি হাতির কানের মতো ডানে বামে চাটি মারল।

লোকজনের বিরক্তির তেজটুকু এবার আগন্তুকের ওপর গিয়ে পড়ে। এবং ক্রমে তা লোকটির কাদা-লেপা জুতা, শহুরে জামা কাপড় উজিয়ে জোড়া ভুরুর নিচে অচেনা, কিছুটা অসহনীয় দৃষ্টির কাছাকাছি হতে হতে থিতিয়ে আসে।

মাঝি এবার নৌকার মাথাটা ঘোরায়। বিঘত পানিতে নেমে কোমর পিঠ-সামনে বাঁকিয়ে গলুইতে হাত রেখে হেঁইয়া বলতেই কাজ হয়। সর সর শব্দে কাদার গা থেকে আলগা হয়ে নৌকাটা পুরোপুরি পানিতে নেমে দ্রুত পাক খায়।

গঙ্গাচরণের হাতে একটা পলিথিনের ব্যাগ। ব্যাগটার তলায় কাশির ওষুধের শিশিতে দুই ছটাক সর্ষের তেল। সুতা কিনতে কুমারহাটে গিয়ে সারাটা দিন পণ্ড। এ বর্ষায়ও জাল সারান হল না। জায়গায় জায়গায় আজেবাজে সুতোর গিঁট দিয়ে দিয়ে এখন গাবের কষ ঘষাই সার। তার খুড়ো বিধু কৈবর্তর কথায় কান দিলে এখন কপাল চাপড়াতে হত না। সুতো কিনতে সরকারের ঋণের টাকা এলো সদরের ব্যাংকে।

এর ওর মুখে খবর শুনে জোর পেয়েছিল গঙ্গাচরণ, কিন্তু কিছুদিন যেতেই আগাগোড়া বৃত্তান্ত শুনে হাল ছেড়ে বসে থাকল। ঋণ দেবে সরকার, ভিটেমাটি বন্ধক রেখে কথা— সে জন্য দালাল ধরতে হবে কেন? সরকার কি সুদের টাকা দু'টো কম গুনবে, না তার মুখ চেয়ে মাপ করে দেবে; ওদিকে আবার কিস্তির টাকা দিতে দেরি হলে আণ্ডা বাচ্চা মিলে লাভটা তো সরকারের। এর মধ্যে দালাল কী করতে? খুড়ো তাকে বোঝাতে চেয়েছে, যে কাজে যার দরকার— তোরে যে ঋণের টাকা হাতে তুলে দিতিছে সেডা দেখতি হবে না? সদরের ব্যাংক, আমাগো ক্যাডা চিনে?

গঙ্গাচরণ গা করেনি। শেষে অবশ্য অন্যের দেখাদেখি পথে আসল, দালালও ধরল। কিন্তু এর মধ্যে যা হবার হয়ে গেছে। ঋণের টাকা ভাগ-বাটোয়ারা শেষ, মাঝপথে ঝুপখালির কদর মোল্লার পকেটে দালালীর ষাট টাকা।

আজ সকালে অনেক ভেবে চিন্তে জমা টাকায় হাত দিয়েছিল গঙ্গাচরণ। কুমারহাটের করমালীর সাথে কিছু জানাশোনা ছিল, আগেও মাঝে মাঝে টুকটাক সুতো কিনেছে ওর কাছ থেকে। ভেবেছিল, নগদা নগদি না পোষালে কিছু বাকি রাখতে আপত্তি করবে না করমালী। বানিয়ার বেটা বজ্জাতি করল। সাফ জানিয়ে দিল, বাকির কারবার শ্যাষ গো নাইয়া, সূতা নিতি চাও, নগদ টাহা ফেলি নিতি পার।

নগদই ফেলত গঙ্গাচরণ— বাকি যা থাকত, এত করে ধরল অঘ্রাণ মাসেই দিয়ে দেবে, রাজি হল না। মন খারাপ করে উঠে পড়েছিল গঙ্গাচরণ। করমালী এই সময় কেন যে আচমকা ঘা-টা মারল— তুমার ছাবাল না জেলে আছে? কুন জেলে গো ভাইডি?

ছেলের কথায় দুঃখের চেয়ে রাগে আপমানে ধা করে একটা অন্ধ রোখ চেপে গিয়েছিল মাথায়। চার বছর আগে এই কুমারহাটের কানাই ডাক্তারের ফার্মেসী থেকে মণিরামকে পিঠ-মোড়া করে বেঁধে নিয়ে গিয়েছিল পুলিশ। গঙ্গাচরণ নিমেষে ঘুরে করমালীর টুটি লক্ষ্য করে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু এই অবস্থায় একটি কী দু'টি মুহূর্ত নিজেকে সে সামলে নিয়েছিল। সে আর করমালী এক! নাতানো সাপের মতো মাথা নিচু করে বেরিয়ে এসেছিল। আর দাঁড়ায়নি কোথাও। তারপর ঘাটে এসে সেই কখন থেকে ভাবছে বাড়ি ফিরবে।

গঙ্গাচরণ খালি হাতেই ফিরছে। সারাদিন মাটি করে দুই ছটাক তেল। মন খারাপ করে সে নৌকার এক কোণে জবুথবু হয়ে বসেছিল। ভাগ্য ভালো যে খেয়াটা পাওয়া গেল। বৃষ্টি-বাদলার দিন, তার ওপর এ বেলার জোয়ারের খুব জোর। মাথা তুলে গঙ্গাচরণ সহযাত্রীদের দেখে। প্রায় সবাই হাটুরে, সওদাপাতি নিয়ে ফিরছে। কেবল জুতা, প্যান্ট পরা লোকটা অন্য রকম। হঠাৎ লোকটার সাথে চোখাচোখি হয়ে যেতে সে কী রকম চমকে ওঠে। লোকটার বয়স নেহাত কম না, চল্লিশ-বিয়াল্লিশ

হবে। মাথায় এলোমেলো কোঁকড়ানো চুল, তেল দেয়নি, পাড়ের দিকে মুখ করে এক মনে সিগারেট খাচ্ছে। এক ঝলক দেখে নিয়ে চেহারাটা বড্ড চেনা চেনা লাগে। হুবহু এ রকম আরেকটা মুখ মনে করতে গিয়ে দে সন্তর্পণে কোমরে হাত দেয়, সুতা কেনার টাকাটা আঙুলে ছুঁয়ে স্বস্তি পায়।

গঙ্গাচরণ লোকটাকে আবার দেখে। নৌকায় ওঠার সময়ের বাহাদুর ভাবটা একদম নেই। বাম হাঁটুটা ভাঁজ করে বুকের কাছে তুলে এনে থুতনি গুঁজে বসে আছে। আলো নেই আকাশে। ঘোর ঘোর আবছা একটা ছায়া মত যা-ও ছিল মুছে যাচ্ছে। নদীর বুকে ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। লোকটার সিঁথির দু-পাশে খাটো খাটো চুল চিংড়ির দাড়ার মতো খাড়া হয়ে আছে। সেদিকে তাকিয়ে সে আশা ছেড়ে দেয়, নাহ্ চেনা মানুষটাকে চিনতে পারল না। ট্যাঁক থেকে বিড়ি বের করে সে মাথা নিচু করে বাতাস বাঁচিয়ে দেশলাই জ্বালে। খিদে-পেটে বিড়ির ধোঁয়ার সাথে সকালবেলার পান্তার টক ঢেঁকুর উঠে আসে মুখে।

পাড়ে এসে নৌকা ভিড়তে ব্যাগটা হাতে নিয়ে নামবে, এমন সময় লোকটার সাথে আবার চোখাচোখি হয়ে যেতে গঙ্গাচরণ বুঝতে পারে না কী হয়ে গেল, তার হাতে-পায়ে-শরীরে অসম্ভব কাঁপুনি হতে থাকে। সে বলে ওঠে, মাশটের আপনে ?

লোকটা বারবার পিছিয়ে পড়ছে। বৃষ্টিতে থকথকে হয়ে আছে কাদামাটি। মাঝরাস্তা বাদ দিয়ে গঙ্গাচরণ বলে, ইদিকে। লোকটা, আফজাল মাস্টার, কাদা ছেড়ে ঘাসের ওপর দিয়ে হাঁটে। ভেজা ঘাসে জুতার সপ্‌সপ্ আওয়াজ। দুপুর থেকেই আকাশ ঘোলা ঘোলা। একটু আগে অন্ধকার গাঢ় হয়ে নামতে ঝিরি ঝিরি না হলেও ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরতে শুরু করেছে। গঙ্গাচরণ নিজেকে গালমন্দ করে— শিক বেরুনো, ছেঁড়া-ফাড়া হলেও ছাতা একটা ঘরে আছে !

আফজাল মাস্টারের তেমন বিকার নেই। জামার হাতটা এখন গোটানো, মাঝে মাঝে হাত উঠিয়ে কপাল থেকে বৃষ্টির ছাট মুছে নিচ্ছে। হঠাৎ করেই লোকটার বয়স বেড়ে গেছে। গোঁফ-দাড়ি কামানো চেহারাটা কী রকম গো-বেচারা। বাবরি ছেঁটে ফেলায় আরো। খেয়া নৌকায় উঠে অমন অসুখী মুখ করে বসে থাকায় গঙ্গাচরণ ধরতে পারেনি। তবু খটকা লাগছিল। এতো চেনা মুখ, অথচ বসার ধরনটা সম্পূর্ণ অন্য মানুষের।

এদিকে খবর কি ?—বেশ খানিকটা পথ হাঁটার পর লোকটা বলে।

কথা শুনে কোত্থেকে একটা অভিমান ঘুচিয়ে ওঠে ভেতরে। খবরের কী অভাব। কত খবর দেবে গঙ্গাচরণ। মণিকে ধরে নিয়ে গেল সে কত বছর। দিনের পর দিন কত কষ্ট, হয়রানি। রাত-বিরেতে ভিটে ঘের দিয়ে থাকত পুলিশ, সাঙ্গোপাঙ্গো

কাউকে যদি পাওয়া যায়। কোনো রাতে দরজায় দুমদুম লাথির চোটে ঘুম ভেঙে হাঁ হয়ে যেত সে আর সরস্বতী। একেকটা নাম বলত একেক বার। এইটুকু ঘর তাও উল্টেপাল্টে খুঁজত। কোনো কোনো বার বন্দুকের গুড়ি দিয়ে হাঁড়িটা, সানকিটা ভেঙে চুরমার করত। শুনতে শুনতে লোকটা থেমে পড়ে। পকেট থেকে সিগারেট বের করে ঠোঁটে গুঁজে পর পর কয়েকটা কাঠি খরচ করে। আলো জ্বলে ওঠার ফাঁকে ফাঁকে লোকটার মুখ দেখে গঙ্গাচরণ। নাহ্, আগের মতোই আছে মাস্টার। আগেও খুব সিগারেট খেত, অবশ্য যখন যা মিলত— বিড়ি হলে বিড়ি। বদলায়নি মোটে। খালি গোঁফ-দাড়ি আর বাবরি। সে বলে, দাড়ি কাডি ফেলাইলেন? আমি কই কি, মানুষটা ক্যাডা— অ্যামন চেনা মুখ। আমারে চিনতি পারেন নাই, মোডে চিনতি পারেন নাই।

লোকটা হাসে। ঠোঁটের সিগারেটের আগুনে হাসিটা খেলে বেড়ায় চোখে-মুখে। হাসিটা বড় গোপন আর রহস্যময় মনে হতে সে গলা নামিয়ে বলে, খবর কী মাশ্‌টের? ইদিকে কোয়ানে?

চার বছর পর লোকটার পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলতে তার গায়ে কাঁটা দেয়। পরক্ষণে নিজের নির্বুদ্ধিতায় নিজেই লজ্জা পেয়ে বসে। মাস্টার সব খবর তাকে বলবে?

বৃষ্টির জোব বাড়ছে। রাস্তাটা সামনে গিয়ে দক্ষিণে বাঁক নিয়েছে, ডোম পাড়ার পাশ ঘেঁষে পুব দিকে সোজা বের হয়ে গেছে। সামনেই বাঁশের পুল। ইঞ্চি চারেক বেড়ের তিন-চারটা বাঁশ লম্বালম্বি ফেলা; পার হওয়ার সময় হাতে ধরে তাল রাখতে কোণার সমান আরেকটা বাঁশ খুঁটির সাথে বাঁধা। মাস্টার তাকে বললেই পারত— কোথায় যাচ্ছে!

আফজাল মাস্টার পুলে পা বাড়াতেই গঙ্গাচরণ বলে, ব্যাগটা এট্টু ধরি।

লোকটা হাসে, কী যে বলেন!

গঙ্গাচরণ এপারে দাঁড়িয়ে মাস্টারকে আগে পেরোতে দেয়— একসাথে দু'জন উঠলে কাঁপাকাপি বেশি হবে, তার ওপর পিছল বাঁশ। ওপারে গিয়ে লোকটা পিছন ফিরে ডাকে, কী হল, আসেন।

কথার পিঠে গঙ্গাচরণ তার জায়গায় দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করে, আমাগো মণির কী খবর! নিজের গলার স্বরে নিজেই সে চমকায়। গত ক'বছর প্রশ্নটা কত যে শঙ্কায়, যন্ত্রণায় বুকের ভেতরে পাক খেয়ে উঠেছে, বলতে পারেনি কাউকে। এ মুহূর্তে সব বাঁধন আলগা হয়ে যাচ্ছে। নদী পার হয়ে লোকটার সাথে হাঁটা দেয়ার পর থেকে বুকের ভেতর একটানা ঝুম্ ঝুম্ ঘণ্টি শুনতে পাচ্ছে সে, মণি মণি মণিরাম।

কী হল!— লোকটা আবার ডাকে। এক হাতে মুঠো করে ধরা বাঁশ, আর হাতে ন্যাতানো পলিথিন— গঙ্গাচরণ অন্ধকারে বৃষ্টিতে ভূতের মতো সাঁকোর মাথায়

দুলতে থাকে। ভেতরটা অভিমানে উগরে আসতে চায়। হঠাৎ কী যে পাগলামি চেপে বসে, সে এক দৌড়ে সাঁকোটা পার হয়ে ওপারে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আফজাল মাস্টারের পায়ের ওপর। ভেতরটা তোলপাড় করে সে গলায় ফাঁস আটকা চারপেয়ে জানোয়ারের মতো একটা ঘরঘর আওয়াজ ছাড়া কিছুই বের করতে পারে না। মাস্টার উবু হয়ে তাকে ধরতে যায়, সামলাতে পারে না। ট্যাটা বিঁধা মাছের মতো কাদা পানিতে গড়াগড়ি খায়। তার গলায় অমানুষিক ঘরঘর আওয়াজটা ক্রমশ ক্ষীণ দূরাগত ধ্বনির রূপ পায়। সে বলতে থাকে, আপনে যাতি পারেন না মাশ্‌টের, আপনে যাতি পারেন না।

ঘরের মাঝখানে কুপিটা একটু একটু কাঁপছে। বৃষ্টি আরো গতি বাড়িয়ে দিয়েছে, সঙ্গে হু হু বাতাস। দরজার বেড়ায় হাওয়া লেগে ধুপ ধুপ আওয়াজ উঠছে। চাঁদনি রাতে নৌকার পেটে সদ্য তোলা মাছের ঝাপটার মতো এ রকম শব্দে কতদিন গঙ্গাচরণের ঘুম কেটে গেছে। আধঘুমে সে সরস্বতীকে ডেকেছে, বৌ মাছ।

ঘরের একমাত্র চৌকিতে আফজাল মাস্টার পা তুলে বসেছে। এনামেলের চোঙের মাথায় হলুদ আগুন লম্বা ছায়া ফেলে বেড়ায়। আফজাল মাস্টার বলে, জেলে খুব কড়াকড়ি, দেখা-সাক্ষাৎ করাও কঠিন। ঢাকায় গেলে দেখি কী করতে পারি। কোন জেলে আছে জানা দরকার।

কথা শেষ করতেই সে একটা প্রবল গা কাঁপানো হাঁচির তোড়ে একপাশে হেলে পড়ে। সোজা হতে না হতে একটার পর একটা, পর পর কয়েকটা ধাক্কা এসে যায়। রুমাল দিয়ে নাক মুছতে মুছতে সে সামনে তাকায়।

গঙ্গাচরণ মেঝেতে চাটাই পেতে হাঁটু মুড়ে কুঁজো জন্তুর মতো বসে আছে। তার ভেতরটা স্থির, চোখের পাতা কাঁপে না। সে তেমনি অনড়ভাবেই বলে, তা'লি মাশ্‌টের কিছু ক'র্তি পারেন না!

দু-দু'বার উত্তরটা শোনার পর অকারণেই সে প্রশ্নটা আবার করে। ঘরের মধ্যে সরস্বতীর বেখাপ্পা একটি ভারী নিশ্বাস ছাড়া কোনো শব্দ ওঠে না। বাইরে বৃষ্টি-হাওয়ার শোঁ শোঁ মিলিত আওয়াজ। গঙ্গাচরণ উঠে দাঁড়ায়, ম্যালা রাত, ঘুমায়ে পড়েন।

মাঝরাতের দিকে আফজাল মাস্টার একটা দুঃস্বপ্ন দেখে। ঘুমের ভেতর দমবন্ধ আতঙ্কে সে লক্ষ্য করে, তার বুকের ওপর দু'দিকে পা ছড়ানো মূর্তিমান অসুরের মতো কে যেন বসে। গলার কাছে মাছ-কাটা বঁটি চেপে দূরাগত বাজনার তালে ডাকছে, মাশ্‌টের— ও মাশ্‌টের। বিস্ময়ে, আতঙ্কে সে নড়া-চড়ার ব্যর্থ চেষ্টা করে। কিন্তু ঘুমটা কেটে যেতে অবিশ্বাস্য গঙ্গাচরণ স্বপ্নটাকে দীর্ঘায়িত করে তোলে। গঙ্গাচরণ গোঙানির সুরে টেনে টেনে বলে, কইছিলা না দ্যাশে অ্যাটটা যুদ্ধ হবে, মস্তো যুদ্ধ!

আফজাল মাস্টারের দম আটকে আসে। প্রাণান্তকর শ্বাসটানার তালে তালে তার চেপ্টেবসা ছাতি গঙ্গাচরণের মাংসহীন পাছার তলায় গুঁড়িয়ে যেতে থাকে। গঙ্গাচরণ ভাঁজ করা হাঁটু দিয়ে মাস্টারের ছাতি দু'দিক থেকে চেপে ধরতে ধরতে অবিকল মমতা মিশিয়ে বলে, ভয় করতিছে মাশ্‌টের'?

জোয়ার জলের কাব্য

ইমদাদুল হক মিলন

অন্ধকারে কুয়াশার মতো নিবিড় হয়ে নেমেছে বৃষ্টি।

জোয়ার জলে কিংবা গাছের পাতায় বৃষ্টির কোনও শব্দ হয় না। হলে আমিনুলদের বাড়িব নামায় মিয়াদের ছাড়াবাড়ির সীমানায় পড়েছে যে হিজলগাছ সেই হিজলতলায় ঘাপটি মেরে বসা শফিজদ্দি এবং হাফিজদ্দি শব্দটা পেত। বৃষ্টির শব্দ তারা পায় না। তারা পায় দূবেব আউশ আমন খেতে ডাকা কোলাব্যাঙের ডাক, পাটখেত ভেঙে জোয়ার জলে ছপছপ শব্দ তুলে গেরস্ত বাড়ির দিকে খাদ্যের খোঁজে আসা শেয়ালের ডাক। আর ঝিঁঝির ডাক তো আছেই, রাতপোকা, কীটপতঙ্গের ডাক তো আছেই। এসব ডাক, এসব শব্দ রাতের বেলা চিবকাল ধরেই হয়। ফলে দেশগ্রামের মানুষ এই সব শব্দকে শব্দ মনে করে না।

শফিজদ্দি হাফিজদ্দিও মনে করছিল না।

মাথার ওপরকার হিজলগাছ থেকে আসছিল হিজলফুলের মৃদু মোলায়েম একখানা গন্ধ। হিজলের ফুল হয় দু'রকমের। কোনও কোনও গাছেব ফুল লালরঙের কোনও কোনওটার গোলাপি।

এই গাছটির ফুলের রঙ লাল।

লাল হিজলফুলের গন্দ কি সামান্য তীব্র হয়?

এই গাছের ফুলের গন্দ যেন একটু তীব্র লাগছে!

জোয়ারে বাতাস থেকে থেকে বইছে। সাঁ সাঁ করে এই এল, এই উধাও হল। বাতাস বয়ে যাওয়ার সময় কেমন একটা আলোড়ন ওঠে চারদিকে। হিজলের ফুল বৃষ্টির মতো ঝরে পড়ে। জোয়ার জলে টুপটাপ ঝরে দু'একখানা কচি হিজল ফল। হারিকেনের আলো লাফিয়ে ওঠে। বাতাস উধাও হলে আবার নির্জন হয় চারদিক।

জোয়ার জলে আসে শান্ত সমাহিত ভাব। হারিকেনের আলো ফিরে পায় আপন স্বভাব। সেই আলোয় শফিজদ্দি হাফিজদ্দি দেখে আমিনুলদের বাড়ির দক্ষিণ দিককার পুকুরের জল উপচাতে শুরু করেছে। উপচে আস্তে ধীরে নেমে আসছে পুবমুখী।

বাড়ির পুবদিকে, বাড়ি থেকে নামা পথখানা চলে গেছে জাহিদ খাঁর বাড়ির সামনের সড়কের দিকে। এই পথের উত্তরে, আমিনুলদের বাড়ির লাগোয়া পুকুরখানা হাজামদের। আর দক্ষিণে মিয়াদের ছাড়াবাড়ি। পথ এবং ছাড়াবাড়ির মাঝ বরাবর দুই শরিকের সীমানা করেছে দেড় দুহাত চওড়া একখানা নালা। আমিনুলদের পুকুর থেকে নেমে পুবে চলে গেছে নালাটি। খরালিকালে চোখে পড়ে না এই নালা, আছে কি নেই বোঝা যায় না। বর্ষার মুখে মুখে মূল্যবান হয়ে ওঠে। পুকুরের জল উপচে এই নালা দিয়ে নামে। সঙ্গে নামে মাছ। সবই গুঁড়োগাড়া মাছ। তবু মাছ তো! মূল্যবান বস্তু। এই মাছের লোভে নালার মুখে সরু বাঁশের খোটাখুঁটি পুঁতে ভেশালের মতো করে জাল পাতে মেন্দাবাড়ির ছেলেরা। তাদের সঙ্গে থাকে আমিনুল। তিনচারটা দিন, দিনভর রাতভর মাছ ধরে তারা।

দিন তিন চারেকের মধ্যে যখন পুকুর ডোবা ভরে জল নামার জায়গা থাকে না তখন এই নালাটি আবার খরালিকালের মতো মূল্যহীন, আছে কি নেই বোঝা যায় না।

আজ বিকেলে এই নালার মুখে, হিজলতলায় এসে জাল পেতে বসেছে শফিজদ্দি হাফিজদ্দি। এখনও জোয়ারটা পুরো আসেনি, পুকুরের জল পুরোপুরি উপচাতে শুরু করেনি। একটু একটু করে নামছে জল। বিকেল বেলা জল নামার আয়োজন দেখতে পেয়েছিল হাফিজদ্দি। সে গিয়েছিল মেন্দাবাড়ি। ফেরার সময় জলের ভাব দেখে বাড়ি এসে শফিজদ্দিকে বলেছিল, ও শইপ্পাদা, কাম করবিনি একখানা?

শফিজদ্দি একটু নির্বিকার, নরম ধরনের ছেলে। উদাস গলায় বলল, কী কাম?

মিয়ার ছাড়ার লগে জাল পাতবিনি?

কেমতে? ওহেনে জোয়ার আইছে?

হ। ইট্টু ইট্টু আইছে।

আমিনুল দেহে নাই?

কইতে পারি না। মনে হয় দেহে নাই। দেখলে তো মেন্দাবাড়ির পোলাপানগ খবর দিত। বেবাকতে মিল্লা জাল পাইত্তা বইত।

না দেখলেও কাইল বিয়ানে দেইক্কালাইব।

কাইল বিয়ানে দেখলে আমগ কী?

কথাটা বুঝতে পারল না শফিজদ্দি। বোকাসোকা মুখ করে হাফিজদ্দির দিকে তাকাল। আমরা যুদি মাছ ধরতে যাই, যুদি জাল পাইত্তা বহি, আমিনুল উদিস পাইলে কাইজ্জা লাগাই দিব না!

শফিজদ্দি যেমন নরম আর সরল ধরনের হাফিজদ্দি ঠিক তার উল্টো। খুবই

চতুর ধরনের ছেলে সে। বারো তেরো বছর বয়সেই বেশ তাগড়া জোয়ান হয়ে উঠেছে। আলকাতরার মতো তেলতেলে কালো গায়ের রঙ। মাথায় কদমের রোয়ার মতো চুল। চালচলনে বেশ একখানা ডাকাবুকো ভাব। বেজায় সাহসী। তবে গলাখানা খুব সুন্দর হাফিজদ্দির। দেশগ্রামে শোনা বয়াতিদের গান খুব ভাল গাইতে পারে। গানের নেশা খুব। মাওয়ার বাজারে গিয়ে, কাজির পাগলা জশলদিয়া বাজারে গিয়ে, মঙ্গলবার দিন গয়ালীমান্দ্রার হাটে গিয়ে যেসব দোকানে ট্রানজিস্টার রেডিও আছে সেইসব দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আব্বাসউদ্দিন আর আবদুল আলুমের গান খুব মন দিয়ে শুনে আসে। তারপর দিন নেই, রাত নেই, গলায় হাফিজদ্দির শুধুই ওসব গান।

ভারি স্ফূর্তিবাজ ছেলে সে।

দেশগ্রামের বিয়ে বাড়িতে বিয়ের দুতিন দিন আগ থেকে মাইক বাজান হয়। বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরও এক দুদিন থাকে মাইক। ওই ধরনের অনুষ্ঠানাদি পেলে বাড়ির লোকে আর হাফিজদ্দিকে খুঁজে পায় না। সে গিয়ে ঢোকে বিয়ে বাড়িতে।

বিয়ে বাড়ির আবার সবখানে নয়। বাংলা ঘরে। যে ঘরে গাদা গাদা রেকর্ড, ব্যাটারি কলের গান, এসব নিয়ে বসে মাইকম্যান। যে ঘরের চালার ওপর কিংবা ঘরের পাশে গাছে বসান হয় মাইক, সেই ঘরে ঢুকে এককথা দুকথায় মাইকম্যানের সঙ্গে খাতির করে ফেলে। দুএকঘণ্টা পর দেখা যায় হাফিজদ্দি ছাড়া মাইকম্যান আর কাউকে বুঝতেই চাইছে না, কাউকে চিনতেই চাইছে না। মাইকম্যানের খাওয়া শোয়ার তদারকি থেকে শুরু করে সব কাজই হাফিজদ্দি করছে। মাইকম্যান হয়ত ঘুমোচ্ছে, দেখা গেল তার আসল কাজটাই করে দিচ্ছে হাফিজদ্দি। কলের গান পাম্প করছে, রেকর্ড বদলাচ্ছে, ভোঁতা হয়ে যাওয়া পিন বদলে নতুন পিন লাগাচ্ছে।

আসলে যে কোনও ধরনের নতুন কাজে, মজাদার, দুঃসাহসী কাজে অপরিসীম উৎসাহ হাফিজদ্দির। আমিনুলদের বাড়ির নামায় জাল পাতার উৎসাহটাও এই জন্যই হয়েছিল। শফিজদ্দির কথা শুনে সে বলে, আমিনুল কাইজ্জা লাগবই না। আমিনুল হইছে অর বাপের লাহান। মাইনষের লগে কাইজ্জা কিত্তন করে না। তয় আমিনুলের মায় লাগাইব।

তাইলে কেমতে ওহেনে গিয়া জাল পাততে চাস তুই?

এমতেঐ চাই।

তারপর একটু থেমে নিজের বুদ্ধিটা খুলে বলেছিল হাফিজদ্দি। এখনও জোয়ার তেমন আসেনি জায়গাটায়। দুপুর নাগাদ পুরোপুরি আসবে। তখন গিয়ে জাল পাতলে একটা দুটো মাছ যাই পাওয়া গেল অসুবিধা নেই। রাত দুপুরে জোয়ারটা যখন পুরো আসবে তখন নামবে মাছ। আমিনুলদের পুকুরটা জংলা মতন। ওই পুকুরে নানান পদের মাছ। শিং মাগুর কৈ শোল গজার টাকি ফলি নলা আর পুঁটি টেংরা তো আছেই। রাত দুপুর থেকে সকাল পর্যন্ত ধরলে দু'তিন ডুলা হবে। সকালবেলা

আমিনুলদের বাড়ির লোকজন জেগে ওঠার আগেই জাল গুটিয়ে বাড়ি চলে আসবে।

শুনে শফিজদ্দি বলল, তয় অহন গিয়া জাল পাতলে যদি অরা দেইক্কালায় ?

হাফিজদ্দি বলল, দেখব না! আর যদি দেহেও কোনও অসুবিধা নাই। অহন গিয়া জাল পাতুম আমগ সীমানায়। তাইলে ওরা দেখলেও কথা কইব না। হাজ অওনের লগে লগে জাল উডাইয়া ইজল গাছতলায় নিয়া পাতুম। রাইতে আমিনুলগ বাড়ির মাইনষে ঘর থিকা বাইর হয় না।

ব্যাপারটা তারপর বুঝল শফিজদ্দি। বুঝে তারও বেশ উৎসাহ হল। কিছু একটা করতে পারলে মন্দ হয় না। এরকম মেঘবৃষ্টির দিনে শরীরের ভেতর কেমন একখানা ম্যাজম্যাজে ভাব হয়। ভারি অলস লাগে। একটা কিছু নিয়ে মেতে থাকলে ভাল লাগবে।

দু'ভাই তারপর বিপুল উদ্যমে কাজে লেগেছিল। নিজের কথা মতো কাজ করেছে হাফিজদ্দি! প্রথমে গিয়ে নিজেদের সীমানায় জাল পেতেছে। ফলে ওই নিয়ে কোনও কথা হয়নি। যদিও জাল পাতার সময় আমিনুলের ছোট বোন হামিদা দেখে ফেলেছিল। সে গিয়ে মাকে ডেকে এনেছে। কিন্তু তাদের সীমানায় নয় বলে ওই নিয়ে কথা বলেনি আমিনুলের মা। সন্ধের পর জাল তুলে আসল জায়গায় এনে পেতেছে শফিজদ্দি হাফিজদ্দি। দুটো একটা মাছ তারপর থেকে পাচ্ছে। তবে আমিনুলদের পুকুরের আসল মাছ নয়। পুটি কিংবা টেংরা পাচ্ছে। আসল মাছ নামবে গভীর রাতে। কৈ শিঙ মাগুর ফলি নলা শোল গজার টাকি কিংবা বোয়ালের বাচ্চা। সেই আশায় নালার দুপারে বসে থাকে দুভাই। ওপারে হিজলগাছের তলায় হাফিজদ্দি, এপারে শফিজদ্দি। মাঝখানে ভেঁশালের মতো পাতা জাল। হাফিজদ্দির পায়ের কাছে হারিকেন আর ডুলা। গুঁড়ো বৃষ্টিটা বাড়ছেই। চারদিককার অন্ধকার অন্ধকারের মতো গাঢ় হয়ে আছে। এই অন্ধকারে হারিকেনের আলো পার্থিব কোনও আলো মনে হয় না। মনে হয় এ এক অপার্থিব আলো। কোথাকার কোন অচিনলোক থেকে এসে মিয়াদের ছাড়াবাড়ির হিজলগাছের তলায় পড়েছে।

সন্ধের পর থেকেই উপচাতে শুরু করেছে পুকুরের জল। ছোট্ট নালা ঠেলে নামতে শুরু করেছে। আস্তে ধীরে বেগ বাড়ছে জলের। জোয়ার বেশ জোরাল হয়েছে। ফলে নালার জলে কলকল কলকল শব্দ। এই শব্দে আস্তে ধীরে চাপা পড়ছে চারপাশের ঝিঁঝিঁর ডাক, রাতপোকা, কীটপতঙ্গের ডাক। গেরস্ত বাড়ির পালা কুকুরের ডাক শোনা যায় না। শেয়ালের পায়ে জল ভাঙার শব্দ পাওয়া যায় না। আউশ আমনের খেত থেকে, পাট খেতের নিবিড় অন্ধকার থেকে মুছে যায় কোলাব্যাঙের ডাক। ডিম ছাড়ার ক্লান্তিতে বুঝি ঘুমিয়ে পড়ে ব্যাঙেরা। মাথার ওপর দিয়ে বাদুড়ও উড়ে যায় না। সম্পূর্ণ নির্জন হয় প্রকৃতি।

এই নির্জনতার মানে কী ?

এই নির্জনতা কি শুধুই মাছেদের জন্য ?

এরকম নির্জনতা না পেলে কি জঙ্গুলে পুকুরে বহুকাল ধরে ঘাপটি মেরে থাকা মূল্যবান মাছ তার পরিচিত আবাস বদল করে না? জোয়ার জলে গা ভাসিয়ে নেমে যায় না যে দিকে দুচোখ যায়?

প্রকৃতি কি মাছেদের জন্যই তৈরি করে এমন নির্জন, সুনসান সময়!

এই পরিবেশটা যেন হঠাৎ করেই খেয়াল করল শফিজদ্দি। জালে এখন অবিরাম মাছ পড়ছে। দু একখানা কৈ, দু একখানা ফলি, টাকি কিংবা শিং। থেকে থেকে জাল তুলছে হাফিজদ্দি, মাছ তুলে রাখছে ডুলায়। কাজ যা করার সেই করছে। শফিজদ্দি আছে উদাস হয়ে।

তার উদাসীনতা কেটে যায় নির্জনতায়। মনের ভেতর কেমন একটা ভয় ভয় ভাব হয়। মৃদু শব্দে গলা খাঁকারি দেয় শফিজদ্দি। ওই হাইপ্পা!

হাফিজদ্দি ডুলায় মাছ রাখতে রাখতে বলল, কী?

তুই কিছু খ্যাল করছস?

কী খ্যাল করুম?

চাইরমিহি কেমুন নিটাল হইয়া গেছে?

হইবঐ তো। রাইত দুইফরে নিটাল হইব না?

এমুন নিটাল হয় না।

হাফিজদ্দি খিক করে হাসল। না হইলে আজ হইছে কেমতে?

এইডাঐ তো তরে কইতে চাই।

আইচ্ছা ক।

আমার কেমুন জানি লাগে।

কেমন লাগে?

ডর করে।

কিসের ডর?

তুই বোজচ না?

না।

জোয়াইবা মাছের লগে তারা থাকে।

তারা কারা?

কইতে ডর করে।

হাফিজদ্দি নির্বিকার গলায় বলল, তাইলে কইচ না।

শফিজদ্দি ভীতু গলায় বলল, না কইয়া ঐ তো পারতাছি না।

তারপর ভয়ে ভয়ে চোখ তুলে মাথার ওপরকার অন্ধকারে হিজলগাছটির দিকে তাকাল শফিজদ্দি। ফিসফিসে গলায় বলল, এই গাছে একজন আছে।

হাফিজদ্দি খুবই অবাক হল।

চঞ্চল চোখে মাথার ওপরকার গভীর অন্ধকারে ডুবে থাকা হিজলগাছটির দিকে

তাকাল। কে আছে এই গাছে? কেডা?

উত্তেজনায় তার গলার স্বর বেশ চড়েছে। কোথাও কোনও শব্দ ছিল না। চরাচর ডুবেছিল সুনসান নীরবতায়। এই নীরবতার খুব ভেতর থেকে কলকল কলকল শব্দে ভেসে আসছে জল নেমে আসার মৃদু মোলায়েম একখানা শব্দ। ঝিঁঝি কিংবা কীটপতঙ্গের ডাকের মতো এই শব্দকেও এখন আর শব্দ মনে হয় না। মনে হয় এই শব্দও বুঝি নীরবতার অংশ। ফলে হাফিজদ্দির গলার স্বর ডিম ছাড়ায় মত্ত কোলাব্যাঙের ডাকের মতো তীক্ষ্ণ মনে হয়।

শুনে শফিজদ্দি কেমন ভড়কে গেল। দিশেহারা গলায় বলল, আস্তে কথা ক।

হাফিজদ্দি সরল গলায় বলল, ক্যা, আস্তে কথা কমু ক্যা? কী হইছে? কেডা আছে গাছের ওপরে ক আমারে! রাতে দুইফরে কে আইয়া ইজলগাছে ইউট্টা বইয়া রইছে?

হাফিজদ্দি যত চড়া গলায় কথা বলে, শফিজদ্দি গলা তত নামায়। তুই বোজছ নাই?

না।

কোনও মানুষজন না।

তয়?

শফিজদ্দি ভয়ে ভয়ে আবার হিজলগাছের দিকে তাকাল। কাতর গলায় বলল, রাইত দোফরে এহেনে বইয়া এই হগল কথা তরে কেমতে কই?

ক্যা, কইলে কী হইছে?

কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে নির্বিকার ভঙ্গিতে জাল তুলছে হাফিজদ্দি, মাছ তুলে রাখছে ডুলায়। তোলার সময় কোনও কোনও মাছ খলবল খলবল শব্দ করে। জাল থেকে ডুলায় তোলার পরও শব্দটা সহজে কমে না, ডুলার অন্যান্য মাছের সঙ্গে মিলেমিশে লাফঝাঁপ দেয়। তারপর হঠাৎ আসা জোয়ারে বাতাসের মতো যেমন করে আসে তেমন করেই যেন থেমে যায়।

জলের বেগ এখন আরও বেড়েছে। কলকল কলকল শব্দে পুকুরভাসা জল ছুটে আসছে। জলের সঙ্গে জলের বেগে আসছে মাছ। আমিনুলদের পুকুরের আসল মাছ। কৈ শিং ফলি শোল টাকি গজার টাকি দুএকখানা ছোট বাইন, একটা তারবাইনও এসেছে খানিক আগে।

তারবাইন বাইন হয়েও পদে অন্য। বিঘত দেড়েক লম্বা হয়। বড় শিংয়ের মতো মোটা। শরীরে তারার মতো ফোঁটা।

মাছটা দেখে হাফিজদ্দি খুব খুশি হয়েছিল। একটু নতুন, একটু অন্যরকম যে কোনও ব্যাপারে তার ভারি আমোদ।

বৃষ্টি এখন আছে কি নেই বোঝা যায় না। থাকলেও কুয়াশার মতো মিহিন হয়ে ঝরছে। হিজলের পাতায় জমে জমে, বড় ফোঁটার আকার ধরে ক্ষণে ক্ষণে

টুপটাপ ঝরে। জোয়ার জল কিংবা গাছতলায় বসা হাফিজদ্দি শফিজদ্দির মাথায় পিঠে মুখে বুকে পড়ে।

জলে থেকে জলের কথা কে ভাবে!

শফিজদ্দি হাফিজদ্দিও ভাবছিল না।

তবে হারিকেনের চিমনিতে কাচে দুচার ফোঁটা জল পড়লেই, জোয়ারে বাতাসে হারিকেন নিভু নিভু হলেই দুভাই একসঙ্গে ব্যস্ত হচ্ছিল। যদি হারিকেন নিভে যায়! যদি বৃষ্টির জলে আর আগুনের তাপে চট করে ফাটে কাচ!

ওই হলে আর মাছ ধরা হবে না। এমনিতেই ঘুটঘুটে অন্ধকার, হাতের কাছের মানুষ চোখে পড়ে না। তার ওপর আছে হিজলের অন্ধকার, বৃষ্টি। অন্ধকারে মাছ তুলতে গিয়ে পোকা শিংগের কাঁটা খাবে। ওই কাঁটায় জব্বর বিষ। হলুদ বাটা আর চুন লাগিয়ে রাখলেও তিনদিন লাগবে সারতে।

তার ওপর আছে সাপ।

জলের সাপ, ঢোড়া, মেটেপোড়া। লোকে বলে পোরা, মাইট্টা ঢোড়া।

জোয়ার জলে ভাসে, জলের টানে বাইন মাছের মতো জালে এসে জড়ায় এই দুরকম সাপ। অন্ধকারে বাইনমাছ মনে করে ধরলেই হল। কামড়ে বিষ তেমন নেই, তবে খুব জ্বলুনি হয়।

আর বাইন মাছই বা কী নিরীহ মাছ?

কায়দা মতো ধরতে না পারলে পেটের ভেতর লুকিয়ে রাখা বেলকাটার মতো মোটা চকচকে কাঁটাখানা বের করে হাতের তালু ফালা ফালা করবে।

সাপ এবং বাইনের মতো আছে আরেকখানা জীব। কুইচ্চা। কুইচ্চাও আসে যখন তখন। কুইচ্চার কামড়েও বিষ কম। কেউ কেউ বাইন মাছের কায়দায় বেঁধে খায়। খুব নাকি তেল!

হাজাম বাড়ির কেউ কুইচ্চা খায় না।

হাফিজদ্দির খুব ইচ্ছা করে তেলতেলে মোটা একখানা কুইচ্চা একবার বেঁধে খায়। খেতে কেমন, খেয়ে দেখে।

শফিজদ্দি বলল, কী রে হাইপ্পা, কথা কচ না ক্যা?

মাছ তোলায় ব্যস্ত হাফিজদ্দি কখন থেমে গিয়েছিল খেয়াল করেনি। শফিজদ্দির কথা শুনে বলল, কইলাম তো! তুইঐত্তো কচ না।

কইতে ডর করে।

তুই একখান ডবহিযাইল্লা।

হোনলে তুইও ডরাইবি।

কে কইছে তবে?

কে আবার কইব? আমিঐ কই!

তুই কইলেই অইবনি! আমি কিচ্ছুরে ডরাই না।

তয় মনে হয় তুই বোজছস।

হাফিজদ্দি খিক করে হাসল। না বুঝি নাই। তুই ক। কইলে বুজুম।

কওনের পর তো এহেনে বইয়া আর মাছ ধরতে চাবি না নে।

কে কইছে তরে?

আমি কই।

না। তুই অহন গেলেগাও আমি যামু না।

শফিজদ্দি খুবই অবাক হল। একলা একলা মাছ ধরবি?

হ।

হারারাইত?

তয় ধরুম না? এমুন মাছ আর কোনওহানে পামুনি। আইজ রাইতের পর তো আর এহেনে আইয়াও বইতে পারুম না। কাইল বিয়ানেঐত্তো আমিনুলের লগে মেন্দাবাড়ির পোলাপানে আইয়া জাল পাতব। আমগ মাছ ধরতে দিব না।

শফিজদ্দি চুপ করে রইল।

হাফিজদ্দি বলল, কচ না?

না থাউক।

ক্যা?

এমতেঐ।

তয় চুপ কইরা থাকবিনি?

হ।

না, চুপ কইরা থাকলে আমার ভাল্লাগে না। ইজলগাছে কেডা আছে কওন লাগব তর। এই হগল কইতে যুদি ডর করে তর তাইলে অন্যকথা ক। কিচ্ছা ক একখান। তুই কিচ্ছা ক আর আমি মাছ ধরি। দেখবি রাইত কেমতে পোয়াইয়া যায়।

এ সময় শাঁ শাঁ করে ছুটে আসে জোয়ারে বাতাস। গেরস্ত বাড়ির গাছপালায়, শফিজদ্দি হাফিজদ্দির মাথার ওপরকার হিজলগাছে, হিজলের ডালপালায় সাড়া পড়ে।

জোয়ারে বাতাস বয়ে যাওয়ার সময় মাছেরা যেমন সাবধান হয়, যতক্ষণ বাতাস বয় জল নামে ঠিকই, মাছ নামে না। হারিকেনের আলো নিভু নিভু হয়ে আসে। দুহাতে চিমনি ঢেকে হাওয়া আড়াল করে আলো বাঁচায় শফিজদ্দি।

জোয়ারে বাতাস উধাও হওয়ার পর শফিজদ্দি ফিসফিস গলায় বলল, তুই কোনও গন্দ পাচ হাইপ্পা?

কিসের গন্দ?

নাক পাত পাবি।

এদিক ওদিক তাকিয়ে, ওপর নিচ তাকিয়ে দু'তিনবার নাক টানল হাফিজদ্দি। না পাই না তো!

কোনও গন্ধ পাচ না?

হ পাই। মাছের গন্দ, পানির গন্দ।

আর কিছু পাচ না?

হ পাই। হারিকলের গন্দ পাই, কেরাসিন তেলের গন্দ পাই।

শফিজদ্দি একটু অস্থির হল। আরে না, এই হগল গন্দের কথা আমি কই না।

তয় কিসের গন্দের কথা কচ?

ফুলের গন্দ। ফুলের একখান গন্দ পাইতাছস না?

হ পাই তো?

কী ফুলের গন্দ ক তো?

কী ফুল আবার! ইজলফুল। ইজলফুলের গন্দ পাইতাছি। জোয়াইরা বাতাস ছাড়লে ইজলফুলের গন্দ ছোড়ে।

না এইডা ইজলফুলের গন্দ না।

তয়?

শফিজদ্দি চুপ করে থাকে। শফিজদ্দি কী ভাবে!

হাফিজদ্দি বলল, কীরে, কচ না কী ফুলের গন্দ?

এই ফুলের নাম আমি জানি না।

গন্দডা আহে কই থিকা?

তর মাথাব ওপরেব ইজলগাছ থিকা।

ইজলগাছ থিকা অন্য ফুলের গন্দ কেমতে আহে? ইজলগাছে কি অন্য ফুল ধরেনি?

না। একগাছে আরেক ফুল কেমতে ধরে?

তয়?

এই গাছে যে আছে গন্দডা তার।

হাফিজদ্দি আবার চমকাল। কী?

হ।

এবার হাফিজদ্দি একটু নড়েচড়ে উঠল। চড়া গলায় বলল, তর কথাবার্তা আমি কিছু ঐ বুজতাছি না শইপ্পাদা। তুই যা কইতে চাছ কইয়া ফ্যালা। আমি ডরামু না। ভয় ডর আমার নাই। আর যেই কথা তুই কবি, আমার খালি মনে হয় এই রাইত দুইফরে ইজলতলায় বইয়া জোয়াইরা মাছ ধরতে ধরতে হেই হগল কথা হোনতে আমার খুব আমদ লাগব।

শফিজদ্দি মিনমিনে গলায় বলল, এমুন জাগায় বইয়া এই হগল কথা তো কেঐ কয় না।

কয় না ক্যা?

হোনলে মাইনষের ডর আরও বাড়ে। এই হগল কথা মাইনষে কয় দিনদোফরে।

রাইত বিরাইতে কইলেও ঘরে বইয়া কয়।

আমার কাছে দিনদোফর আর রাইতদোফর এক কথাঐ, ঘর আর ইজলতলা এক কথাঐ। তুই ক গাছে কেডা, গন্দ কী ফুলের?

তর নাইলে ডর নাই আমার তো আছে!

ভাইকে সাহস দেয়ার গলায় হাফিজদ্দি বলল, ডরাইচ না। আমি আছি। আর আমি তো আছি ইজলতলায়, তুই আছস ইট্টু দূরে। তর কিয়ের ডর? তুই ক।

শফিজদ্দি তবু দ্বিধা করে। তবু বলতে চায় না।

গভীর রাত তখন আরও গভীর হয়। নির্জনতা জোয়ার জলের মতো ধেয়ে আসে। বৃষ্টি আর অন্ধকার মিলেমিশে একাকার হয়। আউশ আমনের খেতে, পাটের খেতে মৌন হয় মুখর ঝিঁঝি। অন্ধকারে আকাশ দেখা যায় না, অন্ধকারে গাছপালা জলমাটি দেখা যায় না।

এসময় হিজল ফুলের গন্ধ কি চড়া হয়!

অন্য সময়ের তুলনায় এরকম রাত দুপুরে আপন গন্ধে কি বিভোব হয় হিজল!

নাকি এ সত্যি সত্যি অন্য এক গন্ধ?

অচিন গন্ধ!

কোন সুদূর থেকে ভেসে আসে কেউ জানে না!

নাকি এই গন্ধ আসে খুব কাছ থেকে!

নাকি এই গন্ধ কোনও অলৌকিক গন্ধ! মাথার ওপর কিংবা পাশে বসে ছড়িয়ে যায় কোনও অশরীরী অস্তিত্ব!

হাফিজদ্দি বলল, ও শইপ্পাদা কচ না গাছে কেডা? গন্দ কিয়ের?

ধীর গম্ভীর গলায় শফিজদ্দি বলল, এই গাছে যে থাকে সে এখন আসছে। গন্দখান তাগ শইল্লের। তাগ শইল্লে নানান পদের গন্দ। কে ঐর শইল্লের গন্দ পচা মাছের, কে ঐর শইল্লের গন্দ খাডাসের। কেঐর শইল্লে মুদ্দারের গন্দ, কেঐর শইল্লে গোলাপ পুলের। এই গাছে যে আছে তারডা হইল গোলাপ ফুলের।

হাফিজদ্দি বলল, হেয় কে?

হেয় একখান শকশ।

শফিজদ্দিব কথা শুনে তার মুখের দিকে খানিক তাকিয়ে রইল হাফিজদ্দি। তারপর হেসে ফেলল। ক'জন আমারে ডর দেহাইতাছস শইপ্পাদা? ডর দেহাইয়া লাব নাই। আমি ডরামু না।

শফিজদ্দি আগের মতোই গম্ভীর গলায় বলল, ডর দেহাই না। তরে ডর দেহাইয়া আমার লাব কী! অনিষ্ট হইলে তো দুই ভাইয়ের ঐ হইব! এই গাছে যে একখান আছে তুই জানচ না? হোনচ নাই?

হুনছি। তয় এই হগল আমি বিশ্বাস করি না। নিজের চোক্কে যা না দেখি, তা আমি বিশ্বাস করি না। তুই যে আমারে কইতাছস, তুই কোনওদিন দেকছস?

না, আমি দেহি নাই, তয় মেন্দাবাড়ির পোলাপানে দেখছে। আমিনুল দেখছে।

কবে ?

আর বছর। জোয়াইরা দিনে।

কী দেখছে ?

এহেনে বইয়া মাছ ধরতাছিল। আমিনুল ছানা সেন্টু রব মোতালেব। তালেব আছিল, না, না, আছিল কইতে পারি না, তয় আজাদ আছিল। রাইত দোফরে, চাইর মিহি যহন এমুন নিটাল হইছে, ছাড়াবাড়ির ওপরে থিকা, ওই যে গাবগাছটা আছে, ওই গাছের মিহি থিকা হা হা হা হা, হা হা হা হা আওজ হুনা গেল। পয়লা পোরথম অরা কিছু বোজতে পারে নাই। মনে করছে জোয়াইরা বাতাসে গাছের ডাইলে ডাইল লাইগগা এমন আওজ হইতাছে। কেঐ আর খ্যাল করে নাই। বাতাস থাইমমা যাওনের পর আবার ওই রকম আওজ। এইবার আওজটা আরও সামনে আউগগাইয়া আইছে, আরও জোরে হইতাছে। গাবগাছতলা থিকা যেন এই ইজলগাছ মিহি আউগগাইয়া আইতাছে কেঐ আর আওজ বাড়তাছে। তিনবারের বার সেন্টু পয়লা বোজছে। বুইজজা জাল ডুলা হালাইয়া, মাছ ধরণ হালাইয়া ফাল দিয়া উটছে। আর দেহাদেহি বেবাকতে মিল্ল' দৌড় দিছে। দৌড় দিয়া আমিনুলগ বাইত্তে গিয়া উটছে। বেবাক কথা হুইন্না আমিনুলের বাপে কইল, ওইডা তেমুন খারাপ জিনিস না। খারাপ হইলে তগ অনিষ্ট করত। খারাপ না দেইক্কা ঐ দূর থিকা আওজ দিয়া তগ সরাইয়া দিছে। ইজলগাছটায় থাকে তো তরা এতডি মানুষ ইজলতলায় বইয়া মাছ ধরতাছস, এতডি মাইনষের সামনে হেয় আসে কেমতে! এর লেইগা অমুন করছে। তারবাদে তগ মইদ্যে আছে মামু ভাইগনা। মামু ভাইগনাগ সামনেও হেরা আইতে পারে না।

এসব কথা হাফিজদ্দি যেন গায়েই মাখল না। জালে আটকে কি একটা মাছ ছটফট করছিল। তাড়াতাড়ি জালটা তুলল সে। তুলে খুশি হয়ে গেল। বিঘতখানেক লম্বা একখানা সরপুঁটি পড়েছে জালে। সন্ধে থেকে এই এতটা রাত অব্দি এতপদের মাছ পড়েছে জালে কিন্তু সরপুঁটি পড়েনি একটাও।

এই মাছটা খুব পছন্দ হাফিজদ্দির। দেখতে যেমন সুন্দর, খেতেও তেমন স্বাদ। অতিযত্নে মাছটা মুঠোয় চেপে ধরল হাফিজদ্দি। তারপর হ্যারিকেনের আলোয় চোখের সামনে তুলে ধরল। কায়দার একখান মাছ পাইলাম শইপ্পাদা!

শফিজদ্দি আছে নিজের ভিতরে, অন্য এক জগতে, অন্য এক বিষয় নিয়ে। ফলে সরপুঁটিটা সে দেখতেই পেল না। চিন্তিত চোখে হিজলগাছটার দিকে তাকিয়ে রইল।

মাছটা ডুলায় রেখে হাফিজদ্দি বলল, জিগাইলি না কায়দার মাছখান কী ?

শফিজদ্দি নির্বিকার গলায় বলল, কী ?

সরপুডি।

শফিজদ্দি কোনও উৎসাহ দেখাল না।

হাফিজদ্দি চটপটে গলায় বলল, আইচ্ছা ক তারবাদে কী হইল ?

শফিজদ্দি বলল, কিছু হয় নাই। তাঁরা আর রাইত দোফরে এহেনে বইয়া মাছ ধরে নাই।

কচ কী ?

হ। হারাদিন ধরছে। হাজ হওনের লগে লগে বাইত গেছে গা।

এ কথা শুনে আনন্দে একেবারে ফেটে পড়ল হাফিজদ্দি। ইবারও যুদি রাইত্রে তারা মাছ না ধরতে বহে তাইলে একখানা কাম হইব।

কী কাম ?

তুই আর আমি আইয়া বমু।

কেমতে ?

বুদ্ধিটা তারপর খুলে বলল হাফিজদ্দি। বিয়াল থিকা আমগ বাড়ির ঘাড়ে বইয়া থাকুম আমি। বইয়া বইয়া দেহুম কুনসুম তারা জাল উডাইয়া বাইত্তে যায়গা। তারা যাওনের লগে লগে জালডুলা লইয়া, হারিকল লইয়া তুই আর আমি আইয়া বমু। তারা ধরব হারাদিন, আরাম ধরমু হারারাইত। রাইতে ঐ আসল মাছটি পাওয়া যাইব। দেহচ না এই যে পাইতাছি।

শফিজদ্দি ভীতু গলায় বলল, তা তো পাইতাছস! তয় আমার যে ডর করে ?

ডরের মইদ্যে ডরের কথা কইলে আর ডর থাকে না। ক, মামা ভাইগনার কথাডা ক। মামা ভাইগনা এক লগে থাকলে তারা সামনে আইতে পারে না।

অগ লগে মামা ভাইগনা আছিল কেডা ?

আজাদ আছিল না ? আজাদ তো রব মোতালেবের ভাইগনা। আমিনুলেরও ভাইগনা। আপন ভাইগনা না, চাচাতো ভাইগনা।

আমি হুনছি লগে আগুন থাকলেও তারা সামনে আহে না।

হ। আগুনরে তারা ডরায়।

তাইলে যে তুই কইলি এই গাছে যে থাকে সে অহন আইছে ? কেমতে আইব ? আমাগ লগে তো আগুন আছে ? এই যে হারিকলডা আগুতাছে।

শফিজদ্দি কেমন একটা চিন্তায় পড়ল। তাইলে অচিনফুলের ঘেরানডা আইল কই থিকা ?

অচিনফুলের ঘেরান আহে নাই। আইছে ইজলফুলের ঘেরান।

না ওইডা ইজলফুলের ঘেরান না।

তাইলে ঘেরানডা অহন পাইতাছি না ক্যা ? ঘেরানডা গেল কই ?

শফিজদ্দি কথা বলে না। নিজের মধ্যে যেন ডুবে থাকে।

হাফিজদ্দি বলল, তাগ শইল্লের ঘেরানের কথা তুই জানলি কেমতে ?

হুনছি।

কার কাছে?

কত মাইনষের কাছে? তেজাবার বাইষ্যাকালে তাগ শইল্লের ঘেরান পাইছিল সেন্টু আর আজাদ। আজাদগ কোষা লইয়া তারা গেছিল বস্তিছাড়ার লগে যে চন্দ্রেরবাড়ি ওই বাইত্তে ধরাছি খেলা দেখতে। হাজ খালি হইছে, কোষা লইয়া বাইত মেলা দিছে অরা। দারগা বাড়ির পুব দক্ষিণ কোণায়, চর্দরি বাড়ির পুকঐরের লগের খাল দিয়া আইতাছে, খালেব দক্ষিণ মিহির বাড়ির একখান গাছ থিকা আইজকার লাহান অচিন একখান ফুলের ঘেরান আইল। কোষায় মিলনও আছিল। অরে কোষার মাঝখানে বহাইয়া সেন্টু পাছায় থিকা নৌকা বায় আর আগায় বইয়া আজাদ বইডা টানে। ঘেরানডা পয়লা পাইল মিলন। পোলাপান মানুষ তো, বোজে নাই। ঘেরান পাইয়া খুশি হইয়া গেল। কইল, কী সোন্দর ফুলের ঘেরান আইতেছে। ও সেন্টুদা, এইডা কী ফুল? কী ফুলের ঘেরান?

সেন্টু আর আজাদ দুইজনে ঐ ঘেরানডা তহন পাইয়া গেছে। আজাদ কিছু বোজে নাই, তয় সেন্টু বোজছে। বুইজজা নিজে তাড়াতাড়ি বইঠা চাপ দিল। আজাদরে কইল তাড়াতাড়ি টান দে। বাইত্তে আহনের পর বেবাক হুইন্না আজাদের বুঝি কইল, জাগাডা ভাল না। যেই গাছ থন ফুলের ঘেরান আইছে ওই গাছে একজন থাকে। কালী সন্ধ্যায় তাগ শইল্লর ঘেরান পাওয়া যায়। নিশি রাইতে পাওয়া যায় আর পাওয়া যায় কোনও কোনও দোফরে। যহন দিন দোফরে রাইত দোফরের লাহান নিটাল হয় চাইর মিহি।

হাফিজদ্দি এবার কেমন বিরক্ত হল। ধুৎ এই হগল প্যাচাইল হোনতে হোনতে কান বয়রা হইয়া গেল। বাদ দে এই প্যাচাইল। এই হগল মিছা কথা। যুদি নিজের চোক্কে কোনওদিন কিছু দেহচ তয় বিশ্বাস করবি। এহেনে তুই আর আমি ছাড়া কেঐ নাই। ইজলগাছেও নাই, আমগ সামনেও নাই। ফুলের কোনও ঘেরানও আহে নাই। যেই ঘেরান আসছে ওইডা ইজলফুলের ঘেরান।

শফিজদ্দি তবু বলল, তয় আর বছর কিয়ে ডর দেহাইছিল আমিনুলগ?

হেইডা আমি কেমতে কমু?

আর ঐ যে ফুলের ঘেরানডা পাইছিল আজাদ মিলন আর সেন্টু? ওইডা কোন ফুলের ঘেরান?

ঐ বাইত্তে মনে হয় কোনও ফুল ফোটছিল। ঐ ফুলের ঘেরান মনে হয় আগে কোনও দিন অরা পায় নাই।

তাইলে আজাদের বুজি কি মিছা কথা কইছে?

যা মন চায় কউকগা। এই প্যাচাইল তুই বাদদে। তর যুদি এহেনে বইয়া মাছ ধরতে ডর করে, তুই বাইত্তে যা গা। আর যুদি থাকচ তয় বুজিচ এহেনে কিচ্ছু নাই। তুই কইলে আমি ইজল গাছে উইট্টা দেখতে পারি। দেহুম?

শফিজদ্দি মিনমিনে গলায় বলল, কাম নাই।

হাফিজদ্দি হাসল। তয় একখান কাম করি?

কী কাম?

শকশডারে ডাক দেই। যদি থাকে তাইলে হুমইর দিব।

শফিজদ্দি ভয়ে একেবারে সিঁটিয়ে গেল। কচ কী তুই!

হ। ডাক দিয়া দেহি।

বলেই গলা সামান্য চড়াল হাফিজদ্দি। সেই অলৌকিক শকশকে ডাকল। হাচাঐ আপনে আছেননি এহেনে? আ? আছেন? থাকলে হুমহর দেন। ও মিয়াভাই, কোন পদের শকশ আপনে? হুমইব দেন না ক্যা?

হাফিজদ্দি তার মতো করে ডেকে দেয়, কোথাও কোনওদিকে থেকে সাড়া আসে না। মাথার ওপরকার হিজলগাছ আপন স্বভাবে বিভোর হয়ে, রাত দুপুরকার অন্ধকার আর বৃষ্টিতে, জোয়ারে বাতাসে জুবুথুবু হয়ে থাকে। আমিনুলদের পুকুরের পুকুরভাসা জল জলের স্বভাবে নেমে আসে। কলকল কলকল শব্দে টের পাওয়া যায় জলের চলাচল। ভয়টা কেমন কাটতে থাকে শফিজদ্দির। মনের গহনে চাপা পড়া সব শব্দ যেন একটু একটু করে জেগে ওঠে। চারদিককার ঝিঁঝির ডাক শুনতে পায় সে। রাতপোকা, কীটপতঙ্গের ডাক শুনতে পায়। আউশ আমনের খেতে, পাটখেতের গহন অন্ধকারে ডিমছাডায় মত্ত কোলাব্যাঙের ডাক শুনতে পায়। পায়ে জল ভেঙে গেরস্ত বাড়ির দিকে হেঁটে যাওয়া শেয়ালের শব্দ পায়। গেরস্ত বাড়ির পালা কুকুর খেউ খেউ করে। মাথাব ওপর দিয়ে ডানায় অন্ধকার আর বৃষ্টি মেখে উড়ে যায় বাদুড়। থেকে থেকে আসে হিজল ফুলের গন্ধ। হাফিজদ্দি জাল তোলে, জাল ফেলে। হিজল ফুলের গন্ধের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয় জোয়ারে মাছের তাজা গন্দ।

শফিজদ্দি বেশ বড় করে একটা শ্বাস ফেলল। তাবপর খোলামেলা গলায় বলল, তয় এইডা কইলাম ঠিকরে হাইপ্পা, জোয়াইরা মাছের লগে শকশ থাকে।

ডুলা তুলে মাছের ওজন দেখল হাফিজদ্দি। থাকলে থাকুক গা।

তুই সিন্দুইরা বোয়াল গজারেব কথা হোনছস?

হুনছি। তয় ভাল কইরা হুনি নাই।

হুনবি?

ক। তয় তর যুদি ডব করে তাইলে কইচ না।

না অহন আর ডর করে না।

তয় ক।

সিন্দুইরা গজার থাকে মাইনষের পুকঐরে। তয় সব পুকঐরে থাকে না। বেশি খাই যেই হগল পুকঐর ওই হগল পুকঐরে থাকে। জংলা নিটাল পুকঐরে থাকে। ঠাকুর বাড়ির মাঝেখানকার পুকঐরে একখান আছে। বিরাট গজার। কপালে সিন্দুরের লাল একখান ফোডা। এই গজার আসলে গজার না। এই গজার হইল শকশ। এই গজার দেইক্কা কেঐ যুদি ঝাকিজাল দিয়া খ্যাও দেয়, পলো দিয়া চাব দেয়,

জুতি টেডা দিয়া কোপ দেয় তাইলে অর মরণ। গজারের শইল্লে তো জুতি টেডার কোপ লাগবঐ না, ঝাকিজাল আর পলোর তলে তো হেই মাছ পড়বঐ না, কামড়া যে করব, তার জানডা যাইব।

কেমতে ?

জ্বরাজ্বারি হইয়া মরব।

ঐ মাছখান আমি দেখতে চাই।

কী ?

হ। দেখলে ঐ হালারে জুতি দিয়া কোপ দিমু। তারবাদে দেহুম কেডা মরে। মাছ না আমি।

শফিজদ্দি ভয়ার্ত গলায় বলল, খবরদার হাইপ্পা, এমুন কথা কইচ না।

হাফিজদ্দি হাসল। ঠাকুরের পুকঐরে তো আছে সিন্দুইরা গজার ?

হ।

তাইলে অরে আমি খাইছি।

শফিজদ্দি আর আর কথা বলে না। কী রকম চোখ করে হাফিজদ্দির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

হাফিজদ্দি বলল, তুই ইবার সিন্দুইরা বোয়ালের কথা ক।

শফিজদ্দি মৃদু শব্দে গলা খাঁকারি দিল। সিন্দুইরা বোয়াল থাকে বিলে। কপালে সিন্দুরের ফোডা থাকে আর বোয়ালডা হয় বিরাট। মাইনষের সমান। যাগ খুব জোয়াইরা মাছ ধরনের নিশা, পিরের বোয়াল মারণের নিশা, জোয়াইরা দিনে, নিশিরাইতে আইয়া কে জানি তাগ ডাক দেয়। হেই ডাক হুইন্না জুতি পলো হাতে যে বাড়িত থনে বাইর হয়, বিলে যায়, তার আর বাঁচন নাই। মাছের আশায় পানি ভাইঙ্গা হাঁটতে হাঁটতে তারা খালি পিরের বোয়ালের আওজ পায়। সামনে আওজ, পিছে আওজ। ডাইনে আওজ, বাঁযে আওজ। তারা খালি আওজ পায় আর আউগগায় আর পানি খালি বাড়ে। এমুন করতে করতে ডুইব্বা মরে।

আমি বিশ্বাস করলাম না।

শফিজদ্দি অবাক হল। ক্যা ?

যারা মাছ ধরে তারা সাঁতর না জাইন্না পারে না।

সাঁতর জানলে কী হইব ?

সাঁতর জাইনন্না মানুষ পাইনতে ডুইব্বা মরে না।

মাইনষে তো ডুইব্বা মরে না. সিন্দুইরা বোবয়ালের ছইল ধইরা থাকে যে শকশ হেই শকশে তাগ চুবাইয়া মাবে !

শুনে হাফিজদ্দি একটু চুপ করে রইল। তারপর বলল, এই রকম সিন্দুইরা বোয়াল আমার খুব দেখতে ইচ্ছা করে শইপ্পাদা। কেমতে মাইনষেরে চুবাইয়া মারে দেখতে ইচ্ছে করে।

শফিজদ্দি ভয়ার্ত গলায় বলল, অলইক্কা কথা কইচ না।

হাফিজদ্দি আর কথা বলে না। তার চোখ থেকে তখন মুছে গেছে মিয়ার ছড়ার হিজলতলার এই পরিবেশ। চোখে ভেসে উঠেছে আমন আউশ আর পাটে নিবিড় হয়ে থাকা, জলেডোবা আদিগন্ত এক বিল। বিলের মাথার ওপর ঝুঁকে আছে ম্যাটম্যাটে জ্যোৎস্নামাখা আকাশ। এই আকাশের তলা দিয়ে, একহাতে জুতি আরেক হাতে পলো, হাফিজদ্দি একাকী হেঁটে যায় বিলমুখী। তার সামনে পেছনে, ডানে বাঁয়ে অবিরাম খলবল খলবল করে কপালে সিঁদুরের টিক দেয়া অতিকায় বোয়াল।

হাফিজদ্দি এগিয়ে যায় আর গভীর থেকে গভীরতর হয় বিলের জল।

নতুন জলের শব্দ

সেলিনা হোসেন

ঢেউটি এসে পায়ের কাছে গুটিসুটি বসতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায় এবং গড়াতে গড়াতে অনেক দূরে গিয়ে থামে। আর তখুনি জমিলার শরীর ছলকে ওঠে। ছলকে ওঠে নতুন জলের শব্দের আশায় কানকো মেলে রাখা চপল মাছের মতো। ওরা যেমন আবলি ভেঙ্গে এপাশ ওপাশ ছুটে থমকে দাঁড়ায়, তেমনি এদিক ওদিক ছুটতে চায় মন। কিন্তু শব্দ নেই। আসলে শব্দ থাকে না। জমিলা জানে জলের নিচের কালো মাটির গায়ে লাল কানকোঅলা মাছের শরীর পলাতক হয়ে যায়। তবুও ছাউনিতে ফিরে যাবার নামে কিছুতেই ইচ্ছের লাগাম ধরতে পারে না জমিলা। ইচ্ছেটা গুণটানা নৌকোর রশি হয়ে গভীর থেকে গভীরতর জলের দিকে টানতে থাকে।

জল ছাড়া কিছু ভালো লাগে না জমিলার। চরধূমানীর শেষ সীমানা এই আছড়ে পড়া নদীর কুল নিশির মতো টানে। কোনো সাধ্য নেই একমাথা উঁচু হোগলা পাতার ঐ ছাউনিটার মধ্যে নিজেকে ধরে রাখার। উল্টো-পিঠ নৌকোর মতো ভুস করে ভেসে ওঠে শুশুক। ফুটকি দিয়ে ওঠে ফকফকে পোমা-ভোল। ভাসতে ভাসতে চলে যায় কত কি। জলীয় লম্বা ঘাস ভিজা বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মাথা দোলায়। মাথার ওপর দিয়ে এক ঝাঁক মধুচুশকী উড়ে যায়। মধুচুশকীর ছোট ঠোঁটে নিজের মনটা ঝুলিয়ে দেয় জমিলা। জানতে চায় না ওরা কোথায় গিয়ে থামবে। এই সব দৃশ্যের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে অনবরত জলের বুকে নিজের ছবি দেখে ও।

মাঝে মাঝে মকবুল পাটারী রাগে বেহুঁশ হয়ে ছুটতে ছুটতে আসে।

এই জমিলা তোরে নিয়ে আর পারি না।

না পারলি এই জলের মদ্দি ফালায়ে দাও। আর কনু সময় ফিরা আসব না।

জমিলা নির্বিকার উত্তর দেয়।

মকবুল পাটারী সুঁচালো দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকে। জানে মেয়েটা এমন। আস্তে আস্তে বলে, পানিই তোরে খাবে। পানির মন্দি তোর এত কি ?

আমার মা নাই ক্যান ?

আমিও তো কই তোব মা নাই ক্যান ? তাহলে তো এত জ্বালায় জ্বলতাম না।

চল ঘরে যাই।

তোমার ঐ পাতার ছাপরা আমার ইট্টুও ভাললাগে না বাজান। জমিলা বাবার মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়।

বাজান তুমি মহাজনের ধান পাহারা দিবার লাগি এই চরে আইলে ক্যান ? মকবুল পাটারী কথা বলতে পারে না। নদীর বুকেব ওপর থেকে ইওল বাতাস ভেসে আসে। আথাই পানির কোন দিশপাশ নেই। ইওল বাতাস যেমন শরীর জুড়ায়, আথাই পানি জুড়ায় দৃষ্টি। মকবুল পাটারীর বুকটা ভার হয়ে ওঠে। জমিলা এক পা এগিয়ে জলেব মধ্যে পা ডুবিয়ে দেয়। মধুয়া ঘাগড়ার তলে এসে বসে থাকে বেলে মাছ। স্বচ্ছ জলের তলে তার আঁশঅলা শরীর পরিষ্কার দেখা যায়। আবো দেখা যায় কুঁচো চিংড়ির ঝাঁক।

জমিলা ?

কি বাজান ?

মা পান্তা দিবিনে ?

বাবার এই দীন কণ্ঠস্বরের পর অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা আর সম্ভব নয়। ফিরতে হয় জমিলাকে। ঘরে ফেরার ডাক জমিলার চেতনায় নেই। ঐ একটা পাতার ছাউনি না থাকলে ভালো হতো। সমগ্র চরের যেদিকে তাকায় সেদিকেই মনে হয় একটি করে পাতার ছাউনি দাঁড়িয়ে আছে। নদীর বুকেও পাতার ছাউনি। বাবার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে ঘরে ফেরে জমিলা। ধূপছায়া রোদের আগুন-আভা ওকে তখন জ্বালিয়ে মারে। মনে হয় নদীর বুকে দ্বীপের মতো গজিয়ে ওঠা চরটা ওর রক্তের সঙ্গে মিশে আছে। এর বাইরে জমিলার আর কোনো অস্তিত্ব নেই। গাঁয়ে ছিল কেবল শাসন আর পায়ের বেড়ি। এখানে আসার পর ও খাঁচা থেকে ছাড়া পাওয়া ময়না হয়ে গেছে।

কেবলই উড়ালের সাধ হয়। চরধুমানীর এমন স্বাধীনতা না পেলেও কোনোদিন জলের এত কাছাকাছি আসতে পারতো না। জল ওকে মায়ের ভালোবাসার সুখ দেয়।

পান্তাভাতের সানকিটা বাবার সামনে ঠেলে দেবার সঙ্গে সঙ্গে শূন্য হয়ে যায় জমিলার মন। পান্তাভাতের সপ্ সপ্ শব্দ ওর কানে হিস হিস শব্দ তোলে। ক্ষুধার সাপটা ফণা তোলা ছাড়া আর কিছু বোঝে না। জমিলা ছাউনির বাইরে এসে চুপচাপ

বসে থাকে! যতদূর চোখ যায় কেবল ধানের নতুন চারা মাথা দোলায়। চরধূমানীতে এসে জমিলার নতুন জন্ম হয়েছে। নদীর পাড়ে অবিশ্রান্ত ঢেউয়ের কেলিবিলাস মায়ের কথা মনে করায়। বাতাসের নিঃশব্দ হামাগুড়ি আর অজস্র পাখি ওর স্বাধীনতার স্বপ্ন। যে পাঁচ-ছয় ঘর বাসিন্দা আছে তারাও অনেক ভালো হয়ে গেছে। জমিলার কোনো আচরণে বক্তচক্ষু তুলে শাসন করতে আসে না। বেহায়া বলে গালও দেয় না। গ্রামে থাকতে অনেক গাল শুনতে হয়েছে।

অ্যাই জমিলা?

কি বাজান?

তুই খাবিনে?

ভাতের দলা মুখে পুরতে পুরতে জিজ্ঞেস করে মকবুল পাটারী।

না ভুক নাই।

ভাত আর আছে নাকি?

জমিলা লজ্জা পায়। হাঁড়ি উপুড় করে আমানীটুকু সানকিতে ঢেলে দেয়।

ভাত কহানে?

আর নাই।

হঠাৎ করে ভাতের শেষ দলাটা মকবুলের বুকে আটকে যেতে চায়। ভুক নাই বলে মেয়েটা ওকে ফাঁকি দিয়েছে। ক্ষুধার যে তীব্রতা এতক্ষণ মাথায় আগুন জ্বালিয়েছিল তা দপ করে নিভে যায়। মনে হয় মেয়ের সামনে থেকে এখন পালিয়ে যেতে পারলেই বুঝি বাপ হওয়ার লজ্জাটা এড়ানো যায়। কোনোমতে হাতটা ধুয়ে ঘরের কোণ থেকে বিনযাটা উঠিয়ে নেয় মকবুল পাটারী।

এই রোদের মন্দি কহানে যাও বাজান?

যাই কাম করিগে। ক্ষ্যাত না নিড়াইলে আমন ধান ভালো অবিনে। এই ভাদাইলেগুলাই আমার দুশমন।

মকবুল পাটারী অপরাধী হাসি হেসে বেরিয়ে যায়।

সারাবেলা কোনো কাজ নেই জমিলার। সকালবেলা চাট্টি ভাত রাঁধে আব একমুঠো সুটকিব ভর্তা বাটে। মাঝে মাঝে জোয়াবের জলে ভেসে আসা মাছ ধরে রান্না করে। কুঁচো চিংড়ি বেটে বড়া বানায। বাবা মেয়ে মিলে তিনবেলা তাই খায়। মাঝে মাঝে পাশের ঘরের নসুর মা যখন প্রশ্ন করে, কি রে কি রানদলি?

উত্তর যেন জমিলার সূক্ষ্ম অনুভূতির দিকে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে থাকে। মনটা কেমন হাসফাঁস করে। ভালো কিছু না রাঁধতে পারাটা অপরাধ মনে হয়। ঠোঁট উল্টিয়ে বলে, কি আর রানদব— সুটকীব ভর্তা করছি।

আমার কয়ডা সুটকি দিবি? ঘরে রান্দবার কিছু নাই।

জমিলা নিঃশব্দে একমুঠি সুটকী এনে দেয়। জানে ঐ চাওয়াটুকুর জন্যে এত

ভনিতা।

সারাদিন কিছু করার নেই বলে বুকটা খাঁ খাঁ করে। মৃত মার কথা মনে হলে মনটা বাউরা হয়ে যায়। তখন ওর জলের কাছে যেতে ইচ্ছে করে। গাঁয়ে থাকলে এঘরে ওঘরে সারাদিন গালগল্প করে সময় কাটাত। মা-কে তেমন মনে পড়ত না। কিন্তু এই চর ওর উনিশ বছরের জীবনটাকে একদম ওলোট-পালট করে দিয়েছে। নদীর তীরের বালুর মতো মিটিমিটিয়ে জেগে থাকে স্মৃতি। তখন কষ্ট হয়। কাঁদতে ইচ্ছে করে। বেশি খাবাপ লাগলে উঠে হাঁটতে থাকে। তখনও সারাক্ষণ মনে মনে নতুন জলের শব্দের প্রার্থনা করে। হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূরে চলে যায় জমিলা। বাশকা ঘাসে পা ডুবিয়ে রাখতে আরাম লাগে। পাশ দিয়ে ছুট করে পালিয়ে যায় মাউপ্পো। বেরাইলা ফড়িং কানের কাছে বোঁ করে উড়ে আসে, আবার ডিগবাজী খেয়ে অনেক দূরে চলে যায়। জমিলার মনে হয় গাঁয়ের কথা। চরধূমানীর মতো কেউ ওকে এমন করে কাছে টানেনি। এখানে সবাই ওকে ভালোবাসে। আসলে চরধূমানী ওর একলার! আর কারো না। দূরের মাঠে কর্মরত বাবা এবং অন্যান্য লোকের মাথা কালো বিন্দুর মতো দেখায়। তখন মনটা আভমাল ষাঁড়ের মত হয়ে রুখে উঠে। না এই চর আর কারো নয়। শুধু ওর। এখানে কারো দাবি নেই। জোর দখলি নেই। চরধূমানীর কাছে ওরা চায় ফসল। মুঠো মুঠো ধান। ওদের প্রার্থনা কেবল দাও। জমিলা চরধূমানীর রসনিংড়ানো ছাড়া কিছু চায় না। জমিলা একে ভালোবাসে। যৌবনের মতো ভালোবাসে। নীড়ের স্বপ্নের মতো ভালোবাসে।

অথচ নীলাক্ষীর বুকে সম্প্রতি জেগে ওঠা চরধূমানীকে নিয়ে দুই দলের মধ্যে বিবাদ দানা পাকিয়ে উঠেছে। চর জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এর সবটুকু স্বত্ব দখল করেছে আলিমুদ্দিন। জমিলার বুড়ো বাপ আর ছয়ঘর লোক এসেছে তারই প্রতিনিধি হয়ে চরের জমি আর ধান পাহারা দেবার জন্য। ইতিমধ্যে এ চরের স্বত্ব নিয়ে বিভিন্ন লোকের মধ্যে একটা অধিকারের দাবি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। তাহের আলি বলে এখানে গত বর্ষার আগে তার জমি ছিল। বর্ষারঢলে সে সব জমি ভেসে গেছে। এখন এ চর তার। কিন্তু আলিমুদ্দিন অত কাঁচা লোক নয়। সামান্য মুখের কথায় সরে দাঁড়াবে না। বাহুতে অত কম জোর নিয়ে সে মাঠে নামেনি। চর জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সে দখল করেছে। সুতরাং তার দাবি আগে। তাছাড়া কবে কোন যুগ আগে কোথায় কার জমি ছিল সেসব শুনতে আলিমুদ্দিন রাজি নয়। এসব করে করেই তার সম্পত্তি বেড়েছে, ধানের জমি বেড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বয়স বেড়েছে আর মাথার চুলে পাক ধরেছে। ফলে দুই প্রতিপক্ষ দল পরস্পরের প্রতি মারমুখী হয়ে আছে। কেউ কাউকে ছাড়বে না।

মকবুল ওকে প্রায়ই বলে, একদিন দেখবিনে ঘাড়ের পর মাথাডা নাই। এমন কামে আমগার কাম নাই বাজান। তারচে’ বাড়ি চইল্যা যাই।

ফিরে যায়া খাবো কি? খালিতো সেই খিদার জ্বালা। এই পোড়া কপাল নিয়াই আমরা আইছিরে জমিলা। আমগার ডাঙ্গায়ও মরণ, পানিতেও মরণ। জমিলা বাবার কথায় উত্তর দিতে পারে না। কেবল ঝোপের ভেতর বাবুই পাখির মতো লাফায় মনটা। জানে মা মারা যাবার পর বাবা একদম বদলে গেছে। বেশিকিছু একসঙ্গে ভেবে কুলিয়ে উঠতে পারে না।

এই দেহনা মা, গেছে জষ্টির পর থি তোরে আর কাপড় দিবার পারি নেই।

তোমার কাছে কি কাপড় চাইছি বাজান?

তুই না চাইলে কি? আমার কি আর কেনার সাধ অয়নারে?

বাবার ছলছল মুখের দিকে তাকিয়ে জমিলার মার কথা মনে হয়। একজন মানুষের জীবন থেকে একজন প্রিয় মানুষ সরে যাওয়ার অর্থ ভয়ানক নিষ্ঠুরতা। এ নিষ্ঠুরতা ভয়ংকর প্রবৃত্তির মতো নয়। বেদনায় আচ্ছন্ন করে রাখে। জীবন নিয়ে কোনো বাঘিবুঘি চলে না। ফাঁকে পা পড়লেই মরণ। পা টেনে ওঠায় যে কার সাধ্যি। বাবা সে ফাঁকে পড়েছে। আর উঠতে পারছে না। ওঠার মতো মনের জোরও নেই। জমিলা ঘাসের ভেতর পা ডুবিয়ে আবার হাঁটতে থাকে। নদীর কাছাকাছি এসে যায়। চরের পুব দিকটায় সাধারণত কেউ আসে না। বাশযমা ঘাস আর উলুঝাড় বুক সমান উঁচু হয়ে উঠেছে। হেলেঞ্চা ভরা নদীর কিনার সবুজের বিনুনি হয়ে শুয়ে থাকে। জমিলাব কেবলই মনে হয় এসবই তাব। এদিকে মানুষের চলাচল নেই বলে জমিলার আকর্ষণ এখানে। সন্ধ্যাব পূর্বক্ষণেব বিরিং লাল আকাশ দেখতে দেখতে উনিশ বছবের যৌবনটা নিস্ফল মনে হয়। মনে হয় আকাশের মতো টুকটুকে লাল হতে হতে একসময় ওটা টুপ করে নদীর বুকে ডুবে যাবে। আর কি। বুকটা মোচড়ায়। ভশ্‌-শালিকের কিচিরমিচির তখন যৌবনের শেষ সঙ্গীত হয়ে কানে বাজে। এই চবের ভালোবাসা তখন সান্দ্র হয়ে উঠে। জমিলা ঘাসের ডগা দাঁতের তলে চিবুতে চিবুতে সেই চিরাচরিত ছাউনিতে ফিবে আসে। যেখানে ওর জন্যে কোনো আনন্দ নেই।

জমিলাব মনে হয় ওব চারদিকে একটা নিরানন্দের স্রোতই বইছে। জীবন-যাপনের সঙ্গে এই চর এবং তার সমস্ত পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। সে এই মাটিকে যত ভালইবাসুক ওর বাবা এখানে প্রতিনিধি। অন্যের সম্পদের পাহারাদার মাত্র। এই চরকে কেন্দ্র করে ওর আবেগের কোনো মূল্য নেই। এই বোধের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত অনুভূতি পানসে হয়ে যায়। এ দু'য়ের সম্মিলনের সম্বিত চেতনা ওকে বিরূপ করে তোলে।

চরধূমানী প্রসব করেছে কেমন নিটোল আর পুষ্ট ধানের ছড়া। যৌবন যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে খান খান হয়ে যেতে চায়। জমিলা দেখে স্বর্ণ প্রসবিনী উর্বরা চরে ফসলের প্রাচুর্যময় সমারোহ— সোনালি ধানের শীষে আশ্চর্য জীবন্ত এ চর। অথচ

এর একটা ধানও তাদের নয়। এ চিন্তা জমিলাকে পাগল করে দেয়। বুকে আগলে এগুলো পাহারা দিচ্ছে ওর বুড়ো বাপ। অথচ পুরুষ্টু ধানের কণা আলিমুদ্দিনের গোলাই ভর্তি করবে মাত্র। চরের বুকে জমিলা এখন আলাদা একটা মৌ মৌ গন্ধ পায়। তাতল হয়ে ওঠে শরীর। সমুচ্ছ্বাসে আক্রান্ত হয়ে ও সমীহ করে ধানের ক্ষেতে পা রাখে। নির্বর্ষ আকাশটার দিকে তাকিয়ে মনে মনে চায় যে বৃষ্টি নামুক। একমাত্র বৃষ্টি ওর তাতল ভাব কাটাতে পাবে। আর কেউ না। ধানের ছড়া বুকে জড়িয়ে গন্ধ শুঁকলে মনে হয় এ যেন ওব রক্তের একটা অংশ। তাই কিছুতেই ভাবতে ইচ্ছে করে না যে এ ধানের মালিক শুধু আলিমুদ্দিন। এ জমি চাষ করেছে ওর বুড়োবাপ, ধান লাগিয়েছে— আগাছা সাফ করেছে। বুকের মমতা দিয়ে পাহারা দিচ্ছে। অথচ সে যখন এ ধানের অধিকাবী নয় তখন ওর কাছে আলিমুদ্দিনও যা তাহের আলিও তা। এ ধান তাহের আলির গোলায় গেলেই বা কি ক্ষতিবৃদ্ধি। একদিন বাবাকে একথা বলেছিল। মকবুল কিছুক্ষণ ওব মুখের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলেছিল, সে আমগাব পালক। যার নুন খাই তাব গীবত গাইতে নাই জমিলা।

জমিলা অনুভব করেছে মকবুল পাটারী খুব সুস্থভাবে কথাগুলো বলতে পারেনি। গলাটা কেমন ভারি মনে হয়েছিল। মকবুল পাটাবীব নির্বোধ অনুভূতি বুঝি চিড় খেয়ে গিয়েছিল সেদিন।

একদিন হেলেঞ্চার গা উল্টিয়ে মলাংগি মাছ খুঁজতে খুঁজতে ও দেখেছিল সেই ডিঙিটা। ভয়ে থমকে গিয়েছিল। মেঘলা ছিল আকাশ। হয়তো বৃষ্টি নামতে পারে। একঝাঁক মপুক উড়ছে ওর মাথার ওপর। আঁচলে বাঁধা আট দশটা মলাংগি মাছ তখন নিথর হয়ে এসেছে। লোকটা প্রথমে ওকে দেখতে পায়নি। জমিলা হেলেঞ্চার গা ঘেষে চুপচাপ বসে থাকে। উঠে যাবার শক্তিটুকুও নেই। মনে হয় উলোঝাড় যদি ওর চারিদিকে নিবিড় বেষ্টনী বচনা করে দিত, তাহলে এ যাত্রা বেঁচে যেত ও। লোকটা খুব কায়দা করে হেলেঞ্চার গা ঘঁষড়ে কুলে এনে ঠেকালো ডিঙিটা। তখুনি জমিলার সঙ্গে চোখাচোখি হলো ওর। একটু ঘাবড়ালেও নিজেকে সামলে নিল দ্রুত। তারপর লাফ দিয়ে পাড়ে নেমে লগি পুতে বেঁধে ফেলল ডিঙি। কাছে ধারে কেউ নেই। যে নির্জনতা জমিলার নিত্যসঙ্গী, তা ওকে পাষাণের মতো জাপটে ধরল। কানকো মেলে রাখা মাছের কথা বেমালুম ভুলে গেলো ও। জলের শব্দও কানে আসছে না। কাদামাখা পা জোড়া কোনোমতে ধুয়ে উঠে এলো। নদীর বুকে তখন উথালপাতাল ঢেউ। কানের পাশ দিয়ে শাঁ করে উড়ে গেলো বোয়াইলা ফড়িং। জমিলা দ্রুত হাঁটতে থাকে।

লোকটা তখন এক দৌড়ে ওর সামনে এসে দুহাত প্রসারিত করে দাঁড়ায়।

যাও ক্যান ?

জমিলা কথা বলতে পারে না। লোকটার ঠোঁটে চিকন হাসি। ছোটখাটো ঝোপের

মতো এক জোড়া গোঁফ। জমিলার দৃষ্টি গোঁফের ওপর থেকে বুকে নেমে আসে। তারপর সরাসরি পায়ের কাছে গিয়ে থমকে যায়। সে দৃষ্টি আর উপর দিকে ওঠে না।

চলো ঐ জাগায় বসি।

লোকটা ওর হাত ধরে টানে। জমিলা হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে। মনে দ্বিধা, সংকোচ ইত্যাদি ঢেউয়ের মতো গড়াতে থাকলেও, উনিশ বছরের উথাল পাতাল যৌবন লোকটাকে সরাসরি অস্বীকার করতে পারে না। লোকটা একটু জোরে টানতেই ও প্রবল আপত্তি না জানিয়ে পিছু পিছু আসে।

ঘাসের ওপর বসেই লোকটা ওকে জিজ্ঞেস করে তুনার বাপ কিডা?

মকবুল পাটারী।

জমিলার ভীত কণ্ঠ কেঁপে যায়

হুঁ।

লোকটা ট্যাঁক থেকে বিড়ি বের করে ধরায়। আকাশে মেঘের ঘটা গাঢ় হয়ে ওঠে। এক ঝলক ইতল বাতাস বয়ে যায়। জমিলা আস্তে করে বলে,

তুমি কেডা?

আমি কালাম। তাহের আলি আমার বাজান অয়।

অ্যাঁ!

জমিলার মুখ থেকে অস্ফুট ধ্বনি বেরিয়ে আসে।

ভয় পাইলা মনে অয়?

কালাম হো হো করে হাসে। তাগড়া জোয়ান লোকটার মুখের হাসি ভরা গাঙের মতো। কূল ছাপিয়ে ছপছপ করে ওঠে। জমিলার উনিশ বছরের যৌবনে এখন একটা কথাই আলোড়িত হয়, এ ধান তাহের আলির গোলায় গেলই বা কি ক্ষতিবৃদ্ধি?

কালাম হাত নেড়ে গড়গড় করে যা বললো তার অর্থ এই, ও দেখতে এসেছে ধানের এখন কি-অবস্থা। এ ধানের এক কণাও ওরা ছাড়বে না। একদিন রাতে এসে সব কেটে নিয়ে যাবে। আলিমুদ্দিনকে ওরা থোড়াই পরোয়া করে। কারো সাধ্যি নেই তাহের আলি আর তার ছেলেদের বাধা দেবার।

কালাম বিড়ি ছুঁড়ে ফেলে ওকে কাছে টানে। জমিলা আড়ষ্ট হয়ে সরে যায়। জোর বাতাস বয়। হয়তো এখুনি বৃষ্টি নামবে। কালাম ফিসফিসিয়ে বলে, কাইল আবার এ হানে আইসো?

জমিলা ফিক করে হেসে ঘাড় নাড়ে।

আচ্ছা।

কালাম লগিটা টেনে নিয়ে লাফ দিয়ে ডিঙিতে উঠে যায়। ডিঙি যখন দুলতে দুলতে অনেক দূরে চলে যায় তখনো জমিলা দাঁড়িয়ে থাকে। বাতাসে চুল ওড়ে।

তখনো ভাবনা, কি হবে তাহের আলি এ ধান নিয়ে গেলে? কিছু না কিছু না। জমিলার লাভ লোকসানে তা কোনো আঁচড় কাটবে না। তার চেয়ে কালামের উপস্থিতি অনেক ভালো।

অর্ধেক পথ আসতেই বড় বড় ফোঁটার বৃষ্টি নামে। জমিলা একটুক্ষণ দাঁড়ায়। মওসুমের প্রথম বৃষ্টি। তার মনে নতুন জলের শব্দ। জলের শব্দ ওকে মাতাল করে তোলে। ও তখন ধরে নেয় জলের শব্দ মানেই জীবন। নতুন জীবন। জলের শব্দ ভালোবাসর মতো। ও আমোদ করে ভিজতে থাকে। ভিজতে ভালো লাগে। ভিজে থিতুবিতু হয়ে ও যখন ছাউনিতে ফেরে, মকবুল পাটারীর উদ্বিগ্ন মুখে তখন রাগের আগুন আভা।

কহানে ছিলি এতবেলা?

মাছ ধরলাম বাজান।

জমিলা আঁচল মেলে মাছ দেখায়। ওর খুব হাসি পায়।

আইজ আমি মাছ মারলাম বাজান।

জমিলা হেসে গড়িয়ে পড়ে।

যদি অসুক অয়?

না, বাজান অসুক অবে না।

না অসুক হবে না!

মকবুল পাটারী ভেংচি দিয়ে ওঠে।

তোর জ্বালায় জ্বলে মলাম। আমি যার চিন্তায় চিন্তায় মরি, সে বেড়ায় ফুত্তি কইরা। যা কাপড় বদলা গে। জ্বর না আইলেই অয়। মওসুমের পয়লা দোওয়া। তোরে নিয়ে যে কি কি করি?

গাইলাও ক্যান বাজান। মার সুয়াগতো আর পালাম না। তা পাওয়ার আগেইতো মা মইল। আমি দোওয়ায় ভেজব, মাছ মারব, যা চাই তাই করব। তুমি গাইলাবার পারবা না। মার সুয়াগ তুমি আমারে দিলা না।

জমিলার চোখে জল। মকবুল কথা বলতে পারে না।

বাইরে চরধূমানী বৃষ্টির তোড়ে ভেসে যায়। স্রোত বয় ধান ক্ষেতে, বাশযমা ঘাসের ফাঁকে, হেলেঞ্চার চিকন পাতায়, হোগলার ছাউনির ওপর। স্রোত বয় জমিলার মনেও।

পরদিন ঘাসের গায়ে গা মিশিয়ে জমিলার অস্থিরতা একদম চুপ করে যায়। কান পেতে অনুভব করে একটা নিষিদ্ধ শব্দ কেমন কেঁপে কেঁপে বাশযমার বুকের ওপর দিয়ে সরে সরে যাচ্ছে। বাশযমার সবুজ নরম শরীরের গন্ধে জমিলার উষ্ণ আমেজ অভিভূত হতে থাকে। গড়িয়ে পড়া রোদের বিচূর্ণ কণা জমিলার শরীরের বিষুবরেখা স্পষ্ট করে তোলে। কালামের চওড়া বুকের ঘন লোমে অদ্ভুত ইচ্ছের

দপ্‌দপানী। সে দপদপানী সম্বল করে শুধু একগাদা ইচ্ছের নিখুঁত রূপায়ণ হয়ে যায় স্যাঁতসেতে মাটির গায়ে। নীলাক্ষীর ঘোলা জলে তখন ভালোলাগার আঁকিবুঁকি।

এক সময় জমিলা হাসতে হাসতে বলে, তোমার এই মোচের ঝাড়ে মধুর মাছি ঘর বানাতে পারে?

কালাম ওর গাল টেনে বলে, পারেই তো, এই মধুর মাছি তো পারে।

ইস আমার অত সাধ নাই?

সাধ নাই? আচ্ছা দাঁড়াও দেহাই।

কালাম ওকে জোর করে ডিঙির ওপর উঠিয়ে নেয়।

সাধ না থাকলে ঐ মদ্দি গাঙে চুব্যায়া ধরব।

আচ্ছা মানলাম! এবার ছাড়ো।

ঠিক সোজা হয়া চলবা।

জমিলা ওকে ভেংচি কাটে। কাছেই উলোঝাড়ের ফাঁকে একটা মউপ্‌পা অবাক· হয়ে চেয়ে থাকে। এ জমিলাকে ও কোথাও দেখেছে কিনা সে কথা মনে করতে পারে না। মাথার লপর দিয়ে মধুচুশকী উড়ে যায়। ছাউনিতে ফিরতে ফিরতে মধুচুশকীর ছায়া আনকোরা মনে হয় জমিলার। এ মাটিকে সঙ্গী করে ঘুরে বেড়ানো পায়ের তলা চিন্‌চিন্ করে। জ্বালা করে সমস্ত দেহ। হঠাৎ করেই কান্না পায় জমিলার। কিন্তু না, কান্না আসে না। বাবার মুখটা মনে পড়ে। রোদের কণা আগুন হয়েছে। তারই উত্তাপে চোখ দু'টো জ্বালা করে। বাড়ি ফিরে ধপাস করে বিছানায় গড়িয়ে পড়ে ও। বাবা এখনো ফিরেনি। সেই ভালো। জমিলা এখন একলা থাকতে চায়। একদম একলা। সেই মউপপাটার স্থির চাহনি কালামের চকচকে চোখের মতো থমকে আছে। ওর মনে হয় তীরে বাঁধা কালামের ডিঙিটা বুঝি চপল বাতাসে এপাশ ওপাশ করছে।

ধান পাকার সময় হয়ে গেছে। মকবুল পাটারীর বৃদ্ধ দেহে জওয়ানী শক্তি প্রবল হয়ে উঠতে চায়। বয়সের ভারে ক্ষয়ে যাওয়া চোখের মণি দু'টো সর্বদা শকুনীর সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে চকমক করে। জমিলা বাবার সামনে সব সময় সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে। কালামের উপস্থিতির কথা কিছুতেই বলতে পারে না। কখনো মুখ ফুটে বলতে গেলে হারাই হারাই ভাবটা ব্যাকুল করে। আর কিছু বলা হয়ে ওঠে না। অথচ প্রতিদিন যখন দেখে কাজে যাবার সময় বাবা দা, সড়কি নিয়ে বের হয় তখন জমিলা অস্থির হয়ে ওঠে। সারাদিনের অস্বস্তি ওকে বিধ্বস্ত করে রাখে।

মাঝে মাঝে মকবুল পাটারী অবাক হয়ে তাকায়, তোর কি অইছে জমিলা?

চোখ মুখ লাল ক্যান?

জমিলা সামনে থেকে সরে যায়।

একদিন কাজ থেকে ফিরে গামছা দিয়ে ঘাম মুছতে মুছতে মকবুল পাটারী বলে

শুনলাম তাহের আলি আর তার ছাওয়ালরা ধান কাটবার পাঁয়তারা করতাছে : আউস কত? নেড়ি কুত্তার বনের বাঘ আবার আউস আর কি। আইলে এক একটারে ধইরে খুন করব। এহনও বকবুল পাটারীর পাঁজরে অনেক ত্যাজ।

জমিলা কথার পিঠে কথা বলতে পারে না। বুকের ভেতর ঢেঁকির উঠা নামার ধপাস শব্দ হয়। শুকনো মুখে বাবাকে ভাত বেড়ে দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। মনের মধ্যে এখনো সে দ্বন্দ্ব। ওর কাছে আলিমুদ্দিনও যা, তাহের আলিও তা। তবে ও কেনো আলিমুদ্দিনের পক্ষ নিয়ে কালামকে হারাবে? ধান কাটা শেষ হলে এখানকার ছাউনি ভাঙতে হবে। আলিমুদ্দিন ভালোবেসে ওর বাবাকে চরের মালিকানা দেবে না। তবে কিসের আশা? অথচ চরধূমানীতে এসে যৌবনের যে প্রাপ্তিযোগ ঘটল তাকে কি করে অস্বীকার করবে জমিলা? বরং কালামকে হারাবার চিন্তায় শূন্য চরের মতো খাঁ খাঁ করে ওঠে জমিলার মন।

ধান পেকেছে মাঠে মাঠে চরের ছয় ঘরের ছয় জন ' ষ সবাই ব্যস্ত। আরো সাত আটজন লোক পাঠিয়েছে আলিমুদ্দিন। মকবুল পাটারীর চোখে ঘুম নেই। কেবল কচাকচ কাঁচি চালায়। সারাদিন মাঠে কাজ হয়। এখন আর জমিলার বেরুনোর উপায় নেই। খাঁচার বন্দী পাখি হয়ে যায় ও। কালামের আসাও সম্ভব নয়। হয়তো মাঝ নদীতে ডিঙি নিয়ে ঘুরে বেড়ায় কেবল। অস্থিরতা ওকে ব্যাপ্ত করে রাখে। কালামরা এখনো ধান কাটাতে আসেনি। ওরা কোন সুযোগের অপেক্ষায় আছে কে জানে। নসুর মার ঘরে গিয়ে হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে থাকে ও।

কি রে কি অইছে?

ভাল্লাগে না চাচী।

ক্যান? মন পোড়ে বুঝি?

কি জানি। কবার পারিনে।

ও বুঝছি। আচ্ছা ঠিক আছে তোর বাজানরে কবো এ্যাটা ব্যবস্থা করবার :

যাঃ আমি কি তাই কইছি নাকি?

তখনি জমিলার মনে হয় কাঁদতে পারলে ভাল হতো।

দু'দিন যাবত মকবুল পাটারীর শরীর ভালো নেই। রাতে জ্বর আর কাশির চোটে ঘুমুতে পারে না। রাত জেগে জমিলা বাপের বুকে তেল মালিশ করে। মনটা কঠিন হয়ে ওঠে। আলিমুদ্দিনের গোলার জন্যে বাবার এত খাটনি। এককৌটা ওষুধ নেই। বুড়ো মানুষটা কথা বলতেও হাঁফিয়ে ওঠে। তার ওপর ঘুমের মধ্যে প্রলাপ বকে। তাহের আলির চৌদ্দগুষ্ঠী উদ্ধার করে ছাড়ে। জমিলার চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করে, আঃ বাবা যেধান তোমার না, তার জন্যে তোমার এত দরদ কেন? তার চেয়ে চলো আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে চরধূমানীর ধান ওর বুকেই রেখে যাই। দু'জনের জন্যে এক মুঠো ভাত কি কোথাও থেকে জোগাড় করতে পারবে না?

সব ধান কেটে চরের বুক বোঝাই করে ফেলেছে ওরা। যেদিকে চোখ যায় সেদিকটাই ধু ধু করে। জমিলার মনে হয় একটা শূন্য বাতাস ছুটতে ছুটতে এসে হোগলার ছাউনির মাথায় আছড়ে পড়ে। তখুনি বুকটা চেপে আসে। জানে কালাম কাণ্ডজ্ঞানহীন সাহসী। রোখের সামনে কোনকিছুই ও পরোয়া করে না। কিছুটা বেরুককা স্বভাবের লোক ও। বাবার বুকে তেল মালিশ করতে করতে বাবা ঘুমিয়ে গেলে জমিলা বাইরে এসে বসে।

মাকড়জোনাক চরধূমানীকে প্লাবিত করে রাখে। জমিলা জানে মাকড়জোনাক রাতে গরম বেশি। তবু মনে হয় শুধু আবহাওয়ার জন্যে নয়, ঝিলিমিলিও ওকে সারাক্ষণ উত্তপ্ত করে রাখে। ভেতরটা যেন ফুটছে। তখন ওর কালামের কাছে যেতে ইচ্ছে হয়। মাকড়জোনাক রাতটা বুকের ভেতর নিয়ে চলে যেতে সাধ হয় অনেক দূরে। দূরের জমিতে চাষাবাদের অস্থায়ী ভাওলঘর হয়ে জমিলা ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে। সে স্বপ্ন কখনো মেঘ। কখনো জ্যোৎস্না।

পরদিন মকবুল পাটারী সারাদিন বাড়ি ফিরল না। ধানের গোছা আঁটি বেঁধে তৈরি করে নিচ্ছে ওরা। সন্ধ্যায় নৌকা বোঝাই হয়ে চলে যাবে আলি মুদ্দিনের বাড়ি। বুকে প্রচণ্ড কাশি আর জ্বর নিয়ে সারাদিন একটানা কাজ করেছে মকবুল পাটারী। জমিলা নসুকে দিয়ে ভাত পাঠিয়েছিল। খায়নি। জমিলার এক একবার ইচ্ছে করে নীলাক্ষীর পাড়ে ছুটে গিয়ে বাবাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে আসতে। পরক্ষণে দমে যায়। বাবা আসবে না। উল্টে রাগারাগি করবে। মকবুল পাটারী প্রভুকে অস্বীকার করার ভাষা জানে না।

সন্ধ্যা নেমেছে। চরের ছয় ঘরে কুপি জ্বলছে। সবাই উদ্বিগ্ন। কখন কাজ শেষ হবে, কত রাতে ঘরের লোকেরা ফিরবে কেউ জানে না। চাঁদটা মেঘের আড়ালে। আঁধার ঘন হয়েছে। কাছের বৌগাছগুলোও আর পরিষ্কার দেখতে পায় না জমিলা। তখন ওর মনে হয়, নদীর দিক থেকে যেন একটা কোলাহলের শব্দ আসছে। ও বাতাসে কান পেতে দাঁড়ায়। ইপাকে উপাকে তাকায়। কিছু দেখা যায় না। এলোমেলো বাতাসে শব্দটা কখনো হঠাৎ করে জোরে কখনো একদমই না। জমিলা আর দাঁড়াতে পারে না, কুপিটা হাতে নিয়ে নদীর দিকে হাঁটতে থাকে।

দূর থেকে দেখতে পায় লাঠালাঠির অভিনব দৃশ্যটা। জমিলা কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়ে পড়ে। মেঘ সরে গেছে। চাঁদের ক্ষীণ আলোয় মানুষগুলোকে প্রেতের মতো দেখায়। এর মধ্যেও কালামকে চিনতে কষ্ট হয় না ওর। বাবার ছোটখাটো অসুস্থ দেহের তুলনায় সড়কিটা বেমানানভাবে বড়। কেমন বিভ্রান্ত দেখায় মকবুল পাটারীকে! হতবুদ্ধি জমিলা নিস্পলক তাকিয়ে থাকে সে দৃশ্যের দিকে এবং পরক্ষণে আশ্চর্যভাবে দেখে কালামের তেল চকচকে লাঠির আঘাতে মকবুল পাটারীর দেহটা টলে পড়ে নীলাক্ষীর কোল ঘেঁষে।

কান্না নয় জমিলার দু'চোখে আগুন জ্বলে ওঠে। ছুটে যায় ধানের স্তূপের কাছে। হাতের কুপি দিয়ে আগুন ধরায় শুকনো খড়ে। মুহূর্তে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে পালা করে রাখা ধানের আঁটি। দুই প্রতিপক্ষ দল বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে।

মকবুল পাটারীর মাথাটা' নদীর পানি বারবার ছুঁয়ে দেখে। লাল রক্ত জলের সঙ্গে লাল হয়ে ভেসে যায়। জমিলা হাঁটু গেড়ে বসে।

বাজান—বা-জা-না-গো—

নিশ্চুপ দর্শকের মতো সবাই দাঁড়িয়ে।

বাবার মাথাটা কোলের ওপর উঠিয়ে নিতে নিতে জমিলার মনে হয়, বাবার রক্ত নতুন জলের মতো তাজা, হিমেল ; আঃ কি চমৎকার সুবাসিত।

এমন ঘ্রাণ ও আর কোনদিন পায়নি।

নেয়ামতকে নিয়ে গল্প নয়

সৈয়দ শামসুল হক

তার এই খ্যাতির সূচনা কিভাবে কিংবা কবে থেকে, এখন আর কেউ ভালো করে মনে করতে পারে না। এখন কাঁঠালবাড়ির সকলেই জানে নেয়ামত যা বলে তা ফলে যায় ; শুধু কাঁঠালবাড়ি কেন, নেয়ামতের এই খ্যাতি আমাদের এই এলাকায় ভেলাকোপা, হাগুরার হাট, বল্লার চর, মান্দারবাড়ি, এ সকল তো বটেই, যেখানে সিনেমা আছে, কলেজ আছে, কাছারি আছে, হাকিম থাকেন, একাত্তরে যেখানে মিলিটারির ঘাঁটি ছিল, খোদ সেই জলেশ্বরী পর্যন্ত বিস্তৃত।

নেয়ামত একটা কথা বললে তা খেটে যায়, হয়ে যায়, ফলে যায়, অতএব মানুষজন নেয়ামতের কাছে আসে কখনও আগাম শুনবার জন্যে, কখনও বা কোন বিষয়ে নিশ্চিত হবার জন্যে, আবার কখনও কোন বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে। নেয়ামত হাসে, নেয়ামত তার হাতের কঞ্চি দিয়ে রাস্তার ধারের আগাছা পিটিয়ে নাশ করে, নেয়ামত শুধু এটুকু বলে— এসব কোনও ক্ষমতাই তার নেই। লোকেরা নেয়ামতের পেছন ছাড়ে না, আমাদের কোন কিছু না হারালেও, কোন বিপদ থেকে আপাতত উদ্ধার পাবার না হলেও আমবা নেয়ামতকে দেখলেই কাছেব চা দোকান থেকে কিনে চা খাওয়াই, নেয়ামতেব ঐ একটিই শখ, চা। দূর দূর থেকে হঠাৎ হঠাৎ একটা লোক সে আমাদের কাঁঠালবাড়িতে, তার বাড়িতে চুরি হয়েছে, নেয়ামতের কাছে জানতে চায় চোরাই মাল পাওয়া যাবে কিনা!

আগাম বলবার নানা রকম বিষয়ের ভিতরে এই চোবাই মালের বিষয় ভালো মন্দ বলাটা নেয়ামতের খ্যাতির পিছনে প্রধানত। অনেকে ধারণা করে, বহু বৎসর আগে এখানে এক বুড়ির গাই গরুটি হারিয়ে যায়, বুড়ি গাই গরুটিকে নিজের মেয়ের মতো দেখত, তাকে হারিয়ে বুড়ি কেঁদে কেঁদে ফিরত, মাঠের ভেতর শস্য, খেতভরা শস্যের ভেতর দিয়ে আলপথ, বুড়ি গাই গরুর শোকে সারাদিন সেইসব

আলপথ দিয়ে কেঁদে কেঁদে ফিরত। বয়সের ভারে সে এখন নত, তাই তাকে লকলকে শস্যের ভেতর দিয়ে চলে যেতে দেখা যেত না, সে ঢাকা পড়ে থাকত, কেবল তার বিলাপ এত ক্ষীণ, পতঙ্গের মতো উড়ে যেত এক মাঠ থেকে অন্য মাঠ, কেউ বুঝে পেত না বুড়িকে সান্ত্বনা দেবে কিভাবে। বড় গরীব এই কাঁঠালবাড়ি। সম্ভব হলে, কাঁঠালবাড়ির মানুষেরা বুড়িকে একটি নতুন গাই কিনে দিত, সে প্রস্তাব তারা একবার করেও ছিল, কিন্তু বুড়ির চাই সেই গাইটিকেই, মেয়ে হারালে সেই মেয়ে ভিন্ন আর কাকে চায় জননী? — বুড়ির এই শোকে, এই আতান্তরে, সারা কাঁঠালবাড়িতে একমাত্র নেয়ামতকেই একদিন কাঁদতে দেখা যায়, সান্ত্বনা দিলেও সে সান্ত্বনা গ্রহণ করে না, তাকে চা দেয়া হয়, কিন্তু সে নেয়ামত দিনে চল্লিশ পঞ্চাশ কাপ চাকে চা বলেই গোনে না, সে নেয়ামত চা ফিরিয়ে দেয় এবং এক সময়ে চোখ তুলে উঁচু গলায় পরিষ্কার ভাষায় উপস্থিত সবাইকে সে জানায়, হ্যাঁ, বুড়ির গাই গরুটিকে সামনের মঙ্গলবার বল্লার চরের পূবদিকের পাথারে দেখা যাবে।

গাইটিকে কথিত পাথারেই দেখা যায়, হয়ত মঙ্গলবারে, সত্যি কি মিথ্যে আমরা বলতে পারব না, এ রকম ঘটনা ঘটে থাকলেও আমাদের তখন বয়স অল্প। তবে নেয়ামতের গল্প উঠলে, তার আদি ঘটনা এই ইতিহাসটি লোকে বলে থাকে।

কিন্তু এতো আমাদের স্বচক্ষেই দেখা, আমাদের জবা গাছ থেকে ফুল তুলতে আসত যে মেয়েটি, যাকে বাড়িব সবাই দেখলে তাড়া করত কিন্তু আমরা তাকে ফুল তুলতে দিতাম, আমাদের বড় জানতে ইচ্ছে করত মেয়েটি ফুল নিয়ে এই ভোরবেলায় কি করে, ফুল সে কেমন সন্তর্পণে ডাল থেকে তুলে আনত, পেতলের সাজিতে রাখত, এই ভঙ্গিটি দেখে আমাদের বড় বিস্ময় হতো এবং খেদ হতো জবা ফুলের মাস কেন বছরের বারোটা মাসই নয়, সেই মেয়েটি একদিন আর ফুল তুলতে আসে না, আমরা জানতে পাই সে বিছানায় শুয়ে আছে, তার জীবনের আশা আর নেই, আমাদের খুব ইচ্ছে করে সন্ধ্যাকে একবার দেখে আসতে, মেয়েটির নাম ছিল সন্ধ্যা, কিন্তু সাহস হয় না, সন্ধ্যাদের বাড়ির বাইরে আমরা ঘুরঘুর করি, কি পরিচ্ছন্ন ওদের উঠোন ঝকঝক তকতক করছে, নিকোনোর টানে কাদার রামধনুগুলো থেকে জ্যোতি আর স্নিগ্ধতা ফুটে বেরুচ্ছে, কিন্তু আবার সবাই কেমন নিস্তব্ধ, একটি ভীরু পাখির স্বর ভিন্ন শব্দ নেই, সন্ধ্যার আজই শেষ দিন, গলার কাছে বাষ্পের দলা উঠে আসে আমাদের, পেছন থেকে হঠাৎ নেয়ামত আমাদের আশ্বাস দেয়, যেনবা সে মাটি ফুঁড়েই পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল, সে বলে— সন্ধ্যার কোন ভয় নেই, সে ভালো হয়ে যাবে।

সন্ধ্যা পরদিনই ভালো হয়ে যায়, কবিরাজ পর্যন্ত অবাক হয়ে যায় এবং 'সবচেয়ে বড় বৈদ্য তিনি আছেন ওপরে'— বলে কবিরাজ গনগনে ঝনঝনে দুপুরের আকাশটার দিকে খাড়া তর্জ্জনী তুলে দেখায়, আমরা আবার সন্ধ্যাকে দেখি — তার মুখের সেই ম্লান কিন্তু সুন্দর হাসিটি এখনও আমার হৃদয়ে ধরি, সন্ধ্যাকে কতকাল আর

দেখি না. সীমান্তের ওপারে দীনহাটায় বিয়ে হয়ে চলে যায় সে আমাদের কৈশোর থেকে আলো নিভিয়ে দিয়ে, কিন্তু নেয়ামতের কথা যে ফলে গিয়েছিল সন্ধ্যার অসুখের সময়ে এর সাক্ষী তো আমরা নিজেরাই।

এই ঘটনা আমাদের মনে আছে বিশেষভাবে। অসুখ থেকে সেরে ওঠার পরেই সন্ধ্যাকে দেখতে এসেছিল দীনহাটার লোকেরা। সন্ধ্যাকে তারা পছন্দ করে যায়, আশীর্বাদ করে যায়. আমরা নেয়ামতকে অনেক সাহস করে গিয়ে ধরি, এতটা ইতঃস্তত করবার হয়ত দরকার ছিল না, নেয়ামত বয়সে আমাদের বহু বড় হলেও ব্যবহারে আমাদের সমবয়সী ছিল. সে আমাদের হতাশ করে দিয়ে ভবিষ্যত বাণী করেছিল, এ বিয়ে হবেই. সত্যি সত্যি সত্যি নেয়ামতের কথা ফলে যায়, সন্ধ্যা দীনহাটা চলে যায়।

কিন্তু এই স্তরেই নেয়ামতের কথা ফলে গিয়েছে কেবল. তা নয়। আমাদের আরও মনে পড়ে, মোতাহার যেদিন ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে যাবার আগের সন্ধ্যায় জিগ্যেস করল, কি নেয়ামত ভাই, পাশ করব তো? নেয়ামত সে প্রশ্নের উত্তরে হ্যাঁ না কোনটাই বলেনি, সে এক সম্পর্কবিহীন সূত্রবিহীন দৃশ্য বর্ণনা করেছিল, নেয়ামত বলেছিল মোতাহার তোকে আমি দেখতে পাচ্ছি, আমি একটা দালান দেখতে পাচ্ছি. লাল ইঁটের দালান, সামনে বাগান. সেই বাগানে কত ফল, বড় বড় ফুল. মোতাহার তুই ফুলের ঝারি হাতে নিয়ে ফুল বাগানে ফুলের গাছে পানি দিচ্ছিস আমি দেখতে পাচ্ছি। আমরা তো শুনে হাঁ। কোথায় মোতাহার যাচ্ছে জলেশ্বরীতে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে আর কোথায় তাকে দেখা যাচ্ছে তার ফুলের গাছে পানি দিতে। আমরা হা হা করে হেসে উঠি। আমরা ধরেই নিই যে মোতাহার পরীক্ষায় ফেল করবে. কথাটা নেয়ামত বলতে চায়নি, তাই যাহোক পাগলামো একটা কথা বলে কাটান দিতে চাইছে।

আমরা তো এই ঘটনারই প্রত্যক্ষ সাক্ষী, কয়েক বৎসর পরে, মোতাহার জেল থেকে ছাড়া পেল, পৃথিবীর নৃশংসতম রাজনৈতিক হত্যার ঘটনায় শেখ মুজিবর রহমান সপরিবারে যখন নিহত হয়েছিলেন, যখন তার প্রতিবাদ করতে কেউ একটি আঙুল তোলেনি, পথে নামেনি, কথা বলেনি, তখন আমাদের মোতাহার জলেশ্বরীতে, সে তখন ম্যাট্রিক পাশ করে কলেজে পড়ছে, বিস্ময়কর এক কাণ্ড করে বসে, সে জলেশ্বরী থেকে কিছু তরুণকে নিয়ে ঢাকার পথে রওয়ানা হয় মুজিব হত্যার প্রতিবাদ ও অবৈধ সরকারকে প্রতিরোধ করবার ডাক দিয়ে, মোতাহারের কল্পনা ছিল, পথে প্রতিটি জনপদ থেকে তরুণেরা তার এই মিছিলে সামিল হবে এবং শেষ পর্যন্ত কয়েক লক্ষ তরুণের মিছিল নিয়ে তারা ঢাকার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে, সেই মোতাহার গ্রেফতার হয় জলেশ্বরী থেকে নবগ্রাম মাত্র পাঁচ মাইল দূরত্ব অতিক্রম কববার মাথাতেই, বহুদিন বিনা বিচারে সে বন্দি থাকে, তারপর তার কারাদণ্ড হয়। সামরিক আইনের ধারায় সাত বৎসরের জন্যে। জিয়াউর রহমানের

সামরিক সরকার তাকে কারাদণ্ড দিলেও, সেই জিয়াউর রহমানই সংসদ নির্বাচনের আগে কারাবন্দিদের ছেড়ে দেন। সেই সঙ্গে মোতাহরকেও ছেড়ে দেন। তার অনেক মুক্তির সঙ্গে আমরা এখন খুবই পরিচিত, আমরা মোতাহারকে মিছিল করে কাঁঠালবাড়ি নিয়ে আসি। কাঁঠালবাড়ির চৌরাস্তায় বিমলের সাইকেলের দোকানে বসে মোতাহার গল্প করছিল, তাকে ঘিরে অনেক ছেলে ছোকরা, সামনের দোকান থেকে চা আনছে পেয়ালা পেয়ালা, এমন সময় নেয়ামত ভিড় ঠেলে 'কই, চা খাওয়াও বাবা মোতাহার' বলতে বলতে এসে হাজির, মোতাহার তাকে নিজের পেয়ালাটাই বাড়িয়ে দেয় 'আমি এখনও মুখ দিই নাই' বলে, বলেই সে বিস্ময়ে হাঁ করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে নেয়ামতের দিকে, তারপর চারদিকে তাকায়, আমি ছিলাম পাশে, আমার কাঁধ খামচে ধরে একবার নাড়া দেয় মোতাহার, তারপর বলে, নেয়ামত ভাই, তুমি সেদিন কি বলেছিলে? তুমি বলেছিলে লাল দালান, ফুলের বাগান, ফুলের ঝারিতে পানি দিই আমি ফুল গাছে, আমি তো জেলখানায় সুপারের বাগানে ফুল গাছেই পানি দিতাম নেয়ামতভাই, তুমি আগে থেকে জানলে কি করে? তারপর নেয়ামতের চোখের দিকে চোখ রেখে নিষ্পলক কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মোতাহার বলে, তুমি যদি এতই জানতে, জানতে না বঙ্গবন্ধু খুন হবেন? তবে তুমি সেই কথাটা কেন আগে বলো নাই? কেন তুমি দেশবাসীকে বলো নাই? তবে আমরা জানতাম, আমরা সাবধান হতাম। তুমি তবে জানতেই না নেয়ামত ভাই।

আমরা তো এখন জানি কথাটা অনেকেই জানতেন, জানতেন শেখ মুজিবর রহমানও স্বয়ং, তাঁকে জানানো হয়েছিল বহুবার, কিন্তু তিনি সাবধান হননি, তিনি বিশ্বাসই করতে পারেননি যে, তাঁকে কেউ হত্যা করতে পারে এই বাংলাদেশে, অথবা তিনি জেনেও আর ঠেকাতে পারছেলেন না পতনের প্রচণ্ড গতিঝোঁক আমরা তো এখন দেখতেই পাচ্ছি, শেখ মুজিবের পরিণতির কথা জানবার জন্যে কোন নেয়ামতের দরকার ছিল না যে তার কাছে আমরা আগাম জেনে নিতে পারতাম, এই পরিণতির কথা লেখা ছিল আমাদের চারদিকেই, আমরা পড়তে পারিনি সেই অক্ষরগুলো, জাতি হিসেবে সত্যি সত্যি সেদিন ছিল আমাদের শৈশব, আমরা বুঝতে পারিনি ইতিহাসের ভাষা।

তবে বিমলের সাইকেলের দোকানে সেদিন বিকালে সেই সমাবেশে যারা উপস্থিত ছিল, তাদের ভেতরে আমাদের চেয়ে বয়সে যারা কিছু বড়, একাত্তরে আমাদের মতো বালক যারা ছিল না, তারা মনে মনে অবশ্যই মোতাহারের ঐ উক্তির প্রতিবাদ অনুভব করতে পেরেছিল। না, নেয়ামত নিশ্চয়ই সব জানত। তার কাছে তো অজানা কিছু নেই। আমাদের জ্যেষ্ঠ যাঁরা তাঁদের তখন স্মরণ না হয়ে পারেনি, যে, কাঁঠালবাড়ির সকলেই যখন নিশ্চিন্ত ছিল পাকিস্তানের মিলিটারি আসবে না, তখন নেয়ামতই একমাত্র বলছে— মিলিটারি আসছে, আবার যখন মিলিটারি এসে গোটা কাঁঠালবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে গেল, যখন যুবতীরা এখানে ধর্ষিত হলো এবং যুবকেরা নিহত, তখন

এই নেয়ামতই রাতের অন্ধকারে জংগলে পগাড়ে লুকিয়ে থাকা মানুষগুলোকে গিয়ে বলত, নাই, আর বেশি দিন নাই। মানুষগুলো জানে, নেয়ামতের কথা ফলে যায়, নেয়ামত যা বলে তা ফলে, মানুষগুলো অতএব পেশীর ভেতর শক্তি অনুভব করে, তারা বিজয়ের জন্য অপেক্ষা করে, বিজয়ের জন্য অপেক্ষা করা গেরিলা যুদ্ধের পরিস্থিতিতে নিষ্ক্রিয় অপেক্ষা হতে পারে না, অতএব কাঁঠালবাড়ির মানুষগুলোকে দেখা যায় মুক্তিযোদ্ধা আকবর হোসনের দলে যোগ দিতে। আমাদের জ্যেষ্ঠরা এই ইতিহাস জানে বলেই তারা এখন বলে ওঠে, নেয়ামতের অজানা কিছু নেই, আসলে নেয়ামতকে কেউ জিগ্যেস করেনি বলেই বঙ্গবন্ধুর কথা সে কা[illegible] বলেনি।

কথাটা আমরাও স্বীকার করি, কারণ, আমরা দেখেছি, নেয়ামতকে কেউ প্রশ্ন না করলে সে নিজে থেকে কখনই কিছু বলে না। একাত্তরেও লোক যখন জানতে চাইত, মিলিটারি আসবে? কেবল তখনই সে বলত, আসবে, আর যখন লোক প্রশ্ন করত, ও নেয়ামত, এই খাড়ে দরজালরা আর কতদিন? তখনই সে কেবল অভয় দিত, নাই, আর বেশিদিন নাই।

বিমল আমাকে মনে করিয়ে দেয় যে, কথাটা অবশ্য সব সময় সত্যি নয়, নেয়ামত বিনা জিজ্ঞাসাতেও দু' একটা কথা বলেছে যা ফলে গেছে, বিমল তখন আমাকে আমারই ঘটনা আঙুল তুলে দেখায়।

আমি ভুলে গিয়েছিলাম। তবে কি মানুষের এই এক বিষাদ যে, যে প্রেম বিয়ে পর্যন্ত যায় সে প্রেমের কথা মানুষ ভুলে যায়? কুলসুমের জন্যে আমার প্রাণ তখন নিশিদিন নদীর মতো ধাবিত ছিল, কিন্তু চোখে কোনও আশা দেখতাম না, কাঁঠালবাড়ির সবচেয়ে বড় ঘরের মেয়ে কুলসুম, ইরানের বুলবুলের মতো রূপসী কুলসুম, তাপসী রাবেয়ার মতো বিনম্র কুলসুম সেই কুলসুমকে আমি পাবো? শহর থেকে লেখাপড়া করি, বইয়ে আমার মন বসে না, কাঁঠালবাড়ি ছুটে আসি, আমি কাঁঠালবাড়িতে এসে তিষ্ঠোতে পারি না, কারণ, কুলসুম আমাকে দেখেও না, এই অবহেলার ভেতরে থাকতে পারি না। আমি আবার শহরে ফিরে যাই, যাবার আগে বিমলের বাড়িতে ওদের মজা পুকুরের পাশে ফাটলধরা শানে বসে বিমলের গা জড়িয়ে ধরে আমি কাঁদি, প্রতিজ্ঞা করি— আর কখন ফিরে আসব না, কিন্তু পূর্ণিমা আবার ফিরে আসে, মজা পুকুরের পানি আবার রূপালি হয়ে যায়, তখন শান বাঁধানো ঘাট শত ফাটল নিয়েও ঝকঝক করে, বিমল বসে বসে সিগারেট টানে, আমি লম্বা শুয়ে পড়ে আকাশের নক্ষত্র আর চাঁদের দিকে তাকিয়ে গলা ছেড়ে গান করতে থাকি, আশা— যদি বা সে গান দূরে ঐ বাঁশবনের ওপারে কুলসুমের দরোজা পর্যন্ত পৌঁছোয়।

নেয়ামতের ভবিষ্যত বাণী করবার খ্যাতি যদিও রীতিমতো প্রতিষ্ঠিত, আমার মাথাতেই আসেনি আমি নেয়ামতকে জিজ্ঞেস করে দেখি কুলসুমের সঙ্গে আমার কিছু হবে কিনা। ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি নেয়ামতকে, কাঁঠালবাড়ির বুড়ো

বটগাছ, হাঁটু পর্যন্ত ধুলো ভর্তি ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সড়ক, শিবমন্দিব, গোরস্থান, প্রাইমারি স্কুলের চিরকালের পড়ো পড়ো ঘরখানা, মাঠের মধ্যে পুরনো কোন শতাব্দীর কোন একটা দালানের ভাঙা কোণ যে বেরিয়ে আছে সেই কবে থেকে, এ সবের মতোই নেয়ামতও যেন কাঁঠালবাড়ির রূপ রচনা করে আছে, বিশেষভাবে তার সম্পর্কে সচেতন হবার আমার কোন কারণ নেই। সেই নেয়ামত একদিন আমাকে শিবমন্দিরেব কাছে পাকড়াও করে। এই তুই নাকি ঢাকা থাকিস? হ্যাঁ, থাকি। নেয়ামত নির্মল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, বলে, তাই তোকে দেখি না, তাইতো বলি জাহাংগীব আমাকে চা খাওয়াতো সেই জাহাংগীর গেল কোথায়?

শিবমন্দিরের কাছে কোন চায়ের দোকান নেই, আশে পাশে যতদূর তাকাও সরকারের তুলোর বাগান, এই বাগানের তত্ত্বাবধানে আসে আমার এক চাচাতো ভাই, নেয়ামতকে নিয়ে তারই কাছে গেলাম। ভাই, চা খাবো। চা? হতাশ হয়ে চারদিকে তাকালে আমার চাচাতো ভাই। চা? সে অবশেষে উঠে দাঁড়াল, খুঁজে পেতে ভাঙা একটা কেতলি বের কবল। চা? সে আমাদের অপেক্ষা করতে বলে বেরিয়ে গেল। নেয়ামত আর আমি বসে আছি বাগানের এক পাশে অপিস ঘরে, ধাবে কাছে জনমানুষ নেই, তুলাব গাছে গাছে হাওয়া নড়ছে, সরসব খুটখুট শব্দ উঠছে, বাতাসে তুলোর সূক্ষ্ম আঁশ উঠছে, সামনের রাস্তা দিয়ে একটা ভিখিরি করুণ স্বরে ভিক্ষা চাইতে চাইতে টিনের গামলায় খুচরো পয়সাগুলো ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে চলেছে, আর গরম পড়েছে তেমনি, কিন্তু এ সবের কোন কিছুই আমাকে এতটুকু বিচলিত বা বিরক্ত করতে পারছে না, কারণ আমার মনের ভেতরে কুলসুম আছে, তাই আমার একটি বসন্তকাল আছে, শীতল বাতাস বইছে, মেঘ ছায়া দিয়েছে— কোথাও গান হচ্ছে, আমার কোন তৃষ্ণা নেই। আমি আপনাব ভেতবে যখন আপনি রয়েছি এ ভাবে, এ তুলোর বাগানে, বিশ্রী এই গরমের দিনে, নেয়ামত হঠাৎ উচ্চারণ করল, তুই পাবি। আমি প্রথমে বুঝতে পারি না, সে আবার বলে, তুই পাবি। অচিরে বিমলকে খুঁজে বের করে এ কথা জানাই, বিমল প্রথমে এই ভবিষ্যতবাণীব ভবিষ্যত নিয়ে ঈষৎ সন্দেহ প্রকাশ করে, পরে যখন শোনে যে, আমি প্রশ্ন করার আগে নেয়ামত নিজে থেকেই এই বাক্য উচ্চারণ করেছে তখন এর সত্যতা সম্পর্কে তার আর কোন সন্দেহ থাকে না, আমারও আর থাকে না।

অনেকদিনের কথা, এ অনেকগুলো বৎসর আমরা পার হয়ে এসেছি, এখন আমদের বৎসরগুলো একেকটি বৎসরের ভেতরে বহু বৎসর ধারণ করে অতিক্রান্ত হয়ে যায়, বিমল আমাকে মনে করিয়ে না দিলে আমার হয়ত মনেই পড়ত না যে আমারও জীবনে প্রেম একদা এসেছিল।

বিমলের সঙ্গেও বহুদিন পরে আমার দেখা, বহুদিন পরে আমি কাঁঠালবাড়ি এসেছি। কুলসুম সন্তানসম্ভবা, আমি আর কুলসুম রোজই এখন একটা তর্কের ভেতরে পড়ে যাই। আমাদের ছেলে হবে না মেয়ে হবে? সেই তর্কের সূত্র ধরেই আমার কাঁঠালবাড়ি

আসা, কুলসুমই হঠাৎ একদিন বলে, নেয়ামতকে জিজ্ঞেস করা গেলে সে বলতে পারত ছেলে না মেয়ে হবে। যে সন্তান গর্ভে আছে সে পুত্র অথবা কন্যা, এটা দু'দিন আগে জানলে কোন অর্থেই কোন দিক থেকে লাভবান হবার কথা নয়, তবু মানুষ যতদিন থেকে সন্তান আকাঙ্ক্ষা করতে জেনেছে, যতদিন থেকে সে একটি নারীকে নির্বাচন করতে শিখেছে, ততদিন থেকে সে গর্ভের সন্তানের ব্যাপারে কৌতূহলী হয়েছে— এ রকম একটি ধারণা আমার ছিল কিন্তু আমার সেই ধারণাকে একেবারে তুলোধুনা করে দেয় আর কেউ নয়, কুলসুমের ভাই মোতাহার। কুলসুমের সাধভক্ষণ ছিল, মোতাহারকে ডেকেছিলাম, খাওয়া দাওয়ার পর কোলের কাছে বালিশ টেনে সে আমার আর কুলসুমকে তর্ক খানিক শোনে তারপর চিৎ হয়ে শুয়ে বলে দ্যাখ, এ যে ছেলে না মেয়ে এটা কেন জানতে চাস? আসলে সম্পত্তি, তোর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী কে হতে যাচ্ছে তুই সেটা জানতে চাস, ছেলে হলে নিজের ঘরেই থাকছে সম্পত্তি, মেয়ে হলে চলে যাচ্ছে পরের ঘরে। কুলসুম একথা শুনে ঠোঁট বাঁকিয়ে ভাইকে বলে, রাজনীতি করে তো নিজের জীবন নষ্ট করলে, তোমাদের পার্টি কোনদিনও ক্ষমতায় আসবে না, তা যাক, সে তুমি বোঝো, কিন্তু রাজনীতি এনে আমাদের মতো ছাপোষা মানুষের জীবনে ঢোকাবে না। মোতাহার তখন ঠোঁট উল্টে বলে আগুন যখন জ্বলবে— গা তখন ঝলসে যবে। কুলসুম খুব রাগ করেছিল মোতাহারের ওপর, কুলসুমকে খুশি করবার জন্যেই কাঁঠালবাড়ি আমি আসি, নেয়ামতের খোঁজ করি, আমার হঠাৎ ভীষণ কান্না পায়, বিমল আমাকে জানায়, নেয়ামত মারা গেছে। বিমল আমাকে বলে, নেয়ামত নিজেই ভবিষ্যতবাণী করেছিল— আমি মারা যাবো।

আমি মারা যাবো— কথাটি যতই বক্র ঠাণ্ডা করে দেবার মতো শোনাক না কেন, আমার মনে না হয়ে পারে না, যে এটি একটি সাধারণ বাক্য, সরল বাক্য এবং সত্য বাক্য। এই বাক্য উচ্চারণ করায় নেয়ামতের বিশেষ কোন কৃতিত্ব নেই। এই বাক্য উচ্চারণ করায় আদৌ প্রমাণিত হচ্ছে না যে নেয়ামত ভবিষ্যত বক্তা।

তখন বিমল আমাকে বলে, হাঁ সে কথা সত্য তবে ক্ষেত্র বিশেষে। আমি বিস্তারিত ব্যাখ্যা চাই তার এই কথার। তখন খুব সংক্ষেপে এবং নিচু গলায় সে আমাকে বলে দেয়, যে এ এমন এক কাল যখন কে যে কোথায় শুনে ফেলবে এবং কি বিপদ পরিণামে উঠে আসবে কেউ বলতে পারে না। চারদিকে সতর্ক দৃষ্টিপাত করে অচিরে বিমল আমার চোখে চোখ রাখে, এক মুহূর্তের জন্য, তারপর রাস্তার দিকে চোখ ফিরিয়ে সে বলে, তুমি তো মান্নানদের চেনো না, একাত্তরে ছোট ছিল বলে রাজাকার হয়নি, এবার আবার একাত্তর হলে মান্নানরাই হবে রাজাকার, সেই মান্নানদের সঙ্গে কথায় কথায় নেয়ামত বলেছিল— কি বলে ছিল এ নিয়ে একেকজন একেক রকম কথা বলে, তবে এটা ঠিক নেয়ামত পরোয়া করে কথা বলেনি, তখন মান্নানরা বলেছিল, নেয়ামত, তুমি তো এত জানো ভবিষ্যত, তবে বলো, তোমার ভবিষ্যত

কি ? নেয়ামত নাকি উত্তর দিয়েছিল, আমার ভবিষ্যত ? আমি মারা যাবো।

এই সময়ে বিমলের দোকানের গ্রাহক উপস্থিত হয়, বিমলের কথায় ছেদ পড়ে, দূরের এক মানুষ, সর্বাঙ্গে ধুলো, তার সাইকেলের চাকা বসে গেছে, বিমল টায়ারের লিক সারাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আমি যেন শুনতে পাই আমার কানে অবিরাম ধ্বনিত হচ্ছে নেয়ামতের কণ্ঠ 'আমি মারা যাব।' আমি অনুভব করে উঠি, যে, ক্ষেত্রবিশেষে সরল বাক্যও কত জটিল হয়ে পড়তে পারে।

গ্রাহক বিদায় নিলে বিমল আবার আমার পাশে এসে বসে এবং খুব নিচু স্বরে জানায়, এর কয়েকদিন পর নেয়ামতের লাশ পাওয়া যায় সরকারি তুলো বাগানের ভেতরে, সে লাশ আবিষ্কার করে আমারই চাচাতো ভাই, গত কয়েক দিন থেকে কাঁঠালবাড়িতে সকলেই আলোচনা করছিল যে নেয়ামত বলেছে 'আমি মারা যাব', কথাটা আমাব চাচাতো ভাইও শুনেছিল, অতএব নেয়ামতের লাশ দেখেই তার মনে পড়েছিল কথাটা, কাঁঠালবাড়ির সকলেরই মুখে তারপর কয়েক দিন ধরে শুধু শোনা গিয়েছিল— নেয়ামত ছিল এমন বাক্যসিদ্ধ যে নিজের মৃত্যুর কথাও নিজে বলে যায় নিজ মুখে।

বিমলের দোকান থেকে বেরিয়ে সারাদিন সারা কাঁঠালবাড়ি হেঁটে, সরকারি তুলোর বাগানে আর কিছু পড়ে নেই জেনেও সেখানে আঁতিপাতি করে কি খুঁজে আবার আমি ফিরে যাই বিমলের কাছে। এখন সন্ধ্যা, সন্ধ্যার আগেই এখন সব বন্ধু মজা পুকুর পাড়ে গিয়ে বসি, আমরা-যে ফাটল ধরা শানের ওপর বসি, বিমলের বউ চা দিতে এসে বলে যায়, সেদিন এই ফাটলে কে নাকি সাপ দেখেছে, যেন আমরা এখানে বেশিক্ষণ না বসি। আমরা অনেক রাত পর্যন্ত এখানেই বসে থাকি। আমাদের গল্প নেয়ামতকে নিয়ে নয়, নেয়ামতকে নিয়ে গল্প করতে করতে আমরা প্রত্যেকেই হয়ত কিছু না কিছু ভবিষ্যৎবাণী করতে পারি, বিমল আর আমি, আর এই ফাটল ধরা পুকুর পাড়, এই অন্ধকার, এই সাপের ভয়, আমরা সমস্ত কিছু নিয়ে এবং জড়িয়ে বসে থাকি, আমরা কখন যেন আমাদেরই জীবনের গল্প করতে শুরু করি, এবং চমকিত হয়ে আবিষ্কার করি, যে মান্নানরা এখন এই পুকুর পাড়ে উপস্থিত নেই, তবু আমরা ভবিষ্যতবাণী করতে ভয় পাচ্ছি। এমনকি কুলসুমের গর্ভের সন্তানকে নিয়ে কোন উচ্চারণ আমার পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছে না।

যখন চারপাশ কবরের মতো স্তব্ধ

নাসরীন জাহান

শকুনের নাক ফজলুর, সারা বছরই গোরস্থানের দিকে খাড়া হয়ে থাকে। ত্রিভুবনে মানুষ মরা বন্ধ হয়ে গেল? ফাঁপা তক্তায় ফজলুর শরীর মটমট করে। সারাদিন ঘরে শুয়ে থেকে হাড়ের গিট কেমন ফুলে উঠেছে। গত পনেরো দিনে সে চৌগ্রামের ছোট বড় ছটি গোরস্থানে বার কয়েক চক্কর খেয়েছে। মুন্সি মিয়ার মুমূর্ষু মুখের দিকে তক্কে তক্কে তাকিয়ে থেকেছে। ব্যাটা বার কতক গাঁজলা তুলে ফিট হওয়ার পর ফজলু যখন তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিশ্চিত....তখন শালা উঠে বসেছে। মেয়ের হাতের চামচের সাগু চেটেপুটে খাওয়া শুরু করেছে। নাহ্, আজরাইলের নিশ্চয়ই পৃথিবীর অন্যত্র জরুরি ডিউটি পড়েছে।

তক্তার ওপর শুয়ে ফজলু হাই তোলে। গ্রামের উঠোনে অসাবধানে পড়ে থাকা লোটা, কলসি, দা...এইসব চুরি করে একেবারে মন্দ দিন যাচ্ছিল না। কিন্তু তারাও বেশ সাবধানী হয়ে উঠেছে। সারা আঙিনা চষে ফেলে এক টুকরো গোবরের নাগালও পায় না ফজলু।

রডের আঘাত খেয়ে সেই যে শিরদাঁড়াটা সিধা হয়ে গেল, এরপর থেকেই তাগড়া ফজলুর মাগী হওয়ার পালা। নইলে লোটা, বাটি চুরি করার মতো ছিঁচকে কাজে ফজলু নিজেকে জড়ায়? কী লোমহর্ষক দিন ছিল তার। দলবেঁধে সিঁদ কাটা কত সোনা, রূপার আধুলি ঝন ঝন...ঝন। এমন ভাবনার মধ্যে পেচকী ডাইক্যা উঠলো ক্যান?

মাথা উঠিয়ে ফজলু রোজকার মতো বেড়ার মধ্যে নিজের আচাভুয়ো আকৃতি দেখে।— হাজার বিলইডা হেইদিন কই আছিল? যেদিন রডের বাড়ি খাইলাম? স্পষ্ট মনে পড়ে ঘর থেকে বিড়ালকে স্মরণ করেই বেরচ্ছিল। কিন্তু চেতনার মধ্যে কিছুতেই তার ছায়া গেঁথে যাচ্ছিল না।

পাশেব ঘবে, বেড়াব ওপাশে চাচিব দেহ মড়মড়িয়ে উঠতেই নিজেকে নিয়ে তাব ভয় শুরু হয়। এ ভয় ফজলুব অত্যন্ত ব্যক্তিগত। ফজলুব এব বিরুদ্ধে দাড়াতে গিয়ে কত বাত নিজেকে ক্ষয়িষ্ণু, নিস্পেষিত করেছে। বাতেব এই ভয়েব কাবণেই দিনেব বেলা স্তন্যদায়িনী এই মহিলাব সামনে সহজ হয়ে দাড়াতে পাবে না সে।

কয়েক বাত ধবে কী হয়েছে, অনাহুতভাবে ফজলু ফি গ্রাম চক্কব খায়। জং ধবা পুবনো টর্চ...যা এখনও তাব পৌরুষ দিনেব সাক্ষী হয়ে আছে, তাব আঘাত দিয়ে অন্ধকাব বিদীর্ণ কবে।

সাবা বছবই ফজলু বিপদেব আশঙ্কায় থাকে। এক বোগ, নাবী দেখলেই ধর্ষণেব স্পৃহা জাগে। যখন দুপুব মবতে থাকে, তিন লাফে পড়ন্ত সূর্যেব দিকে এগিয়ে যায়। ধবল আলো শুষে বক্তাক্ত হয়ে সৃষ্টি ফজলুব কালো চামড়াব মধ্যে ডুবে যায়। বাউব বাতাস ফবফবায়। কোন একটা কুত্তানি হযত ডেকে ওঠে। গোবস্থানে বোজ সন্ধ্যায় কী এক হয় ধ্বংস শব্দ। ফজলুব গলা বেয়ে চিক্কণ ঢেকব উঠতে থাকে। বাতেই ফজলুব আসল কাজ অথচ বাতকেই তাব সব চাইতে বেশি ডব।

ফজলু সবচেয়ে বেশি ভবায় নিজেকে। গাঁয়ে বাতেব অভিযানে যাওয়াব আগে নিজেব ঘবেব বেড়ায় যখন কুপিব আলো তাব ছায়াটাকে লম্বা কবে দেয়, ফজলু নড়তে থাকে। এমন ছায়া দেখে ঘব থেকে বেবনো অকল্যাণ। দেখো না, কেমন যেন শয়তানেব মতো লাগছে। ফজলু কালো। জলন্ত কয়লাব মতো গবম চক্ষু, চুল নয়, মাথাব ছাল উঠতে থাকা ভেড়াব পশম--- তাই বলে সে এত বীভৎস ? ফজলু বাকাচোবা হয়ে ছায়াটাকে আয়ত্তে আনতে চায়। যত সে মাথা ভাঙে, তত সে কালো লোমশ জন্তুব আকৃতি নিতে থাকে। এবং সেই জন্তুব মাংস, শিবদাঁড়াব বিষ, ভাঙাচোবা বেড়াব ফাঁকে-ফোঁকবে কেমন থেঁতলে যায়। প্রচণ্ড ক্রোধে ফজলু কুপিব শিখায় ক্ষিপ্র পা ঠেসে ধবে।

আল্লাহব পৃথিবীতে ফজলু এখন একা। বেড়াব ওপাবে অসুস্থ চাচি স্বপ্নে কিচ্ছা বলতে থাকে। ফজলু চৌকাঠে পা বাখাব আগে সুবা পড়ে নেয়। আহবে অমাবস্যা। এখন ফজলু দা দিয়ে অন্ধকাব কেটেকেটে পথ চলবে। তাব মৃত্যুব মতো ভয় লাগতে থাকবে, একই সাথে বোমাঞ্চিত চামড়া স্ফিত হয়ে উঠতে থাকবে। আশেপাশে গরুব হাম্বা শুনলে কেল্লা ফতে। ফজলু বাবাকে যমেও টেনে নিয়ে যেতে পাববে না।

দুই

খড় বিচালিব সাথে উড়তে থাকে জবাজীর্ণ ঘ্রাণ। ফজলু নিদ্রায়, অথবা জাগবণে...অথবা চেতন অবচেতনেব শীর্ষে থেকেই খাড়া বাখে নাসাবন্ধ্র। সর্বত্র বিপদেব শব্দ। নিদ্রায় অশ্বেব খটখট....দববেশ দাঁড়ায় দবিয়াব ফেনাব ওপব...তাঁব অপার্থিব হাত প্রসাবিত...ধবণী ভাসতে থাকে স্ফুলিঙ্গে....ফজলু দাঁড়াতে চায়....পিঠেব একটা আজন্ম ব্যথা ককিয়ে স্থবিব কবে দিলে নিদ্রা ছুটে যায়। মনে

হয় জাহাজের বৃহদাকার মাস্তুল আটকে গেছে শিরদাঁড়ার চরে। পাশের ঘরের চাচিকে উচ্চস্বরে ডাকার আশায় হাঁ বিস্ফারিত হয়। তখন কাফনের কাপড় খুলে উঠে আসে লাশ...ফজলু সেই আদিম অবয়বের দীপ্রতা ছড়িয়ে তরতর খোঁজে তার আব্রু। নতুন কাপড়ের ঘ্রাণ। এ ঘ্রাণে কী অনির্বচনীয় যাদু...এর চক্কর থেকে বেরতে পারে না সে। দূর গাঁয়ে বিক্রি করলেই টাকা। আহ্ ঘ্রাণ, কিন্তু কাপড় কই ? রুক্ষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে লাশ...। তার তরঙ্গিত কণ্ঠে মেঘের গুঞ্জন...আয় আয়।

হতচকিত ফজলু বসতেই মেরুদণ্ডে ঘা। অনাহারী রাত তার ফাঁপা পেটের তলানি চুষতে থাকে। তন্দ্রা এলেই স্বপ্ন সমস্যা। ফজলুর নিদ্রাতে বড ভয়। মানুষের স্বপ্ন এত বীভৎস হয় ? বাস্তবে যে মৃত্যু, যে লাশ ফজলুর কাছে জল....নিদ্রায় সেই স্বাভাবিকতায় এত রক্ত...কম্পিত ফজলুকে ঘুটঘুটে রাত্তিরে বোবাওলায় ধরে...যত হাঁ করে তত নিঃশব্দতা। এত সাধের হরিণ....যা কিনা দৃষ্টি মনোরম... তার আধা দর্শনে ফজলুর বাতে বিষ জমতে থাকে।

তিন

এসব ছাড়া ফজলু ফি দিনভর কী যে এক মৌজে থাকে। দুঃখ কষ্টের গায়ে হাতির মতো থপাস থপাস পা ফেলে এগোয়। রাতে ঘুমই যেহেতু প্রধান বিপদ তাই পেশা বেশ সহায়। গত অভিযানে বেবনোর সময় মনে মনে সে একটি তাগডা বিড়ালকে দৃশ্যে আনে। বিড়বিড় করে— 'বিলাই তর পায়ে ধরি'। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার কল্পনা ঘুটঘুটে রাত্তিরেও বিডালের ছায়া স্পষ্ট হয়। এ ব্যাপারে তার বদ্ধমূল বিশ্বাস, সে যদি চকিতে ধরাও পড়ে, পুরো ধোলাইটি যাবে বিড়ালের শরীরের ওপর দিয়ে।

আহা রে, সেই রাতে কোন্ ভূতে ধরেছিল ? পুরো যাত্রার মধ্যেই ছিল একাগ্রতার অভাব। একটা বড় দানে বেরচ্ছে সবাই। পরদিন চাঁদ খানের মেয়ের বিয়ে। গয়না, টাকা....ঝনঝন....কী সুদূরপ্রসারী ঘ্রাণ...তার পয়লা থেকেই থাকা উচিত ছিল অত্যন্ত সতর্ক। সে কিনা ঘুটঘুটে রাতে জিনের ভয় তাড়াতে গলা ছেড়ে গান ধরল। ভরা বর্ষায় খাল বিল ডুবে আছে। শুধু কি গান ? রীতিমতো নাচন।

গভীরভাবে ভাবতে চেষ্টা করে ফজলু, ঘর থেকে বেরতেই তাকে শনি ধরেছিল। মনে হচ্ছিল পেছনে কেউ হেঁটে আসছে। সাঁ শব্দে সে হকচকিয়ে বার কয়েক পেছনে ফিরে তাকিয়েছে। কিন্তু অপার ফাঁকা। হরি দত্তের দীঘির কোণা, যেখানে পিঠের কুঁজের মতো ফুলে আছে মাটি, তাব পেট ফুঁড়ে বেরনো প্রেত জামগাছটা, যার গায়ে গোল গোল ফোস্কা— সেখানে এসেই দেখে চার হাত আকাশে স্থাপন করে পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে কেউ। মুহূর্তে কলজে খুলে মাটিতে ঝরে পড়ে। এর মধ্যেও তলানির জোর দিয়ে টর্চ মারতেই... শালা দেখো না, একটা কলাগাছও যদি সেখানে থাকত। কিছু নেই। মাথাটা বিগড়ে গেছে। ভাবতে ভাবতে আলে

পা রাখতেই বুকটা আচানক ফুরফুরে হয়ে ওঠে। আসমানের গাঙে জোর করে পানি পড়েছে। এক হাতে টর্চ অন্য হাতে পাকাটি নাড়তে নাড়তে গলা ছেড়ে গান, তারপর নাচন... একেবারে ভিরমি খেয়ে ধানি জমির কাদার মধ্যে। হি হি হাসি পায়। এর মধ্যে দেখো ফজলুর লুঙ্গির ভেতর খপ করে একটা ব্যাঙ ঢুকে পড়েছে। শুধু কি ঢুকেই ক্ষান্ত ? একেবারে জননেন্দ্রিয় ধরে টানাটানি। দক্ষ হাতে সে চেপে ধরে ব্যাঙটাকে খুবলে তুলে আনে। কীরকম চিঁচি করছে। যেন গোখরোর খপ্পরে পড়েছে। ওটার ঠ্যাঙ শক্ত আঙুলে চেপে ধরে ফাঁক বরাবর টর্চ মারে। শালী মাগী না মরদ পরীক্ষা করা দরকার।

এরকম ভাবনার পর ফজলু কাম বোধ করে। পরে নিজেকে তন্ন তন্ন কেটেছে সে, ওইরকম রুটি রুজির অভিযানেও এরকম অনুভূতি কি করে তাকে উসকায় ? শয়তান কি তাহলে সত্যিই পিছু নিয়েছিল ? সিঁদ কেটে মাটির ফোকর গলিয়ে সবে সে মাথাটা ঢুকিয়েছে, পেছনে ঠেলা দিচ্ছে সঙ্গীরা। তেমন শব্দ তো কোথাও হয়নি ? চোর চোর চিৎকার উঠল কেন ? মুহূর্তে সঙ্গীরা উধাও। তবে শরীরটা ঢুকল ঠিকই, কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে পেটটা কি খেয়ে অমন ফুলে উঠল, টানাটানি করেও বেরতে চাইল না।

আহা রে। সে কি গগন বিদারী পিটুনি। বেইমান সঙ্গীদের সাথে তার সারা জীবনে চুরির খায়েসটাই গেল মিটে। ঐ ব্যাঙটাই কি তবে তার আসল বন্ধু ? টানাটানি করে তাকে আটকে রাখতে চাইছিল ? তা না হলে সাক্ষাৎ শত্রু, ঘরের বউ যেখানে স্বামীকে পেছনে ডাকতে তিনবার চিন্তা করে সেখানে ব্যাঙ কিনা তার পথলা বাধা হয়ে দাঁড়াল ? গেরামের মুরুখ্য বউ আর ব্যাঙের বুদ্ধিতে আপাতদৃষ্টিতে কস্মিনকালেও ফজলু কোন পার্থক্য দেখেনি। দু'জাতির প্রাণী সম্পর্কে সে বিভাজন টানে সেদিনই প্রথম।

বীভৎস পিটুনির যন্ত্রণা সে প্রথম সরল পিঠেই গ্রহণ করেছিল। মানুষ বেকায়দায় পড়লে কী না হয়। প্রচন্ড ভিড়ের মারের আয়োজনের মধ্যে অমন সুন্দর পুতুলের মতো বাচ্চাটা, তার ঠিক মতো নুনুই গজায়নি, সেও কিনা ফাঁক বুঝে একটা থাপ্পড় মারল। ভাবলে রাগে এখনও অন্তরাত্মা গবগর করে। শেষে ফিট হওয়ার ভান না করলে, পুরো ধোলাই পর্বটা সরলভাবে ঘটতে দিলে, আজ ফজলু আসমান জমিনের মুখ দেখে ?

যাহ্ শালা। আজ যাত্রার সময়ও অতীতের পরাজয় পথ আগলে দাঁড়াচ্ছে ? আজকের চিন্তাতেও বিড়ালের ছায়া স্পষ্ট হচ্ছে না। আজ কামের ধান্দা বাদ দেওয়াই ভালো। ফজলু লুঙ্গি গুটিয়ে, আলো বন্ধ করে ঘরে আসে। চাচি ভয়ংকর শব্দে শ্বাস টানছে। গলার ছিদ্র যতদিন সরু থাকবে, বুড়ির জন্তু আকৃতির শ্বাসটা ততদিন সশব্দে গজরাতে থাকবে। বেশ ক'বছর ধরে দেখছে ফজলু, বুড়ি দাঁতে দাঁত চেপে গলার রাস্তাটাকে সরু করে রেখেছে। পেটে দু'বেলা ভাত নেই, পরনে কাপড়

নেই, তারপরও ফজলুর মতনই বেটির আসমান জমিন দেখবার শখ। অবশ্য তার বাঁচতে চাওয়ার অধিকারও আছে, চুল সাদা বলে ফজলু তাকে বুড়ি ডাকলেও কতই বা বয়স চাচির? গা-গতরে তো প্রায় যুবতীর মতোই। ফজলুর কি নিজেকে নিয়ে সাধে অত ডর? যে মহিলা তাকে সন্তানের মতো দুধকলা খাইয়ে বড় করল, তাকে কেন্দ্র করেও কিনা ফজলু নিজেকে বিশ্বাস করতে পারে না? কোনদিন অঘটন ঘটে গেলে ফজলুর বেঁচে থাকার শেষ যুক্তিটিও নিঃশেষ হয়ে যাবে না? নিজেকে সে কী জবাব দেবে? কোন গর্তে লুকোলে সে নিজের ছায়া থেকে পরিত্রাণ পাবে?

এই যে মুন্সি মিয়ার মুমূর্ষুতার দিকে শকুনের মতো তাক করে আছে সে। মুন্সি মিয়া মরবে। তাকে কবরে সমাহিত করে সবার কদম যখন স্তব্ধতার শেষ বিন্দুতে তখন, যখন মুন্সি মিয়ার হিসাব নিকাশের জন্য ফেরেশতারা এসে গেছে....ফজলু মিয়া গাঢ়, শান্ত রাতের পথ ধরে কম্পিত পা ফেলে হাঁটবে। তার একই সাথে তীব্র রোমাঞ্চ এবং ভয় লাগতে থাকবে। তারপরও সে বল্লম দিয়ে মাটি, বাঁশের আস্তরণ ভেদ করে শেয়ালের মতো সুড় সুড় করে ঢুকে যাবে অদৃশ্য ফেরেশতাদের মাঝখানে। লাশটাকে নগ্ন করে নয়া কাফনটা চুরি করে সিধা বাইরে এসে হাঁপাতে থাকবে। তারপরও কি কোন মাত্র গ্লানি হবে তার? নিজের ছায়ার ভয়ে গর্ত খুঁজতে ইচ্ছে হবে? কোনদিন হয়েছে?

ফজলু একে পাপই মনে করে না। যে লোক মরে গেছে তার কি দরকার নয়া কাপড় পরে শুয়ে থাকার? ফেরেশতার সাথে তার যা জীবনের দর কষাকষি তার মধ্যে তার দেহ কী ভূমিকা রাখছে? অত দামি কাপড়টা পচিয়ে সেটাও বিরান হয়ে যাবে। যে আত্মার সাথে ফেরেশতার মোলাকাত তার মধ্যে যাওয়ার সাধ্য ফজলুর আছে? বরং মরা মানুষের কাপড়টা বেচে ঠিক করেছে, ফজলু, নিজে না খাক, স্তন্যদায়িনীর মুমূর্ষু মুখে যতটুকু সম্ভব জল ঢালতে পেরেছে। এ নিয়ে ফজলুর ডর থাকবে কেন?

এইসব জাগতিক পাপ পুণ্য নিয়ে ফজলুর মনে কোন ভীতি নেই। সে দালান করছে না, ধানি জমি কিনছে না, পেটের দানার জন্য যা তার কর্ম, তা নিয়ে নিজের কাছে কোন জবাবদিহি নেই। তার সমস্ত ভয় ভেতরের জন্তুটাকে নিয়ে, যে দানাপানি, পাপ পুণ্য বোঝে না, মুহূর্তে ফজলুকে রূপান্তরিত করে সর্বোৎকৃষ্ট গাধাতে এবং মস্তিষ্কহীন ফজলুকে টেনে নিয়ে চলে সর্বনাশা অপার্থিবতার দিকে।

সে রাতে কী সর্বনাশটাই হতে পারত। দিনের বেলা যে ফজলু লাজুক, নারী দেখলে সিধা মাটিতে চোখ...তাকে কিনা রাতের অন্ধকারে জন্তুটা হাঁটিয়ে নিয়ে চলল হরি দত্তের বাড়ির দিকে? ফজলু টের পাচ্ছিল চূড়ান্ত পতনের শুরু, তার জীবনের আহারের পথ প্রশস্ত হচ্ছে, তারপর কী সে নিজেকে ফেরাতে পারছিল? হরি দত্তের মেয়েটা তার সারা মাংসে গরম তেল ঢেলে দিয়েছিল। তার অহংকারী পা, নরম থুতনি, শরীর ছটফট করতে করতে ফজলু মেয়েটার অপেক্ষায় পাশের

ঝোপে আশ্রয় নিয়েছিল। ভারি জ্বরবোধ হচ্ছিল। কিন্তু জন্তুটা তাকে পাক্কা দুঘন্টা মাটির সাথে ঠেসে রেখেছিল, প্রতিটি মুহূর্তেই খাড়া প্রস্তুতি, বেরনোর পরপরই...হালুম....মেয়েটার রক্ত মাংস আগলে তবেই যদি ফজলুর জলুনির উপশম হয়। চূড়ান্ত রোমাঞ্চে সারাক্ষণই সমস্ত অস্তিত্বে পাকা ধানগাছের খসখস।

সেই মেয়ের প্রাকৃতিক প্রয়োজন হয় না। মশার বিষাক্ত কামড়ে একসময় উদ্দীপিত ফজলুর মধ্যে ভর করা জন্তুটা নেতিয়ে এলে তাকে মাথায় করে সুস্থির ফজলু ঘরে এলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

পাশের ঘরে চাচির শ্বাসের শব্দ ঝড়ের বেগে বাড়ছে। ফজলু কান খাড়া করে। চাচি অস্পষ্ট গোঁ গোঁ শব্দ করছে ফজু ফজু...।

চকিতে লম্বা পা ফেলে ও ঘরে গিয়ে দেখে অবস্থা অন্যরকম। কুপির খাড়া শিখা ছুরির মতো চাচির চক্ষু টেনে বের করতে চাইছে। চোখ তো নয় যেন চারপাশ ছেঁটে রাখা কাঁচা ডাল। শ্বাস, শরীর, ভাঙা কণ্ঠস্বর, যা দুমড়ে মুচড়ে চাচি যুদ্ধ করছে মহাশক্তির সাথে। তার শরীরে হাত রেখে বড় মায়ায় ফজলু আপ্লুত হয়ে ওঠে। সারা জীবন মহিলা একা কাটাল। কোনকালে স্বামী মরেছে, স্বামীর স্মৃতি চাচির মনে গল্প শোনা কোনও দৈত্য অথবা রাজকুমারের মতো। তারপর এই দেহ, এই মনকে এত বঞ্চনা, এত পিপাসা, কোন মানে আছে? নখ দিয়ে মাটি আঁচড়ে বীভৎস মুখে চাচি যন্ত্রণা ঠেলে বের করতে চাইছে। ফজলুকে কী বলতে চাইছে ইশারায়। কিন্তু কিছুতেই শব্দ ভাষায় রূপ নিচ্ছে না। ঘরে বদ্ধ হাওয়া। চাটাইয়ে বিছানো তেলচিটে কাঁথায় ততোধিক বদ্ধতা। রাতের দরজার গেরো খুলে দেয় ফজলু। চট দিয়ে ঢাকা খিড়কি খোলার আশায় হাত দিতেই ঝুরঝুর করে ভেঙে পড়ে। বাতাস বড় উদার। এইসব পথ দিয়ে আসতেও কার্পণ্য করে না। চিটানো বালিশের তুলোয় গাঁজলা ভরা মুখ ঠেসে যাচ্ছে। তার মাথা ওঠাতে হলে ফজলুকে বাঁকা হতে হয়, এবং তা হতে গিয়েই— ইয়া আল্লাহ্ ফজলুর শিরদাঁড়ায় কে ইঁটের ঘা বসাল রে?

চোখ উপচে জল আসে। এইরকম করুণ মুহূর্তেও, যখন জানালার ঝুরঝুরে গুঁড়োর সাথে ফজলুর সমস্ত অক্ষমতা ঝরে পড়ছে, হরি দত্তের মেয়ের কথা ফজলুর চকিতে মনে পড়ে যায়। ফজলু কি নিজেকে সাধে বেজন্মা বলে। চাচির শ্বাসের কিছু সুবিধা হচ্ছে। মিহি বাতাসে তার সতেজ গলা যখন খুলতে থাকে, শোন বাবা, কথা আছে— তখন ফজলু পাকা চিকিৎসকের মতো, কায়দা মতন নিজেকে চাটাইয়ে বসিয়ে চাচির সুস্থির মাথা বালিশে হেলিয়ে দেয়। সমস্ত অন্ধকারে সোরগোল তুলে দীর্ঘ দিন পর তার সেবার হাতপাখা ফরফর করে ঘুরতে থাকে।

এই ভাবে
দিন যায়...
দিন যায়...দিন যায়....।

চার

সে রাতে কী ঝড়টাই না উঠল। আসমান উজার করে হায়রে কী তরল এই ভূতুড়ে বৃষ্টির মধ্যে, যখন ফজলুর হাড্ডিমাংস সেধিয়ে যাচ্ছে...দেখো না দুই দিন আগে ভিরমা খেয়ে পড়ে থাকা যুবতী চাচি কেমন গতি ধরেছে। গ্রামে খরা আছে, ক্ষুধা আছে, মৃত্যু নেই। মানুষ ঘাস মাটি খেয়ে বাঁচতে শিখছে। ফজলু অগত্যা মাঝে মাঝে ভিক্ষা করতে দূরে যায়। যা হোক আজ পাঁচ রকম চাল গলায় পড়ায় হা আল্লাহ, বুড়ির কণ্ঠ কেমন ঝনঝনিয়ে উঠছে।

ফজলুর সারা গায়ে বিষ জমতে থাকে। নাহ, কথায় কথায় তার অত বিষ কেন? যে মহিলা দীর্ঘ জীবনে কখনও মা, কখনও স্ত্রী, কন্যা...অতসব ভূমিকায় ফজলুকে ওম' দিয়েছে, তার আনন্দেও ফজলুর বিষ? রাগে ক্রোধে নিজেকে দশ দিগন্তে ছুঁড়ে দিতে চায় সে। সন্তর্পণে দাঁড়ায়।

পাঁচ

মহাজাগতিকতার টানে ফজলুর রহমানের পঞ্চ ইন্দ্রিয় সম্মুখে বিস্তারিত হয়। যখন দিন যায়...দিন যায়... এমন হচ্ছিল, ফজলুর সমগ্র চেতনায় আদিম শব্দ...নিজেকে সে বারংবার ভেঙেছে...কুয়োর তলার জল তন্ন তন্ন ছেনেছে...তিন বেলা গরম ভাতেই কি তার সব বেদনার উপশম? কোন তৃষ্ণায় নিরন্তর প্রাণপুঞ্জের উল্লম্ফন? জটিল পাকের সমাধান কল্পে সে কি বিবাহ করবে?

ভাবতেই বরফ....ভাবতেই শিথিলতা। উত্তরাধিকারের শিক্ষামতে সেই নারী তো হবে আপোষকামী। ভিখিরির তলায় নিজেকে সহজে বিছিয়ে দেওয়ার জন্য সর্বাঙ্গে ঘষবে রঙকালি। সন্ধ্যার শস্যভূমিতে এমনই এক আপোষকামী নারীর প্রতিবাদহীন খুলে ধরা ফজলুকে পুরুষত্বহীন করেছিল। সেই বিবস্ত্রতায় কোন কাঁটা নেই....এ যেন দাঁতহীন মাড়ি... ফজলু যত নেতিয়ে পড়ে তত সেই নারীর ধিক্কার। সেই বিচলিত সন্ধ্যা কি ফজলুকে অপমান থেকে পরিত্রাণ দিয়েছিল? আতঙ্কিত ফজলুর সর্বাঙ্গে শুধু গ্লানি। এভাবে ফজলু প্রতি অক্ষর দিয়ে নিজেকে জেনেছে। জেনেছে তার স্নায়ুতন্ত্র বিকল। ধর্ষণ ভাবনাতেই শুধু পঞ্চ ইন্দ্রিয় জেগে ওঠে!

কেবল গরম ভাত ফজলুর সমাধান?

আর জন্ম জন্ম যে চৌর্যবৃত্তি এবং কাফন উন্মোচনের উন্মাদনার সাথে তার নিয়তি গেঁথে গেল, বাঁচার সহজ-সাপটা পথ কি ফজলুকে পরিত্রাণ দেবে?

হায়রে জ্যোৎস্না। মহিলার কণ্ঠে এ কী আদিম গীত? ফজলু অনুভব করে তার মরা কোষে তেল জমেছে! শিঙায় ফুঁ দিচ্ছে মহাশক্তি.... অপার্থিব পা বেড়া উন্মোচন করে দেখে জননী নয়, শুয়ে আছে ফেরেশতা কন্যা। চাচিকে সে এত নম্র, উদ্দীপিত আগে কখনও দেখেনি। মাথায় তেলের সুগন্ধি, বেড়ায় পিঠ, দু'পা প্রসারিত পুরো আব্রু জুড়ে কী এক আলুথালু। এই গীতের সুরে কী এক পাঁচফোড়নের ঘ্রাণ। চোখ

বন্ধ ধ্যানস্থ। আহা! জ্যোৎস্নার গায়ে পেস্তাবাদামের সুরভি।

ফজলুর ভেতর থেকে চাগিয়ে ওঠে বাঘের শিখা, সে টের পায় তার মধ্যে মটমটিয়ে উঠছে শয়তান, নিজেকে সে প্রচণ্ড চিৎকারে থামাতে থাকে: ফজলু থাম, ফজলু সর্বনাশ... কে শোনে কার কথা? চাচির অবিন্যস্ত অবয়বের দিকে সবেগে তাড়িত হয়ে বাঘ যেই বলে উঠতে থাকে হালুম....অমনি চাচি বড় কোমল, বড়ো নরম করে বলে ওঠে— বাপ্, তোরে একটা কতা কই হুন। চাচির এরকম কণ্ঠে ফজলুর সব রক্ত নিবে যায়। ভয়ে থরথর হয়ে সে সেই জননীতুল্য মহিলার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে। চাচি ওর মাথায় হাত রেখে ওর হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিয়ে বলে ওঠে, এই টাকাডা রাখ। আমাব মরণের সময় হইছে। এইডা কাফনের দাম। কবর খুইড়া বাজান আমারে বেআব্রু করিস না।

জ্যোৎস্নার ধবল আলোর বিস্তৃত মাঠে দাঁড়িয়ে ফজলুর ভেতরাত্মা কম্পিত হয়। নিজের স্বভাবের শক্ত দড়ি থেকে বেরনোর জন্য সে প্রাণপণে ছটফটায়। কিন্তু চাপ চাপ রক্ত শুধু, কিছুতেই মুক্তি মেলে না। ফজলুর নিজের বিরুদ্ধে গ্লানি হয়, ধিক্কার জন্মে. উর্ধ্বমুখী হাঁ করে তার প্রচণ্ড যোদ্ধা মন খুঁজতে থাকে, কোন্ সেই শক্তিতে তার নিয়তির মধ্যে এমন জটিল চক্র গেঁথে গেল, কে তার দেহ ইঁদারার জলে নিক্ষেপ করে বারংবার ওপরে ওঠাতে থাকে? কার হাতে দড়ি?

খুঁজে পায় না।

নির্জন স্তব্ধ রাতে বসে ফজলু ডাক ছেড়ে কেঁদে ওঠে।

সীমন্তিনী

জুলফিকার মতিন

সকালবেলাতেই বেঁকে বসলেন কমাণ্ডার. 'না চলবে না, এ গ্রামে থাকা চলবে না। নতুন শেলটার দেখ।'

ভোর না হতেই চারপাশটা ঘুরে এসেছে সে। রাতে যখন পৌঁছান গিয়েছিল তখন অবশ্য করবার ছিল না কিছুই । পৌষের কুয়াশা জড়ানো প্রকৃতির সমস্ত নিস্তব্ধতা জমাট বেঁধেছিল মনে। সড়ক থেকে নেমে অপরিসর জঙ্গলাকীর্ণ পথে অনেকটুকু হেঁটে আসতে সবাইকে হোঁচট খেতে হয়েছে বহুবার। ভগ্ন চাঁদের স্বল্প আলোয় এখানে ওখানে ছড়িয়ে থাকা ছায়ারা একজনকে অন্যজনের কাছ থেকে কেবলই লুকিয়ে ফেলছিল।

বুড়ো এমনিতেই ঘুমোয় না। তারপর বয়স বাড়াতে এখন আর ঘুমও আসেও না ভাল করে। দিনের বেলা গিয়েছিল বেহাই-বাড়ি। তার ছেলের বউ এতদিন ওখানে পিঠে খাচ্ছিল বাপের ওখানে। তাকে আনতে। সারাদিনের পরিশ্রমে অনেক রাতে তন্দ্রার মত আসলেও পিপীলিকার সারির মত একদল মানুষ যে নিঃশব্দ পায়ে পায়ে এগোচ্ছে, তার খবর মৃত্তিকার অব্যক্ত কম্পনে কানে পৌঁছায়। সজাগ হয়েও কিছুক্ষণ ভাবে, যতি মিলিটারি হয় ? চতুর্দিকেই তো মিলিটারির ভয়। আবার ভাবে, দূর ছাই, তাই বা কেন হবে ? মিলিটারি তো আসবে দিনের বেলায়। মেশিন গান— বন্দুক— টমি গান,—আরো যেন কী কী সব নাম, সেগুলো দাওড় করতে করতে। দিনের আলোকেই ভয় করে তারা—এলোপাথাড়ি গুলি ছোঁড়ে। লক্ষ্যহীন।

ভাবতে ভাবতে ফোকলা দাঁতের শব্দহীন হাসিতে মুখ ভরে যায় বুড়োর। তবে কী তারা ? সহজ করে চেঁচায়, 'কে যায় ?'

গলা শুনেই মাটির সাথে পা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে সবাই। আশ্রয়ের ব্যাপারে

সম্পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষাটা নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয়। নির্দেশও আছে সে রকম। পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকায়। অপেক্ষা করে কমাণ্ডারের।

বুড়ো কিন্তু ইতিমধ্যেই বেরিয়ে পড়েছে ঘর থেকে। প্রাকৃতিক প্রয়োজনও ছিল। ভিটার পূর্বদিকের প্রান্তে এসে দাঁড়াতেই দেখে নিচের রাস্তায় সারি সারি মাথা। তার আর কোনো সন্দেহ থাকে না। সে উৎসাহ ভরে চেঁচায়, 'কই গো, কথা বলছ না যে—'

কমাণ্ডার ছরোয়ার্দী বি-এ পড়ার ভয়ে বিয়ে করেছিল ঘরজামাই থাকবে বলে। কিন্তু শ্বশুর সাহেবের চল্লিশ পার না হতেই ছাড়তে হয়েছিল শ্বশুরবাড়ি। বাড়ির কাছে জংশন স্টেশন। জীবনে কী ভাবে কী করা যায়— এই কথাটা নিরিবিলিতে গভীরভাবে ভেবে দেখার জন্য চক্ষু মুদে শুয়েছিল খালি ট্রেনের বগিতে। সেই ট্রেন এস পি. সাহেবেরা চালিয়ে নিয়ে ঢুকে পড়েছিলেন ভারতে। এমনি এমনি ফিরে যেতে আর তার মন টানেনি। জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধা তাকে আত্মহত্যার পথেও নিয়ে যেতে পারত। একদিকে জীবিকা সংস্থানের অক্ষমতা, অন্যদিকে বাড়িতে নবজাতিকা। অ-পারগতার গ্লানিই তাই হয়ে উঠেছিল আরো বেশি ভারাতুর। আত্মহত্যা না করলেও ছরোয়ার্দী মৃত্যুর পথই বেছে নিল। কিন্তু তাতে করে জীবনের কোনো কোনো অর্থ তার কাছে ধীরে ধীরে তাৎপর্যময় হয়ে উঠে— বড় বেশি পরিষ্কার হয়ে ধরা পড়তে থাকে।

বুড়ো কিন্তু থামে না। জিহ্বা লকলকিয়ে নদীর স্রোতের মত কথার প্লাবন ডাকে, 'তাই তো বলি, এতদিন কোথায় ছিলে বাপধনেরা ? এত গেরামে মুক্তি এল, আনরা আর জাতে উঠতে পারলাম না। আজক্যা আমাদের গেরাম ধন্য হলো। কই, কিছুই যে কও না? বোবা নাহি? যুদ্ধ করবা, যুদ্ধ? আমি তো বুড়া। আমারে আর ভয় কর্যা কি করবা, বাপধন ?'

বুড়োর খুশিতে ছরোয়ার্দী খুশি। কিন্তু সমস্যা হল, সে যে-ভাবে লাফাচ্ছে, তাতে মনে উৎসব লেগেছে। তার চেঁচামেচিতে জানাজানি হয়ে গেলেই বিপদ। কার মনে কী আছে বলা মুশকিল। একবার যদি থানায় খবর পৌঁছে যায়, তবে সকাল হতে না হতেই সমস্ত গ্রাম ঘিরে শুরু হবে তাণ্ডবলীলা। তাই সে কঠোর হতে চেষ্টা করে। ভাবে, বুড়োটাকে বেঁধে সঙ্গে রাখাই ভাল।

কমাণ্ডারের সিদ্ধান্ত নিতে যেটুকু সময় লাগছে সেই ফাঁকে এগিয়ে আসে বিমল ওরফে বেমল। গ্রামেরই ছেলে, বলে, 'দাঠাকুর, আমারে চিনবার পারচেন তো ?'

চোখ পিটপিট করে মতিজুল বুড়ো, 'চিনতে পারি নাই, চিনতে পারি নাই। মুক্তির হাথে আসচো, তুমি তো দ্যাশের শত্রু।'

বিমল বলে, 'একটু আস্তে কথা কন্ দাঠাকুর, একটু আস্তে কথা কন।'

—'আস্তে কমু ক্যান ? তোমরা কি চোর ডাকাত ?'

বুড়ো যেভাবে এগোচ্ছে, তাতে বিপদের সম্ভবনাই ছরোয়াদীর মনে দোলা দিতে থাকে। সে সিদ্ধান্ত নেয়। এগিয়ে এসে ঠাণ্ডা গলায় বলে, 'আজকে রাতে আমরা আপনার বাড়িতেই থাকব। আমাদের কথাটি আর কারো কাছে ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করবেন না। বিপদ এলে আমরা হয়ত পালিয়ে যেতে পারব, কিন্তু আপনাদের যে শাস্তি হবে, সে কথাটা ভেবে মুখ বন্ধ করে রাখুন।'

কথা শুনে মতিজুল বুড়ো হাসে। বিপদের কথা আর কী শোনাবে ছোকরাগুলো। বিপদের কথা তারা কী জানে ? গোলমাল শুরু হতেই পালালেন তো সব ভিনদেশে। এখন আবার এসেছেন রাইফেল বন্দুক নিয়ে। এখানে কুট্টস— ওখানে কুট্টস, তারপরে তো হাওয়া। বিপদটা দেখছে কে, শুনি ?

তবে চিন্তিত হয়ে পড়ে অন্যকারণে। ঘরতো মাত্র দু'টো। অনেকটা ইংরেজি এল অক্ষরের মত। একটা পুবদুয়ারী। অন্যটার মুখ দক্ষিণে। ভেতরের আঙিনায় যাতায়াত করার জন্য দুয়ার আছে উল্টাদিকেও। ওই বাড়িকে দক্ষিণসদরীও বলা যায়। আবার পুবসদরীও বলতে বাধা নেই। রাস্তা থেকে ভিটেটা বেশ উঁচুতে। বর্ষাকালে চারপাশে পানি যখন থই থই করে, তখন কেবল মতিজুল বুড়োর নয়, এ অঞ্চলের সব বাড়িই কাছিমের পিঠের মত ভাসে। দু'পাশ খোলা। ভিটে থেকে নেমেই রাস্তা ধরা যায়। অন্য দু'পাশ জঙ্গলাকীর্ণ। নির্ভরযোগ্য ভাবে আব্রু রক্ষার নিয়মিত ব্যবস্থা। গ্রামের কোনো বাড়িই তার ব্যতিক্রম নয়।

ছরোয়াদীর ইউনিট দেড়শ জনের। শুরুতে ঠিক এত লোক ছিল না। বারোজনের একটি ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে জুলাই মাসের শেষের দিকে এসে ঢুকেছিল দেশে। গোটা দুয়েক অপারেশনে আশাতীত সাফল্যের পর পাকিস্তানি সৈন্যদের ফেলে যাওয়া অস্ত্রশস্ত্র কাজে লাগানোর জন্য নতুন রিক্রুট করা হয়েছিল। অনেকটা বাধ্য হয়েই। কেননা নিজেদের পক্ষে সব সময় ওগুলো বহন সম্ভব ছিল না। কোথাও রেখে দেওয়াটাও সঙ্গত মনে হয়নি। তাতে করে সেগুলির ব্যবহার চুরি-ডাকাতি খুন রাহাজানিতে লাগানোর সম্ভাবনা ছিল ষোল আনা! এভাবে যখনই কোনো বাড়তি অস্ত্র এসেছে, লোক বেড়েছে একজন। আর তাছাড়া অস্ত্রধারীদের কথা ছেড়ে দিলেও আরো অনেক মানুষ আছে ইউনিটে। তাদের কাজও ভিন্ন। খোঁজ-খবর নেওয়া, আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা, খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ ইত্যাদি। সত্যি কথা বলতে কী, এদের বাদ দিলে তার বাহিনীও অচল। তদুপরি রয়েছে আরো অনেক কিশোর ও তরুণ। বাড়ি থাকাটা যাদের মোটেও নিরাপদ নয়। তারাও সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে। কখনো কাজে লাগে, বাকি সময় হরিণের শিংয়ের মত বিপদের সম্ভাবনা ডেকে নিয়ে আসে। সুতরাং এত লোকের একটা ইউনিট নিয়ে গোপনীয়তা বজায় রেখে চলাফেরাটা অসম্ভব। অথচ একটা অসম শক্তির সাথে মরণপণ লড়াইয়ে নিজেদের আত্মগোপন করে রাখা আর সুযোগ বুঝে আঘাত হানা ছাড়া গত্যন্তরও নেই কিছু। এ জন্য

ছরোয়ার্দী সব সময়ই শেলটার নেবার সময় ইউনিটটাকে অনেকগুলো ছোট ছোট দলে ভাগ করে ফেলে। আশেপাশের গ্রামগুলিতে তারা থাকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে।

তবে এ বারের ব্যাপারটা ভিন্ন।

প্রায় প্রত্যেক রাতেই শেলটার বদল। মাইলের পর মাইল, বর্ষা চলে যাবার পর থেকেই প্রায় অন্তহীনভাবে হাঁটা, রসদ ও খাদ্যের অপ্রতুলতা দলের লোক-জনদের অনিবার্যভাবেই কাহিল করে ফেলেছিল। তদুপরি গত সপ্তাহের দু'দুটো দুর্ঘটনা। তার প্রতিক্রিয়াও ছিল সাংঘাতিক।

প্রথমটা ঘটেছিল ব্রহ্মগাছা অপারেশনের সময়। ছোট্ট তরতরিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর উপর বেললাইন উড়িয়ে দিয়ে সরবরাহের পথ বন্ধ করার নির্দেশ ছিল ছরোয়ার্দীর উপর। সে-মত সে-এগিয়েও ছিল। রাতে পুলটায় পাহারা দিচ্ছিল কয়েকজন রাজাকার। পাকিস্তানিরা ছিল একটু দূরে নিরাপদ জায়গায়। তাঁবুতে। তারা কোনো কিছু বুঝে উঠবার আগেই রাজাকারদের আয়ত্তে আনতে অসুবিধা হয়নি মোটেই। ওদের দেখামাত্রই এমন করে হাত উঁচিয়ে থাকল, তাতে বোঝা গেল বহু পূর্ব থেকেই তারা আত্মসমর্পণ করার জন্য বসে আছে। সুতরাং বেশ ধীরেসুস্থে এক্সপ্লোসিভ লাগিয়ে তার টেনে নিয়ে যাওয়া হল সুবিধাজনক জায়গায়। সেখান থেকে সরে যাওয়া যায় সহজেই । কিন্তু সুইচ অন করবার সময় কারোরই খেয়াল নাই যে ক্লাস-সেভেনে-পড়া আওলাদ এক্সপ্লোসান পয়েন্টেই রয়ে গেছে।

প্রচণ্ড বিস্ফোরণের সাথে আওলাদের মৃত্যু চিৎকারও মিশে ছিল। আলাদা করে তা বুঝে ওঠা যায়নি। এমন একটা সফল অভিযানের পর পরিতৃপ্তির সঙ্গে ঘুমিয়ে বেশ বেলা হলে সবাই যখন রোদ পোহাতে দাঁত ঘষছিল, খবরটা এসেছিল তখনই।

খবর আনা-নেওয়ার কাজ করে মতিয়ার। গুটি গুটি পায়ে শেলটারের ভেতর এসে পড়তেই জিজ্ঞেস করে ছরোয়ার্দী, 'খবর টবর কী ?'

'খবর ভাল না কমাণ্ডার', মতি মাটিতেই বসে পড়ে, 'ব্রীরিজ ভালই আছে লোহালক্কড় কাঠ-ফাঠ কিছু এদিক ওদিক চল্যা গ্যাচে— সারাতে বেশি সময় লাগবো না। তবে ত্যারো চোদ্দ বচরের একটা ছাওয়াল মারা গ্যাচে। ব্যান ব্যালাতেই মিলিটারিরা লাশটা পুরণ বাজরে রাখ্যা দিচে। আশে পাশের গেরামের লোকেরা দেখ্যা যাতাচে। ছাওয়ালডা যে কার তা কেউ বলতে পারচে না। বুঝলেন কমাণ্ডার, মিলিটারির কাচে স্বীকার না করলেও এলাকার ছাওয়াল অ'লে চেনা যাতো।'

মতিয়ারের খবর শোনার জন্য অনেকেই চারপাশে ভিড় জমাচ্ছিল। তাদের অনেকেরই তখন খেয়াল হয়,—তাইতো, তেরো চৌদ্দ বছরের ছেলে,— তাইতো আওলাদ যে তাদের সাথে ছিল। অপারেশনের পর থেকে সে যে আর তাদের সাথে নেই, কেউই তা লক্ষ্য করেনি। ঘর খোঁজা হল, বার খোঁজা হল। না, সে কোথাও নেই। ব্রিজের উপরেই সে ছিল, এটাই তার সম্পর্কে সর্বশেষ সংবাদ।

ছরোয়ার্দীর ইউনিটে মৃত্যু এই প্রথম।

অনেকদিন ছিল ছেলেটা। বলা যায়, দেশে ঢুকবার পর থেকেই। বাবা ছিলেন সরকারি অফিসার। পঁচিশে মার্চের পর ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ক্যান্টনমেন্টে। তারপর থেকে কোনো খবর পাওয়া যায়নি। অনেকেরই না। অনন্যোপায় মাতা ঢাকা শহরের ব্যয়ভার বহনে অসমর্থ হয়ে চলে এসেছিলেন পরিবারসহ স্বামীর ভিটায়। সেখানেও ছিল না আয়ের কোনো নিশ্চিত উৎস। এই ঘটনা কিশোর আওলাদের মনে পাকিস্তানিদের ওপর রূপান্তরিত হয় ভীষণ আক্রোশে। সুখে হোক আর দুঃখে হোক, মা তার ছেলেকে চেয়েছিলেন আপন আঁচলে বেঁধে রাখতে। কোনো ফল হয়নি। প্রথম সুযোগেই সে মিলে যায় মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের সাথে।

এই কথা আওলাদ কতদিন ছরোয়ার্দীকে বলেছে। শুনিয়েছে প্রায় সবাইকে। অনেকদিন তাকে কোনো রাইফেল দেওয়া যায়নি। একটা রাইফেলের জন্য কেঁদে ফেলত।

ছরোয়ার্দী ঠাট্টা করে বলত, 'এখন রাইফেল দিয়ে কী করবে? যখন পাকিস্তানিদের সাথে সরাসরি যুদ্ধে নামব, তখন তুমি ঠিক আর্মস পেয়ে যাবে।'

সঙ্গে সঙ্গে ধারাল গলায় জবাব দিত আওলাদ, 'তা কেন হবে? পাকিস্তানি আর পাকিস্তানিদের দোসর তো একই কথা। রাজাকার আর আলবদরেরা কি কম পাকিস্তানি?'

শেষ পর্যন্ত একটা রাইফেল দিতে হয়েছিল তাকে। একেবারেই বৃটিশ আমলের থ্রি নট থ্রি। ভারী। কাঁধে করে ঘুরতে বেশ কষ্ট হত ছেলেটার।

সে আর নেই। আওলাদের আগ্রহেই ছরোয়ার্দীদের একবার শেলটার নিতে হয়েছিল তাদের গ্রামে। ছরোয়ার্দীকে বিশেষভাবে নিয়ে তুলেছিল তাদের বাড়িতে। আওলাদদের মা ছরোয়ার্দীর হাত ধরে বলেছিলেন, 'আমার যে কী কষ্ট সে শুধু আমি জানি বাবা। এই ছেলেটাও যদি মারা যায়, তবে আমার আর কিছুই থাকবে না। বাবা, তুমি আবার ওকে আমার হাতে ফিরিয়ে দিও।'

হরমুজ এসে ঝাঁপিয়ে মাটিতে পড়ে, আমাকে মার‍্যা ফালন ছরোয়ার্দী ভাই। বীরিজের উপর থাক্যা আমি চল্যা আল্যাম, একবারো অর কতা মনে পললো না। আমিই ওকে ম্যারা ফালাচি।

দুর্ঘটনার দায়িত্ব কার, সেটা নির্ণয় করতে যাওয়াটা এ সময়ে বাতুলতাই বটে। ইচ্ছাকৃত যে নয় সে বিষয়ে কারোরই কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এই অকালমৃত্যু— তার শোক ভয়াবহ। স্কুলে পড়া ছাত্র— একেবারেই কিশোর— দলের সবারই মমতা পড়ে গিয়েছিল। সেজন্য দুঃখটা আরো মর্মস্পর্শী।

দুর্ঘটনা আরেকটি ঘটলো। কৃষকগঞ্জ বাজারে।

সপ্তাহে দু'দিন হাট বসে। আর রোজ সকাল থেকে বলা যায় প্রায় দুপুর পর্যন্ত

দুধ মাছ তরিতরকারির বাজার। স্থায়ী ঘর আছে অনেকগুলো। প্রয়োজনীয় জিনিসই পাওয়া যায়। রিট্রিট করার সময় এক শনিবারের হাটের দিন ভিড়ের ভিতর মিশেছিল কয়েকজনের একটা ক্ষুদ্র বাহিনী। মোতালেব ছিল তাদের সাথে। এখনো পাকাপোক্ত হয় নাই। কাজ করে হেলপারের। তার হাতে ছিল গ্রেনেড। ভিড়ের ভিতর মিশে থাকলেও কী করে ওদের চিনে ফেলে লোকেরা। বোধকরি আপনজনের প্রতি অন্তরের টানই ওদের চিনিয়ে দেয়। সুতরাং ছোট খাট ভিড় জমে গিয়েছিল ওদের ঘিরে। একজন স্টেনটা দেখিয়ে বলে, 'কন দেহি ভাই, কেমন করে দাওড় করে?'

আরেকজন বলে, 'গ্রেনেড ফুটলে কত লোক মরে?'

শেষোক্ত কথাগুলো বলা হয়েছিল মোতালেবকে লক্ষ্য করেই। সঙ্গে সঙ্গে সে উৎসাহী হয়ে পড়ে। হাতের গ্রেনেডটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সবাইকে দেখাতে থাকে। অসাবধানতায় অতিরিক্ত উৎসাহের উত্তেজনায় কখন যে গ্রেনেডের পিনটি খুলে গিয়েছে, প্রথমে সে বুঝতেই পারেনি। তারপর যখন গরম লাগতে শুরু করে তখন তার খেয়াল হয়। কিন্তু হাত থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে কোথায়? চারপাশে লোক— হাটভরতি লোক। ফেলবে যেখানে সেখানেই মরবে একগণ্ডা। উপায়ন্তর না দেখে আত্মহত্যা স্বীকার করে হাতে চেপে রাখে। মরতে যদি হয় তবে সে আগে মরবে। অনেকজন আহত হয়েছিল। মরেছিল সে আর আরেকটি লোক।

সবাই বুঝেছিল ওই ব্যাপারটিও দুর্ঘটনা। কিন্তু শত্রুপক্ষের স্বপক্ষে জনমত তৈরিতে সাহায্য করেছিল অনেকটুকু। ওই জন্য ছরোয়ার্দীকে কৈফিয়ত দিতে হয়েছে হেড কোয়াটারে।

এবার তাই ইউনিটের লোকজনদের কাছে পরামর্শ করেই ছরোয়ার্দী ঠিক করেছিল আপাতত আর অপারেশন নয়— সপ্তাহখানেক কোথাও সবাই মিলে বিশ্রাম নেবে। শরীরের নাট বল্টুগুলো সারিয়ে নেবার জন্য— দুর্ঘটনা দু'টোর মানসিক প্রতিক্রিয়া কাটিয়ে ওঠার জন্য এই বিশ্রাম ছিল একান্তই প্রয়োজনীয়। ব্যবস্থাদিও হয়েছিল সেরকম। কিন্তু মাঝখান থেকে গণ্ডগোল পাকিয়ে তুলল অতিউৎসাহী মুক্তিবাহিনী প্রেমিক এই বুড়ো।

সে কিন্তু ততক্ষণে এগিয়ে গেছে পুবসদরী ছেলের ঘরের দিকে। অনেক দিন পর একত্র হয়েছে, কারো চোখেই ঘুম নেই! এতক্ষণ ধরে ওরা কথাই বলছিল। কিন্তু বুড়োর সাড়া পেয়ে নিঃশব্দে পড়ে আছে। বিপদ ওদেরও কম নয়। মুক্তিবাহিনী এসেছে রাত্রির জন্য বিচ্ছেদ টেনে দিতে।

ভেতরবাড়ি দিয়ে সন্তর্পণে বুড়ো ছেলের বউকে নিজেদের ঘরে পার করে পুবসদরী ঘরের দুয়ার খুলে হাঁকল, 'কই গো বাপজানেরা, আসো।'

ছেলে কিন্তু তখনো মনে গজরাচ্ছে চৌকির উপর শুয়ে। যদি মনের বাসনা দিয়ে মানুষ নিশ্চিহ্ন করা যেত তবে ইতিমধ্যেই এই অমোঘ অস্ত্রটি প্রয়োগে সে

বিলম্ব করত না।

ছরোয়ার্দী ঘরে ঢুকে দেখে মেঝেতে শুয়েও তিনচারজনের বেশি লোকের কোনমতেই থাকা চলবে না। কিন্তু ওদিকে বুড়োকে অরক্ষিত রেখে চলে যাওয়াও যায় না। তখন সে ঠিক করল কয়েকজনকে সঙ্গে রেখে বাকিদেরকে পাঠিয়ে দেবে নির্দিষ্ট জায়গায়। গ্রামের ছেলে বিমল— সেও থাকল। তারপর খড়ের গাদা এনে জড়াজড়ি করে যাত্রিযাপন।

ছরোয়ার্দীর ঘুম ভেঙেছিল সকালে।

প্রভাতের রেখা চতুর্দিকে বিস্তৃত হচ্ছে। দিনের আলোতে তো আর বেরনো চলবে না। সুতরাং সূর্য ওঠার আগে— মানুষজন জাগবার আগেই অবস্থানের চারপাশটা দেখে আসতে হবে। তাই কাউকে কিছু না বলেই সে বাইরে চলে আসে। সেন্ট্রীরূপে পাহারায় ছিল মোকতাদির। দাওয়ার বাঁশের খুঁটিতে ঠেস দিয়ে ঘুমুচ্ছে। রাইফেলটি পড়ে আছে দূরে। এটিও একটি সাংঘাতিক অপরাধ। অন্যসময় হলে সঙ্গে সঙ্গে ডিসআর্মড করে অন্য শাস্তি বিধানের কথাটি চিন্তা করত ছরোয়ার্দী। আজকে সে সব কিছুই মনে এল না। বরং এক ধরনের মমতা মাখানো চোখে তাকিয়ে দেখে মোকতাদিরকে। আহা ! বেচারা ঘুমুচ্ছে। ছরোয়ার্দীর মনে হয়, ওরা যেন কেউ ঘুমিয়েও ঘুমায় না।

সামনেই তাকিয়ে দেখে হালকা পাতলা সাইজের একটি মেয়ে। বেশ গৌরবর্ণ। গ্রামে সচরাচর এমন বর্ণ দেখা যায় না। তার উপর পরনে হলুদ শাড়ি। দেখেই মনে স্বাভাবিকভাবে হলদে পাখির তুলনা আসে। ছরোয়ার্দী তো জানে না গতরাত্রিতে এই মেয়েটিকেই সে মিলনশয্যা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। সে জন্য অবশ্য মেয়েটির মনে কোনো আক্ষেপ নাই। ছরোয়ার্দীকে দেখেই সে আড়ালে লুকিয়ে যায়। তবে তা কেবল দু'এক মুহূর্তেব ব্যাপার। আবার লক্ষ্যগোচর হয়। ধীর পায়ে এগিয়ে আসে ছরোয়ার্দীর সামনে। অপার কৌতূহল চোখে মুখে, 'আপনারা যুদ্ধ করেন ?'

আমতা আমতা করে ছরোয়ার্দী, 'তা করি, মানে করার চেষ্টা করি।'

মেয়েটি আবার জিজ্ঞেস করে, 'আপনারা মিলিটারি মাবেন ?'

'—মারিতো—মিলিটারি মারার জন্যই আমাদের যুদ্ধ।' একটু থামে। ভাবে মেয়েটিকে কী বলা যায়, আপনি না তুমি ? তারপর দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে সহজ গলাতেই বলে, 'তা তোমাদের এদিকে মিলিটারি নাই ?'

'—এ দিকের কথা বলতে পারমু না। আমিতো আছিলাম বাপের বাড়ি। কালক্যাই আসচি।'

ছেলের ঘরে রাত কাটিয়েছে ওরা। ব্যাপারটা আন্দাজ করে ছরোয়ার্দী মনে মনে লজ্জাবোধ করে। কিছু বলার জন্যই বলে, 'এটা তাহলে তোমাব শ্বশুরবাড়ি ?'

—হ্যাঁ।

'—তাহলে তো'—সহজ হতে চেষ্টা করে ছরোয়ার্দী, 'কালকে রাতে তোমাদের খুব অসুবিধাই করেছি।'

মুহূর্তেই মেয়েটির ব্রীড়ায় একঝলক লজ্জা ঢেউ খেলে মিলিয়ে যায়, 'না না অসুবিধা কী? অসুবিধাতো আপনাদের। বালিশ নাই, বিছানা নাই— কত বড় বড় ঘরের ছাওয়াল আপনারা!'

চুপ করে থাকে ছরোযার্দী—বড় ঘরে বিয়ে করেছিল, সেই কথাটা আবার নতুন করে মনে পড়ে। প্রসঙ্গ পালটানোর জন্য বলে, 'তা তোমার বাবার বাড়ির দিকে মিলিটারি নাই?'

'—ক্যাম্প আছে গঞ্জে। গাঁয়েব মধ্যেও একদিন আসছিলো। এই জন্যই তো আমি চল্যা আল্যাম। তবে মিলিটারি আমি দেখচি। ওই পোশাক পড়্যা মানুষগুলকি জানোয়ার হয়্যা যায়। আপনারা যে লুঙ্গি আর সার্ট পর্যা আছেন, তা দেখ্যা আমার যে কি ভাল লাগতাচে।'

খুশির আতিশয্যে মেয়েটি হয়ত আরো অনেক কথাই বলত। কিন্তু বুড়োর কাশির আওয়াজে সচকিত হয়ে ঢুকে পড়ে বাড়ির ভেতরে। যেতে যেতে বলে, 'উনি ঘুমাতেচেন। বন্দুকটা সরায়ে রাখেন, কওয়াতো যায় না কি অয়?'

ইউনিটের দায়িত্বভার নেবার পর থেকে রিট্রিটের ব্যবস্থা রাখাটাকেই ছরোয়ার্দী সবচেয়ে জরুরি বলে মনে করেছে। কে না জানে, এক অসম শক্তির সাথে যে লড়াই চলেছে, তাতে নিজেদের টিকিয়ে রাখার জন্য এ ছাড়া আর অন্য উপায় কী? তাই গ্রামটা দেখে সে বেশ চিন্তিতই হয়ে পড়ে। ওখানে ঢোকারও যেমন কোনো রাস্তা নেই— বেরুবার পথও তথৈবচ। এ বাড়ির ভেতর দিয়ে ও বাড়ির গোয়ালঘরের পাশ দিয়ে—সে এক দারুণ এলোমেলো ব্যবস্থা। চারপাশটা ঘিরে রাখলে এক্সিটের কোনো পথ নেই। সুতরাং ফিরে এসেই ডাকে, 'বিমল।'

সবাই ততক্ষণে ঘুম থেকে উঠে কেউ মওটার ডাল ভেঙে, কেউ উনুনের কয়লা দিয়ে দাঁত ঘষায় ব্যস্ত। বাড়ির ভেতরটাই ব্যবহার করতে হচ্ছে গোপনীয়তা রাখার জন্য। আঙিনায় খোলা উনুনে ফুঁ পাড়ছে সকালেব দেখা মেয়েটি—এ বাড়ির বউ। পাশে বসে আছে এক বৃদ্ধ মহিলা। তাকে দেখে বিমল সহ অন্যান্য সঙ্গীরাও এগিয়ে আসে। ছরোয়ার্দী কোনো ভূমিকা না করেই বলে, 'বিমল, আমার খুব ভাল মনে হচ্ছে না।'

আমতা আমতা করে বিমল, 'দিনের বেলা নড়াচড়া করবেন ছরোয়ার্দী ভাই?'

—এসে যখন পড়েছি, তখন সন্ধ্যা পর্যন্ত তো অপেক্ষা করতেই হবে। তুমি বরং খোঁজ খবর নিয়ে এস—

মতিজুল বুড়ো বলে, 'পাগল নাকি? দু'চারদিন জিরাও, তারপর তোমাদের যুদ্ধে তোমরা যায়ো বাপজানেরা।'

সকালের নাস্তা নিয়ে আসে বুড়ো। খুদের খিচুড়ি, সঙ্গে বেগুনভাজা। তার পাশে ছেলের বউ। ফোকলা দাঁতে বুড়ো. 'চোত বোশেখে নাহি বিয়া নাই। আমি কিন্তু এসব মানি নাই। সাত মাস হল। বড় লক্ষী পয়মন্ত বউমা আমার।'

ঘোমটা আবো একটু নিচে নামিয়ে দেয় মেয়েটি। হাতে কিন্তু কাজ করতেই থাকে। এগিয়ে দেয় থালা পানি।

ছবোয়ার্দী যখন থাকে তখন কথা বলার দায়িত্ব তার। বলে, 'বেশ ভাল বউ এনেছেন ঘরে। আপনার ছেলেব বউ তো আমাদের বোন। তা বুবু, তোমার নাম কী ?'

মতিজুল বুড়োব ছেলেও খেতে বসেছে। ওদেব সঙ্গে। সে মুখটা গোঁজ কবে বসে থাকে। চোখ দুটো জ্বলে। সকালবেলাতে বেরিয়ে গিয়েছিল ! ফিরছে কেবল।

টিয়া আস্তে করে বলে, 'টিয়া।'

'—খুব সুন্দর নাম তো। পাখির নামে নামে' —কথা বলতে বলতে ছবোয়ার্দী হাসে। তাব সঙ্গীরাও হাসে। কেবল মুখটা গোমড়া করে বসে থাকে মতিজুল বুড়োর ছেলে। ছরোয়ার্দীই বলে, 'পাখির নামে নাম হলেও তুমি তো আব উড়তে পাববে না। তবে তুমি বাঁধতে পার নিশ্চয়ই। এই সুন্দর খাবারগুলো তো তুমিই রেঁধেছো ?'

হাসে টিয়া। নিঃশব্দ হাসি। জ্বালা ধরে মতিজুল বুড়োর ছেলেব বুকে। টিয়া বলে. 'না, আমি এখনো রানতে শিখি নাই। আম্মাজান রানচেন।'

ছরোয়ার্দী আবার বলে, 'আম্মাজান অনেকদিন বেঁচে থাকুন। তবে সংসারের কাজকর্ম তো তোমাকেও শিখ   হবে। ভাল কবে রান্নাবান্না শেখ। যুদ্ধ শেষ হলে একদিন এসে তোমার হাতের রান্না খেয়ে যাব।'

কথা শুনে টিয়া বলে. 'আমাগোরে কী আব ত্যামন কপাল অবো। আজকা কোন ভাগ্যে আমাগোবে বাড়ি আসচেন। যহন চল্যা যাবেন তহন সব ভুল্যা যাবেন।'

টিয়াব সাথে কথাবার্তা ওই পর্যন্তই। খাওয়ার পর গড়াগড়ি আর ঘুম। দিনেব বেলাব কাজ এই। মোকতাদিব মতিজুল বুড়োব ছেলেকে ডাকে. 'আসুন তাস খেলি।'

ছরোয়ার্দী তাস খেলে না। আর চারজন না হলে খেলাও জমে না। তাই এই ডাকাডাকি। ঘনিষ্ঠ হবার জন্যও বটে।

মতিজুল বুড়োর ছেলে বলে. 'না, আপনাগারে মত খাইলে আর ঘুমালে আমাগারে চলে না। আমার কাজ আছে।'

কথাগুলো বাঁকা না সোজা বোঝা যায় না। গতবাতেও ছরোয়ার্দী দু'একবাব বলার চেষ্টা করছে। তেমন এগোয়নি। ভেবেছে এমনিতেই বোধ হয় কথাবার্তা কম বলে।

মতিজুল বুড়োর ছেলের খটকা বেঁধেছে সকালবেলাতেই। ছরোয়ার্দী উঠবার পরপরই সে ও উঠেছিল। কিন্তু আঙিনায় টিয়ার সাথে কথা বলতে দেখে আর এগোয়নি।

বলা তো যায় না। হাতে অস্ত্র আছে। মেরে ফেলতে তো আর সময় লাগবে না। সুন্দরী বউ নিয়ে এমনিতেই তার দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। তারপর এই সব লেখাপড়া করা জোয়ান ছেলেরা রয়েছে সামনে।— আব্বাও যেন কী?—কথা নেই বার্তা নেই, কোথাকার সব না-চেনা লোকজন ঢুকিয়েছে বাড়ির ভিতরে, —রাগে তার সারা শরীর জ্বলতে থাকে, —কে জানে কতদিন থাকবে?

এসব ভেবে অস্থিরতা বেড়ে যায় তার। এই সময়ের মধ্যে টিয়ার সাথে যদি কারো— সে আর ভাবতে পারে না, মাথায় আগুন দাউ দাউ জ্বলে।

এক ফাঁকে টিয়াকে ধমকায়, 'উঠানের মদ্যে এত কী কাম পড়চে? ঘরে যায়্যা বস্যা থাকা যায় না?'

তখন জানতে চায় টিয়া, 'কেন? কী হচে?'

'—হবে আর কী? মেয়ে মানুষের পর্দাপুসিদার মধ্যেই থাকা ভাল।'

এসব কথার তাৎপর্যও টিয়াও বুঝতে পারে। স্বামীর সন্দেহকাতরতায় তার মনটিও ছোট হয়ে যায়। এমনটি নতুন নয়। এর আগেও বহু পরিচয় সে পেয়েছে। এবার সে বিগড়ে যায়, 'সব তাতেই তোমার সন্দ।'

টিয়ার ওই কথায় মতিজুল বুড়োর ছেলের সন্দেহ আরো গাঢ়তর হয়। কথার পরে কথা বলে টিয়া যেভাবে সাফাই গাইছে, তাতে ঘটনা সত্য হওয়াই স্বাভাবিক। সকালবেলায় দেখা দৃশ্যের ছবিও তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সে ভাল করে তাতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে টিয়ার চোখ মুখের ভাষা পড়তে চেষ্টা করে। গজ গজ করে বলে, 'সন্দ-টন্দ কিছু নয়— যা বললাম তাই কর।'

বলেই বেরিয়ে পড়ে বাড়ি থেকে। নিজের চেহারাটা লুকানোরও প্রয়োজন ছিল! ভাবে নেকবর আলির সাথে পরামর্শটা করে ফেলাই ভাল।

সকালবেলাতেও একবার গিয়েছিল সেখানে। এর আগে নেকবর আলি তাকে বুঝিয়েছিল, 'এসব যুদ্ধফুদ্ধ সব ভুয়া। কতকগুলো ছেলেছোকরা চুরি-ডাকাতি করার জন্য রাইফেল বন্দুক জোগাড় কর্যা এহন গেরামে গেরামে খাওয়া দাওয়া করত্যাচে।'

কাজেই মুক্তিবাহিনী যখন এসে তাদের বাড়িতেই উঠল, তখন একবার ভেবেছিল নেকবর আলিকে কথাটা বলে বুদ্ধি পরামর্শ করাই ভাল। কিন্তু ঠিক সাহস হয় নাই। মুক্তিবাহিনী যে আবার দালালদের মারে। আর কথাটা যদি ফাঁস হয়ে যায়, তবে তাকে আর খাতির করবে না। কিন্তু এখন টিয়ার ব্যাপারটা যেভাবে এগোচ্ছে, তাতে তো আর চুপ করে থাকা যায় না। কথা শুনে নেকবর আলির চোখ তো চড়কগাছ, 'করচ কী? এ্যাহনো এ খবর ক্যাম্পে পৌঁছাও নাই। দেশের দুশমন, জাতির দুশমন! বাড়িতে থাকলে কী মা বোনের ইজ্জত থাকবে। পরিণাম চিন্তা কর নাই!'

ঠোঁট চাটে মতিজুল বুড়োর ছেলে, 'আমি কী করমু? আব্বা নিজে ডেকে আনল।'

'সর্বনাশ! তোমার আব্বা নিজে ডাক্যা আনচে? ও কথা আর কারো কয়ো

না। ফাঁসি অবো ফাঁসি। গাড়ির চাকায় বান্দ্যা রাস্তায় ছুটাব। তোমার বাপরে বোঝাও। আর এই কথা যদি মিলিটারি পায়, তবে গেরাম জ্বালিয়ে দিব। গেরামের সর্বনাশ অবো। তোমার ফরজন্দরে বুঝাও।'

আবারো ঠোঁট চাটে মতিজুল বুড়োর ছেলে, 'আব্বা তো বুঝবো না।'

'বুঝবো না তো বুঝবো না,' —কুটিল হাসি হাসে নেকবর আলি, 'এ কাম তালি তোমাদের করতে অবো। শোন, —মুখের কাছে সে মতিজুল বুড়োর ছেলের কান নিয়ে আসে, 'উপায় একটা আচে। তুমি যদি শান্তি-কমিটির হয়্যা খবর দাও, তালে কারোরই কিছু অবো না। এনামো মিলব। তুমি সন্ধ্যার আগেই ক্যাম্পে যাও। তোমার বাপরে কিছু জানায়ো না। বুঝলা, আমিও তোমার হাথে যামু। চিন্তার কোনো কারণ নাই।'

দুপুরে খাওয়ার সময় টিয়া আর এল না। ব্যাপারটা লক্ষ্য করার মতও নয়। ছরোয়ার্দীও সারাদিন শেল্টার বদলানোর চিন্তাতেই নিমগ্ন ছিল। প্রতিটি মুহূর্তের চেয়ে পরবর্তীটি তার কাছে দীর্ঘতর বলে বোধ হচ্ছিল। কখন সন্ধ্যা আসবে—কখন রাত্রি হবে— এই ছিল তার মনের মধ্যে ব্যাকুল জিজ্ঞসা।

এদিকে মতিজুল বুড়োর ছেলে দেখল বাড়িতে যেয়ে আর কাজ নেই। নেকবর আলির বাড়িতেই সে চাট্টি খেয়ে বেরুল ক্যাম্পের উদ্দেশে। দুপুরে খাবার জন্য তার এই না আসাটা অন্যদিন হলে টিয়ার তেমন কিছু মনে হত না। কিন্তু আজকে কেমন জানি অজানিত আশংকা বুকের ভেতর দুলতে থাকল। সন্ধ্যার আগে সে আর কিছুতেই স্থির থাকতে না ে রে পাশের বাড়ির একটি ছেলেকে ডেকে খোঁজ করতে পাঠাল।

ছেলেটি খবর নিয়ে ফিরে এল কিছুক্ষণের মধ্যেই। নেকবর আলির সাথে সে দুপুরের পর দক্ষিণে গিয়েছে।

তবে কোথায়। তা কেউ জানে না।

নেকবর আলির কথা টিয়া তার শ্বশুরের কাছে শুনেছে। বুঝতে আর বাকি থাকে না। স্বামী তার কোথায় গেছে।

তারপর যে কী হবে, তাও পরিষ্কার।

খবর শুনেই সে দৌড়িয়ে ছরোয়ার্দীদের ঘরের ভিতর ঢোকে।

ছরোয়ার্দী কী করবে, কিছুই ঠিক করতে পারছিল না। বিমল তখনও ফিরে আসেনি। টিয়াকে হন্তদন্ত হয়ে ঢুকতে দেখে সে কিছুটা আশ্চর্যই হয়ে যায়। টিয়া ব্যস্ত কণ্ঠে বলে, 'আপনারা পালান ভাই, দয়া কর্যা যেখানে পারেন পালায়া যান। একখুনি —এই মুহূর্তেই। আমার সোয়ামী ক্যাম্পে গ্যাচে মিলিটারিদের খবর দিতে।'

মতিজুল বুড়োর বাড়ি থেকে বেরুতে সময় লেগেছিল এক মিনিটেরও কম।

আর নিরাপদ জায়গাতে আশ্রয় পেতেও অসুবিধা হয়নি কিছুই।

পরদিন সকালবেলা। নিশ্চিন্ত নিদ্রার পর জেগে উঠেছে সবাই। প্রভাত সূর্যের আলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে আমলকীর ডালে—দেবদারুর পাতায়। রিক্ত মাঠের ধোঁয়াটে কুয়াশা মিলিয়ে ধীরে ধীরে শুকিয়ে যাচ্ছে শিশির।

খবরটা নিয়ে এল মাতিয়ারই।

কাল রাতেই মিলিটারি এসেছিল। সেখানে তারা প্রথমে টিয়াকে বেইজ্জত করেছে। তারপর তাকে মেরে রেখে গেছে।

অমল তরণী

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত

সে-সময় পুলের ওপরে গাড়িটি চলে যেতে থাকে। গাড়ির মাথায় ধোঁয়া ছিল। ধোঁয়া মাঝির কল্কে থেকেও বেরোয়। মাঝি পরিতোষে ধুমপান করে। পুলের ছায়া অন্ধকার নদীজলে অতিকায় হয়। এবং অন্ধকারে গাড়ির শব্দ হতে থাকে।

পুলের নিচে নৌকাবাসীরা নানারকম শব্দ করে। স্থানটি তাদের রাত্রির আশ্রয়। অদ্ভুতদৃশ্য নৌকাটিতে আশুতোষ ছইয়ের বাইরে যুগপৎ নিঃশব্দ ও স্থির, ধুমপানে রত। ছইয়ের ভেতরে সুখেন জলযাত্রাজনিত ক্রোধে কম্পমান।

আশুতোষের সঙ্গে ঘরভাঙা তৈজসপত্র ও বাসন ইত্যাদি আছে। দু'টি চৌকি, তেপায়া, ক্ষুদ্রাকার টেবিল ইত্যাদিও আছে। তিনি জীবিত প্রাণীকুলের একটি করে জোড়া সঙ্গে নেননি। আশুতোষের সঙ্গে চল্লিশ দিনের রসদ নেই। আশুতোষের নৌকায় কোনো স্ত্রীলোক নেই। ফলে, মহাপ্লাবনের শেষে নবপৃথিবীর স্বপ্ন নেই। মহাপ্লাবনের কোনো প্রস্তুতিও নেই। মাঝি যখন সকালে নূহ নবীর গল্প করেছিলো, আশুতোষ ভীত হননি।

আশুতোষ কোথায যাচ্ছেন ? আশুতোষ, ঘর ভেঙে ভেসে যাচ্ছেন ? আশুতোষ, ভিন্ন আশ্রয়ের সন্ধানে যাচ্ছেন ? আশুতোষ, বাসস্থান বদলাচ্ছেন কেবল ? মৃতা স্ত্রী, জ্যেষ্ঠা কন্যা সুদূরে বিবাহিতা, পুত্রটি বিদ্যার্থী, কনিষ্ঠা কন্যা অপরের গলগ্রহ, অপর দুই পুত্রদ্বারা পরিত্যক্ত আশুতোষ বড় অসহায়। আশুতোষ অনাত্মীয় আত্মীয়ের নৈকট্যে বলবান হতে চান।

গ্রামের ঘাটে শেষবারের মতো পৈতৃক ভিটের দিকে তাকিয়েছিলেন আশুতোষ। নদীর ঘাট থেকে সব স্পষ্ট দেখা যায়। এমনকি যে আমগাছটির শাখা নলিনীর চিতা তৈরি করে, সেটিও অদৃশ্য নয়। তখন চোখ কাছে আনলে ঘাটে গ্রামবাসী সুহৃদবর্গ ক্ষীয়মান, বিষণ্ণ। স্ত্রীগণ রুদ্যমানা। আয়েত আলি দু'পা বাড়িয়ে আশুতোষের

হাত ধরে এবং "আশু, কী করছি, কী দোষে আমাগরে ছাড্যা যাত্যাছ" ক্রন্দন সহকারে এই কথা বলার চেষ্টা করে। আশুতোষ যেন ভয়ঙ্কর অপরাধী, আশুতোষ প্রতিকারপ্রার্থী, আশুতোষ যেন ভবিষ্যতের আশাহীন, কপালে হাত রাখেন এবং অদৃষ্ট, অদৃষ্ট অদৃষ্ট বলতে বলতে আবাল্যের হোরাসাগরে পদপ্রক্ষালন করে নৌকায় উঠে বসেন। সুখেন বাক্যহীন দৃষ্টি মেলে সমগ্র ব্যবস্থার প্রতি প্রতিবাদ জানায়। সে দূরে ওই জামরুল গাছ, ওই চিনি-পাতা আম, ওই সেই লেবুগাছ যার নিচে গ্রাম্যবালারা তার মনস্তুষ্টির চেষ্টায় রত থাকত, দেখতে থাকে।

হোরাসাগরের বোয়াল ভাল, হোরাসাগরের সরপুঁটি ভাল, ভাল হোরাসাগরের টাটকিনি। নদী আর বাড়ির মাঝের সড়কে আশুতোষ যৌবন লাভ করেন— সেই সড়কে প্রত্যাগমনরত আয়েত আলি।

ক্রমে অনাদৃতজন ক্ষুদ্রাকার হয়। আশুতোষ সারাদিন তাই ছইয়ের বাইরে বসে থাকেন। মাঝিরা দাঁড়ে, গুণে, পালে এগিয়ে যায়। আশুতোষ মাঝে মাঝে গলাখাঁকারি দিয়ে গান গাইবার চেষ্টা করেন, "অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া"—আশুতোষ একসময় স্টার থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, আশুতোষ পৈতৃক-সম্পত্তি থেকে অন্যায়-বঞ্চিত, কিছু বিনষ্ট, আশুতোষ বিষয়বুদ্ধিহীন, অসহায়, অবশেষে পৈতৃকবাসভূমি পরিত্যাগকারী, "দেখি নাই কভু শুনি নাই কভু এমন তরণী বাওয়া" সুরটি গলায় বসে না। হাওয়াটি কখনো মৃদুমন্দ ছিল না।

দুপুরে সুখেন অগত্যা রান্নার চেষ্টা করে। আশুতোষের বড়োই ক্ষুধার অভাব, তবু ভেতরে যান এবং স্থির করেন, রাতে তাঁকেই দায়িত্বশীল হতে হবে।

'সরোজিনী মেমোরিয়াল লাইব্রেরি'র এক ভগ্নাংশ মাত্র আশুতোষের সঙ্গে ভেসে চলেছে। সরোজিনী অবশ্য চেয়েছিলেন, তাঁর পুত্র গ্রামে প্রথম পাস করুক। সুদীর্ঘ প্রবাসে আশুতোষ মাতৃহীন। পরে সরোজিনী অকালমৃতা। তবে আশুতোষ বিদ্যোৎসাহী হন এবং তাবৎ পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা সহকারে বারবাড়িতে যে পাঠাগার ছিল তার ভগ্নাংশ মাত্র তাঁর সঙ্গে ভেসে চলে।

দুপুরের দিকে একবার ভেবেছিলেন কী বই সঙ্গে যাচ্ছে তার একটা তালিকা তৈরি করা উচিত। এ কাজে সুখেন কি সহায়ক হবে? কেন না সে বিদ্রোহী, আশুতোষ যথার্থ শাসনে অক্ষম। তবুও ইছামতী দেখে আশুতোষ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন। ইছামতীর মোহনায় নৌকা নাচতে থাকে। মাঝিরা দাঁড় টানে। বিকাল হয়ে যায়। সুখেন নৌকার পেছনে হালের মাঝির কাছে বসে থাকে। আশুতোষ এই সময় ছায়া নামক তাঁর কনিষ্ঠা কন্যাটির সুব্যবস্থা চিন্তা করেন এবং অবনী ও মণীষ কি সঠিক পথে চলে যায়নি এই সন্দেহের সূত্রপাত করেন। আশুতোষ কার্যোপলক্ষে বাইরে থাকতেন, অনেক কথা শুনেছেন, অনেক কিছু দেখেছেনও। কিন্তু আশুতোষ নিরুপায়।

প্রথম রাত্রি শাহজাদপুরের ঘাটে কেটেছিল। আশুতোষ দু'বার রবীন্দ্রদর্শন

করেছেন। আশুতোষ খবরের কাগজের কথা ভাবলেন। শাহজাদপুরের ঘাটে স্তব্ধতা, পদ্মায় বোট ভাসে না, কেবল "আমায় পার করে নাও" এই গানটি গীত হতে থাকে। ধরণীর ভাই তরণীর কথা সুখেনের মনে পড়ে, তরণী গোয়ালন্দের ঘাটে যায়, আর আসে না। সে-ও কি দাদাদের মতো গোয়ালন্দের ঘাটে যেতে পারে না।

নৌকায় মৃদু দোলা। মাঝরাতে হাওয়া দিল। শেষ রাতটুকু ঠাণ্ডা, শাহজাদপুরের ঘাটে ডাকাত পড়ে না। অনেক রাতে ঘুম ভেঙে জাগরিত আশুতোষকে মাঝি সুনিদ্রার পরামর্শ দিল "বাবু, সারারাত বস্যা থাকপেন ? ঘুমাব্যার যান ?"

পরে শাহজাদপুর দূরে চলে যায়। শূন্য নদীতে ভাসা। তখন নদী অনেক বড় হয়। লোকালয় ছিল না। কোনো বন্দর না, কোনো নৌকা না।

বড় নদী নিস্তরঙ্গ। কেবল ছোট ছোট ঢেউ নৌকাপৃষ্ঠে আঘাত করে। পশ্চিমাকাশ রক্তিম হয়। দিগ্বলয় বিষণ্ণ হয়। চরাচর একা হয়। এই সময় আশুতোষ একটি মৃদু হুইসিলের শব্দ শুনতে পান। বংশীধ্বনি নয়, তাহলে কী ? শূন্যতার শব্দ থাকে না ভেবে আশুতোষ চরাচরে দৃষ্টি মেলে দ্বিতীয় জলযান দেখতে পান না। তাহলে এই নদীর আড়ালে কি আর-এক নদী আছে যেখানে বংশীধ্বনিসহকারে স্টিমার চলে যায় ? শব্দটি মৃদু কিন্তু অনেকক্ষণ একটানা চলে। সুখেনও শব্দটি শুনে থাকবে এবং 'এই নদীতে স্টিমার চলে' ভাবনা তাকে উৎফুল্ল করে। জলে ভাসা তার পছন্দ ছিল না আর। নৌকার মধ্যে পাটাতনের বিছানায় দিন কাটে। কখনো বা হালের কাছে। ছইয়ের ওপরে যেতে মাঝিরা বারণ করে। কারণ, ছইয়ের দু'পাশে দু'খানা চৌকি,পায়াগুলো আকাশের দিকে করে বাঁধা আছে। এইটিই নৌকাকে অদ্ভুতাকৃতি দিয়েছে। সুখেন ছইয়ে চড়ে না তাই।

সেদিন অন্ধকার ঘন হলেও আশুতোষ কোন বন্দর পাননি। উদ্বেগ কিছুটা ছিল, গ্রামেরও কোন চিহ্ন দেখা যায় না।

ভোরে আকাশে মেঘ। আলো স্পষ্ট হওয়ার আগেই দু'ফোঁটা বৃষ্টি পড়ে যায়। মাঝি আকাশের দিকে চেয়ে নিশ্চিন্ত হয় এবং পুলের নিচে থেকে নৌকা সরিয়ে এনে উদ্দিষ্ট বন্দরের পথে যায়। নগরের নির্দেশক রেলপথ সুখেনকে আকর্ষণ করে, বিদ্রোহী করে এবং ক্রুদ্ধ করে। অনেক দূরে গেলে পুলটি চোখে ছোট হয়ে আসতে থাকে ও ভোরের ট্রেনটি হাঁসফাঁসে পুলের ওপরে ওঠে দেখা যায়। গুম গুম শব্দটি বেশ কিছুক্ষণ করে বেজে যায়। নদীর বাঁকে ক্রমে পুল ঢাকা পড়ে।

ঝড়ের আভাস থাকলেও এ-সময়ে প্রাতঃকালে ঝড় হয় না। তবে বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা পড়ে। বৃষ্টি খুব প্রবল হয়। বর্ষা শেষ শরৎসহ, হেমন্তী বিষণ্ণতা কেউ বোঝে না। বৃষ্টি খুব জোরে হয়। মাঝিরা দাঁড় বন্ধ করে দিতে চায় তীরে ভিড়িয়ে। আশুতোষ একবার মহাপ্লাবনের কথা বলেছিলেন বুঝি, মাঝির হাস্যধারা আসন্ন শীতে মহাপ্লাবনের সম্ভাবনা উপেক্ষা করে।

গন্তব্য দূরে। উদ্দিষ্ট মধ্যপথবর্তী বন্দরের পথে রোদ উঠতে থাকে। বন্দরটি নদী থেকে দূরে থাকায় আশুতোষ নেমে যান। বন্দরের ব্যবসায়ী ভজহরি আশুতোষকে চেনে। আশুতোষ কেন নৌকায় দিন কাটান জিজ্ঞাসা করে। বৃত্তান্ত তাকে সুখী করে না। কিন্তু আশুতোষ বড় অসহায়, নিরুপায়। আশুতোষ বাজার সেরে আবার নৌকায় ফিরে আসেন।

সুখেন নামতে চায়নি। সুখেন মুখ ভার করে মাছ কেটে দেয়। 'সব কিছু ছড়িয়ে ফেলে দেব' তার এই ইচ্ছাকে আশুতোষ থাপ্পড় মারতে চান। আশুতোষ রান্না করেন এবং ভেসে যান।

মৃতপতিসহ বেহুলাও ভেসে যায়। বেহুলা কিন্তু স্বর্গে যায়। নৃত্যকলায় পরিতুষ্ট দেবগণ মৃত পতিকে পুনরুজ্জীবিত করে দেয়। বেহুলা সপতি এ দীর্ঘকাল সুখভোগ করে। আশুতোষ সর্বকলাহীন।

মহাপ্লাবন পঙ্কিল এক পৃথিবীকে ধুয়ে দেয় নূহ নবীর জাহাজে পুণ্যাত্মাদের নবজীবনের জন্যে। সে বড় প্রাচীন কাহিনী।

পরবর্তী বন্দরে আশুতোষের ভাগ্নীজামাইয়ের ব্যবসা এখনো চলে। সেখানে পৌঁছে রাত কাটানো স্থির হয়। সুখেন এই সুযোগ নিতে চায় অর্থাৎ সেখান থেকে স্থলপথে গন্তব্যে পৌঁছানর কথা বলে। আশুতোষ নির্মম। নৌকা ভিড়িয়ে আশুতোষ সুখেনকে পাহারায় রাখেন।

বীণার বর, ভাগ্নীজামাই, কোন মন্তব্য করে না। তার অসন্তোষ স্পষ্ট ছিল। সে ছায়া অর্থাৎ আশুতোষের কনিষ্ঠা কন্যাটির ভবিষ্যত নিয়ে কালাতিপাত করে। সুখেনও তার শিরঃপীড়ার কারণ হয়। পিতৃঘ্ন অবনী ও মণীষ তার সমর্থন লাভ করে। আশুতোষ নৌকায় ফিরে আসেন। বীণার বর ভোরে ঘাটে আসতে চায়।

আশুতোষ ঘাটে এসে দেখেন মাঝিরা একাকী। সুখেন নাকি বাজারে বেড়াতে গেছে। আশুতোষ প্রথমে ক্ষিপ্ত হন। কিন্তু মাত্র চতুর্দশবর্ষীয় পুত্র তাঁকে কি উদ্বেগ দেয়। এমন সময় সুখেন বিনাবাক্যে নৌকারোহণ করলে মাঝিরা অনেক কষ্টে তাকে উদ্যত আঘাত থেকে রক্ষা করে।

রাতে রান্না হয় না। আহরিত মিষ্টদ্রব্য পর্যাপ্ত হয়। আশুতোষ একসময় নির্ভার ছিলেন, নলিনী তখন জীবিতা। আশুতোষ এখন আর পারেন না। আশুতোষ বড়ো দুঃখী, কেননা মৃত্যু কামনা করেন।

মধ্য রাত্রিতেই সম্ভবত, ছইয়ের ঝাঁপ খুলে কেউ ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করে। সদ্য নিদ্রিত আশুতোষ অচিরেই সেই দুষ্কর্মীর অভিলাষ টের পেয়ে যান। মাঝিরা ঘুম ভেঙে সোরগোল করে। আশপাশের দু'একটি যানও সচকিত হয়। তখন আশুতোষ বড় বিপন্ন বোধ করতে থাকেন। পাদপ্রদীপের আলোয় আসতে ভয় ছিল বরাবরের। ইচ্ছা ছিল প্রস্থান যেন নিঃশব্দে হয়। পাছে আলো ফুটলে ভাগ্নীজামাই ঘাটে আসে

এবং বাক্যহীন তিরস্কারী দৃষ্টি মেলে দেয় এজন্যে শেষ রাতে আশুতোষ নৌকা খুলে দেন।

নদী তখন ক্রমে ছোট হয়ে আসে। বড় নদী ছেড়ে, শাখা নদী ছেড়ে ছোট নদীতে ঢোকা হয়। বর্ষা এই নদীকে পরিপূর্ণ যৌবন দিয়েছিল, কিন্তু সে ধরে রাখতে পারেনি! স্রোত নেই তবু নৌকার দু'পাশে ছল্‌ছলাৎ শব্দ উঠতে থাকে।

হিসাব মেলে না। পাঁচদিন চলে যায়, গন্তব্য এখনো দূর। মাঝিরা আশাবাদী। কিন্তু সুখেন অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। আর সে পারে না। আশুতোষ অনেক সহজে পারেন। সারা জীবন ভেসে যেতে পারেন।

গত দু'দিন আশুতোষে সুখেনের কোন সাহায্য ছিল না। সে কিছু করতে চায়। শারীরিক নির্যাতন কোনো পথ নয় আশুতোষ জানেন। আবার, প্রয়োজনীয় কঠোরতা আশুতোষে অনুপস্থিত।

সুখেন এখন হালে বসে। হালমাজির সাগরেদ সে। আশুতোষ নিষেধ করেন। সুখেন শোনে না। সে এখন এই ছোট নদীতে পেশাদারী চালে হাল ধরে। আশুতোষ শঙ্কিত হন। কেননা, শক্ত হাতে হাল ধরে বসে থাকা বড় কঠিন।

ছোট নদীর দু'পাশে জনপদ এখন ঘন। স্নানরতা পল্লীবালা, জীবিকাসন্ধানী ধীবর, খেয়াঘাটের মাঝি এখন অনেক দ্রুততায় আসে এবং যায়। নদীর জলে সর্বত্র খেয়া চলে না। বাঁশের সাঁকো সেখানে অবলম্বন। মাঝনদীতে জল কিছু বেশি এবং সাঁকো তুলে বিদেশী নৌকা কষ্টে যাতায়াত করে।

গ্রাম্য বালকেরা ছইয়ে চৌকি-যুক্ত নৌকাটিকে পরম কৌতূহলভরে নিরীক্ষণ করে। সুখেন হাল ধরে বসে থাকে। বালকগণ এই ভিন্নরূপী কিশোরকে পরম শ্রদ্ধায় কর্ণধারের সম্মান দেয় এবং তন্মুহূর্তেই একটি সাঁকো পারকালীন চৌকির একটি পায়া সাঁকোব বাঁশে লাগে, ভেঙে যায়, জলে পড়ে যায়। সমস্ত নৌকা এতে রীতিমত আন্দোলিত হয়। ছোট নদীর অতো শক্তি নেই অনুমান করে আশুতোষ বাইরে আসেন। মাঝি ততক্ষণে লগির সাহায্যে ভাঙা পায়াটাকে তুলে নেয়।

সুখেন মাঝির হাতে হাল সমর্পণ করে। কিন্তু ক্রুদ্ধ আশুতোষ জানেন, শক্ত হাতে হালধরা কঠিন কাজ, এবং এই বয়সেই সেই পরিচয় প্রকাশ পাওয়া উচিত নয়। এ-সময়ে সুখেন প্রকৃতই একটু কেমন হয়ে গেছিল। তার বিদ্রোহী ভাবটি কিছু সময়ের জন্যে উড়েছিল। আশুতোষ হাল মাঝির কথা শোনেন না, সুখেনকে একটি চপেটাঘাত করেন। পাড়ে সমবেত বালকবৃন্দ হাস্য করে।

সমস্তদিন নৌকায় একটি থমথমে আবহাওয়া। সুখেন অন্নস্পর্শ করে না। অসহায় আশুতোষ ছোট নদীর কূলে নৌকা ভিড়িয়ে আর এক রাত্রি নিদ্রাগত হন।

ভোরে নৌকা ছাড়ার সময় সুখেনকে ভেতরে দেখা যায় না। আশুতোষ ভাবেন সে মাঠে গেছে। কিন্তু বেলা ফুটে যায় সুখেন ফেরে না। আশুতোষ তখন নেমে যান। মাঝিদের দু'জন নেমে যায়। তারপর তারা নদীর দুই তীর হরিদ্রাভ শস্যক্ষেত,

সংকীর্ণ বনপথ, কৃষকের কুঁড়েঘর সর্বত্র সুখেনকে খুঁজে ফেরে। কোথাও সুখেন ছিল না।

'ফিরে আয় ফিরে আয়', অব্যক্ত ক্রন্দন সহকারে আশুতোষ ফিরে আসেন। মাঝি সান্ত্বনা দেয়, 'বাবু ও মোটরে কর‍্যা চল্যা গ্যাছে।' আশুতোষ শিশু, আশুতোষ অবুঝ, আশুতোষ সর্বহারা, আশুতোষ জানেন, সুখেনও ওই দুই কৃতঘ্নের মত তাঁকে ছেড়ে চলে গেছে।

সারাদিন সেই পলাতকের সন্ধান চলে। বেলা চলে যায়। মাঝিরা নির্দেশের জন্যে অপেক্ষা কবে, আশুতোষ কোনো আদেশ দিতে পারেন না।

মাঝিরা স্থির করে এই রাত্রিতে বিশ্রাম নিয়ে শেষ রাত্রিতে যাত্রা শুরু করবে। আশুতোষ সারাদিন অভুক্ত, তিনি কোনো মিনতি, অনুরোধ কিছুতে কর্ণপাত করেন না।

শেষ রাত্রির অন্ধকারে মাঝিরা স্বেচ্ছায় ও স্বনির্দেশে নৌকা খুলে দেয়। রাত্রিটি বড় অন্ধকার ছিল। চরাচরে শব্দ ছিল না। বাঁশবনের শনশন হাওয়া রাত্রিচর কীটের রব, প্রহর ঘোষণাকারী শিবা কতিপয় দূরে উল্লাসরত। তাহার, আলো নেই, তবু সেই তারাই দিকদর্শী।

প্রভাতে, ক্লান্তি ও জাগরণে আশুতোষ নিদ্রা যান। ঘুম ভাঙে পরিষ্কার আলোয়। আশুতোষ বাইরে আসেন। দেখেন এ নদী। রাত্রির অন্ধকারে নিরাপদ নদী সুখেনের মতই তাঁকে পরিত্যাগ করে চলে গেছে। এ নদী অনেক বড। এ নদীতে ঢেউ আছে। এ নদীতে ঝড় হয়। এ নদী মমতাহীন।

মাঝিরা উদ্বিগ্ন। তাদের মুখে চিন্তার আভাস স্পষ্ট। রাতের অন্ধকারে তারা কি পথ ভুলে ভিন্ন নদীতে এসে গেছে? গ্রামের কোনো নিশানা নেই, তাই তারা দাঁড় টানে।

আশুতোষ বলেন, 'ঘাটে যাবে কখন, মাঝি?'

মাঝি জানে না। জনমনুষ্য মিললে সে জিজ্ঞাসা করতে পারে।

আশুতোষ বাইরে এসে বসে থাকেন। নদীটি বিশাল। ঢেউ মৃদু। কিন্তু বাতাস সহযোগে যে কোন মুহূর্তে ফুঁসে উঠতে পারে। মাঝিদের অস্ফুট আলাপ কানে আসে, 'তাই তো এ অ্যালাম কনে?'

আশুতোষ বসে থাকেন। তিনি আর কারো কথা শোনেন না। হাতে তালি দিয়ে তিনি গানটি গাইবার চেষ্টা করেন, "অমল ধবল পালে লেগেছে"। গানটি সুগীত হয় না।

আশুতোষ দিগন্তে চেয়ে থাকেন, এবং দেখেন দাঁড়হীন, পালহীন, মাল্লাহীন তাঁর নৌকাটি ছোট নদী ছেড়ে শাখানদী, শাখানদী ছেড়ে বড় নদী, তারপর বিশাল নদীতে দিগ্বলয়হীন গন্তব্যে ভেসে যাচ্ছে।